

চতুর্থ ভাগ। } আষাঢ়, ১৩০৮। { ৭ম সংখ্যা।

বর্ষা-আবাহন।

১

এস নীল নভে নিবিড় মেঘের
কুন্তলজাল মেলিয়া,
জড়ায়ে তাহারে স্বর্ণ-সাপিনী
বিজলী বেড়াবে খেলিয়া!

২

জগৎ জুড়ানো ছায়াখানি তাব
বসনের সম পরিয়া,
নব নীপ-ডালা ধরিয়া মাথায়
ধরা ল'বে তোমা' বরিয়া!

৩

উল্লাসে বায়ু এ শুভ বারতা
কাননের কাণে কহিয়া,
রুদ্ধ দুয়ার আঘাতি' আবেগে
উচ্ছ্বাসে যাবে বহিয়া!

৪

ধবল পতাকা উড়ায়ে বলাকা
দলে দলে আগে যাইবে,
দু'কূল ডুবায়ে আকুলা-তটিনী
হৃদয়ে ধরিতে ধাইবে।

৫

সিক্ত শ্যামল অঞ্চলখানি
এস গো ভূতলে লুটা'য়ে,
পরশ হরষে সরস কাননে
মল্লিকারাজি ফুটা'য়ে!

৬

দিগন্ত-ঘন-বনরেখা শিরে
ঘনতর কালী আনিয়া;
স্নিগ্ধ সজল-নয়নে তোমার,
কাজল দিবেক টানিয়া!

৭

অম্বর-কবি গম্ভীরস্বরে
বন্দনা গাথা গাহিবে,
ঝরিবেক ধারা, ভাবরাশি যেন
নবীন ছন্দে নামিবে।

৮

মন উপবন উন্মুখ হ'য়ে
সে সলিল পান করিবে,
গাঁ ভকার ফুল যূথিকার মত
চরণের তলে ঝরিবে।"

শ্রীবিনয়কুমারী বসু।

কদম্ব।

নিদাঘের অবসানে
তৃপ্ত পাপিয়ার গানে
পুলকে শিহরি উঠে কদম্ব কুসুম।
সজল সমীরে তার
বহিয়া সৌরভ ভার,
ভাঙে জগতের চোকে বিরহের ঘুম।

তাহারি মধুর বাসে
স্মৃতি পরশিয়া আসে,
দূর দ্বাপরের সেই অতীত কাহিনী—
বিধুরা ব্রজের বালা,
কপট কঠিন কালা,
কালো কালিন্দীর ধারা,—আনন্দ-বাহিনী।

হেরিয়া রোমাঞ্চ তা'র,
মনে পড়ে রাধিকার
সুখ সান্ধ্য অভিসার,—নিধুবন-বাসে!
মধুর ঝুলন খেলা
মনে পড়ে, সন্ধ্যা বেলা
সে যখন কেঁপে উঠে পূবাল বাতাসে!

তাহারি শ্যামল শাখে
পাপিয়া যখন ডাকে,
মনে পড়ে, সুধামাখা শ্যামের বাঁশরী;
প্রোষিত আভীর-বালা
কিশ্রুত আনন্দ-জ্বালা,
বিরলে, বাঁশীর ডাকে, আপনা পাসরি।

হে কদম্ব! তব তলে
নিতি গোচারণ ছলে,
সজ্জিত রাখাল-রাজ রাধিকারমণ।
তোমারি শীতল ছায়ে
বসিলে, এখনো গায়ে
লাগিয়া, শিহরে, তা'র পূত-পরশন।

তোমারে হেরিয়া তরু
সিক্ত এ হৃদয় মরু,
শ্যাম-স্মৃতি-সুধা সিন্ধু উথলি প্রবল!
তোমার পল্লব পত্রে,
পড়ি আমি শত ছত্রে,
অতীতের ইতিহাস—অতি অনর্গল!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

পাতা ও ফুল।*

ফুল সকলেই জানে, সকলেই চিনে। যে শিশুর মুখে কথা ফুটিয়াছে মাত্র, সেও ফু ফু করিয়া ফুলের দিকে হাত বাড়াইয়া দেয়।

কিন্তু ফুল বলি কাহাকে? ফুলের লক্ষণ কি?—যাহা গাছে হয়, যাহার গন্ধ ও শাদা লাল নীল প্রভৃতি বর্ণ আছে, ইত্যাদি বলিয়া গেলে সামান্য লক্ষণ শেষ হয়। বলা বাহুল্য, এই প্রকার স্থূল লক্ষণ দ্বারা বস্তুনির্দ্দেশ করা সহজ নয়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ফুলের লক্ষণ বলিতে পারি না বটে, কিন্তু দেখিলেই চিনিতে পারি। ইহার অর্থ এই যে, কোন বস্তু ফুল কি না, তাহা নিশ্চয় করিতে যে বিশ্লেষণ আবশ্যক, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না বটে, তথাপি সে বিশ্লেষণ মনে মনে অব্যক্তভাবে থাকে। কিন্তু বিশ্লেষণ-ফল ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারিলে বুঝা যায়, তাহার

*প্রদীপে 'কুষ্মাণ্ড-চিন্তা' প্রকাশিত হইবার পর প্রবন্ধের বিষয়সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র পাই। সেই সকল পত্রে কয়েকটি প্রশ্ন ছিল। সেই প্রশ্নগুলির উত্তর যথাসাধ্য দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

স্পষ্টজ্ঞান নাই। তাই কি, দেখিলেই ফুল কি না, বলিতে পারা যায়? পারিলে আমরা সকলেই ডুমুরের ফুল দেখিয়া এতদিন রাজা হইতাম। অথচ ডুমুরটা কাটিলেই তাহার ভিতরে পুঞ্জাকারে ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। ডুমুর দুষ্প্রাপ্যও নয়; ফুলও তত ছোট নয়। কাঁটালের ফুল সকলেই দেখিয়াছে, অথচ ডুমুরের ফুল অপেক্ষা কাটালের ফুল অধিক বড় নহে। তবেই বোধ হয়, ডুমুরের ফুলগুলি ভিতরে হয় বলিয়া উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

সূর্য্যমুখীর ফুল দেখিলে বুঝা যায়, উহা একটি ফুল নহে। একখানি থালের কিংবা আস্কে পিঠের উপরে কতকগুলি ছোট ছোট ফুল বসাইলে যেমন দেখিতে হয়, সূর্য্যমুখীর ফুলও তেমনই। থালাখানিকে বাঁকাইয়া ঘটীর মত করিতে পারিলে সূর্য্যমুখীর ফুল দেখিতে ঠিক ডুমুর ফুলের মত হইত। কাঁটাল, আনারস, তুত ফুলও একটি ফুল নয়, সূর্য্যমুখীর ও ডুমুরের ফুলের মত পুষ্প সমষ্টি। কিন্তু এস্থলে যেন একটা মুষলের গায়ে ফুলগুলি সাজান আছে। মান ও কচুর ফুলেও এই রকম। একটা ডাঁটার গায়ে ফুলগুলি সাজান, এবং সকল ফুলের বাহিরে একটি হলদে বা লাল আবরণ থাকে। তবেই সূর্য্যমুখীর অনেকগুলি ফুলের একটি বোঁটা। যদি মৌরীফুলের বোঁটাগুলি না থাকিত, তাহা হইলে উহার ফুলগুলির সন্নিবেশ ঠিক সূর্য্যমুখীর মত হইত। কিংবা যদি সূর্য্যমুখীর প্রত্যেক ফুলের এক একটি পৃথক্ বোঁটা থাকিত, তাহা হইলে ঠিক মৌরীফুলের মত উহার সন্নিবেশ হইত। সূর্য্যমুখী, কাটাল, আনারস, তুঁত ও ডুমুরের প্রত্যেক ফুলের এক একটি পৃথক্ ও লম্বা বোঁটা থাকিলে, উহারা যে গুচ্ছফুল, তাহা সহজেই বুঝা যাইত।

লিখিত ফুলগুলির অঙ্গ-সংস্থান বুঝা তত সহজ নহে। তাই, অপেক্ষাকৃত একটা বড় ফুল লওয়া যাক্। ধুতুরা ফুল সকলেই চিনে। দেখা যায়, উহার একটা বোঁটা আছে। বোঁটার উপরে একটা সবুজ রঙ্গের খোল, যেন লম্বা কলকে। তাহার ভিতরে তদপেক্ষা বড় কিন্তু শাদা আর একটা খোল। উহাও দেখিতে ঠিক কল্কের মত। উহার ভিতর গায়ে মোটা সূতার মত পাঁচটা লাগিয়া থাকে। সূতা পাঁচটার উপরে পাঁচটা সরু মাথা। ইহাদের ভিতরে শাদা এক রকম গুঁড়া থাকে। খুব ফুটন্ত ফুলে গুঁড়া তত দেখা যায় না, অল্প ফোটা ফুলেই বেশী দেখা যায়। এই সকল অঙ্গের মাঝখানে আর একটা মোটা সূতার মত দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নীচেটা মোটা, কাটিয়া দেখিলে উহার মধ্যে শাদা শাদা ছোট ছোট বীজ দেখা যায়। সূতার উপরে একটা মাথা। অল্প ফোটা ফুলের ঐ মাথাটায় হাত দিলে তাহাতে চট্চটে আটার মত একটা জিনিস হাতে ঠেকে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ধুতুরাফুলের এই কয়েকটি অঙ্গ আছে।

উপরের বর্ণনায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ত্যাগ করা গিয়াছে। ত্যাগ করিবার দুইটি কারণ। এক, পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহার লক্ষণ দেওয়া আবশ্যক, দ্বিতীয়, বাঙ্গলাভাষায় উদ্ভিদ্-বিদ্যার পরিভাষা নাই বলিলেই হয়। একে, ফুলের নাম করিবার সময়ে উহার আর কি কি নাম আছে, তাহা ভাবিতে হয়, তাহার উপর পারিভাষিক শব্দ যোগ হইলে বিষয়টা দুর্ব্বোধ হইবার সম্ভাবনা ঘটে। অথচ একটা না একটা পরিভাষা খাড়া না করিলেও চলে না। তাই, ধুতুরা ফুলের উপরের লিখিত সবুজ রঙের বাহিরের খোলটাকে বহিষ্পুট, ভিতরের সাদা খোলটাকে অন্তষ্পুট বলা যাইবে। যে শাদা গুঁড়ার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা পরাগ। অন্তষ্পুটে লগ্ন পাঁচটা সূতা পাঁচটা পরাগকেশর। উহাদের মাথাগুলা পরাগাশয়। সকলের মধ্যস্থ অঙ্গের নিম্নভাগে বীজ হয়। এজন্য উহার নাম বীজকাশয়। উহার উপরের শাদা সূতাটা শলা, এবং শলার মস্তকে পিণ্ড। ধুতুরা ফুলে দুইপ্রকার পুট আছে বলিয়া উহাকে দ্বিপুট বলা যায়। পরাগাশয় ও পরাগকেশর লইয়া একটি অঙ্গ, এবং বীজকাশয়, শলা, ও পিণ্ড লইয়া উহার আর একটি অঙ্গ।

এখন প্রত্যেক অঙ্গের উদ্দেশ্য বলা আবশ্যক। বীজকাশয় নাম হইতেই উহার উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে। উহার মধ্যে বীজক হয়, বীজক ক্রমে বীজে পরিণত হয়। শলাটি বীজকাশয়ে যাইবার নালী, এবং পিণ্ডটি নালীমুখ। নালীমুখে আটা থাকে; সেই আটায় পরাগ পড়িলে, পরাগের মধ্যস্থ পদার্থ বিশেষ নালী দিয়া বীজকের পদার্থ বিশেষের সহিত মিলিত হয়। ঐ দুই পদার্থের মিলনকে নিষেকক্রিয়া বলা যায়। ইহার ফলে বীজক ক্রমে বীজ বা গর্ভ বা ভ্রূণে পরিণত হয়। ভ্রূণটি ক্ষুদ্রাবয়ব বৃক্ষ সন্তান। অতএব

বীজকাশয়, শলা ও পিণ্ড,—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়, সংক্ষেপে স্ত্র্যঙ্গ ; এবং পরাগাশয় ও পরাগকেশর,—পুংজননেন্দ্রিয়, সংক্ষেপে পুমঙ্গ। বহিষ্পুট বা বহিরাবরণ দ্বারা ফুলের অন্যান্য অঙ্গ রক্ষিত হয়। অন্তষ্পুটের উদ্দেশ্য অধিকাংশ স্থলে পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ। ফুলের পিণ্ডের উপরে পরাগপতন আবশ্যক, নইলে বীজ হয় না। পবনের দ্বারা কোন কোন ফুলের পিণ্ডে পরাগ আসিয়া পড়ে, কোন কোন ফুলে পতঙ্গগণ পরাগ-পাতনে সহায় হয়। এই দুইটি সামান্য উপায়।

তবে, ধুতুরা ফুল দ্বিপুট, দ্বিলিঙ্গ। সকল ফুল এ প্রকার নহে। কুষ্মাণ্ড ফুল দ্বিপুট, কিন্তু একলিঙ্গ। কদলী ফুল দ্বিলিঙ্গ, কিন্তু একপুট। সূর্য্যমুখীর দুই প্রকার ফুল একই আধারে জন্মে। বাহিরের ফুলগুলি একলিঙ্গ, একপুট। উহাতে স্ত্র্যঙ্গ এবং অন্তষ্পুট মাত্র থাকে। ভিতরের বা মাঝের ফুলগুলি দ্বিলিঙ্গ। প্রথমে মনে হয়, যেন উহাতে কেবল অন্তষ্পুট আছে; কিন্তু তাহার নীচে দুই পাশে বহিষ্পুটের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গোলাপ ফুলেও চারিটি অঙ্গ আছে। সবুজবর্ণ বহিষ্পুট, অন্তষ্পুট বা পাপড়ি, পরাগকেশর এবং বীজকাশয়, এই চারি অঙ্গ। কিন্তু উহার একটি বীজকাশয় ও তাহার শলা ও পিণ্ড না থাকিয়া অনেকগুলি স্ত্র্যঙ্গ থাকে। একটা গোলাপ ফুলকে লম্বালম্বি কাটিলে বহিষ্পুটের ভিতরে অনেক স্ত্র্যঙ্গ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তবে, গোলাপ ফুলও দ্বিপুট, দ্বিলিঙ্গ। রজনীগন্ধা দ্বিলিঙ্গ বটে, কিন্তু পুট দুইটি উভয়েই শাদা। এইরূপ চাঁপা ফুল দ্বিলিঙ্গ, কিন্তু পুটের প্রভেদ নাই। চাঁপাফুলেও অনেক স্ত্র্যঙ্গ থাকে। এজন্য একটি ফুল হইতে অনেকগুলি ফল হয়। বলা বাহুল্য, বীজকাশয়ের নাম ফল। এইহেতু সূর্য্যমুখীর যাহাকে বীজ বলা যায়, তাহা বস্তুতঃ ফল। ধান্য বীজ নহে, ফল।

বহিষ্পুট, অন্তষ্পুট, পুমঙ্গ ও স্ত্র্যঙ্গ—এই চারি অঙ্গেরই বহুবিধ রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে সমুদয় বর্ণনা করিবার স্থান নাই। দ্বিপুট ফুলের দৃষ্টান্ত সহজেই পাওয়া যাইবে। একপুট ফুলের দৃষ্টান্ত সকলের তত অধিক জানা নাই। নিষ্পুট—অর্থাৎ যাহার একটিও পুট নাই—এমন ফুলের দৃষ্টান্ত আরও অল্প। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, যাহাকে আমরা কচুর ফুল বলি, বাস্তবিক তাহা একটি ফুল নহে। উহার মধ্যস্থ দণ্ডের গায়ে নীচে ও উপরে নিষ্পুট একলিঙ্গ ফুল জন্মে। নীচের ফুলগুলি স্ত্র্যঙ্গ, উপরেরগুলি পুমঙ্গ মাত্র। এই সকল ফুলে পুটের চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না। তবে, ফুল নিষ্পুট হইতে পারে, কিন্তু নির্লিঙ্গ হয় না। উদ্যানে সযত্নপালিত কোন কোন বৃক্ষের ফুল নির্লিঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু বন্যফুলের নির্লিঙ্গ হওয়া, বোধ করি সম্ভবপর নয়।

এখন ফুল নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করা যাউক। একই বস্তু বহুবিধ প্রকারে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ জীবাঙ্গের নির্দ্দেশ নানা ভাবে করিতে পারা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের হাতটাকেই লওয়া যাউক। অর্থাৎ, আমাদের হাত কাহাকে বলি? রূপ (আকার) দেখিলে উহা মানুষের অঙ্গবিশেষ,—সন্ধি ও অঙ্গুলীযুক্ত দীর্ঘাকার অঙ্গ ইত্যাদি; উহার ক্রিয়া (উদ্দেশ্য) দেখিলে, উহা জিনিস পত্র ধরিবার অঙ্গ বিশেষ; উৎপত্তি দেখিলে, উহা মানুষ-কবন্ধের অনুবন্ধবিশেষ; আভ্যন্তর রচনা দেখিলে, উহা মাংসত্বগাদিবেষ্টিত অস্থিসমষ্টি বিশেষ; ইত্যাদি। এখানে পূর্ণ নির্দ্দেশের চেষ্টা করিলাম না।

এইরূপ, ফুলেরও নানা ভাবে সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। তন্মধ্যে এখানে দুইটির উল্লেখ করা যাইতেছে। রূপ দেখিলে উহা বিকৃত পল্লব মাত্র (ক্ষুদ্রাকার পত্রময় কাণ্ড); ক্রিয়া বা উদ্দেশ্য দেখিলে উহা জননেন্দ্রিয় মাত্র। রূপ নির্দ্দেশ করিবার সময় উৎপত্তি, এবং উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিবার সময় রূপ ভাবিতে হয়। একটি অন্যের অপেক্ষা করে। এস্থলেও উৎপত্তি দেখিলে ফুল বিকৃত পল্লব মাত্র। রূপ বলিবার সময় এতটা না বলিলেও চলে। তখন উহার পুট ও পরাগ কেশর বীজকাশয়াদির বর্ণনা করিতে হয়। যাহা হউক, কোন একটি না দেখিয়া দুই তিনটি দেখিলে বস্তুনির্দ্দেশ অপেক্ষাকৃত পূর্ণ হয়। এইরূপে বলা যায়, ফুল সন্তান-জননের উপযোগী বিকৃত পল্লব মাত্র।

ফুল যে সন্তান জননের উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফুলের পিণ্ডটি কাটিয়া দিলে কিংবা বস্ত্রাদিতে আবৃত করিয়া রাখিলে তাহাতে পরাগ পড়িতে পারে না, বীজও হয় না। কিন্তু কি প্রমাণের সাহায্যে ফুলকে বিকৃত পল্লব বলা যায়? বিকৃত পল্লব অর্থে এরূপ নহে যে, পূর্ব্বে পল্লব থাকে, পরে ফুল হয়। উহার অর্থ এই যে, পল্লব ও ফুল এক আদর্শে গঠিত। আরও বলিতে পারা যায়, পল্লব ও ফুল গঠনে

এক জাতীয়, কার্য্যে ভিন্ন। এমন কি, কার্য্যে ভিন্ন বলিয়াই রূপে ভিন্ন। প্রথমে উদ্দেশ্য, পরে রূপান্তর; কি প্রথমে রূপান্তর পরে কার্য্য-ভেদ, এ-তর্ক জীব-বিদ্যায় বিলক্ষণ করিতে হয়। এস্থলে এ তর্কের সম্ভাবনা নাই। নিশ্চিত বলিতে পারা যায়, প্রথমে পাতা ছিল, পরে ফুল হইয়াছে। আদি সৃষ্টিতে পাতাই ছিল, পরে পাতাগুলি রূপান্তরিত হইয়া ফুলের বহিস্পুট, অন্তস্পুট, পুমঙ্গ, ও স্ত্র্যঙ্গে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রমাণ?

প্রমাণ অনেক এবং সকল বিষয়েরই আছে। কতকগুলি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। গোলাপ, কুম্মাণ্ড প্রভৃতির পাতা একটির পর একটি, এইরূপ পর্য্যায়ে ডাঁটায় জন্মে, অর্থাৎ প্রতি গ্রন্থি হইতে একটি পাতা জন্মে। ফুলে সে রকম কই? ধুতুরা ফুলের চারিটি অঙ্গ। এইরূপ অধিকাংশ ফুলে এক এক অঙ্গ মণ্ডলাকারে জন্মিতে দেখা যায়।—কিন্তু সকল ফুলেই এই প্রকার নহে। কুমুদ, ও চাঁপা ফুলের অঙ্গগুলি মণ্ডলাকারে না থাকিয়া পাতার মত সর্প-কুণ্ডলাকারে আছে। এইরূপ আরও অনেক ফুল আছে।

২। আকন্দ ও তুলসীর প্রতি গ্রন্থি হইতে দুইটি পাতা বহির্গত হয়।—এইরূপ সর্ষপ ফুলেও দুটি দুটি চারিটি বহিস্পুট, দুটি দুটি চারিটি অন্তস্পুট ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। প্রতি গ্রন্থি হইতে একটি পাতাই হউক, দুইটি পাতাই হউক, দুই গ্রন্থির মধ্যে কিছু না কিছু অন্তর থাকে। —সকল ফুলের মণ্ডলদ্বয়ের মধ্যে অন্তর নাই বটে, কিন্তু কোন কোন ফুলে এইরূপ অন্তর আছে। হুড়হুড়িয়ার ফুলের অন্তস্পুট, বহিস্পুট, পুমঙ্গ, ও স্ত্র্যঙ্গ এই চারি মণ্ডলের মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প অন্তর আছে। আজকাল ঝুমকা লতা বাগানে দেখা যায়। ঝুমকা ফুলের অন্তস্পুট পুমঙ্গ ও স্ত্র্যঙ্গের মধ্যে অল্প অল্প অন্তর দেখা যায়। তা ছাড়া সকল গাছেই পাতা ফাঁক ফাঁক থাকে না। জলে যে টোকা পানা জন্মে, তাহার পাতাগুলার মধ্যে ফাঁক দেখা যায় না। মূলার কাণ্ডে পাতার বিন্যাসেও অধিক অন্তর দেখা যায় না।

৪। শিম, মটর প্রভৃতি কোন কোন গাছের পাতার নীচে ও পাশে অপর দুটি ক্ষুদ্র পাতা দেখা যায়।—কোন কোন ফুলেও এইরূপ আছে। জবা, কার্পাস প্রভৃতি কোন কোন ফুলের বহিস্পুটের বাহিরে নাচে অপর কয়েকটি ছোট ছোট পাতা দেখা যায়।

৫। ধুতুরার বহিস্পুট ও অন্তস্পুট মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে বুঝা যায়, প্রত্যেকটি পাঁচটি দলের পরস্পর সংযোগে কলকের মত আকার পাইয়াছে।—এইরূপ কোন কোন গাছের একই গ্রন্থিজাত দুইটি পাতা যুক্ত হইয়া থাকে।

৬। গাছের পাতা চেপ্টা কাগজের মত সমস্ত।—বহিস্পুট ও অন্তস্পুটের দলগুলিও এমনই চেপ্টা। কুমুদ ফুলের পরাগকেশর চেপ্টা, শিমের বীজকাশয় চেপ্টা। তা ছাড়া, সকল গাছের পাতা চেপ্টা নয়। পেঁয়াজের পাতা গোল লম্বা, নুনিয়া শাকের পাতা গোল না হইলেও চেপ্টা নয়।

৭। পাতার আকারের সহিত ফুলদলের আকারের সাদৃশ্য আছে। গোলাপের বহিস্পুটের এক এক দল সময়ে সময়ে ঠিক পাতার মত হয়। কুমড়ারও এইরূপ দেখা যায়।

৮। পাতা সবুজবর্ণ, কিন্তু ফুল?—ফুল অর্থে কেবল পাপড়ি বা পুমঙ্গ ও স্ত্র্যঙ্গ ধরিলে চলিবে না। বহিস্পুট ও ফুলের অঙ্গ। বহিস্পুট প্রায়ই সবুজবর্ণ। শিম, মটর প্রভৃতির স্ত্র্যঙ্গও সবুজবর্ণ। অধিকাংশ ফল প্রথমে সবুজ বর্ণ থাকে, পাকিবার সময় হলদে বা লাল হয়। তা ছাড়া, কোন কোন ফুলের পাপড়ি অর্থাৎ অন্তস্পুটের দলও প্রথমে সবুজবর্ণ থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "প্রদীপের" কোন কোন পাঠক বনফুল, কাঁটালিচাঁপা, মধুমালতীর উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্বিষয় পরে বলা যাইবে।

৯। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বহিস্পুট কতকটা পাতার মত বলিয়া কি ফুলের অন্তস্পুট, পুমঙ্গ ও স্ত্র্যঙ্গকে পাতার বিকৃতি বলিতে হইবে? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি ফুলের একটি অঙ্গকে পাতার বিকৃতি মনে হয়, তবে বোধ হয়, অন্যান্য অঙ্গও তাই। সারল মাটীতে গোলাপের বহিস্পুট কখন কখন ঠিক পাঁচটি পাতার মত হয়। তার পর, কুমুদ ফুলের বহিস্পুট ও অন্তস্পুটের প্রভেদ করিতে পারা যায় না। সকলের বাহিরের দলগুলির এক পিঠ সবুজ অন্য পিঠ শাদা। সুতরাং অন্তস্পুট ও বহিস্পুট এক জাতীয় বলিতে হইবে।

১০। কিন্তু পুমঙ্গ ও স্ত্র্যঙ্গের সহিত পুটের কোন

সাদৃশ্য দেখা যায় কি?—যিনিই "ডবল" ফুল দেখিয়াছেন, তিনিই ইহার প্রমাণ দিতে পারেন। ফুল "ডবল" বা বহুদল হইবার কারণ দুইটি। (১) একদল ফুলের যে অন্তস্পুট থাকে, তাহা পালনগুণে সম্মুখে বিভক্ত হইয়া বহুদল হয়। অর্থাৎ অন্তস্পুটের একটি মণ্ডলের স্থানে দুই তিনটি মণ্ডল হয়। এইরূপে বহুদল বেলা বা 'ডবল' বেলার উৎপত্তি। (২) পুমঙ্গ, অন্তস্পুটের দলে পরিণত হয়। এইরূপে গোলাপ ডবল হয়। বহুদল গোলাপের ভিতরকার দলের কোন কোনটার শিরোভাগে পরাগাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চমুখী জবাতে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কোন ফুলের পাপড়ি স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা বড় হইলেও কেহ কেহ তাহাকে 'ডবল' মনে করেন। এইরূপে, অপরাজিতার পাঁচটি পাপড়িই বড় হইলে কখন কখন 'ডবল' নামে পরিচিত হয়। বলা বাহুল্য, ইহা বহুদল নামের অপব্যবহার। যেহেতু দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না। যাহা হউক, দেখা গেল পুমঙ্গ অন্তস্পুটে পরিণত হইতে পারে। এমন কি, কখন কখন গোলাপের অনেক স্ত্রাঙ্গও দলের আকার প্রাপ্ত হয়।

১১। পুমঙ্গ ও স্ত্রাঙ্গ, দলের আকার পাইতে পারে বলিয়া কি সেগুলিকে পাতার বিকৃতি মনে করিতে হইবে?—ফুলের মধ্যে স্ত্রাঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকৃত। কিন্তু সেই স্ত্রাঙ্গও কোন কোন স্থলে সবুজ পাতায় পরিণত হইতে দেখা যায়। কখন কখন গোলাপের এই প্রকার বিকার ঘটে, এবং ইহারই বিষয়ে "প্রদীপে" প্রশ্ন হইয়াছিল। অবশ্য এরূপ ঘটনা সর্ব্বদা হয় না, তাই ইহাকে অদ্ভুত পদার্থ মনে করা যায়।

১২। স্ত্রাঙ্গের ভিতরে বীজ হয়। কিন্তু কোন পাতার গায়ে বীজ হয় কি?—বীজ অর্থে সন্তান বা ক্ষুদ্র বৃক্ষ. পাষাণভেদী, ঢেঁকিলতা প্রভৃতি (Ferns) নামে খ্যাত গাছগুলির পাতার নীচের পিঠে এক প্রকার রেণু জন্মে। সেই রেণুগুলি ঠিক বীজ নয় বটে, কিন্তু তাহা হইতে নূতন গাছ হয়। এই সকল গাছের স্পষ্ট ফুল দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য ইহারা অপুষ্পক শ্রেণীর অন্তর্গত। ছত্রাক (বেঙের ছাতি, ছাতু) এই প্রকার রেণু হইতে জন্মে। উহার রেণুগুলি ছত্রাকের ছাতার নীচের পরদায় জন্মে। উহাও অপুষ্পক। সপুষ্পক গাছের মধ্যে পাতরকুঁচি বা হিমসাগর অনেকেই জানেন। উহার পরিপক্ক পাতা সূতায় বাঁধিয়া কয়েকদিন ঝুলাইয়া রাখিলে পাতার ধারে ছোট ছোট গাছ হয়। এই জন্য, একটি পাতা হইতেই অনেকগুলি পাতরকুচির গাছ জন্মাইতে পারা যায়। এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পাতা হইতে ক্ষুদ্রাকার গাছ বা বীজ জন্মিতে পারে, এবং স্ত্রাঙ্গ রূপ পাতা হইতে বীজের জন্ম তত বিস্ময়কর নহে।

১৩। ফুল যদি পল্লব, তাহা হইলে ফুল উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই পল্লবের বৃদ্ধি শেষ হয় কেন? যে ডালের শেষে ফুল হয়, তাহার বৃদ্ধি সেই খানেই শেষ হয়। কিন্তু পল্লবের ত এরূপ হয় না।—ইহাই নিয়ম বটে, কিন্তু এর নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। আনারস প্রথমে ফুলসমষ্টি থাকিয়া পরে ফলসমষ্টি হয়। কিন্তু সেই আনারসের উপরে পল্লব থাকে। এমন কি সেই পল্লব রোপণ করিয়া আনারসের গাছ উৎপাদন করা যায়। এস্থলে ফুলেই ডালের বৃদ্ধি লোপ হয় না।

এইরূপ আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। উপরে দুই একটি ফুলের উল্লেখ করা গিয়াছে। অন্যান্য দৃষ্টান্ত সকলের তত পরিচিত না থাকিতে পারে। যাহা হউক, এই কয়েকটি প্রমাণ দ্বারাই বলা যাইতে পারে যে, পল্লবের বিকৃতি ফুল, কিম্বা পল্লব ও ফুল মূলে একই, কেবল কার্য্যবিভিন্নতায় উভয়ের আকার প্রকার বিভিন্ন হইয়াছে। পাতার কার্য্য গাছের খাদ্য উৎপাদন, ফুলের কার্য্য বংশরক্ষা। একটি পুষ্টি, অন্যটি বংশবৃদ্ধি। এই দুই কার্য্যে যাবতীয় জীবের (প্রাণী বা উদ্ভিদ) সমুদায় কার্য্য। এই দুই কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্যই নাই। সুতরাং এই দুই কার্য্য যত শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়, জীবের ততই মঙ্গল। সবুজ বর্ণ পাতায় সূর্য্যের তেজে স্ব স্ব দেহ-পোষণক্ষম খাদ্য প্রস্তুত হয়। পত্র মধ্যস্থ সবুজ রঙটিই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত। পত্রে এই রঙটি পাওয়া যায় বলিয়া উহাকে পত্রীণ বলা যায়। শিম পাতা ছিঁড়িয়া বা পেষিয়া সুরাসারে ভিজাইয়া রাখিলে পত্রীণ তাহার সহিত মিশ্রিত হয়। ঐ রঙের উপরিভাগ দেখিলে লালবর্ণ, ভিতর দেখিলে ঘোর সবুজবর্ণ দেখায়। ইহা পত্রীণের একটি লক্ষণ। কর-বীক্ষণ (spectroscope) যন্ত্র দ্বারা স্থূলভাবে দেখিলে লোহিত, নারঙ্গ, পীত, হরিৎ, নীল, বেগুনে বর্ণের মধ্যে পীতের ও

হরিতের কিয়দংশ দেখা যায়, অন্যান্য বর্ণ অদৃশ্য হয়। এইরূপও অন্যান্য ক্রিয়া দ্বারা বুঝা যায়, পত্রীণ একটা রঙ নহে। বোধ হয় উহা পীত ও নীল এই দুই রঙের মিশ্রণে উৎপন্ন। ইষ্টক প্রস্তরাদি দ্বারা ঘাস আবৃত করিয়া রাখিলে তাহা পাণ্ডু বা ঈষৎ পীতবর্ণ হয়। অনেকের মতে পাণ্ডুর রঙটী হইতে পত্রীণের উৎপত্তি। স্থূলতঃ বলিতে গেলে পত্রীণে পীত ও নীলবর্ণের দুইটি রঙ আছে।

ফুলের অন্তস্পুটের বর্ণ দেখিয়াই লাল নীল প্রভৃতি বর্ণের ফুল বলা যায়। বহিস্পুট প্রায়ই সবুজ; তাহাতে পত্রীণ থাকে। অধিকাংশ ফলও প্রথমে সবুজ, এবং পাকিলে হলদে বা লালবর্ণ হয়। অপক্ক ফলেও পত্রীণ থাকে। সেই পত্রীণের বিকারে পক্ক ফলের পীত ও লোহিত বর্ণের উৎপত্তি। এইরূপ, গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িবার পূর্ব্বে তাহার পত্রীণ বিকৃত হইয়া পীতবর্ণ হয়। অন্তস্পুটের বর্ণের কারণও বোধ হয় পত্রীণ, তাহারই বিকারে ফুলের বহুবিধ বর্ণের উৎপত্তি।

যাহারা পুষ্পোদ্যানকর্ম্মে রত, তাঁহারা জানেন যে, ফুলের কোন এক স্বাভাবিক বর্ণকে পালন দ্বারা অন্য প্রকার বর্ণে পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়। এইরূপে কিন্তু সকল প্রকার বর্ণ দিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ ফুলগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। (১) যে সকল ফুল স্বভাবতঃ পীত, তাহাদিগকে লাল ও সাদা করিতে পারা যায়, কিন্তু কখনও নীলবর্ণ করিতে পারা যায় না। (২) যে সকল ফুল স্বভাবতঃ নীল, তাহাদিগকেও লাল ও সাদা করিতে পারা যায়, কিন্তু কখনও হলদে করিতে পারা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃষ্ণকেলি পীত, নারঙ্গ, লোহিত বর্ণের, এবং অপরাজিতা নীল, বেগুনে, লালবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। গোলাপ নীলবর্ণের হইতে দেখি না। বস্তুতঃ এক দিকে লোহিত, নারঙ্গ, পীত, পীতহরিৎ; অন্যদিকে হরিৎ-নীল, নীল, মহানীল, বেগুনে, নীললোহিত, লোহিত,—এই দুই ভাগে ফুলের বর্ণ ভাগ করিতে পারা যায়। উহাদের মধ্যস্থলে পত্রীণের হরিদ্বর্ণ।

নানাজাতীয় ফুল লইয়া দেখিলে জানা যায়, শাদা ফুলই অধিক। বোধ হয় শতকরা ৬৯.২৭টি ফুল শাদা। হলদে ও লাল ফুলের সংখ্যা কিছু কম। নীলবর্ণের ফুল ইহার অর্দ্ধেক, বেগুনে তাহার অর্দ্ধেক, সবুজ তাহার অর্দ্ধেক, শতকরা ৩।৪ টা, নারঙ্গবর্ণের ফুল আরও কম শতকরা ১।২ টা। বস্তুতঃ বেগুনে ও নারঙ্গ বর্ণ ফুল তত দেখিতে পাওয়া যায় না, নীলবর্ণ ফুল খুব কম। সবুজবর্ণ ফুল আছে বটে, কিন্তু পূর্ণ বিকশিত ফুলে পত্রীণ থাকে কি? স্থূলতঃ দেখিলে সবুজ বর্ণ বোধ হইতে পারে। এইরূপে কেহ কেহ সবুজ বর্ণের ফুলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বনফুল, মধুমালতী, ও কাঁটালি চাঁপার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহাদের সহিত পীতবর্ণের যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। বনফুল ও কাঁটালি-চাঁপা চিনি, কিন্তু এসময় উহাদের ফুল পাইলাম না। ফুল পাইলে উহাদের বর্ণ ঠিক সবুজ কি না, অর্থাৎ ইহাদের পাতার মত বর্ণ কি না, দেখা যাইত। মধুমালতী নাম হইতে ফুলটি ঠিক করিতে পারিলাম না। কথায় বলে, যোজনান্তে ভাষা। গাছ পালার নাম এই কথার সাক্ষী। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ ফুল অদ্যাপি দেখি নাই। বিলাতী কোন কোন প্রকার "প্যান্‌সি" দেখিতে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ বটে, কিন্তু তাহা ঘোর বেগুনে বা নীল ও বেগুনে। সকলেই জানেন, লাল, সবুজ, নীল, বেগুনে অতিশয় ঘোরবর্ণ হইলে কাল দেখায়।

ফুলের অন্তস্পুটের উদ্দেশ্য স্মরণ করিলেও জানা যায়, তাহা সবুজবর্ণ না হইলেই সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়। পুমঙ্গ ও স্ত্র্যঙ্গকে রক্ষা করা ইহার তত উদ্দেশ্য নয়। পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ হয়। যে সকল ফুলের অন্তস্পুট বড় বা সুন্দর, তাহাদের উদ্দেশ্য পতঙ্গের দিগ্‌দর্শন করা, ইহা সহজেই বোধ হয়। এমন স্থলে তাহা পাতার সহিত মিশিয়া গেলে উদ্দেশ্যই বৃথা হয়। অবশ্য গন্ধ দ্বারা পতঙ্গ আকৃষ্ট হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে। কিন্তু গন্ধের সহিত ফুলের পত্রাতিরিক্ত বর্ণ থাকিলে ফুল দূর হইতে চিনিতে ক্লেশ হয় না। বোধ করি, বৃহদাকার ফুলের গন্ধ তেমন থাকে না। কাঁটালি চাঁপার বর্ণ পীত, কিন্তু তাহার গন্ধ বহুদূর হইতে পাওয়া যায়। সহজে দেখাইবার অভিপ্রায়ে সূর্য্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা, গেঁদা প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র ফুল একত্র জন্মে। উহাদের এক একটি ফুল দূর হইতে স্পষ্ট দেখা না যাইতে পারে, কিন্তু অনেকগুলি একত্র জন্মিলে আকারে বড় হয়, দৃষ্টি পথেও পড়ে। মান কচু প্রভৃতি ফুলের সৌন্দর্য্য নাই, বোধ হয় তাই সকল ফুল গুলির একটি বড় পীত বা রক্তবর্ণ আবরণ থাকে। এই

বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে। এখানে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।

অনেক ফুলের পরাগ পবন দ্বারা পিণ্ডে পতিত হয়। এ সকল ফুল প্রায়ই ছোট, সৌন্দর্য্য ও গন্ধহীন। ধানের, ও বিবিধ ঘাসের ফুল এই প্রকারে নিষিক্ত হয়। এ নিমিত্ত আবার অন্তর্বিধ কৌশল অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। তৎসমুদয় বর্ণনা করা এখন উদ্দেশ্য নহে।* এই সকল ফুল সবুজ হইলেও নিষেক-ক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু ফুলে যদি পত্রীণ থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পত্রের কাজও করাইয়া লওয়া হয়, কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা না করিলে ফুল দ্বারা পাতার কাজ করান সহজে বিশ্বাস হয় না। অবশ্য পত্রীণ-যুক্ত ফুল কখন হইতে বা থাকিতে পারে না, একথা কেহই বলিতে পারেন না। যদি পাতায় পত্রীণ থাকে, তাহা হইলে কোন কোন ফুলেও তাহার থাকা অসম্ভব নহে। যেহেতু ফুল পাতারই বিকৃতি, এবং পত্রের পত্রীণই বিকৃত হইয়া বহুবিধ বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছে।

১৮ই পৌষ, ১৩০৭। শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়।

এমার্সন।

পড়াতে ও বোঝাতে, বোঝাতে ও জানাতে কি যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, এমার্সনের নিকটেই ইহা প্রথম শিক্ষা করি। ইংরাজীনবিশদিগের অনেকেই এমার্সনের নাম জানেন, আমিও জানিতাম। তাঁর লেখাও একটু আধটু অনেকেরই পড়া থাকে, আমারও ছিল। তাই এক দিন এমার্সনের একখণ্ড প্রবন্ধাবলী দেখিতে পাইয়া, আগ্রহ সহকারে, তাহা কিনিয়া আনিলাম। সে বহুদিনের কথা। বাড়ী আসিয়াই, পাতা কাটিয়া, পড়িতে বসিলাম। পড়িলাম—

There is one mind common to all individual men. Everyman is an inlet to the same and all of the same. He that is once admitted to the right of reason is made a free man of the whole estate. What Plato has thought he may think; what a saint has felt he may feel; what at any time has befallen man he can understand. Who hath access to the universal mind is a party to all that is or can be done, for this is the only and sovereign agent.

ভাবার্থ—এক আত্মাই সকল মানুষের মধ্যে বাস করেন। প্রত্যেক মনুষ্যই এই আত্মাতে, ও এই আত্মা-সম্বন্ধীয় সকল বিষয় ও ব্যক্তিতে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। যে একবার অধ্যাত্ম জীবনের অধিকার পাইয়াছে, সে স্বাধীনভাবে সমুদয় বিশ্বরাজ্যে বিচরণ করিতে পারে। প্লাটো যাহা ধ্যান করিয়াছেন, সে তাহা ধ্যান করিতে পারে। যে কোনও সাধুপুরুষ যাহা অনুভব করিয়াছেন, সেও তাহা অনুভব করিতে পারে। যে কোনও যুগে, যে কোনও মানবের জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তৎসমুদায়ই সে বুঝিতে পারে। এই সার্ব্বজনীন বিশ্বাত্মাতে যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে, যাহা কিছু হইয়াছে বা যাহা কিছু হইতে পারে, তৎসমুদয়েরই সে অংশীদার হয়; কারণ এই আত্মাই জগতে একমাত্র কর্ত্তা ও প্রভু!

কথাগুলি ছোট ছোট, অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন। পদযোজনাও নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। আপাততঃ দেখিতে গেলে, সকলই বোধগম্য বলিয়া বোধ হয়। অথচ তলাইয়া যখন দেখা যায় কি বুঝিলাম, শব্দ ছাড়িয়া যখন বস্তু ধরিতে যাই, দেখি সকলই কেমন আবছায়ার মত হইয়া যায়। এমার্সন প্রথম পড়িতে আরম্ভ করিয়া, অনেকেরই এইরূপ মনে হয়। সহজ কথার আড়ালে কি গভীর, দুর্ব্বোধ্য ভাব লুকাইয়া থাকে, অনেক সময়ে তাহা ধরা যায় না। কোনও বিষয় বোঝা গেল না, এটা বুঝিলে তো তার অর্দ্ধেকটাই একরূপ বোঝা হইয়া যায়। অনেকের এমার্সন প্রথম পড়িয়া, এ জ্ঞানও ভালরূপে হয় না। আমিও তাহা বুঝিলাম না। কথার পর কথা, পাতার পর পাতা পড়িয়া গেলাম। কেবল দেখিলাম,—তাহাতে কিছুই মিষ্টতা নাই।

রসভেদে যে অধিকারীভেদ হয়, যে যাহার রস আস্বাদন করিতে পারে না, সে তাহার উপযুক্ত নয়,—আস্বাদন ভিন্ন যে জ্ঞান জন্মে না,—এ শিক্ষাও প্রথমে এমার্সনের নিকটই লাভ করি। এমার্সন বলিয়াছেন—Never read any but what you like—যাহা তোমার মিষ্ট লাগে না, এমন কিছু কখনও পড়িও না। তখনও এই উপদেশ পাই নাই। তাই পড়িয়া গেলাম, মোটামোটি বুঝিতে পারিতেছি, এও

* 'নব্য ভারতে' কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফুলের বিবাহ নামক প্রবন্ধে এ বিষয় যথেষ্ট আলোচনা করা গিয়াছে। প্রবন্ধটিতে যদিও রূপকের আকার দেওয়া গিয়াছে, তথাপি উহার প্রত্যেক উক্তিই সত্য। রূপকও সহজে ভেদ করিতে পারা যাইবে।

মনে করিলাম। তবে যাহাতে রস পায় না, সখ করিয়া এমন বই আদ্যোপান্ত কেহ ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িতে পারে না। এমার্সনও আমার বেশীদিন পড়া হইল না। দু চারি দিন পরেই প্রথম যৌবনের উদ্দাম অজ্ঞতার অহঙ্কারে, সরাসরিভাবে, প্রবন্ধগুলিকে নিতান্তই নীরস সাব্যস্ত করিয়া, গ্রন্থখানিকে প্রাচীন পরিত্যক্ত পুস্তকের মধ্যে তুলিয়া রাখিলাম।



র‍্যালফ্ ব্যাল্‌ডো এমার্সন।

ছয় সাত বৎসর কাল সুখে দুঃখে কাটিয়া গেল। এ সময়ের মধ্যে আর এমার্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। তার পর একদিন, ঘোরদুর্দ্দিনে, মৃত্যুর ছায়াতে, নিরাশার অন্ধকারে, আত্মহারা হইয়া, হঠাৎ দৈবক্রমে এমার্সন হাতে তুলিয়া লইলাম। প্রথমেই "ক্ষতিপূরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে হাত পড়িল। দেখিলাম নিদারুণ শোক ও বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ কিরূপে হয়, এমার্সন তাহারই আলোচনা করিতেছেন। একেবারেই এই কথাগুলির উপরে চক্ষু পড়িল :—

We cannot part with our friends. We cannot let our angels go. We do not see that they only go out, that archangels may come in. We are idolators of the old. We do not believe in the riches of the soul, in its proper eternity and omnipresence. We do not believe there is any force in today to rival or recreate that beautiful yesterday. We linger in the ruins of the old tent, where once we had bread and shelter and organs, nor believe that the spirit can feed, cover, and nerve us again. We cannot again find aught so dear, so sweet, so graceful. But we sit and weep in vain. The voice of the Almighty saith, 'Up and onward for evermore!' We cannot stay amid the ruins. Neither will we rely on the new; and so we walk with reverted eyes, like those monsters who ever look backward.

ভাবার্থ :—আমরা বন্ধু-বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারি না। আমাদের দেবতাগুলিকে আমরা বিসর্জ্জন দিতে পারি না। আমরা ইহা দেখি না যে এক দেবতা চলিয়া গেলে, তদপেক্ষা উচ্চতর দেবতার আবির্ভাবের অবসর জন্মে। আমরা আত্মার সম্পদে বিশ্বাস করি না; আত্মা যে অনন্ত ও সর্ব্বগত, ইহা ভুলিয়া যাই। কল্যকার দিন কি সুন্দর ও সুখকর ছিল, অদ্যকার দিনেরও যে সেইরূপ সুন্দর ও সুখকর হইবার শক্তি আছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা প্রাচীনের উপাসক; অতীতের অসার মূর্ত্তিরই ভজনা করিতে অভ্যস্ত। আমরা অতীতের ভগ্নাবশেষ মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াই। যেখানে একদিন আহার এবং আশ্রয় এবং আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহারই ধ্যান করি, কিন্তু আত্মারাম যে আমাদিগকে পুণরায় অন্নবস্ত্র দিয়া প্রফুল্ল করিতে পারেন ইহা বিশ্বাস করি না। এই জন্য যাহা হারাইয়াছি তার মত এমন প্রিয়, এমন মধুর, এমন সুন্দর আর কোথাও কিছু পাই না। কিন্তু এ বিলাপ আমাদের বৃথা। সর্ব্বনিয়ন্তার আদেশ এই যে আমরা

চিরদিনই পড়িয়াগিয়া আবার উঠিব, এবং অনন্তকালই অগ্রসর হইব। তাই অতীতের ভস্মাবশেষ মধ্যে আমরা একেবারে পড়িয়া থাকিতেও পারি না। অথচ বর্ত্তমানের উপরেও আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। এই জন্য আমরা সর্ব্বদাই পশ্চাতের দিকে চক্ষু খুলিয়া, রাক্ষস বিশেষের ন্যায়, এই বিশ্বে বিচরণ করিয়া থাকি।

এই কথা গুলি পড়িতে পড়িতে পিপাসিত প্রাণের সম্মুখে এক অতি অপূর্ব্ব অমৃতের ভাণ্ডার খুলিয়া গেল। তদবধি এমার্সন আমার অতি প্রিয় হইয়াছেন। সুখে দুঃখে, বিপদে প্রলোভনে, নিরাশায় ও শুষ্কতায় সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গ অন্বেষণ করিয়া থাকি।

এমার্সনের সম্বন্ধে অনেকেরই অভিজ্ঞতা এইরূপ। এমার্সনের রস প্রথমে অনেকেই আদৌ আস্বাদন করিতে পারেন না। কিন্তু দৈবযোগে একবার সে অমৃতের আস্বাদন পাইলে জন্মের মত তাহাতে মজিয়া যান। এ বিষয়ে গ্লানি প্রশংসার কথা কিছুই নাই। এমার্সন অধ্যাত্ম-তত্ত্বের উপদেষ্টা; আর দেবপ্রসাদ ভিন্ন অধ্যাত্ম-তত্ত্ব কদাপি কাহারো নিকট প্রকাশিত হয় না।

এইজন্য, সর্ব্বত্রই এমার্সনের প্রকৃত রসগ্রাহীর সংখ্যা অতি অল্প। এমার্সন আমেরিকান। আর ইহা ঠিক যে আমেরিকাতে আজি পর্য্যন্ত এমার্সন ব্যতীত আর একটীও বিশ্বজনীন প্রতিভা প্রকাশিত হয় নাই। মার্কিন কবি হুইট্যার বলিয়াছেন যে, এমার্সনই একমাত্র আমেরিকান, যাঁহার কথা সহস্র বৎসর পরেও লোকে পাঠ করিবে ও ধ্যান করিবে। তথাপি আমেরিকার চক্ষে এমার্সন, এমন কি, উপন্যাস-লেখক হথরণ অপেক্ষাও হীন। সম্প্রতি নিউইয়র্ক সহরে আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বড় লোকদিগের একটি বাছুনী হইয়াছিল। একশত সভ্যের এক কমিটী নির্ব্বাচিত হইয়া, তাহাদের উপরে এই বাছুনী করিবার ভার অর্পিত হয়। এই কমিটীর নির্ব্বাচনে এমার্সন যে ভোট পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি দশম কি একাদশ স্থান মাত্র পাইতে পারেন! আমেরিকায় এমার্সনের যে প্রতিপত্তি তাহা তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক বলিয়া তত নহে যত তিনি আমেরিকান বলিয়া। এমার্সন ইউনিট্যারিয়ান্ ছিলেন, অধিকাংশ ইউনিট্যারিয়ান্ই আপনার দলের লোক বলিয়া এমার্সনকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করেন; অন্য দলের লোক হইলে সেরূপ করিতেন বলিয়া মনে হয় না। বষ্টনের লোকেরা এমার্সনের অনেক গুণ কীর্ত্তন করে, কারণ তিনি বষ্টনের অধিবাসী ছিলেন; তাঁহার লেখনী প্রভাবে বষ্টন অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছে। এই সকল অবান্তর হেতুতে আমেরিকায় এমার্সনের কতকটা প্রতিপত্তি আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অতি অল্প সংখ্যক আমেরিকান্ই তাঁহার প্রকৃত রস গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমেরিকারই যখন এই অবস্থা, ইংলণ্ডের তো তখন আর কথাই নাই। এমার্সনের প্রকৃত রসগ্রাহী লোক ইংরাজদিগের মধ্যে আরো কম। ফলতঃ এমার্সনের প্রতিভা ইংরাজ বা আমেরিকান জাতীয় চরিত্রের উপরে সম্যক রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ভাষা ছিল তাঁর ইংরাজি, ভাব ছিল তাঁর বিদেশীয়। মার্কিনীয় ইতিহাস ও মার্কিনীয় জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে স্বভাবতঃই তাঁর লেখনীর একটা অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল সত্য, এরূপ যোগ থাকা অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। কিন্তু এই সকল তো সত্যের বহিরাবরণ মাত্র। যে মহাসত্য এমার্সন আয়ত্ত করিয়া এই বহিরুপকরণের সাহায্যে ব্যক্ত করিতে আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, এখনও ইংরাজ বা আমেরিকান জনসাধারণ তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হয় নাই। এই জন্যই এমার্সন অনেকের নিকট এরূপ দুর্ব্বোধ্য। যাঁহারা এমার্সন লইয়া নাড়া চাড়া করেন, তাঁহারাও অনেকেই কেবল এমার্সনের রচনার বহিঃ কোষেই আবদ্ধ থাকেন, মূল শাঁসের সন্ধান প্রাপ্ত হন না।

প্রত্যেক মৌলিক ও বিশ্বজনীন প্রতিভা এক একটী মূল সত্য অবলম্বনে প্রকাশিত হয়। এই মূল সত্যই তাহার উপজীব্য, এই মূল সত্যই তাহার প্রাণ, এই মূল সত্যের অভিব্যক্তির জন্যই তাহা নিয়ত বিব্রত থাকে। নানা সুরে, নানা তালে, সে এই একই সাম গান করে। নানা মতে সে এই একই মন্ত্রের সাধন করে। এই মূল সত্যের সন্ধান বিন্দু মাত্রও যে প্রাপ্ত হয়, এই গূঢ় মন্ত্র যে একবারও উচ্চারণ করিতে পারে, তাহার নিকট সেই প্রতিভার বিরল, বিজন, অন্তঃপুর পর্য্যন্ত, চিরদিনের জন্য মুক্তদ্বার হইয়া যায়।

এমার্সনের বিশ্বজনীন প্রতিভা, এইরূপ কোন্ মহাসত্য অবলম্বনে প্রকাশিত হইয়াছিল? এমার্সন কোন্ নিগূঢ় মন্ত্র সাধন করিয়াছিলেন, যাহার সন্ধান পাইলে, তাঁহার আত্মার

অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার জন্মিয়া থাকে? এক কথায় বলিতে গেলে, তাহা তত্ত্বের একত্ব। একই শক্তি, একই জ্ঞান, একই প্রেম, একই আত্মা যে বহু রূপে এই দেশ কালের রঙ্গভূমিতে লীলা করিতেছে, ইহাই এমার্সনের প্রতিভার মূল মন্ত্র। এই এক গ্রামে তাঁর সকল সুর বাঁধা ছিল। যাঁহাদের প্রাণে এই মহা সত্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, কেবল তাঁহারাই এমার্সনের নিগূঢ় আস্বাদনের অধিকারী।

এই মহাসত্য এমার্সন কোথা হইতে লাভ করেন, বলা সুকঠিন। তবে হিন্দু শাস্ত্র সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যে স্বল্প বিস্তর সংস্রব ছিল, ইহা স্থির নিশ্চিত। ভগবদ্গীতার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার টেবিলে সর্ব্বদাই এক খানি গীতা থাকিত। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আমেরিকায় যাইয়া এমার্সনের বাড়ী দেখিতে যান। সে সময় এমার্সন যে টেবিলে বসিয়া লেখা পড়া করিতেন, তাহার উপরে তিনি একখানি ভগবদ্গীতা দেখিয়াছিলেন। এমার্সনের কন্যা এখন সেই বাড়িতে বাস করেন। আমি যেদিন কন্‌কর্ড্ তীর্থ দর্শনে যাই, সেদিন তিনি বাড়ী ছিলেন না। চাকর বাকর কেহই বাড়ী ছিল না। বাড়ী বন্ধ ছিল। সুতরাং সে গীতাখানি তদবস্থায় এখনও আছে কি না বলিতে পারি না। তবে উপনিষদের মূল তত্ত্বের সঙ্গে যে এমার্সনের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল, ইহা স্থির নিশ্চিত। ব্রহ্ম নামে এমার্সনের একটী ক্ষুদ্র কবিতা আছে। সেটী এই :—

If the red slayer think he slains
  Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways,
  I keep and pass and turn again.

Far or forgot to me is near,
  Shadow and sunlight are the same;
The vanished gods to me appear;
  And one to me are shame and fame

They reckon ill who leave me out;
  When me they fly, I am the wings,
I am the doubter and the doubt,
  And I the hymn the Brahmin sings.

The strongs gods pine for my abode,
  And pine in vain the sacred seven;
But thou, meek lover of the good!
  Find me, and turn thy back on heaven.

ভাবার্থ :—"হন্তা যদি মনে করে সে হনন করিয়াছে, হত যদি মনে করে সে হত হইয়াছে, তবে তাহারা উভয়েই প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। আমিই থাকি, আমিই যাই, আমিই পুনরাবর্ত্তন করি।

আমার পক্ষে দূর ও বিস্মৃতি উভয়ই অতি নিকট। আলোক ও অন্ধকার আমার নিকট দুই এক। অদৃশ্য দেবতারা আমার নিকট প্রকাশিত হন। স্তুতি নিন্দা উভয়েই আমার সমজ্ঞান।

আমাকে ছাড়িয়া যাহারা গণনা করে, তাদের সে গণনা ভুল হয়। আমা হইতে যখন তাহারা দূরে উড়িয়া যায়, আমিই তখন তাহাদের পক্ষপুটের মূলে শক্তিরূপে লুক্কায়িত থাকি। আমিই সন্দেহী, আমিই সন্দেহ, আমিই ঋক-মন্ত্র, যাহা ব্রাহ্মণেরা গান করেন।

দেবতাগণ আমার ধাম কামনা করেন। সপ্তর্ষিগণ বৃথায় আমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হন। কিন্তু হে নিরভিমানী, কল্যাণকারী পুরুষ, স্বর্গের প্রতি বিমুখ হইয়া তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইতে পার।"

এই কবিতাটীতে যে গীতা ও উপনিষদের ছায়া পড়িয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই কবিতাটী প্রথম প্রকাশিত হইলে হার্ব্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এমার্সনের রচনা, সকলেই পড়িলেন। কিন্তু অর্থ বোধগম্য করে সাধ্য কা'র? হার্ব্বার্ডের একজন অন্তেবাসীর নিকট শুনিয়াছি যে, সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্ম কথাটী এক অদ্ভুত অর্থ লাভ করে। যাহা কিছু দুর্ব্বোধ, জটিল, বাক্য মাত্র, তাহাকেই তখন তাঁহারা "ব্রহ্ম" বলিতেন। এমার্সন যে গীতা উপনিষদাদি স্বল্প বিস্তর জানিতেন, এই কবিতাটীই এক দিকে তাহার প্রমাণ, অন্য দিকে যেরূপ ভাবে ইহা তাঁহার স্বদেশীয় সমসাময়িক লোকেদের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইতে তাঁহার রচনার নিগূঢ় মর্ম্ম গ্রহণে, এ সকল লোক কতটা যে অপারগ ছিলেন, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। সৌভাগ্যক্রমে জর্ম্মাণ দর্শনের প্রচারে, এবং পাশ্চাত্য সমাজে প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বের ক্রমশঃ বিস্তারে, শনৈঃ শনৈঃ এমার্সনের মৌলিক তত্ত্ব, ইংরাজ ও মার্কিনীয় চিন্তাকে অধিকার করিতেছে। যে পরিমাণে এই মহা সত্যের প্রভাব সে সকল দেশে বিস্তৃত হইতেছে, সেই পরিমাণে এমার্সনের আদরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

আধুনিক জর্ম্মাণ দর্শন, এবং হিন্দুতত্ত্বজ্ঞান, উভয়েরই সঙ্গে এমার্সনের স্বল্প বিস্তর পরিচয় ছিল, এ কথা সত্য। কিন্তু তথাপি তিনি যে মহা সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত, আপনার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতালব্ধ, এ বিষয়ে তিলার্দ্ধও সংশয় নাই। এইখানেই এমার্সনের মহত্ব ও মৌলিকতা। এই জন্যই, যাহাদের সে অভিজ্ঞতা নাই, তাহাদের নিকট এমার্সন এরূপ দুর্ব্বোধ্য। সাধারণ শিক্ষকদিগের ন্যায় এমার্সন কখনও শুষ্ক শেখা কথা বলেন না। তাঁহার শিক্ষা ও সাধনা যে অতি সামান্য ছিল এরূপও নহে। অতি শৈশবেই তিনি সেক্সপীয়ার, মিল্টন, ড্রাইডেন্, ইয়ং প্রভৃতি ইংরাজ কবিগুণের গ্রন্থাদি পাঠ করেন। তৎপরে ক্রমে বাইরণ, স্কট্, এবং ওয়ার্ডসবার্থের সঙ্গেও ঘনিষ্ট পরিচয় জন্মে। এমার্সন আপনার ভ্রাতাদের সঙ্গে এই সকল পড়িতেন এবং পঠিত বিষয় সম্বন্ধে পরস্পরে স্বাধীনভাবে সর্ব্বদা সবিস্তারে আলোচনা করিতেন। যখন পড়িবার ভাল পুস্তক কিছু পাইতেন না, তখন আপনারা যথেচ্ছা কিছু কিছু লিখিয়া পরস্পরে মিলিয়া তাহা পাঠ ও বিচার করিতেন। এইরূপে শৈশবাবধিই এমার্সনের স্বাধীনভাবে বিবিধ বিষয়ে চিন্তা করিবার অভ্যাস জন্মে। তার পরে একটু বেশী বয়স হইলে, পৈত্রিক পৌরাহিত্য ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য, এমার্সন আমেরিকার তদানীন্তন্ কালের এক উৎকৃষ্ট তত্ত্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। সর্ব্বশেষে এই বিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া, এক উচ্চতর পোষ্ট গ্রাডুয়েট স্কুলে (graduate school) প্রকৃতিতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানাদি, সাধনার উচ্চতর অঙ্গ, অধ্যয়ন করেন। সে সময়ে আমেরিকায় একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকের পক্ষে যতটা জ্ঞান লাভ করা সম্ভব ছিল, এমার্সন তাহা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সকল শিক্ষা ও সাধনাতে এমার্সনকে আপনার কেন্দ্র ভ্রষ্ট না করিয়া বরং তাহারই উপরে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তিনি অনেক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু কদাপি শুদ্ধ অপরের অভিজ্ঞতা দ্বারা আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপুষ্টি সাধনের নিষ্ফল প্রয়াস পান নাই। মানুষকে বিবিধ শাস্ত্র সাহিত্য শিক্ষা করিতে হইবে, এ সকল ব্যতিরেকে মনুষ্যত্বের সম্যক ও সমদর্শী স্ফূর্ত্তি লাভ অসম্ভব ও অসাধ্য। কিন্তু যে আপনার জীবন কেন্দ্রের উপরে আপনি স্থির, অটল হইয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে, কেবল সেই বাহিরের শাস্ত্র সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণে সমর্থ, এমার্সন বারম্বার এই কথা বলিয়াছেন :—

> Can rules or tutors educate
> The semigod whom we await?
> He must be musical,
> Tremulous, impressional,
> Alive to gentle influence.
> Of landscape and of sky,
> And tender to the spirit-touch
> Of man's or maiden's eye:
> But to his native centre fast,
> Shall into Future fuse the Past,
> And the world's flowing fates in his own mould recast.

"To his native centre fast"—এমার্সনের সাধনার এই মূল মন্ত্র। তিনি আপনার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়াইয়া সকল দেখিতেন, সকলই বুঝিতে চেষ্টা করিতেন, কখনও আপনার অভিজ্ঞতাতে যাহা প্রকাশিত হয় নাই এমন সত্য লোকসমক্ষে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। এই জন্য এমার্সনের লেখাতে অপরাপর গ্রন্থের নির্দ্দেশ আছে বটে, অনেক সময়ই অপরের উক্তিও উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সকলই তাঁর নিজস্ব। সচরাচর আমরা যে সকল লোককে পণ্ডিত বলি, এমার্সন সেরূপ পণ্ডিত ছিলেন না; অথচ পাণ্ডিত্যের উপকরণ সমুদায়ই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। তিনি দার্শনিকও ছিলেন না, অথচ দর্শনের অনেক অতি নিগূঢ়াদপিনিগূঢ় তত্ত্ব তিনি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এমার্সন ঋষি ছিলেন। ঋষয়ো মন্ত্র দ্রষ্টারঃ, ঋষিগণ মন্ত্র দর্শন করেন। যাঁহারা নিগূঢ় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বিশ্বের মূলতত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারাই ঋষি। এমার্সনও ঋষি, কারণ তিনি তত্ত্বদর্শী তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। এমার্সনের সুযোগ্য পুত্র এডবার্ড এমার্সনের মুখে শুনিয়াছি যে, এমার্সনকে যে লোকে জ্ঞানী বলিয়া প্রশংসা করে, ইহাতে তিনি সম্ভবতঃ কখনই সন্তুষ্ট হইতেন না—The disagreeable word Sage often applied to him would never have pleased him. Seer is certainly a better word. তাঁহার সম্বন্ধে ঋষি শব্দই সমধিক উপযোগী। এমার্সনের পাঠক মাত্রেই তাঁহার পুত্রের এই

উক্তির সমর্থন করিবেন। এমার্সন তর্ক করেন না, বিচারে প্রবৃত্ত হন না, ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞার ন্যায় যুক্তির উপর যুক্তি স্থাপন করিয়া তদুপরি আপনার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পান না। তিনি কেবল সত্য দেখেন, এবং যাহা দেখেন তাহার সাক্ষ্য দেন এইজন্য তিনি যেখানে বাক্‌বিতণ্ডা হইবার আশঙ্কা আছে, এমন স্থলে প্রায়ই আপনার প্রাণের কোনও গভীর অভিজ্ঞতার কথা বলিতেন না। I do not gladly utter any deep conviction of the soul in any company where I think it will be contested; no, nor unless I think that it will be welcome" এমন কি সে সত্য যেখানে সাদরে গৃহীত হইবে না মনে করিতেন, সেখানে প্রায় তাহা ব্যক্ত করিতেন না। তাঁর ধারণা ছিল যে, তর্ক যুক্তির দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে, তাহাতে সত্যের সত্ত্বাই নষ্ট হইয়া যায়। Truth has already ceased to be itself, if polemically said. মানবাত্মার সত্যলাভের স্বাভাবিকী-শক্তিতে তাঁহার অটল আস্থা ছিল। তিনি বলিয়াছেন,—I believe that each mind, if true to itself, by living forthright, and not importing into it the doubts of other men, dissolve all difficulties, as the Sun at mid-summer burns up the clouds. Hence, I think, the aid we can give to each other is only incidental, lateral, sympathetic." অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মাই যদি আপনার প্রতি বিশ্বাসী থাকে, তাহা হইলে, শুদ্ধ জীবন ধারণ করিয়াই, এবং যাহাতে অপর লোকের সন্দেহ ও অবিশ্বাস আপনার ভিতরে বৃথা না আইসে,—তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া,—সমুদায় বিঘ্ন বাধা শরৎকালের মেঘের ন্যায়, আকাশে উড়াইয়া দিতে পাবে। অতএব আমরা পরস্পরকে যাহা কিছু সাহায্য করিতে পারি, তাহা সমুদায়ই কেবল অবান্তর বিষয়ে মাত্র, তাহা শুদ্ধ সহানুভূতি দ্বারা, তার অধিক নহে। অন্যত্র এমার্সন বলিয়াছেন যে, মানুষ মাত্রেই অনন্ত জীবন ক্ষেত্রে এক সামান্য ভূমি খণ্ড প্রজাস্বত্বে পাইয়াছে। এই সংকীর্ণ প্রাচীরবদ্ধ দেশে, তাহার দৃষ্টি সমক্ষে যাহা কিছু সংঘটিত হয়, তাহার সাক্ষ্য দান করাই তাহার জীবনের এক মাত্র কার্য্য।

"Vast the realm of being is
In the waste one lot is his:
Whatever hap befalls
In his vision's narrow walls
He is here to testify."

এমার্সন আপনার আন্তরিক অভিজ্ঞা হইতে সর্ব্বদা কথা কহেন বলিয়া, যাঁহাদের তাঁর অনুরূপ কোনও অভিজ্ঞতা আদৌ নাই, তাঁহারা কিছুতেই, কেবল মাত্র অভিধান ও ব্যাকরণের বলে তাঁহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। আবার এই জন্যই, যাঁহাদের সেরূপ অভিজ্ঞতা স্বল্প-বিস্তর কিছু আছে, তাঁহারা অন্যদিকে, এমার্সনের রসে একেবারে মজিয়া যান।

জীবনের প্রকৃত অভিজ্ঞতাকে এমার্সন এতটাই মূল্যবান বস্তু মনে করিতেন যে, অতি সামান্য ব্যক্তিও যদি আপনার প্রাণের কোনও প্রত্যক্ষ বিষয়ের কথা বলিত, তিনি তাহা সাদরে, সসম্ভ্রমে শ্রবণ করিতেন। আর অন্য দিকে, অতি বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত লোকও যখন আপনার প্রত্যক্ষের অতীত কথা বলিতেন, এমার্সন তৎপ্রতি কর্ণপাতও করিতেন না। প্রথম জীবনে এমার্সন পৈত্রিক পৌরহিত্য ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে ধর্ম্ম মন্দিরে যাইয়া দশজনকে লইয়া, বাঁধা প্রণালী ধরিয়া ভগবানের স্তুতি বন্দনা করিতে গেলেই, মাঝে মাঝে প্রণালীর খাতিরে, আপনার সাক্ষাৎ অনুভূতির বাহিরের কথা কহিতে হয় বলিয়া, তিনি ক্রমে ধর্ম্মযাজন পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ সাহিত্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। এমন কি অনেক সময় ধর্ম্মাচার্য্যেরা স্বকীয় অভিজ্ঞতার অতীত, অলীক সপ্তম স্বর্গের কথা বলেন বলিয়া, শেষে এমার্সন উপাসনালয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিলেন। একবার একজন অন্তরঙ্গের নিকটে এমার্সন বলিয়াছিলেন যে, উপাসনালয়ে উপদেশবেদী হইতে সচরাচর যে সকল কথা বলা হয়, তাহা শুনিয়া এমন মনে হয় না যে এসকল উপদেষ্টা জীবনে কখন রোগে কাতর, শোকে ম্রিয়মাণ, দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত, ঋণজালে বিজড়িত, বা পাপে তাপে জর্জ্জরিত হইয়াছেন। এরা যে মানুষ, মানুষের সুখ দুঃখ, ও রক্ত মাংসের সঙ্গে যে ইহাদের কোনও সম্বন্ধ আছে, ইহাদের সপ্তম স্বর্গের কথা শুনিয়া এরূপ মনে হয় না। এই সকল শূন্যগর্ভ, বাক্যময় উপসনা ও উপদেশাবলীর জ্বালায় এমার্সন ভজনালয়ে যাতায়াত একরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন।

এইজন্য এমার্সন ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরকেও বড়ই ঘৃণা করিতেন এবং শূন্যগর্ভ বাক্যের দ্বারা ভগবানের ভজনার বড়ই বিরোধী ছিলেন। এমন কি যখন তখন, যেখানে সেখানে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করাকে তিনি অতি গর্হিত কাজ মনে করিতেন। এই কারণে ধর্ম্ম চঞ্চুকের এমার্সনকে একরূপ অবিশ্বাসী বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু এমার্সন যে ভগবদুপাসনার বা পরমেশ্বরের নিকটে আত্ম নিবেদন করার কর্ত্তব্যে ও উপযোগিতায় বিশ্বাস করিতেন না, তাহা নহে। তবে তাঁহার ভাব এত গভীর, ও তাঁহার আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে সকলে তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারিত না। যখনই নিরাশার সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া আশার প্রাণময়ী জ্যোতিঃ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ফুটিয়া উঠে কিম্বা যখনই জীবনের গভীর সুখ ও আনন্দের সময়ে মন অন্তর্ম্মুখীন হইয়া, আপনার প্রতি আপনি তার বেশে চাহিয়া দেখে, তখনই সত্য ও সহজ প্রার্থনার উদয় হয় এমার্সন একরূপ বিশ্বাস করিতেন। ব্রহ্মচক্ষে ব্রহ্ম ওকে দর্শন করাই প্রকৃত প্রার্থনা। জগদীশ্বরের সঙ্গে জগতের সমুদায় কাম্য বস্তুকে সম্ভোগ করাই তাঁহার নিকটে ভগবদ্ভজনার আদর্শ ছিল। এইজন্য সচরাচর লোকে, বিশেষতঃ খৃষ্টীয়ান-মণ্ডলী মধ্যে 'আমাকে ইহা দাও, উহা দাও' বলিয়া যে যাচঞা করে, এমার্সন তাহাকে আত্মার এক প্রকার রোগ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন যে Men's prayers are a disease of the will তিনি লিখিয়াছেন,—

In what prayers do men allow themselves! That which they call a holy office is not so much as brave and manly. Prayer looks abroad and asks for some foreign addition to come through some foreign virtue, and loses itself in endless mazes of natural and supernatural, and mediatorial and miraculous. Prayer that craves a particular commodity—anything less than all good—is vicious. Prayer is the contemplation of the facts of life from the highest point of view. It is the soliloquy of a beholding and jubilant soul. It is the spirit of God pronouncing his works good. But prayer as a means to effect a private end is meanness and theft. It supposes dualism and not unity in nature and consciousness. As soon as the man is at one with God he will not beg. He will then see prayer in all action.

অর্থাৎ হায়! হায়! মানুষ সচরাচর কিরূপ প্রার্থনাই না করে। একরূপ প্রার্থনা একটা পবিত্র কর্ম্ম হওয়া দূরে থাকুক, ইহাতে শৌর্য্য ও মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত নাই। এইরূপ প্রার্থনা বহির্ম্মুখীন, ইহা কোনও বাহিরের শক্তির সাহায্যে কোনও বাহিরের বস্তু লাভ করিতে চায়, তাই অতি প্রাকৃতবাদ ও মধ্যবর্ত্তিবাদে জড়িত হইয়া যায়। যে প্রার্থনাতে কোনও একটা বিশেষ ও ব্যক্তিগত বস্তু ভিক্ষা করে, বিশ্ব-মঙ্গল অপেক্ষা কোনও ইতর বস্তু যাচঞা করে, তাহা পাপ মাত্র। জীবনের প্রত্যক্ষ বিষয় ও ঘটনাবলীকে অত্যুচ্চ দৃষ্টিভূমি হইতে পর্য্যবেক্ষণ করাই প্রার্থনা। যে আত্মা জগতে জগদীশ্বরের লীলা দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হয়, প্রার্থনা তাহার স্বগত উক্তি মাত্র। প্রকৃত প্রার্থনাতে স্বয়ং পরমাত্মা জীবাত্মার ভিতর দিয়া আপনার সৃষ্টি দেখিয়া আপনি পরিতৃপ্ত হয়েন। কিন্তু ব্যক্তিগত কোনও উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ যে প্রার্থনা প্রকাশিত হয়, তাহা নীচতা ও চৌর্য্যের সমান। ইহাতে প্রকৃতি জীব ও পরমাত্মার একত্ব না বুঝাইয়া দ্বৈতভাবও বিরোধ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু মানব যখনই পরমেশ্বরের সঙ্গে একাত্মভাব অনুভব করিবে, তখন আর সে যাচঞা করিবে না। তখন সে সকল কার্য্যকেই প্রার্থনারূপে দর্শন করিবে। এইরূপ প্রার্থনার আবশ্যকতা তিনি সর্ব্বদাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। তিনি বলিতেন যে মাতৃস্তন্য ব্যতিত শিশুর জীবন ধারণ করা যেরূপ সহজ ও সম্ভব, প্রার্থনা ব্যতিত আত্মার জীবন ধারণও সেইরূপ সহজও সম্ভব।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের কথা শুনিয়াছি যে তিনি পাঁচ সাত মিনিটের বেশী ভগবৎ-প্রসঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন না। পরমেশ্বর-তত্ত্ব বিষয়ে দু চারি কথা শুনিলেই তাঁহার চিত্তে এমন ভাবোচ্ছ্বাস হইত যে তিনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িতেন, তাহা বেশীক্ষণ সহ্য করা অসাধ্য হইত। এমার্সনেরও কতকটা সেরূপ ভাব ছিল। তিনি বারম্বার বলিতেন "Do not speak of God much. After very little conversation on the Highest Nature thought deserts us, and we run into formalism অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে বেশী কথা কহিও না। সেই পরা প্রকৃতি সম্বন্ধে দু চারি কথা বলার পরেই আমাদের চিন্তার স্রোত বন্ধ হইয়া যায়, এবং আমরা শব্দের শুষ্ক চড়ায় গিয়া ঠেকিয়া যাই।

জড়ে ও জীবে, সর্ব্বত্রই এমার্সনের চক্ষে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইত। তিনি প্রকৃতিতে ব্রহ্ম পূজা করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার বাসস্থান কন্‌কর্ড চারিদিকে প্রকৃতির বিবিধ দৃশ্যে পরিবেষ্টিত। তাঁহার বাড়ী হইতে একটু দূরে গেলেই

ছোট ছোট পাহাড় ও বন জঙ্গল পাওয়া যায়। কনকর্ডের পাশ দিয়া একটী অতি সুন্দর তটিনী প্রবাহিত হইতেছে। তার পরপারে বৃক্ষ লতা পূর্ণ মনোরম উপবন। বসন্ত সমাগমে যখন পত্র পুষ্পে ইহা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তখন বড়ই সুন্দর দৃশ্য হয়। এমার্সন এই তটিনীর তটে তটে প্রায়ই আপন মনে ভ্রমণ করিতেন। প্রকৃতি তাঁহার নিকট পরমেশ্বরের অবগুণ্ঠন মাত্র ছিল। তিনি বলিতেন,—Nature is too thin a screen ; the glory of the One breaks through everywhere' অর্থাৎ প্রকৃতি বড়ই সরু পর্দ্দা, তাহার ভিতর দিয়া সর্ব্বত্রই সেই একের প্রভা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এমার্সন বনে জঙ্গলে বেড়াইয়া কাণ পাতিয়া প্রকৃতির উপদেশ শুনিতেন। এই জন্য তিনি শিক্ষার্থী যুবকদিগকে সর্ব্বদাই এই উপদেশ দিতেন, "শোন—listen, একাকী ভ্রমণ করিবে, এবং অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু শোন তাহা রোজনামচায় যত্নে লিখিয়া রাখিবে।" আমেরিকার একজন অতি প্রসিদ্ধ সংস্কারক সম্বন্ধে এমার্সন এই কথা বলিতেন যে, তাঁহার প্রধান দোষই তিনি কিছু শুনিতে চান না—that he "would not listen"—not merely in conversation with others, but, what was worse, when alone. এমার্সন প্রকৃতির নিকটেই তাঁহার আপনার উদ্দেশের প্রণালীও শিক্ষা করেন। প্রকৃতি কখনও তর্ক-যুক্তি করে না। প্রকৃতি হয় কোনও তত্ত্ব ইঙ্গিত করে, বা কোনও সত্য ব্যক্ত করে। ইচ্ছা হইলে তুমি এই ইঙ্গিত অনুসরণ করিতে পার; সাধ্য হইলে তুমি এই সত্য গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু তর্কযুক্তির দ্বারা উত্যক্ত হইয়া কদাপি বিপথগামী হইবে না। বিশেষতঃ তুমি তাহার ইঙ্গিত গ্রহণ কর বা না কর, তার কথা শোন বা না শোন, প্রকৃতির প্রফুল্লতা ও ধৈর্য্য তাহাতে নষ্ট হয় না, প্রকৃতি চিরদিনই যোগযুক্ত, অটল, অবিচলিত। এই জন্য এমার্সন বলিয়াছেন যে, কোনও মানুষ সভাসমিতি হইতে বাহির হইয়া নির্জ্জন প্রকৃতির নিকট গেলেই সে যেন হাসিমুখে তাহাকে বলে—so hot, little man?—এত উষ্মা কেন হে বাপু?—তিনি আরও বলিতেন যে, প্রকৃতি হইতে সর্ব্বদাই নূতন, খাঁটি, জীবন্ত, প্রাণস্পর্শী সত্য-প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রকৃতিতে যেমন সেইরূপ সাধু ও সরল মানুষেও এমার্সন নিয়ত ভগবদ্দর্শন করিতেন। মানুষ আপনার নিকট আপনি খাঁটি থাকিলেই, আপনার স্বরূপস্থ ও প্রকৃতিস্থ থাকিলেই, তাহার মধ্যে পরমেশ্বরকে দেখা যায়। মানুষের মধ্যে এই ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত হয় বলিয়া, তিনি সর্ব্ব প্রকারের নীচতা, অসরলতা, ও অসাধুতাতে বড়ই ব্যথিত হইতেন। একস্থলে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, Every where I am hindered of meeting God in my brother because he has shut his own temple doors and recites fables merely of his brothers' or his brother's brother's God.

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহীশূরে রাজোদ্বাহ।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

৬ই জুন—আজ মহারাজের বিবাহ। গতকল্য মান্দ্রাজের গভর্ণর ভারতের রাজ-প্রতিনিধির প্রতিভূ হইয়া আসিয়াছেন। রাজপ্রতিনিধির সম্মানে তাঁহাকে সমাদর করা হইয়াছে। মহীশূরের রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহার প্রত্যাশায় আমরা সকলে পূর্ণ 'লেবাসে' (full dress) উপস্থিত থাকিয়া 'স্বাগত' জ্ঞাপন পূর্ব্বক রাজসম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছি। তিনিও আমাদের কর-মর্দ্দন করিয়া নিজের প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আজ আমরা ১১টার সময় 'ধড়া-চূড়া' পরিয়া বিবাহ-মণ্ডপে উপস্থিত হইলাম। আজকার জনতা, আজকার মহীশূর নগরের শোভা—বর্ণনাতীত: আজ যেন অজ রাজার নগর প্রবেশের চিত্র দেদীপ্যমান দেখিতেছি। রাস্তাঘাটে কেবলই স্ত্রীলোক—অসংখ্য স্ত্রীলোক, স্ত্রী স্বাধীন প্রদেশে যেন যূঁই, চামেলি, বেলি, গোলাপের ছড়াছড়ি; দাক্ষিণাত্য সুলভ শৃঙ্গারে সজ্জিত নারী মূর্ত্তি—রবি বর্ম্মার চিত্রের আদর্শ—দেখিতে দেখিতে যাইতে ছিলাম। তাহাদের শারীরিক গঠন অতীব সুঠাম—বেণীবন্ধে পুষ্পগুচ্ছ অত্যন্ত সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক; কেবল গণ্ডপ্রদেশে জাফ্রানের রঙ্গীন রেখাটী যেন চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় সৌন্দর্য্য নাশ করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে, এমন সুন্দর দেহকান্তি বঙ্গে সুদুর্লভ। ভয়ানক জনতা ভেদ করিয়া আমরা বিবাহ লগ্নের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে মণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। আজকার বন্দোবস্তটী পাকাপাকি—'সরকারী'

অর্থাৎ State ; আজ পূর্ণ সম্মানসহ সকলের অভ্যর্থনা—যথোচিত আসনের নির্দেশ। আমরা বিদেশীয় রাজপ্রতিভূগণ মহারাজের বামদিকে দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে সমাসীন হইলাম। রাজকর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ পদমর্য্যাদানুসারে আমাদের নিকটে কার্পেটে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু একটা রীতি যেন নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইল। স্বয়ং মহারাজ নগ্নপদ, সকলের জন্যই নিম্নে কার্পেটে আসন ; কিন্তু গভর্ণর হইতে সামান্য শ্বেতকায় পর্য্যন্ত চৌকিতে (chair) আসীন। যে কার্পেটে রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী দেওয়ান হইতে নিম্নতন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত আসীন, তাহারই উপর কাষ্টাসনে ইংরেজদিগের বসিবার স্থান নির্দেশ হইয়াছিল। আমাদের চক্ষে ইহা যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। এ বন্দোবস্তের ভাব ও উদ্দেশ্য আমরা সহজ জ্ঞানে বুঝিলাম না। রাজকর্ম্মচারিগণ অবশ্যই তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক এরূপ করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে দুর্গস্থ রাজভবন হইতে মহারাজ বরবেশে সুসজ্জিত এবং সুবর্ণ হাওদার উপর সুবর্ণ ছত্রের ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া মহাসমারোহে মিছিলসহ 'জগন্মনোমোহন প্রাসাদে' উপস্থিত হইলেন। এখানে কিন্তু একটা ইংরেজী প্রবাদের মর্য্যাদা ভঙ্গ হইল ; "All that glitters is not gold" এই প্রবাদটী মহীশূরের তাৎকালীন সমারোহে "All that glittered was gold except diamonds and other precious stones রূপে পরিণত হইয়াছিল। দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদ হইতে জগন্মনোমোহন প্রাসাদ অতি অল্প দূরে অবস্থিত, তবুও মিছিলের বাহার, সমারোহ ও গাম্ভীর্য্য যথাযথ পরিরক্ষিত হইয়াছিল। এ বন্দোবস্ত অতীব প্রশংসনীয়। চারিকোণে সোনার হাওদাযুক্ত চারিটী হাতী, তাহার মধ্যে মহারাজের নিজের সোয়ারী হাতী। পদাতি, অশ্বারোহী, রাজচিহ্নধারী বাহকবৃন্দ, পতাকা, ধ্বজা, ডঙ্কা, এই রাজমিছিলে না ছিল কি? মিছিলসহ মহারাজ ধীর পদবিক্ষেপে বিবাহ মণ্ডপের দ্বারদেশে সমাগত হইলেন। সকলেই জয় জয়কার ধ্বনিতে মহারাজাকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। কন্যাপক্ষ হইতে বনোর রাণা ও মূলীর রাজা মহারাজাকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক মণ্ডপে আনয়ন করিলেন। মণ্ডপমধ্যস্থ বেদিকামঞ্চে মহারাজ আসন পরিগ্রহ করিলে, অন্য সকলে নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইল। মহারাজের আসন গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই তোপধ্বনিতে গবর্ণর সাহেবের আগমন বার্ত্তা সূচিত হইল। সুযোগ্য বৃদ্ধ দেওয়ান বাহাদুর ও অপরাপর রাজকর্ম্মচারিগণ গবর্ণর সাহেব ও এ রাজ্যের রেসিডেণ্টকে দ্বারদেশ হইতে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বিবাহ সভায় আনয়ন করিলেন। এখানে কিংখাপের পর্দ্দার অন্তরালে রাজমাতা মহারাণী উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর সাহেব উপযুক্ত 'লেবাসে' G. C. B র 'তখ্‌মা তাবিজ' পরিধান পূর্ব্বক নতশিরে প্রথমে মহারাজ ও পরে অন্তরালস্থ রাজমাতা মহারাণীকে অভিবাদন করত আসন পরিগ্রহ করিয়া অদ্যকার শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান দর্শন করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে কন্যা বিবাহ-সভায় আনীতা হইলেন। কন্যা কাঠিওয়াব প্রদেশীয় ভনরাজার দুহিতা। তিনি পরমাসুন্দরী, রত্নাদিতে ভূষিতা, বিবাহবেশে তাঁহার মুখশ্রীতে রাজরাণীর গাম্ভীর্য্য ও মহিমা প্রতিভাত হইতে লাগিল। বহুজনতাপূর্ণ সভা মধ্যে, বার বৎসরের কন্যা যেন বরমাল্য হাতে নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্বয়ম্বরে উপস্থিত। চঞ্চলতাশূন্য স্থির দৃষ্টিতে পাত্রী সভাস্থ জনতার দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন ; আর (পুরোহিত কর্ত্তৃক) অনুদিষ্ট বিবাহপদ্ধতির আনুষ্ঠানিক কার্য্যগুলি যথাযথ সম্পাদন করিতেছিলেন। আজকার রাজোদ্বাহে আমরা সেকালের পৌরাণিক ভাব অনুভব করিতেছিলাম। হোমানলের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ সময়ে নবনারীর প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার পদাভরণ রত্নবনকমলের শিঞ্জনে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতেও ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা সহ মন্থরগতিতে প্রাচীন কবির ছবি যেন ফুটিতেছিল। যখন ভনর বড় জামাতা (ভনর রাণার প্রতিনিধিরূপে) কন্যার সম্প্রদান কার্য্য সম্পাদন করিলেন, তখন নব বিবাহিতা রাণী যেন স্বতঃই বুঝিতে পারিলেন, "আমি এখন রাজরাণী, আমায় পদোচিত স্থৈর্য্য ও গৌরব রক্ষা করিতে হইবে।" রাণীর নাম প্রতাপকুমারী বাঈ। তাঁহার অদ্যকার এই ভাবে তিনি যেন সেই নামেরই মহিমা ও সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছিলেন। এ দৃশ্যটী আমাদের বড়ই মনোমোহন করিয়াছিল।

বিবাহপদ্ধতি সমস্তই পূর্ব্বোল্লিখিত বিবাহের অনুরূপ, কেবল 'টালী' বন্ধনের সময় রাজসম্মানসূচক ২১ টী তোপধ্বনিতে রাজা ও রাণীর পরিণয়বার্ত্তা জনসাধারণে প্রচারিত



মহীশুর—রাজদম্পাতি।

Photo by Author. KUNTALINE PRESS.

প্রচারিত হইল। এই তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের মহোল্লাসপূর্ণ জয়জয়কার শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল।

বিবাহ পদ্ধতির কার্য্য সমাধা হইলে, গবর্ণর সাহেব যবনিকার সম্মুখীন হইয়া রাজমাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিলেন :—

'Since H. E. the Viceroy is unable to his regret to be present here today, he has asked me to represent him and to inform your Highness that Her Majesty the Queen Empress of India has been graciously pleased to command that her congratulations should be conveyed to your Highness."

মহারাজের দিকে মুখ ফিরাইয়া গবর্ণর সাহেব আবার বলিতে লাগিলেন "The Viceroy also desired me to express felicitation, on this auspicious ceremony and to wish your Highness and your bride a long and happy life. Speaking for myself, I wish to offer Her Highness the Maharani Regent and to your Highness my sincere congratulations on this happy event and I desire to express my earnest hope that this alliance, so auspiciously entered upon, will bring many blessings to your Highness and to your Highness's bride, that it will promote the happiness of your Highness's beloved mother and that it will add to the welfare of this already fortunate and prosperous State"

তখন দেওয়ান সার্, কে, শেষাদ্রি আয়াব্ রাজমাতা মহারাজের পক্ষ হইতে উত্তর দিলেন :—

"Her Highness the Maharani Regent is deeply grateful to Her Majesty the Queen Empress for the gracious message of congratulations which has just now been conveyed to her. Her Highness the Maharani Regent and His Highness the Maharaja join in tendering to H. E. the Viceroy their most hearty thanks for his felicitation on this auspicious ceremony, which has just now been concluded, and Her Highness begs to add that it has been a source of special gratification to her that their Excellencies the Governor of Madras and Lady Havelock have been able to grace with their presence the auspicious event of today."

তৎপর পুষ্পমালা দ্বারা ইংরাজ অতিথিবর্গকে বরণ করা হইল। গবর্ণর ও রেসিডেন্টসহ অপরাপর ইউরোপীয় অতিথিগণ নতমস্তকে বিবাহসভা ত্যাগ করিলেন। বরকন্যা—রাজা, রাণীও স্মিত মুখভঙ্গি দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রতিনমস্কার জ্ঞাপন করিলেন। আধুনিক প্রথা অনুসারে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া করমর্দ্দন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে হয় নাই।

এবার বিবাহেব উপঢৌকন বা যৌতুক দিবার পালা। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত নিমন্ত্রিত রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণ, মহারাজের আত্মীয় কুটুম্ব, প্রধান কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গ নিজ নিজ যৌতুক মহারাজা ও রাণীর করস্পর্শ করাইয়া আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে মহারাজেব পক্ষ হইতে আতর, পান ও পুষ্পমাল্যের প্রতিদান আবস্ত হইলে, তাঞ্জোরের নানাবিধ নৃত্য দর্শকবৃন্দের চক্ষুর প্রীতিসম্পাদন করিতে লাগিল। যথাসময়ে পুষ্পমাল্য, পান আতর বিতরণকার্য্য সমাপিত হইলে, দূরদেশাগত অতিথিবর্গ, মহারাণী রাজমাতার যবনিকার সম্মুখে অভিবাদনপূর্ব্বক, আপন আপন হৃদয়োচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করিলেন। মহারাণীও অতিথিদিগকে ধন্যবাদ দিয়া নবদম্পতির প্রতি আশীর্ব্বাদ কামনার অনুরোধ করিলেন। সভাস্থ সকলেই নবদম্পতিব শুভকামনা প্রকাশ করিলে, নবদম্পতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে মহারাণীর নিকটে গমন করিলেন। আমরা সভাস্থ সকলে ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া বেলা ১টার সময় স্ব স্ব বাসায় ফিরিলাম।

অপরাহ্ণ ৫ টার সময় আমরা নগর পরিভ্রমণে বাহির হইলাম। তখনও পথে জনতার হ্রাস হয় নাই; নগরের নানাস্থানে বিভিন্নপ্রকার আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত ছিল। সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের জনতা অত্যধিক। এ দৃশ্য বঙ্গীয় অতিথির চক্ষে নূতন। নাগরদোলার স্থানে, ছায়াবাজীর ঘরে, ভেল্কিবাজীর মজ্‌লিসে, ভাঁড়ের সম্মুখে, পুতুলনাচের আসরে, "লটারী" খেলার কুঠরীতে, আশ্চর্য্য সামগ্রীপুঞ্জে সুসজ্জিত দোকানের নিকটে—যেখানে সেখানে স্ত্রীলোকের ভিঁড়; ক্রীড়া নাই, ব্রীড়া নাই, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদের ন্যায় মুখে বস্ত্রাবরণ নাই—যুবতী, কিশোরী ও প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরই মেলা, এসব আমোদে যেন তাহাদেরই পূর্ণাধিকার। বিচিত্রবেশধারিণী স্ত্রীলোকদের জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য!

সন্ধ্যার সময় আমরা রাজদরবারে হাজির হইলাম। আজ নবদম্পতি বিবাহ মণ্ডপেই নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিবেন। দাক্ষিণাত্যে একটী সুন্দর নিয়ম প্রচলিত আছে।

যে বয়সেই বিবাহ হউক না কেন, স্বামী-স্ত্রীতে সন্দর্শন বা একত্রবাস আমাদের দেশের ন্যায় ঘটে না। স্ত্রী যে পর্য্যন্ত উপযুক্ত বয়সপ্রাপ্ত না হন, সে পর্য্যন্ত স্বামীর নিকট হইতে পৃথক থাকেন। তৎপরে বর ও কন্যাপক্ষীয়গণ উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক স্বামী স্ত্রীতে মিলনের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। অদ্যকার রাত্রির অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলিকে আমাদের দেশের স্ত্রী আচার বলিলেই হয়, বর ও কন্যা হাত ধরাধরি করিয়া মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন।

অতঃপর বরকন্যা পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া ফুল গুচ্ছ নিক্ষেপ ও তজ্জনিত আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ফুলশর নিক্ষেপ ও প্রতিনিক্ষেপ লক্ষ্যভ্রষ্টতার জন্য উভয় পক্ষীয় আত্মীয়গণের পরস্পরকে গঞ্জনা, নানা বর্ণের চূর্ণ দ্রব্য লইয়া পরস্পরের গণ্ড দেশে প্রক্ষেপ, পুষ্প তাম্বূল ও সুগন্ধি দ্রব্যাদির আদান প্রদান প্রভৃতি নানা কৌতুক নব দম্পতির মধ্যে চলিতে লাগিল। এখানেও পুরোহিত ঠাকুরের অধিকার, তিনি মন্ত্রপূত করিয়া পুষ্পাদি নব দম্পতির হাতে দিলে পর পরস্পরে আদান প্রদান বা নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টাকাল খেলা ধূলার পর, বর কন্যা দরবারে গম্ভীর ভাবে বসিলেন, নকিব ফুকারিতে লাগিল, দরবার আরম্ভ হইল। রাজ-কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ পদ অনুসারে মহারাজকে অভিবাদনপূর্ব্বক আসরে উপবেশন করিলেন। আবার সেই তাঞ্জোরের এক ঘেয়ে নাচ চলিতে লাগিল। এইরূপে আরও ঘণ্টা খানেক পরে আতর, পান ও পুষ্পমাল্য বিতরণের পর সভা ভঙ্গ হইল। মহারাজ ও রাণী অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন।

ইহার পর ক্রমাগত কয়েকরাত্রি নবদম্পতি এই বিবাহ মণ্ডপে প্রকাশ্য দরবারে নানাবিধ স্ত্রীআচার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। একদিন পুষ্পদোলায় তাঁহাদের দুলিবার কথা ছিল; ইংরাজ অতিথিগণ তাহা দেখিবেন। কিন্তু যথাকালে পুষ্পদোলা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হওয়ায়, সে দৃশ্য দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। কিন্তু তাহার সাজ সরঞ্জাম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, ব্যাপার খানা যথার্থ ফুলদোলাই বটে।

নৃত্যাদি দর্শন উপলক্ষে রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়া আমরা সমবেত অতিথিবর্গ পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলাম। নৃত্যগীত, ভাঁড়ামি, নানা সঙ, ও অন্যান্য তামাসার সঙ্গে সঙ্গে দূরদেশাগত অতিথিগণ পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপনের সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। যাহারা পানাভিলাষী তাহাদের জন্য বন্দোবস্তের ক্রটী ছিল না। যাহাদের তাহাতে অভিরুচি নাই, তাহাদের জন্যও অন্যবিধ সাত্ত্বিক বন্দোবস্ত ছিল। অদ্যকার সভায় নর্ত্তকীদের বিরাম নাই—নানা দেশীয় নানা ধরণের গীত বাদ্য ও নৃত্যকলার চরম আদর্শ প্রদর্শিত হইতে লাগিল। নব দম্পতির সংসর্গে বিবাহ সভায় নানাবিধ আমোদে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি, নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের মলয়ানিলে বঙ্গের নববসন্তের স্পর্শসুখ যেন এ সময় হঠাৎ উপস্থিত। বঙ্গের প্রবাসীর পক্ষে অদ্যকার রাত্রিটী বিরহোদ্দীপক।

১৩ই জুন পর্য্যন্ত বিবাহ-সংসৃষ্ট অপরাপর অনুষ্ঠান ব্যাপারাদি এবং স্ত্রী আচারগুলি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একই রকমে চলিতে লাগিল। দরবারে নৃত্য গীতাদি পান, আতর ফুলমালা বিতরণ সবই একঘেঁয়ে; প্রত্যহ অন্ততঃ পক্ষে দুঘণ্টাকাল প্যাণ্টলুন সহ পদ্মাসনে উপবেশনের কষ্ট অনুভব করিতাম। শেষ দিনে মহারাজ সস্ত্রীক বিবাহের অনুষ্ঠেয় অবশিষ্ট ক্রিয়াদি সমাপন করিলেন; বিবাহ মণ্ডপের স্তম্ভাদির পূজা, গুরুপূজা, যজ্ঞশেষ আহুতি ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া মহারাজা ও রাণী দরবারে বসিলেন। এবার আর এক বিরাট ব্যাপার উপস্থিত। সমবেত অতিথিবর্গ ও রাজকর্ম্মচারিগণকে "খেলাত" বা রাজ-উপহার প্রদত্ত হইতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অবিরাম খেলাত বর্ষণ ব্যাপার চলিতে লাগিল! বহুমূল্য শাল ও উষ্ণীষ একখানি থালায় করিয়া প্রথমে মহারাজ ও রাণীর হস্তস্পর্শ করান হয়, পরে দরবারের বক্সী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে রাজসম্মুখে আনয়নপূর্ব্বক খেলাত প্রদান করিতে লাগিলেন। আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত এই উপহারের যেন আর বিরাম নাই। ছোট বড় অতিথি, ছোট বড় রাজকর্ম্মচারী, সকলেই যথোপযুক্ত খেলাত পাইলেন। শুনিতে পাইলাম, এই খেলাত বিতরণ ব্যাপারে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত নিমন্ত্রিত রাজাদের ও রাজ-প্রতিনিধিদের প্রতিদান স্বরূপ খেলাত ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ং মহারাণী পৃথক্ পৃথক্ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দান করিয়াছিলেন।

বিবাহের দিন হইতে এক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন

ভুবেল। মহারাজ ও রাণী রাজ দরবারে একত্র মিলিত হইয়া নৃত্য গীতাদিতে যোগদান করিতেন এবং শাস্ত্রীয় বিধি ও স্ত্রী আচার ব্যাপার সম্পাদন করিতেন। সপ্তাহান্তে নব-দম্পতি এই কঠিন পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইলেন।



বিবাহ-সভায় সপ্তাহব্যাপী ক্রিয়াকর্ম্মের সময়, দর্শন ব্যতীত রাজ অন্তঃপুরে নবদম্পতির মিলনের কোন ব্যবস্থা নাই। স্ত্রী বয়স্কা হইলে পর, দ্বিতীয় বিবাহ বা গর্ভাধান বিবাহ কার্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বামী স্ত্রী একত্র বাস করিবার নিয়ম মহীশূর রাজ্যে প্রচলিত। সে রাজ্যে এই নিয়ম এখন রাজবিধিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া ২।১ জন লোকে কারাদণ্ডও ভোগ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে 'সহবাস আইন' লইয়া যেরূপ তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল, এই আদর্শ রাজ্যে তাহা বিধিবৎ ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্তটী ভারত সাম্রাজ্যে কম গৌরবের বিষয় নয়!

১৪ই জুন সন্ধ্যার পর বিরাট মিছিলে নব দম্পতির নগর পরিভ্রমণে বাহির হইবার দিন। এই ব্যাপারটীও যেন নাগরিকদিগকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছিল। যে যে নির্দ্দিষ্ট রাজপথ দিয়া মহারাজের মিছিল যাইবে, সেই সেই মহল্লার লোকগণ বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া স্থানে স্থানে অতি সুন্দর তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই ব্যাপারে এক মহল্লার সহিত অন্য মহল্লার যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। সেদিন সহরে আলোর বাহার কি অদ্ভুত! বঙ্গদেশের ন্যায় এখানে মল্লিকার প্রদীপ দিবার প্রথা দেখিলাম না। লাল, নীল, সবুজ নানা রঙ্গের লণ্ঠনে আলো এমন ভাবে সাজাইয়া দিয়াছে, যেন বোধ হয় অট্টালিকার গাত্রে হীরা, চুনি, পান্না গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে। এই লণ্ঠন গুলির শোভা দিনের বেলায় কিছুই বুঝা যায় না; কিন্তু রাত্রিতে এই আলোর দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল। এখানে আর একটী উল্লেখ-যোগ্য বিষয় এই যে, আমাদের দেশে (বঙ্গদেশে) রাত্রি ও দিনের বেলায় সাজের তারতম্যের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। সে জন্য দিবালোকে যাহা সুন্দর দেখায়, রাত্রিতে চন্দ্রালোকে বা প্রদীপালোকে অনেক সময় তাহার বাহার থাকে না। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের লোকেরা এবিষয়ে খুব পটু, তাহারা চমৎকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে নিপুণ। দিনের বেলায় রাজপথের সাজসজ্জা নয়নের তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয় নাই; কিন্তু সন্ধ্যার পর মিছিলের রোশনাই ও চন্দ্রালোকে উহা কেমন বিচিত্র ও সুন্দর দেখাইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা সুকঠিন। বাস্তবিক এরূপ সাজসজ্জার কার্য্যে দাক্ষিণাত্যের লোক সুনিপুণ। তাহাদের আতস বাজীর নমুনা দেখিয়াও আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

রাত্রি দশটার সময় মিছিল রাজপ্রাসাদ হইতে রওয়ানা হইবার কথা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া সকলেরই মনে আশঙ্কা হইল, ঝড় বৃষ্টিতে বা সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু, ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! ভাগ্যবান্ পুরুষদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে কদাচিৎ আকস্মিক বাধা বিঘ্ন দেখা যায়। মহারাজা ও রাণী যেমনই হাতীর উপর উপবিষ্ট হইলেন, অমনি সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়া আকাশ মেঘমুক্ত হইল; তখন সকলেরই মনে মনে ধারণা হইল, দেবগণ স্বর্গ হইতে শান্তিবারি বর্ষণ করিলেন। মেঘমুক্ত চন্দ্রালোক দেখিয়া সকলেই জয় জয়কার করিতে লাগিল। এই মিছিলে না ছিল কি? যিনি ঢাকাতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মিছিল দেখিয়াছেন, তিনি কতকটা ইহার ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নানা বর্ণের আলোক, অত্যদ্ভুত আতস বাজী, নানাবিধ বাদ্য, অসংখ্য সৈনিক পদাতি ও অশ্বারোহী, রাজচিহ্ন ও ধ্বজপতাকাধারী অসংখ্য লোকজন সহ মিছিল বাহির হইল। (২৫১ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ) দাক্ষিণাত্যে নর্ত্তকীদের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশীরকম। দলে দলে নর্ত্তকীগণ মিছিলের অগ্রে, মধ্যে ও পশ্চাতে নানা স্থানে সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছিল। আলোক-মালা, ধ্বজপতাকা তোরণশোভিত মহীশূর নগরী এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল! রাজপথে জনতা—কেবলই জনতা—এই জনতা ভেদ করিয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। ইহা ছাড়াও দ্বিতল, ত্রিতল দালানের উপর অসংখ্য স্ত্রীপুরুষের সমাবেশ। রাজপথের বিভিন্ন স্থানে মহোল্লাসে উন্মত্ত নাগরিকগণ নবদম্পতির অভ্যর্থনার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। পাটহস্তীর উপর আরূঢ় রাজা ও রাণী—এক এক বাড়ীর সম্মুখীন হইলে খৈ, পুষ্প ও মাল্যাদি সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা গৃহপতিগণ উভয়কে বরণ করিতেছে। এই-রূপে নগরের প্রধান প্রধান রাজপথ অতিক্রম করিয়া কর্ম্মচারী ও প্রজাসাধারণের উৎসাহপূরণ করত মহারাজ ও রাণী মিছিল সহ প্রত্যুষে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। মিছিলের আড়ম্বর দেখিয়া আমরা রাত্রির প্রথম ভাগেই স্বীয় আবাসে ফিরিয়াছিলাম। পরদিন অপর সাধারণের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমরা মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে সারারাত্রি না থাকিয়া বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়া-ছিলাম।

ইতোমধ্যে একদিন ইংবাজদিগেব একটী ভোজ state Dinner হয়—After dinnerএ আমবা নিমন্ত্রিত হইযা ছিলাম। মহাবাজ স্বযং Queen's Health পানেব প্রস্তাব কবেন এবং ইংবাজীতে নিজ স্বাস্থ্য পানকাবীদিগকে অভিনন্দিত কবেন। ষোড়শ বৎসব বযস্ক বাজকুমাবেব এই নাকি প্রথম ইংবাজী বক্তৃতা। তাঁহাব সাহস ও ইংবাজী-শব্দোচ্চাবণ প্রণালী প্রশংসনীয।

ইহাব পব দুই ঘণ্টা কাল আতস বাজীব তামাসা হয। মান্দ্রাজী বাজীকবগণ এ বিষযে সিদ্ধহস্ত। কলিকাতায অনেক বড় বড ব্যাপাবে আতস বাজীব তামাসা দেখিযাছি, কিন্তু মান্দ্রাজী আতস বাজীব ন্যায ব্যাপাব আব কোথাও দেখি নাই। অগ্নিবৃষ্টি, নানা বকমেব ছাব, বামবাবণেব ও ইংবাজবুযবেব যুদ্ধ, উপদেশপূর্ণ শ্লোক প্রভৃতি কত বিষয যে আতস বাজীতে দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা কব দুঃসাধ্য।

১৬ই জুন আমাদেব মহীশূব পবিত্যাগ কবিবাব দিন। সে দিন বাজমাতা মহাবাণী আমাদিগকে "খেলাত" দিলেন। বাজ-অন্তঃপুবেব মাঝামাঝি এক স্থানে কিনখাপেব পর্দ্দাব আড়ালে উপবেশনপূর্ব্বক মহাবাণী নানাবিধ সুমিষ্টবাক্যে আমাদিগকে আপ্যাযিত কবিলেন। বিশেষ কষ্ট, অসুবিধা ও পথক্লান্তি স্বীকাব কবিযা আমবা বিবাহে যোগদান কবিয়াছি বলিযা আমাদিগেব ধন্যবাদ কবিলেন এবং আমবা যেন কোন প্রকাব ক্রটী গ্রহণ না করি, এই অনুবোধ কবিলেন। তিনি কানাড়ি ভাষায় কথা কহিলেন এবং তাহার বড় জামাতা (অথবা সহোদব ভ্রাতা) দোভাষীব কার্য্য করিতে লাগিলেন।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলাম, "আপনি এ উৎসব ব্যাপারে একরূপ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; এ বৃহৎ ব্যাপারে বন্দোবস্তের ক্রটি হওয়াই সম্ভব ছিল; কিন্তু কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্যপরায়ণতায় অতি সুন্দররূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে; কোন অংশে কোন বিষযে খুঁত নাই। মানুষ সমালোচন প্রিয, পবদোষান্বেষী। কিন্তু আমবা চেষ্টা কবিযাও এব্যাপাবেব কোন প্রকাব ক্রটি বা দোষ ধরিতে পাবি নাই—যদি আমাদেব মনে কোন দুঃখ থাকে, তবে এই মাত্র এক দুঃখ লইযা যাইতেছি।" হীবকাঙ্গুবী,—জবিব শাল, তাস, কিনখাপ, প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যেব "খেলাত" লইযা যখন আমবা গাড়ীতে উঠিলাম, তখন মনে হইল, কেহ বা আমাদিগকে এই সকল জিনিসেব ব্যবসাযী বলিযা সন্দেহ কবে। তৎপবে সেই অল্পসময মধ্যে যে সকল বাজকর্ম্মচাবী ও দুবদেশাগত অতিথিব সঙ্গে পবিচয ও বন্ধুত্ব হইযাছিল, তাহাদেব নিকট হইতে বিদায গ্রহণেব জন্য বাহিব হইলাম। উপসংহাবে এই আদর্শ বাজ্যেব কর্ণধাব, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবংশীয স্বনামখ্যাত মন্ত্রী সার্, কে, শেষাদ্রি আইযাব কে, সি এস্, আই মহোদযেব



সার্ কে শেষাদ্রি আইয়ার, কে. সি. এস. আই।

সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তিনি সংপ্রতি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু চাণক্যসদৃশ রাজনীতিজ্ঞ এই বৃদ্ধ মন্ত্রীপ্রবরের নাম মহীশূর রাজ্যের অস্থিমজ্জায় বিজড়িত থাকিবে, সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশের পারঘাট জেলার একজন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন B. A B L. ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমে মহীশূর রাজ্যের বিচার বিভাগে সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ সালে ডিপুটি কমিশনার, পরে প্যালেস্ কণ্ট্রোলার, তৎপরে সেসন্ জজের পদে উন্নীত হন। নিজের প্রতিভা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বলে তিনি ক্রমে মহীশূর রাজ্যের কর্ণধাররূপে অধিষ্ঠিত হন। Sir W. W. Hunter তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "A statesman who has given his head to Herbert spencer and his heart to Para Brahma.'

ঘটনাবশতঃ কলিকাতা নগরীতে তাঁহার সহিত প্রবন্ধ লেখকের সাক্ষাৎ হয়। এবং সেই সূত্রেই মহারাজের বিবাহোপলক্ষে মহীশূর গমনের সুযোগ হয়। এই উদ্বাহ কাণ্ডে তিনি কৃষ্ণ সদৃশ সারথি ছিলেন। একটা ঘড়ী হস্তে তাঁহাকে সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য, সামাজিকতায়, আদর অভ্যর্থনায়, ছোট বড় সকল ব্যাপারে ব্যস্ত দেখিতাম। তিনি যেন একটা যন্ত্রের ন্যায় অবিরাম কার্য্য করিতেছেন,—কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি বা বিশ্রাম নাই। ভারতবাসী সময়ের মূল্য জানে না, একলঙ্ক এই বৃদ্ধ মন্ত্রীতে কোন ইংরেজ আরোপ করিতে পারেন নাই।

এই বিরাট ব্যাপারের বন্দোবস্ত এমন পরিপাটী ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল যে, কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকলেই একবাক্যে বিবাহ ব্যাপারের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অতিথিবর্গের জন্য বহ্বাড়ম্বর-শূন্য, অথচ এমন সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, সকলেই একবাক্যে তাহারা প্রশংসা করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যবাসীর পক্ষে এরূপ অভিযান তীর্থভ্রমণতুল্য।

শ্রীমহিমচন্দ্র দেব বর্ম্মা।

আবুল্ ফজল্

যে সমস্ত উদার হৃদয় দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ সভাসদ্ মোগল বংশীয় সম্রাটশ্রেষ্ঠ শাহানসা আকবরের সাম্রাজ্যের ভিত্তি ভারতবর্ষে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছিলেন, আবুল ফজল্ তাঁহাদের অন্যতম। মোগল সাম্রাজ্য কালের অনন্ত মহিমায় ধূলিসাৎ হইয়াছে—মোগল রাজধানী নগরী-প্রধানা মহানগরী দিল্লী আপনার অতীতের স্মৃতি লইয়া দর্শক পথিকের নেত্রকোণে অশ্রুবিন্দুর উদ্রেক করিতেছে—উক্ত সাম্রাজ্যের গর্ব্বের আস্পদ বৈদেশিক নৃপতিবৃন্দের বিস্ময়স্থল "তক্ত তাউস্" (ময়ূর-সিংহাসন) এখন বৈদেশিক বণিকের করতলগত—পৃথিবীর মধ্যে স্থাপত্য কীর্ত্তির পরাকাষ্ঠা তাজমহলের ছবি বক্ষে ধারণ করিয়া নীল সলিলা যমুনা বিষণ্ণভাবে মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া ভূতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি জাগাইয়া দেয় মাত্র। সে জগদ্বিমোহন সমৃদ্ধি, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ অতুল ঐশ্বর্য্যের আর কিছুই নাই। মোগলের সে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত বৈজয়ন্তী দিল্লীর প্রাসাদশিখরে আর সগর্ব্বে আন্দোলিত হয় না। সম্রাট্ আকবরের সে জগৎ প্রসিদ্ধ "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" নাম এখন ইতিহাসগত হইয়াছে। কিন্তু আজিও অতীতের যে গৌরব যিনি বিমোহিনী তুলিকায় চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, এ প্রবন্ধে তাঁহারই একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইবে।

আবুল ফজলের পূর্ণ নাম শেখ আবুযল ফজল বিন মুবারক। নামের শেষাংশের অর্থ মুবারকের পুত্র'। হিন্দু গ্রন্থকারেরা যেরূপ স্বরচিত গ্রন্থের প্রারম্ভে বা উপসংহারে যথারীতি ইষ্টদেবের বন্দনা করিয়া নিজের বংশাবলীর পরিচয় দিয় থাকেন, পারস্য গ্রন্থকারদেরও সেরূপ রীতি আছে। তাহা ছাড়া অনেকে স্বীয় পিতার নামও নিজের নামাংশে যোজনা করিয়া থাকেন। আবুল ফজলও এস্থলে সেই সনাতন প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। মান্দ্রাজ প্রদেশে নাগুর নামক স্থানে তাঁহার পিতা মুবারকের আদিম নিবাস ছিল। তিনি তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া আগ্রায় বাস করেন। সে স্থলের মাদ্রাসায় (মুসলমান বালকদের বিদ্যালয়ে) তিনি বাল্যকালে কয়েক বৎসর যাবৎ শিক্ষালাভ করেন। মুসলমানের মধ্যে শিয়া ও সুন্নি, ধর্ম্মের এই দুই প্রধান বিভাগ আছে। তাঁহার জীবনাখ্যায়কেরা বর্ণন করেন যে, প্রথমে তিনি শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহার পর উক্ত ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া শিয়া সম্প্রদায়কে আশ্রয় করেন। কালক্রমে কিন্তু তিনি উভয় সম্প্রদায়েরই মত ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে স্বাধীনতাবাদ (Freethinking) অবলম্বন করেন। ধর্ম্মান্ধ মুসলমানদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ উদারতা নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র। আমরা পরে দেখাইব যে, আবুল ফজলকে এই মতাবলম্বী হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনে কিরূপ বিপদ-গ্রস্ত, এমন কি অবশেষে নিহত হইতে হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, আবুল্ ফজল্ ও ফেজী পিতার উদার ধর্ম্মমতের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন ও আবুল ফজলের সংসর্গে ভবিষ্যতে সম্রাট আকবরের মুসলমান ধর্ম্মে নিষ্ঠা বিচলিত হইয়াছিল। আবুল ফজল ও ফেজী বাহ্যতঃ মুসলমান ধর্ম্মের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিলেও অন্তরে স্বাধীনতাবাদের যৌক্তিকতা স্বীকার ও অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রায় অনেক ঐতিহাসিকের এই মত যে, আকবরের সহিত পরিচয়ের পর তাঁহাদের সহবাস ও আলাপের ফলে এই ধর্ম্মমত আকবর প্রকাশ্যভাবে অবলম্বন করেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া

* Akbar by Col Malleson. Indian Statesman Series "Ayeen i Akbari" Translated by H. Beverdige B. C. S. আইনী আকবরী শ্রীযুক্ত জলধর সেন কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুদিত।

অনেক মুসলমান আমীর ওমরাহ আবুল ফজলের উপর বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হন ও পরিশেষে এই ছল করিয়া আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র, ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট্, সেলিমের উত্তেজনায় তাঁহাকে সুদূর দাক্ষিণাত্যে নিষ্ঠুর ঘাতকের অস্ত্রে অকালে নিহত করা হয়।

৯৫৪ হিজিরা অর্থাৎ ১৫৫১ খৃঃর আনুমানিক ১৪ই জানুয়ারী তারিখে আবুল ফজলের জন্ম হয়। আবুল্ ফজলের পিতা সেখ্ মুবারক নিজে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র সাঙ্গোপাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আকবরের চরিতাখ্যায়ক বদৌনি বলেন যে, মুসলমান ধর্ম্মের এমন অংশ ছিল না যাহা মুবারকের নিকট প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ধর্ম্মমতের উদারতার বৃদ্ধি হইয়াছিল। মুবারক তাঁহার পুত্রদিগকে এরূপ সংশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকল সমাজেই সমাদৃত হইবার যোগ্য গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি সুপরিমার্জ্জিত ছিল। তাঁহাদের স্মৃতিও সমধিক তেজস্বিনী ছিল। এই অনন্যসাধারণ ধীশক্তির উপর পিতৃ-প্রদত্ত সুশিক্ষার বীজ, উর্ব্বরক্ষেত্রে পতিত বীজের ন্যায়, অতি সুফল প্রদান করিয়াছিল। আবুল ফজল্ বিংশতিবর্ষ বয়সে একপ্রকার অধ্যয়নকার্য্য সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপকের দুরূহ ব্রতে দীক্ষিত হন। আকবরের রাজ্য *শাসন কালে বিংশতিতম বর্ষে অর্থাৎ ১৫১৪ খৃঃ তাঁহার সহিত আকবরের* প্রথম পরিচয় হয়। তখন আবুলফজলের বয়স ত্রয়োবিংশ বৎসর মাত্র। এত অল্প বয়সে তাঁহার বিদ্যাবত্তার খ্যাতি চারিদিকে এরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, গুণগ্রাহী আকবর তাঁহার গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পরিচয় লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান তাঁহার তদানীন্তন জীবনের একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন, একদা ঘটনাক্রমে ইস্পাহানীর একখানি অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের হস্ত লিখিত পুঁথি আবুল্ ফজলের হস্তগত হয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পুঁথির কতকাংশ অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় তাহার অক্ষরগুলি এরূপ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার পাঠোদ্ধার করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। আবুল্ ফজল্ এরূপ দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টিত হইলেন। তিনি উক্ত পুঁথির দগ্ধিত অংশ কাটিয়া ছাটিয়া তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নূতন কাগজ যুড়িয়া দিলেন। তাহার পর বারংবার পুঁথিখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তাহার বিনষ্ট অংশ উদ্ধার করিতে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

এই সময় সম্রাট আকবরের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। এই মোগল-কুল-তিলকের অন্তঃপুর মধুপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় তখন নানা দিগ্দেশ সমানীতা, সম্ভ্রান্ত রাজকুলোৎপন্ন লোকললামভূতা সুন্দরীগণের বলয়শিঞ্জন ও মধুর নূপুর নিক্কণে মুখরিত ও তাঁহার ইতিহাস-খ্যাত রাজসভা নানদেশীয় বিদ্বদ্বর্গের সমাবেশে সমলঙ্কৃত ছিল। আকবর একদিকে যেমন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, অন্যদিকে সেইরূপ অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কি কবি, কি ধর্ম্মোপদেষ্টা, কি দার্শনিক, কি ঐতিহাসিক, কি চিত্রকর কি সঙ্গীত-কলাকুশল সকলেই তাঁহার নিকট সমুচিত সমাদর পাইত। ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বৌদ্ধযুগের পর ভারতবর্ষে কাব্যকলা, চিত্রকার্য্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতির এতদূর উন্নতি আর অন্য কোন সময়েই হয় নাই। এবিষয়ে তাঁহার রাজসভা বিক্রমের নবরত্ন সভার বা আকবরের সমসাময়িক ইংলণ্ডের "কুমারী রাজ্ঞীর" সভা, বা ফ্রান্সের অধিপতি ষোড়শ লুইর বা স্পেনাধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপের রাজসভার সহিত তুলনীয়। আবুল্ ফজলের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুকবি ফৈজী আকবরের রাজ্যশাসনের দ্বাদশ বর্ষে, যখন সংগ্রামের শিবির চিতোরে স্থাপিত হয়, সে সময় আকবর কর্ত্তৃক শিবিরে সমাহূত হন। কথিত আছে যে, ফৈজী সংস্কৃতে বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন ও তিনি প্রায় ১০১ খানি স্বরচিত পুস্তক রাখিয়া যান। বলা বাহুল্য যে তাহার অনেকগুলিই বর্ত্তমানকালে বিনষ্ট হইয়াছে। তাঁহার পুস্তকাগারে ৪৩০০ খানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি ছিল।

প্রথমে আবুল ফজল্ আকবরের সভায় পরিচিত হইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার অগ্রজ ফৈজী সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। ইচ্ছা করিলেই ফৈজী বা তৎপরিচিত অন্য কোন আমীর ওমরাহ অক্লেশে তাঁহাকে আকবরের সহিত পরিচিত করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা স্বাভাবিক বিনয় বশতঃ লোকের নিকট সম্মান পাইবার জন্য প্রায়ই উন্মুখ থাকেন না। কারণ একদিন না একদিন লোকসমাজে তাঁহাদের সম্মান অবশ্যম্ভাবী—তাঁহাদের হৃদয়ে এ বিশ্বাস দৃঢরূপে বদ্ধমূল থাকে। কিন্তু আকবর যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে নিজ দরবারে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন, তখন তিনি বাদশাহের সে আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। বলা বাহুল্য, পরিচয় হইবার পর গুণগ্রাহী আকবর তাঁহাকে সেনাবিভাগের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশেষে কালসহকারে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার সদ্গুণের যথার্থ সমাদর করেন। এই পদে তিনি প্রায় ২৮ বৎসর কাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয় অবধি সম্রাট্ তাঁহার অশেষ গুণগ্রাম *ও বিদ্যাবত্তায় মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত যে সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হন,* তাহা আবুল ফজলের মৃত্যু পর্য্যন্ত অটুট ছিল। আকবরের জীবনীলেখক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কর্ণেল ম্যালিসন্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "পরিচয় অবধি আকবরের রাজসভা তিনি সমলঙ্কৃত করেন। সম্রাটের ও তাঁহার মধ্যে পরস্পরের চরিত্রে শ্রদ্ধা ও পরস্পরের কার্য্যে সহানুভূতি সমুত্থিত যে বিশুদ্ধ সখ্যভাবের বীজ পরস্পরের হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল উহা জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখের সার উপাদানস্বরূপ। সম্রাট আকবর আবুলফজলের একজন প্রধান প্রতিভাশালী শিষ্য হইয়াছিলেন। মৃগয়ার উৎকট আনন্দ, সাম্রাজ্য শাসনের গভীর উৎকণ্ঠা ও যুদ্ধের বিপুল শ্রমাবসানেও তাঁহার একান্ত শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিতে উৎসুক ছিলেন। আকবর একজন ধর্ম্মজ্ঞ মুসলমান ছিলেন; মোল্লা ও মৌলানাদের (শ্রুতি ও স্মৃতিজ্ঞ পণ্ডিতদের) তর্ক-সংগ্রাম শুনিবার অপেক্ষা সম্রাটের অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর আমোদ ছিল না।" *

বহু বৎসর সম্রাট কর্ত্তৃক এরূপ সম্মানিত হইয়া আবুলফজল সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এ সৌভাগ্য আকবরের অনেক মাৎসর্য্যপরায়ণ সভাসদের চক্ষুশূল হইয়াছিল। বিশেষতঃ এক বিষয়ের জন্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট তিনি বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পিতার নিকট আবুল্ ফজল যে উদার ধর্ম্মমত শিক্ষা করিয়াছিলেন, সাহচর্য্য ও আন্তরিক শ্রদ্ধাগুণে আকবর সেই ধর্ম্মমতের পক্ষপাতী হন। তাহার উপর আবার সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা আসিয়া তাঁহার সভা সমলঙ্কৃত করিতেন, সুতরাং সকল ধর্ম্মের সার মর্ম্ম তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন। তাঁহার উদার পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে ধর্ম্মান্ধতার সম্মান ছিল না, যুক্তি ও ন্যায়েরই সমধিক সম্মান ছিল। কালে সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সারভাগ সঙ্কলন করিয়া তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন। তিনিই তাহার প্রণেতা ও তিনিই তাহার প্রচারক (Prophet) ছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে জগৎস্রষ্টার জ্যোতির প্রতিবিম্বস্বরূপ লোকসাক্ষী জগচ্চক্ষু প্রভাকরকে তিনি প্রকাশ্যভাবে উপাসনা করিতেন। সূর্য্যকান্ত মণি দ্বারা কার্পাসে অগ্নিসংগ্রহ করিতেন, অগ্নিহোত্রীদের মত সে অগ্নি সর্ব্বদা জ্বালাইয়া রাখা হইত। কর্পূর ধূপ অগুরু গুগগুলে হোম করিয়া, তিনি ললাটে টীকা ধারণ করিতেন। তাঁহার রাজপুত

* Akbar, by Col. Malleson (Rulers of India Series P. 152.

মহিলাদের সম্মান করিয়া দেব দেবীর অর্চ্চনা করিতেন। একাদশী প্রভৃতি তিথিতে উপবাস করিতেন। অনেক তিথিতে তিনি নিরামিষ ভোজন করিতেন। তিনি নিজে গোমাংস ভক্ষণ করিতেন না। প্রকাশ্য স্থানে গো বধ করিলে প্রজাদের বিশেষরূপে দণ্ডিত হইতে হইত। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিযাছেন যে, অনেককে তিনি মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন। এমন কি নিজেকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া তাঁহার ধারণা হওয়ায় লোকে দেবতার মত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে তাহাতে তিনি আপত্তি করিতেন না। ঈশ্বর ও ঈশ্বর-প্রেরিত ('রসুলো খোদা') মহম্মদ ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা-পদ্ধতি যে ধর্ম্মে নাই, সে ধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট ধর্ম্মমতের এরূপ স্বেচ্ছাচার একেবারে অমার্জ্জনীয়। তাহার উপর আকবর মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে কোনও বিশেষ প্রভেদ করিতেন না। কি খ্রীষ্টান, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কাহারও তিনি অসম্মান করিতেন না। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে ও নীতিতে পণ্ডিত মোল্লা মৌলানাদের, হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক সন্ন্যাসীদের বা বৌদ্ধ শ্রমণদিগের তাঁহার নিকট সমান আদর ছিল। আবুল ফজল স্বীয় গ্রন্থে অনেক স্থলে এরূপ য়িহুদী রাবিদের (Rabbis) ও খ্রীষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় তর্কের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার অনেক সভাসদ গোঁড়া মুসলমানেরা প্রকাশ্যে না হউক, অন্তরে—এ ধর্ম্মের উপর একান্ত বীতশ্রদ্ধ ছিল ও তাহাদের ধারণায় আকবরের এরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিতার যাহারা প্রধান কারণ হইয়াছিল, তাহাদের উপর তাহারা মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইল। তিনি যে উদার অপক্ষপাত রাজনৈতিক ভিত্তিতে মোগল সাম্রাজ্য অক্ষয় করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই অদূরদর্শীদের নিকট অজ্ঞেয় ছিল। আকবরের জীবনচরিত লেখকদের মধ্যে বদৌনি বড় ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। আকবরের কোন রাজনৈতিক বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে বদৌনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কেন যে সম্রাট্ এমন স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি তাহার কতক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে সম্রাট্ ভাবিতেন যে, "যদি সর্ব্বত্র একপ যথার্থ জ্ঞান সুপ্রাপ্য হয়, তবে যে ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও সহস্রবৎসরের অধিক পুরাতন নহে, সেই ইস্‌লাম ধর্ম্মে সমগ্র সত্য নিহিত থাকা কি প্রকারে সম্ভব? তাহা হইলে কেনই বা এক সম্প্রদায় যে বিষয় স্বীকার করে, অপর সম্প্রদায় তাহা অগ্রাহ্য করে—কেনই বা সম্প্রদায় বিশেষ শ্রেষ্ঠতার ভাণ করে—যখন কোথা হইতে সে শ্রেষ্ঠতা তাহাকে প্রদত্ত হয় নাই।"* বিবেক ও যুক্তির নিকট এরূপ বাক্য অমৃতময় হইলেও, ধর্ম্মান্ধতা এমতকে দূরে পরিহার করে।

সম্রাট্ আকবরের সভায় যে সভাসদেরা আবুলফজলের ও তাঁহার আত্মীয়দের প্রধান বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন প্রধান মখ্‌দুম উল্-মুল্ক্ ও শেখ্ আবদুন্নবি। ইঁহারা সুন্নিসম্প্রদায়ের নেতা ও এতাবৎকাল রাজ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহাদের অত্যধিক অহমিকা ও অসহ্য ধর্ম্মান্ধতায় এক অভিনব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে আকবর কৃতসংকল্প হন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারীর আদেশে রাজ্যে সিয়া সম্প্রদায়ের ও "অন্যান্য বিধর্ম্মীদের" যে উৎপীড়ন হইয়াছিল,—তাঁহার বিচারে যে কয়টী লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, তাহাতে সমদর্শী সম্রাটের মর্ম্ম ব্যথিত হইয়াছিল। সেইজন্যই তিনি এই অন্যায় ধর্ম্মান্ধতার মূলোৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বিহার হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারে তাঁহার ইতিহাস-প্রথিত সান্ধ্য-তর্ক সভা আবাহন করিতে লাগিলেন। এ সভায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গ স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের কূটার্থ মীমাংসার জন্য উপস্থিত থাকিতেন। অধ্যাপক ব্লক্‌ম্যান বলেন যে, ফতেপুর শিক্‌রির নির্জ্জন উপলাসনে বসিয়া তিনি তাঁহার হিন্দু প্রজাদের মূল্য বুঝিযাছিলেন, ধর্ম্ম বা জাতির বিষয়ে নিরপেক্ষ ও সার্ব্বজনীন উদারতার ভিত্তির উপর নিহিত রাজ্যশাসনের মহিমা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; উক্ত সভাহ্বানের তাঁহার আবশ্যক হইয়াছিল। আকবর বলিতেন যে, তাঁহার যে সমস্ত ধর্ম্ম বিষয়ক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, তাহার সুমীমাংসা এ সভায় হইবে: আকবরের-ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নহে, উহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এখানে সংক্ষেপে এ কথা বলা আবশ্যক যে, এ সভায় সামান্য বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে গুরুতর বিষয়, এমন কি মহম্মদের চরিত্র পর্য্যন্ত অনালোচিত রহিত না। সম্রাট্ আবুলফজলকেই স্বপক্ষের নেতা ও মধ্যস্থ স্থির করিয়াছিলেন। চতুর আবুলফজলও ধর্ম্মমতের বিভিন্ন তর্কগুলি একে একে উত্থাপন করিয়া তর্কবহ্নি প্রধূমিত রাখিয়াছিলেন। ইহার পর এই সুপণ্ডিত ও ততোধিক সুচতুর রাজমন্ত্রী একটী প্রস্তাব করেন, তাহাতে সম্রাটের নিকট তাঁহার প্রতিপত্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি একদিন এই সমিতিতে প্রস্তাব করিলেন যে, রাজা যখন, সমস্ত পার্থিব বিষয়ের অধিনেতা তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে শাসনভারই বা তাঁহাকে না দেওয়া হয় কেন? ব্লক্‌ম্যান বলেন যে, এরূপ প্রস্তাবের অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্মের ও বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদকারী কথা আর দ্বিতীয় নাই। কারণ উক্ত ধর্ম্মের অনুশাসন উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই শিরোধার্য্য। কেহ ইহার অতিক্রম বা সমালোচনা করিতে পারেন না। ধর্ম্ম কিছুতেই রাজার শাসনের অধীন নহে, রাজাই সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মানুশাসনের অধীন। কারণ তিনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নহেন, রক্ষয়িতা ও পালয়িতা মাত্র। আলাউদ্দীন খিলিজি প্রভৃতি নৃপতিরা কখনও কখনও প্রয়োজন মত কোরাণের অনুশাসনের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কখনই তাঁহারা ধর্ম্মকে এরূপ অনুশাসন হইতে বিভিন্ন বা মোল্লাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। সুতরাং যখন চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৭৮ খৃঃ (৯৮৬ রজবে) আবুল ফজল পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবটী বৃহস্পতিবারের সমিতিতে উপস্থিত করেন, তখন তুমুল প্রতিবাদের প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়াছিল। এতাবৎকাল মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের জীবনের কোন অংশের বিচার বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতামত লইয়া আলোচনা হইত, এখন হইতে উক্ত ধর্ম্মের মূলনিহিত সত্যের বিচার হইতে লাগিল। যে সুন্নিসম্প্রদায় এপর্য্যন্ত রাজ্যের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রধানপদ অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহারা সভয়ে দেখিলেন যে, বিগত চারিবৎসরে ইস্‌লাম ধর্ম্মের সুদৃঢ় ও সুপ্রোথিত ভিত্তি কিরূপ ক্ষয়িতমূল হইয়াছে। কর্ণেল্ ম্যালিসন্ বলেন, আকবরের তদানীন্তন ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বদৌনির গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার তখনকার মানসিক অবস্থা কতক জানা যাইতে পারে। তাহাতে সম্রাটের ধর্ম্মমতের সার্ব্বভৌম উদারতার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, ইহার পর আবুলফজল, তাঁহার অগ্রজ ফৈজী ও তাঁহাদের পিতা সেখ্ মুবারক তিনজনে মিলিয়া একখানি পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করিলেন, তাহাতে আকবরকে 'মুজ্‌তাহিদ্' অর্থাৎ ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিষয়ে অভ্রান্ত প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে ব্যবহারবিদ্ বা পণ্ডিতেরা এমনকি পূর্ব্বোক্ত মকদম্-উল মুল্ক্ ও আবদুন্নবি পর্য্যন্ত সকলেই ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আকবরের নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে অঙ্গীকার করি-

* If some true knowledge were thus everywhere to be found why should truth be confined to one religion or to a creed like Islam, which is compratively new and scarcely a thousand years old ; why should one sect assert which another denies, and why should one claim a prefernce without having superiorty conferred upon itself?" Badoun's words quoted in Col. Malleson's book P. 149.

লেন। আবুল ফজল্ আকবর নামায় লিখিয়াছেন যে, ইহাতে দেশ দেশান্তরের ও ধর্ম্মান্তরের লোকেরা সম্রাটের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও শান্তি রাজ্যে স্থাপিত হইয়াছিল ও দুর্জ্জন নীচাশয়গণ সম্রাটের উদার উচ্চাভিলাষ দেখিয়া লজ্জিত হইয়া আর মুখ তুলিতে পারে নাই। ইহার পর বৎসরে সেথ আবদুন্নবি ও মখদম্ উল মুল্ক্ মহাশয়েরা মক্কা যাত্রা করিয়াছিলেন। এখন মুবারক ও তাঁহার পুত্রদ্বয় নিষ্কণ্টক হইলেন। অধ্যাপক ব্লক্ম্যান্ তাঁহার আইন ঈ-আক্বরীর উৎকৃষ্ট অনুবাদের উপক্রমণিকায় আবুল ফজলের যেএকটা বহুগ্রন্থ-সংগ্রহীত অমূল্য জীবনী দিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে—আবুলফজলের হৃদয়ের উদারতার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, উক্ত দুই ব্যক্তি তাঁহাদের সম্যক ক্ষতি, এমন কি, তাঁহার পিতার জীবন পর্য্যন্ত সংশয়াপন্ন করিয়াছিল; তথাপি আবুলফজল্ ইঁহাদের বিরুদ্ধে একটীও গ্লানিকর কথা স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন নাই।

১৫৭৯ খৃঃ এই ধর্ম্মকলহ ও তর্কসংগ্রামের এক প্রকার অবসান হইয়াছিল। অতঃপর আবুলফজল ও তাঁহার ভ্রাতা ফৈজীর সহিত সম্রাটের সখ্যতা দৃঢ়তর হয়। ফৈজীকে তিনি যুবরাজের শিক্ষকপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার বিশ্বাসের প্রমাণ দিয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে কাল্পি, আগ্রা ও কলিঞ্জরের 'সদর" (অর্থাৎ এক প্রকার শাসনকর্ত্তা) ও চারশতী মনসবদার পদে নিযুক্ত করিয়া নিজ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ফৈজী পার্থিব সম্মান অপেক্ষা সম্রাটের অমূল্য বন্ধুত্বই অধিকতর শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে করিতেন।

তাঁহার অনুজের সমধিক সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ১৫৮৫ খৃঃ প্রারম্ভেই সম্রাট আবুলফজলকে এক হাজারী মনসবদার ও দিল্লী প্রদেশের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ইহার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৮৯ খৃঃ আবুলফজলের মাতার মৃত্যু হয়। "আকবর নামা" পাঠকের নিকট অবিদিত নাই যে, তিনি জননীর স্মৃতিতে গ্রন্থের কয়েকপৃষ্ঠা ব্যয় করিয়াছেন—ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা কিরূপ চরিত্রবান মনীষাসম্পন্ন পিতামাতার ঔরসে জন্মিয়াছিলেন। আকবর, সান্ত্বনার নিমিত্ত, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে যে কথায় সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, উহা তাঁহারই যোগ্য হইয়াছিল। সম্রাট তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"যদি এ পৃথিবীর লোক চিরকাল অমর হইয়া বাঁচিয়া থাকিত,তবে হিতৈষী বন্ধুরা কখন তাহাদের শোকক্লিষ্ট অন্তঃকরণকে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে উপদেশ দিবার সুযোগ পাইত না। কিন্তু পৃথিবীর এই পান্থনিবাসে কেহই দীর্ঘ প্রবাসী নহে, সুতরাং শোককাতর ব্যক্তিরা এ সান্ত্বনায় শান্ত হইয়া ভালই করে।"

ইহার পর সম্রাটের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে রাজ্যে ইসলাম্ ধর্ম্মমতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে সম্ভব পর নহে; তবে এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে—এই ধর্ম্ম বিপ্লবের জন্য অপর পক্ষীয়েরা আবুলফজলকে প্রধান দোষী স্থির করিয়া তাঁহার উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইল ও স্বতঃ পরতঃ তাঁহার যাহাতে অনিষ্ট হয় সে চেষ্টায় রহিল। এমন কি যুবরাজ সেলিমও এই দলভুক্ত ছিলেন। যাহাতে যুদ্ধে অপারগতা বা রাজ্যশাসনে অপটুতানিবন্ধন আবুল্ ফজল সম্রাটের অপ্রিয় হন, সেইজন্য তিনি তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিতে, সম্রাটকে সুযোগ পাইলেই অনুরোধ করিতেন। সেলিম একদিন অতর্কিতভাবে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি লেখককে কোরাণের ভাষ্য নকল করিতে প্রবৃত্ত দেখিলেন। তখন বিদ্বেষবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে একেবারে সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিলেন ও বলিলেন যে, আবুলফজল আমাদের এক রকম শিক্ষা দেন ও নিজে অন্যপ্রকার আচরণ করেন। এই ঘটনায় সম্রাট ও তাঁহার প্রিয় সদস্যের মধ্যে কিছুদিনের জন্য মনোমালিন্য হয়।

এ সময়ে সম্রাটের আদেশে ও প্রধানতঃ আবুল ফজলের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। আরবী গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখে এ প্রসঙ্গ নীরস হইবে বলিয়া তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম, কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থগুলির নাম করা প্রয়োজন। আবুলফজল, ফৈজী, ঐতিহাসিক ও সুপণ্ডিত বদৌনি, শেখ সুলতান, হরজি ইব্রাহিম, শেখ মুনাব্বর প্রভৃতি বিদ্বদ্গণের চেষ্টায় অনেক ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক মূল সংস্কৃত বা হিন্দী হইতে,পার্সীতে অনূদিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ফৈজী প্রাচীন সংস্কৃত গণিত গ্রন্থ লীলাবতী পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। আবুলফজল স্বয়ং মহাভারতের কতকাংশের অনুবাদের ভার লইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদকতায় ও অন্যান্য লেখকের সাহায্যে 'তারিখি আলফি'* অর্থাৎ 'সহস্র বৎসরের ইতিহাস' রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে, মহম্মদীয় ধর্ম্ম একটী জীবন্ত প্রচলিত ধর্ম্মরূপে গণ্য না হইয়া উহা বিগত যুগের ইতিহাসগত ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

১৫৯২ খৃঃ প্রারম্ভে আবুলফজল দুই হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এ সময় হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ ওমরাহদের (উমরা-ঈ কিবার) সমশ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন। এ সময়েই তাঁহার অগ্রজ দাক্ষিণাত্যে বুরহান্ উল মুল্কের নিকট ও খান্দেশ সুলতান সেলিমের শ্বশুর আলিখাঁর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত নব ধর্ম্মের পাণ্ডুলিপি রচনার পর, শেখ মুবারক প্রায় সকল পার্থিব কার্য্যকলাপ হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছিলেন। পর বৎসর লাহোরে নবতিবৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় (৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ১৫৯৩ খৃঃ)। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বপর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি শক্তি অবিকৃত ছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি কোরাণের যে বৃহৎ টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের আভাষ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আকবর্ সাহের সভায়, সেই 'প্রতিরূপ ভূয়িষ্ঠ' সময়েও তাঁহার মত পণ্ডিত অতি অল্প ছিল। তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সম্যক অধিকারী হইয়াছিলেন। পারস্য ও আরব্য ভাষায়, ছন্দঃ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে, দর্শন বিজ্ঞানে, কোরাণ পড়িবার প্রণালী সূচক 'তাজরিয়া' শাস্ত্রে, বহু প্রকারে কোরাণ আবৃত্তি করিবার জ্ঞানে তাঁহার মত লোক দুষ্প্রাপ্য ছিল, এ কথা তাঁহার বংশের পরম শত্রু বদৌনিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার ও তদীয় পুত্রদের সম্বন্ধে কোন কুৎসা রটনা করিতে না পারিয়া বদৌনি কেবল তাঁহাদের মহম্মদীয় শাস্ত্রে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে অনেক গালি দিয়াছেন। এমন কি উভয়কে নাস্তিকতার জন্য জাহান্নমে প্রেরণ ও আবুল ফজলকে ভ্রাতৃ-বিদ্বেষী হুসেনভ্রাতা ঈয়াজিদের সহিত তুলনা করিতেও ছাড়েন নাই। বেচারা বদৌনি বাদ্শাহের অনুগ্রহে কেবল দুইহাজার বিঘা নিষ্কর ভূমি পাইয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু তাঁহার সহাধ্যায়ী আবুল্ ফজল্ শুধু দুহাজারি মনসব্দারের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এমন নহে—আকবরের পরমবন্ধুর মধ্যে পরিগণিতও হইয়াছিলেন। উভয়ের পার্থিব অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে বদৌনির মত লোকের হিংসার যথেষ্ট কারণ ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।

মুবারকের মৃত্যুর দুইবৎসর পরে ফৈজীর মৃত্যু হয়। ফৈজিকে সম্রাট এত ভাল বাসিতেন যে, কথিত আছে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্রাট স্বয়ং গভীর রাত্রে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। অভাগা কবির তখন এমন বাক্শক্তি ছিল না যে, তিনি বাক্যোচ্চারণ করিয়াও সম্রাটকে অভিবাদন করিতে পারেন। আকবর তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন, "শেখজিউ, আমি আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ হাকিম আনিয়াছি—আপনি

---

* এ গ্রন্থের অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ বর্ত্তমান লেখকের "ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণ" প্রবন্ধে (ভারতী, মাঘ, ১৩০৭) দ্রষ্টব্য।

আমার সহিত কোন কথা কহিতেছেন না কেন ?" তথাপিও তাঁহার নিকট কোন উত্তর না পাওয়াতে সম্রাট এতদূর শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বীয় উষ্ণীষ ভূতলে ফেলিয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে আবুলফজলকে অনেক প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। আবুলফজল ভ্রাতৃস্নেহের অনেক অমূল্য নিদর্শন স্বীয় গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছেন। "আকবর নামা," ও "আইন ঈ আকবরী" উভয় গ্রন্থেই তিনি ফৈজীর অনেক কবিতাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জ্যেষ্ঠের তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাসমূহ "মার্কিয্ উল-আদ্ বাব্ নাম দিয়া প্রকাশ করেন।

প্রায় এ সময়েই তিনি দুই হাজার পাঁচশতী মনসব্দার নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম যাইতে হইয়াছিল। যুবরাজ মুরাদ দাক্ষিণাত্যে নিজের অত্যধিক পানাসক্তিদোষে এক বিভ্রাট বাধাইয়া বসিয়াছিলেন—তাঁহার আগমন অবধি তত্রত্য শাসনকার্য্য কোন প্রকারেই অগ্রসর হয় নাই। খাঁ খানান অর্থাৎ বেরাম খাঁর পুত্র মির্জ্জা আবদুর রহিম তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। মুরাদের অত্যধিক পানাসক্তিতে আকবর ভীত হইয়া আবুল ফজলকে এই আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, যদি বিজিত রাজ্য রক্ষা করিতে সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষেরা সমর্থ হয়, তবে পানোন্মত্ত মুরাদকে লইয়া আবুল ফজল ফিরিয়া আসিবেন। কারণ মুরাদ নিজে পানাসক্ত—অতএব অকর্ম্মণ্য ছিলেন, রাজকর্ম্মচারীরা উৎকোচগ্রাহী ও বিদ্রোহী পক্ষের সহিত ষড়যন্ত্রকারী এবং স্বয়ং খাঁ খানান্ও তাহার একান্ত অবিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং আবুল ফজলের অভীষ্ট শীঘ্রই যে সিদ্ধ হইবার কথা, তাহাতে বিচিত্র কি ? আবুল ফজল যখন বহারাণ্ পুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন খান্দেশাধিপতি বাহাদুর খাঁ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, বাহাদুর খাঁর ভ্রাতার সহিত আবুল ফজলের ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া আবুল ফজলকে সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিতে নিরস্ত করিবেন। কিন্তু আবুল ফজল্ বিরক্তি সহকারে উহা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন যে, তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এরূপ কার্য্যে রাজ কার্য্যের ব্যাঘাত হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। সম্রাটের বন্ধুত্বে তাঁহার অন্য কাহারও নিকট পারিতোষিক গ্রহণের অভিলাষ তিরোহিত হইয়াছে।

এদিকে যুবরাজ মুরাদও আহ্মদনগর হইতে এলিচপুর আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার শিশুপুত্র মির্জ্জা রোস্তামের মৃত্যু হওয়াতে অত্যন্ত শোককাতর ও কঠিন বিকার রোগগ্রস্ত হইয়াও তিনি পানদোষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। আবুল ফজল তাঁহাকে সম্রাটের নিকট লইয়া যাইবেন জানিয়া তিনি আহ্মদনগরে ফিরিয়া আসিলেন; দৌলতাবাদ হইতে ষোল ক্রোশ দূরে পূর্ণা নদীতীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। যখন আবুল ফজল্ যুবরাজের শিবিরে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন শিবিরে অতি বিশৃঙ্খলা ছিল। যুবরাজের মৃত্যুতে সৈন্যদল ভগ্নোৎসাহ ও সেনাধ্যক্ষেরা পলায়নপর হইয়াছিল। বিদ্রোহীর রাজ্যে, বিপক্ষের সৈন্য মধ্যে পলায়ন করা যে কতদূর বিপজ্জনক তাহা বুঝাইয়া দিয়া আবুল ফজল এই ভগ্নোদ্যম সেনামণ্ডলীকে অনেক কষ্টে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন; তিনি বিজিত নগর সমূহের রক্ষার্থ সেনা রাখিয়া অত্যল্পদিনের মধ্যে নাসিক ব্যতীত বৈহালাৎ, সাটুণ্ডা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সম্রাটের অধীনতায় জানীর জায়গীরস্বরূপ লইয়া আহ্মদনগরের দুর্গ ছাড়িয়া দিবেন, তিনি চাঁদ বিবির সহিত এই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

আকবর তখন উজ্জয়িনীতে গিয়াছিলেন। যুবরাজ দানিয়েল্কে সম্মান দেখাইতে অস্বীকার করায় বাহাদুর খাঁ দাক্ষিণাত্যের ব্যাপার আরও সঙ্কট সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। সম্রাট স্বয়ং বাহাদুর খাঁর আসীর দুর্গ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং সুলতান দানিয়েলকে আহ্মদনগরের যুদ্ধ কার্য্যের শাসন-ভার দিলেন। উপযুক্ত লোক রাখিয়া সম্রাটের অনুমতিক্রমে আবুল ফজল বিজাপুরের সমীপবর্ত্তী খেড়গাঁও নামক স্থানে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আকবর সেই সাক্ষাৎকালে তাঁহাকে এই কবিতাটির দ্বারা সম্ভাষণ করেন:—

ফরখুন্দা শবে বায়্দো খুশ্ মাহতাবে।
তা বাতো হে কায়দ্ কুমম্ অজ্ হর্ বাবে॥

রজনী মনোহারিণী, সুন্দর জ্যোৎস্না শালিনী—(এরূপ রজনীতে) তোমার সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্য বিজয়ে তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য তাঁহাকে সম্রাট চার হাজারী মন্সবদারের উচ্চপদে উন্নীত করিয়া দিলেন। ইহার পর বাহাদুরখাঁর রাজ্যান্তর্গত মালহি দুর্গ ও আসীর দুর্গ বিজয়ে তিনি যে যোদ্ধৃত্ব দেখাইয়াছিলেন বা দাক্ষিণাত্যে রাজু মান্নার বিদ্রোহ লইয়া যে গোলযোগ বাধে, সেই বিদ্রোহদমনে যে দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার এস্থানে উল্লেখমাত্র করিলাম। আমরা এক্ষণে নীচ পাপাশয় লোকের দুষ্ট চক্রান্তে তাহার শোকপূর্ণ হত্যাকাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তাহার ধর্ম্মমতের জন্য আকবরের রাজ সভাসদ অনেকেই, এমন কি যুবরাজ সেলিম পর্য্যন্ত, তত্প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। সম্রাটের—অনুকম্পায় এতদিন তিনি যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সম্রাটের নিকট তাঁহার যে সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠা ছিল, তজ্জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও যুবরাজ এপর্য্যন্ত তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহার চিরপোষিত হিংসাবৃত্তির পরিতর্পণের যোগ্য অবসর মিলিল। আসীর দুর্গের আক্রমণের সময়েই যুবরাজ সেলিম বিদ্রোহী উদয়পুরের রাণাকে দমন করিতে প্রেরিত হন। তাঁহাকে দমন করা দূরে থাক, তিনি নিজেই পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। যদিও বরহান্পুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পিতাপুত্রে পুনর্মিলন হইয়াছিল, তথাপি আবার সপ্তচত্বারিংশৎবয়স্ক প্রৌঢ় সেলিম পিতৃবিদ্রোহী হন। সম্রাটের অনেক আমীর ওম্রাহ ভিতরে ভিতরে সেলিমকে সহানুভূতি করায় সম্রাট তাহার একমাত্র বিশ্বস্ত ভৃত্য আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্য হইতে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিতে অনুমতি করেন। সুতরাং তিনি পুত্র আবদুর রহমন্কে বিজিত নগর রক্ষাদির ভার দিয়া বহুলোক সমভিব্যাহারে আগ্রাভিমুখে রওনা হন। এই সুযোগে সেলিম্, বুন্দেলা জাতির রাজা উরছা অধিপতি রাজা বীর সিংহকে আবুল ফজলকে নিহত করিতে উৎসাহিত করেন। নানা কারণে বীরসিংহের মোগল দরবারে প্রতিপত্তি ছিলনা, তিনি সম্রাটের রোষ নয়নে পড়িয়াছিলেন। সুতরাং ভারতের ভাবী সম্রাটের এ আদেশ বীরসিংহ অমান্য করিতে সাহস করিলেন না। আবুল ফজলের আগ্রা ফিরিবার পথে নারওয়ার নামক স্থানে বীরসিংহ নিজের সৈনাসহ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী হইলে আবুল ফজলকে সেলিমের এই নীচ কাপুরুষোচিত অভিসন্ধির কথা বলা হইল। কিন্তু তিনি বীর ভাবে উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে—"চোর ও দস্যুদের ভয়ের জন্য তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া বন্ধ রাখিতে পারেন না।" এই বলিয়া তিনি নারওয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে ছয়ক্রোশ দূরে সরাইবার নামক স্থানে বীরসিংহের সৈন্য দৃষ্ট হইল। তখনও ফিরিলে আবুল ফজল রক্ষা পাইতে পারিতেন। তাহার প্রিয় অনুচরেরা, বিশেষতঃ তাহার বহুদিনের বিশ্বাসী ভৃত্য গদাইখাঁ আফগান, তাঁহাকে তিনক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত আন্ত্রী নামক স্থানে ফিরিতে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিল। তথায় তখন তিন সহস্র সৈন্য লইয়া রায়োপলক্ষে রায়রায়াণ ও সূর্য্য সিংহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু আবুল ফজলের মহৎ বীরহৃদয় মৃত্যু নিকটবর্ত্তী ও অবশ্যম্ভাবী দেখিয়াও কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে ঘৃণা বোধ করিল। তিনি আপনার মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া পঙ্গপাল তুল্য অগণিত বীরসিংহের সেনাসমূহের সম্মুখীন হইয়া সিংহ বিক্রমে

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার অদ্ভুত রণকৌশল ও বীরোচিত সাহসেও তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। তাহার অল্প সংখ্যক অনুচর বীরসিংহের সেই বিপুল সেনাবাহিনীর আক্রমণের বেগ কতক্ষণ রোধ করিতে পারে? অল্পক্ষণেই তাহার অনুচরেরা সকলে প্রায় হতাহত হইল, তিনিও যুদ্ধ করিতে করিতে কোন অশ্বারোহীর বর্শাঘাতে নিহত হইলেন। বীরসিংহ তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া সেলিমকে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেলিমও তাহা অযোগ্য স্থানে নিক্ষেপ করিয়া একান্ত নীচাশয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

তৈমুর লঙ্গের বংশে এইরূপ একটী পুরাতন প্রথা চলিত ছিল যে, অভিজাতবংশের কাহারও যদি মৃত্যু হয়, তবে সম্রাটের নিকট মৌখিক কেহ সে সংবাদ জ্ঞাপন না করিয়া সেই মৃত ব্যক্তির উকীল স্বীয় হস্তে একটী নীলবর্ণ রুমাল বাঁধিয়া সম্রাটের সমক্ষে উপস্থিত হইবে। এই চিরাগত নিয়মানুসারে আবুল্ ফজলের উকীল আকবরের সমক্ষে এই চিহ্ন ধারণ করিয়া উপস্থিত হওয়াতে বাদসাহ প্রবল শোকে একেবারে অধীর হইয়া পড়েন। প্রথম শোকোচ্ছ্বাস শমিত হইলে তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—সেলিম যদি ভারতবর্ষের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছিল, সে আমাকে নিহত করিয়া পথের কণ্টক দূর করে নাই কেন? নিষ্পাপ নির্দ্দোষ আবুল ফজলকে হত্যা করিল কেন?" ইহার পরে তিনি এই কবিতাটীর আবৃত্তি করিয়াছিলেন:—

শেখে মা অজ্ শওকে বেহদ চুঁসয়ে মা আমদা।
জিঁ স্তিয়াকে পায় বোসি য়ে সরোপা আমদা॥

আমার সেখ আমাকে দেখিবার আগ্রহাতিশয্যে ত্বরান্বিত হইয়াছিলেন, তিনি আমার চরণ চুম্বন করিবার অভিপ্রায়ে (আসিয়া) নিজ জীবন হারাইলেন।

যদিও বাদসাহের আদেশানুসারে উরছাধিপতি বীরসিংহ নিজ রাজ্য হইতে তাড়িত ও পলাতক হইয়াছিলেন ও আকবরের জীবিতাবস্থায় জঙ্গলে লুকাইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বাদসাহের মৃত্যু ঘটিলে তিনি জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পুরস্কৃত হন। বীরসিংহের এরূপ সম্মানের কারণ যে আবুল ফজলের হত্যাকাণ্ড, একথা জাহাঙ্গীর তাঁহার স্বভাবসঙ্গত নির্লজ্জতার সহিত স্বলিখিত "আত্মজীবন চরিতে" লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আবুল ফজলের সাত ভ্রাতা ও চারি ভগ্নী ছিল। তন্মধ্যে তাঁহার পিতার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পাঁচজন। আবুলফজলের এক পুত্র সেখ আবদুর রহমান আবজল খাঁর উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। জাহাঙ্গীর ইঁহার পিতাকে যেরূপে অকালে মৃত্যুমুখে পাতিত করেন, সেই অনুশোচনা বশতঃই হউক বা অন্য যে কারণে হউক পুত্রকে তদ্রূপ উচ্চপদে অর্থাৎ বিহারের শাসনকর্ত্তা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন ও গোরখপুর জায়গীর স্বরূপ দান করেন। আবুলফজল "আকবর নামা" ও "আইন-ঈ-আকবরী" (উক্ত পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড) ব্যতীত "আয়ার দানীশ" অর্থাৎ একখানি আরব্য গ্রন্থের অনুবাদ, "মক্তুবাৎ-ই-সালেমি" বা ভারতবর্ষীয় অন্যান্য রাজা মহারাজাদিগের সহিত আবুলফজলের যেরূপ ব্যবহার হইয়াছিল তাহার সমগ্র বিবরণ, রচনা করেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান "রিশালা-ঈ মুনাজৎ" বা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা সম্বন্ধীয় পুস্তক ও "জমীউল্লে'লাৎ" বা অভিধান গ্রন্থ ও কাসকোল বা ভিক্ষাপাত্র" (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প সংগ্রহ) প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ "আকবর নামা ও "আইন-ঈ-আকবরীর" সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা বর্ত্তমান লেখক, তাঁহার, ভারতীতে প্রকাশিত ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের উপকরণ প্রবন্ধে, ক্রমশঃ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, এজন্য সে সম্বন্ধে এ স্থলে কোন কথা উল্লেখ করা গেল না। তবে এলফিনষ্টোনপ্রমুখ ঐতিহাসিকেরা পারস্য ভাষায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ আবুলফজলকে সম্রাটের চাটুকার প্রভৃতি অজস্র বাক্যে নিন্দাবাদ করিয়াছেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান যে তাঁহার সম্পাদিত আইন ঈ-আকবরীর অনুবাদের সূচনায় সে সব কথা বিশেষ যোগ্যতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন, এস্থলে সে সব কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ এই দুই গ্রন্থে আবুল ফজল সত্যপ্রিয়তা, ভূয়োদর্শন ও লিপিচাতুর্য্যের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, উহা ঐতিহাসিকের পক্ষে মহার্হ।

আবুল ফজল একদিকে যেমন ধীরতা, অগাধ পাণ্ডিত্য, উদারতা প্রভৃতি গুণে সমলঙ্কৃত ছিলেন, অন্য দিকে তদ্রূপ অসাধারণ বীর ও বিশ্বাসী ছিলেন। গুণগ্রাহী সম্রাটের সভায় তজ্জন্য তিনি এত অল্প দিনে প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। রোমীয় সম্রাট অগষ্টস্ বা ভারতবর্ষীয় বিক্রমাদিত্য সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের গুণগ্রাহিতা ও উৎসাহে অনেক শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকেরা তাঁহাদের রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নিজের বীরত্ব ব্যতীত তাঁহাদের সভাসদেরা লিপিশক্তির সহিত শৌর্য্যবীর্য্যের সমন্বয় করিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিকেরা মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য শকারির সহিত কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিদের উৎসাহদাতা বিক্রমাদিত্যের ঐক্যের বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন। উভয়ের ঐক্য হইলেও অগষ্টস বা বিক্রমাদিত্যের সভাসদদের শৌর্য্যবীর্য্যের বা রণপাণ্ডিত্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু দিল্লীশ্বর আকবরসাহের সভাসদেরা একদিকে যেমন লিপিশক্তি, অপরদিকে সেরূপ যোদ্ধৃত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এবিষয়ে আকবরের জগদ্বিখ্যাত রাজসভা ঐশ্বর্য্য ও গৌরবে কুমারী রাজ্ঞী এলিজাবেথের সভার সহিতও কতকাংশে স্পেনের অধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপের সভার সহিত সম্পূর্ণরূপে তুলিত হইতে পারে। রাজা ভগবান দাস, রাজা মানসিংহ, টোডারমল্ল, আবুল ফজল, ফৈজী, সেখ মুবারক প্রভৃতি উভয়বিধ শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেকের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হয়। আবুল ফজল ও ফৈজীরমত ঐতিহাসিক ও কবি অধিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ইহার মধ্যে আবুল ফজল যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে, দ্বিতীয় ফিলিপের সভাসদেরা অরেঞ্জোডি অ বৃসিলা, জারসিলেস্কো ডিভেগা, সর্ভেণ্টিস্ ও লোপডিভেগা এই উভয় শক্তির বিকাশ দেখাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। গৌরবেও উভয় নৃপতির সময় তুলনীয়। আকবরের সময় মোগল রাজত্ব সর্ব্বোচ্চ গৌরবের সীমায় পৌঁছিয়াছিল। ফিলিপের সময় স্পেনের যে ঐশ্বর্য্য-প্রভাব ও গৌরব হইয়াছিল, সে দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সময়ের বিষয় আলোচনা করিলে সেরূপ কখনও হয় নাই, দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সম্রাট-রত্ন আকবরের গৌরব মুকুটে আবুল ফজল একটি শ্রেষ্ঠতম রত্ন। পাণ্ডিত্যে, লিপিশক্তিতে, মানসিক শৌর্য্য, বীর্য্য ঔদার্য্য প্রভৃতি সদ্গুণে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। আবুলফজলের রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উপহার দিয়া আমরা এস্থলে এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। ইহা অধ্যাপক ব্লকম্যান্ কাশ্মীরের কোন মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলপট্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

ইলাহি বহবৃখানা কে মিনগরম্ যো ইয়ায়ে তু অন্দ্,
ও বহর্ জবান কি মি শেনবম্ গোঈয়ায়ে তু
কুফ্রো ইস্লাম দররহ পো ইয়ান্
ওহ্‌ দাহ্‌ লা শরিক নহ্ পো ইয়ান্
অগর্ মস্‌জিদস্ত বইয়াদে তু নারায়ে কুদ্দস্ মিজনন্দ্।
ও অগর্ কলেসিয়াস্ত্ ব শৌকে তু নাকুস মিজম্বানন্দ্।
গাহ্ মতকিয়ো দৈরমো গাহ্ সাকিল মস্‌জিদ্।
ইয়ানিকে তোরামি তলবম্ খানা বখানা। ইত্যাদি।

অধ্যাপক ব্লক্‌ম্যান্ কৃত অনুবাদের বাঙ্গালা অনুবাদ আমরা দিলাম—

"হে ঈশ্বর! প্রতি মন্দিরে লোকে আপনাকে অন্বেষণ করে। মানব-কথিত প্রতিভাষায় আপনার স্তুতি গীত হয়।

বহুঈশ্বরবাদ ও ইস্লাম্ উভয়েই আপনার জন্য লালায়িত, প্রত্যেক ধর্ম্ম বলে আপনি এক ও অদ্বিতীয়।

মস্জিদে আপনার স্তুতি মৃদুস্বরে ধ্বনিত হয়, খ্রীষ্টানের গীর্জ্জায় আপনার প্রেমবিহ্বল ভক্তেরা ঘণ্টাধ্বনি করে।

কখনও খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম মন্দিরে ও কখনও মস্জিদে আমি গিয়া থাকি কিন্তু প্রতি মন্দিরে আপনারই সন্ধানে ফিরি।

আপনার প্রিয় ভক্তেরা স্বাধীন ধর্ম্মবাদ ও ধর্ম্মান্ধতা উভয়েরই বহির্ভূত। কারণ উভয়ের কেহই আপনার সত্যের যবনিকার অন্তরালে বাস করে না ইত্যাদি।*

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

লক্ষ্মী।

(সাঁওতালী গল্প।)

'ওকনি' একখানি ক্ষুদ্র সাঁওতাল গ্রাম। সাঁওতাল-দিগের ভাষায় গ্রামকে 'আতু' বলে। গ্রামখানিতে ১৫।১৬ খানি কুঁড়ে ঘর, কয়েকটি আমগাছ, ৩।৪ টি মহুয়া গাছ, একটি বড় বটগাছ, এবং ঈষৎ দূরে একটি ক্ষুদ্র নদী। একটি মাঝারি গোছের পাহাড়, তাহারই পাদদেশে ক্ষুদ্র গ্রাম। কয়েক বিঘা আবাদি জমি, এবং একটি স্বল্পতোয়া মন্দগতি নদী, ইহা লইয়াই সাঁওতাল বস্তি। গ্রামের চারিদিকে জঙ্গল, পাহাড়ের উপরেও জঙ্গল, জঙ্গলে বড় বড় শালগাছই অধিক। মহুয়া গাছেরও অভাব নাই, এবং সেই সঙ্গে নেকড়ে বাঘ এবং ভালুকেরও অভাব নাই। সাঁওতালেরা প্রকৃতির শিশু, উহারা এই পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি প্রাণী আনন্দিত মনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বন্য হিংস্র পশু উহাদের প্রতিবেশী। জঙ্গলের মধ্য দিয়া, গ্রামের উত্তরপার্শ্ব দিয়া একটি অনতিবিস্তৃত রাস্তা পূর্ব্বপশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। ইহাই সরকারি সড়ক, অর্থাৎ ডিষ্ট্রীক্‌ট্-বোর্ড-রোড্। এই রাস্তা দিয়া পথিকেরা এবং কখনও কখনও শকটাদি যাতায়াত করে।

এই গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘর খানি, বেশ পরি-স্কৃত ও পরিচ্ছন্ন, ঘরের 'পিণ্ডা'গুলি সুমার্জ্জিত, চালটি নূতন ছাওয়া, ঘরের সম্মুখে কয়েকটি ধান্যের মরাই রহিয়াছে। সেখানি ভাদো মাঝির ঘর। ইনিই গ্রামের মণ্ডল, সমৃদ্ধ এবং সঙ্গতিপন্ন লোক। শুধু এ গ্রামের নহে, নিকট এবং দূরবর্ত্তী ১০।১২ খানি গ্রামের ইনি শাসনকর্ত্তা। ইঁহাকে 'পরগণা' বলে। ইঁহার পরামর্শ ব্যতীত গ্রামগুলির কোন শুভকার্য্য নির্ব্বাহিত হয় না; বিবাহ, পূজা, ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইঁহার পরামর্শ এবং আদেশের অপেক্ষা করে। ইনি একাধারে বিচারপতি, পুরোহিত এবং শাসনকর্ত্তা। ভাদো মাঝির দেহটি স্থূল, পেটটিতে একটি নাতিক্ষুদ্র ভুঁড়ি আছে, গলায় একগাছি রূপার হার এবং বাহুতে একটি রূপার তাগা আছে। ভাদো মাঝির মনটি কিন্তু নিতান্ত সরল ও সুন্দর। ভাদো সাহসী, ক্ষমতাশালী, সহৃদয় এবং সত্যবাদী। উহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হইলেও এখনও বাঘ শিকারে প্রচুর আনন্দ বোধ করিয়া থাকে, এখনও ভাদো শিকারিদলের অগ্রগণ্য।

ভাদো মাঝি জাতিতে 'বাদোলিমাণ্ডি'। সাঁওতালেরা সকলেই এক জাতি, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে এগারটি ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে, যথা,—কিস্কু, সোরেন, মাণ্ডি, হাঁসদাঃ, মুরমু, হেমরোম, টুডু, বাস্কে, পাঁওড়িয়া, বেস্রা এবং চোঁড়ে। ইহাদিগের মধ্যে কিস্কু রাজবংশীয়, এবং সকলের উচ্চ, আর চোঁড়ে সকলের নিম্নে। এক এক গোত্রের মধ্যে আবার ২।৩।৪ টি শাখা আছে, যেমন মাণ্ডির মধ্যে চারিটি শাখা বর্ত্তমান। যথা, বাদোলি মাণ্ডি, রুত মাণ্ডি, মিরুবাহা মাণ্ডি, এবং সাদা মাণ্ডি। সাঁওতালেরা একজাতি, গোত্রনির্বিশেষে পরস্পরের মধ্যে আহারাদি চলে, বিবাহাদিও চলিয়া থাকে, তাহাতে কোনও বাধা নাই। তবে কখনও কখনও চোঁড়ে গোত্রীয় কন্যাকে উচ্চগোত্রীয়েরা আপনা-দের বধূরূপে লইতে দ্বিধা বোধ করিয়া থাকে।

যে গ্রামের কথা আমরা বলিয়াছি, তাহাতে তিন ঘর মাণ্ডি, পাঁচ ঘর হাঁসদাঃ, দুই ঘর টুডু, এক ঘর সোরেণ, এবং চারি ঘর বাস্কে আছে। গ্রামের মধ্যে পরগণা ভাদো মাঝি প্রধান, অধিকন্তু অর্থশালী; সুতরাং তাহারই সম্মান বেশি, কিন্তু গ্রামে যে একঘর সোরেন আছে, সামাজিক শ্রেণীবিচারে তাহারা উচ্চতর। তথাপি ভাদোর নীচে সোরেন গৃহের সম্মান।

---

*এপ্রবন্ধে অন্যান্য যে সব গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা গেল, সে সকল-গুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তন্মধ্যে কেবল অধ্যাপক কয়ের লিখিত আবুলফজলের জীবনী (Dictionary of National Biography) ও অধ্যাপক ব্লকম্যানের আবুল ফজলের জীবনী (Introduction to his translation Ain Akbari) উল্লেখ করা উচিত। শেষোক্ত সুপণ্ডিত লেখকের নিকট আমি সবিশেষ ঋণী।

মঙ্গল্‌া গ্রামের 'যোগমাঝি' অথবা চৌকিদার। গ্রামের সমুদায় অবিবাহিত বালক বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইঁহার উপর অর্পিত। অবিবাহিত বালক বালিকা বলিলে যুবক যুবতীকেও বুঝিতে হইবে। কারণ, সাঁওতালদিগের মধ্যে সাধারণতঃ বিবাহের বয়স, বালক ও বালিকা উভয়ের পক্ষেই, ১০ হইতে ২০।২২ পর্য্যন্ত। যোগ মাঝি গ্রামে কিঞ্চিৎ জমি পাইয়াছেন, এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছেন। যোগমাঝি গ্রামের বালক বালিকাগণকে যথেচ্ছভাবে পরিচালিত করিতে পারেন, ইচ্ছামত লইয়া যাইতে পারেন, এবং তাহাদের লইয়া যথা ইচ্ছা নাচ দিতে পারেন। বালক বালিকাগণের চরিত্র গঠনের উপর যোগ-মাঝির প্রভাব অত্যন্ত অধিক।

ইহা ছাড়া গ্রামের সোমরা 'পারামাণিক' এবং চুনা 'নাএকে' এই দুই জনের সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা কর্ত্তব্য। পারামাণিক মহাশয় জমির বিভাগ এবং বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। যাহাতে ভাল ভাল জমি একজনের একচেটে দখলে না থাকে, সেদিকে তাঁহার খুব নজর, আর যাহাতে অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা এবং তজ্জন্য চাঁদা আদায় করাও তাঁহার কাজের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। নাএকে মহাশয় পূজারি, গ্রামের দেবতাগণের পূজা ইত্যাদি তাঁহার কর্ত্তব্য।

সাঁওতালেরা আপনাদিগকে 'হোড়' এবং অপর সকলকে 'দিকু' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। সাঁওতালের প্রতিবেশীবর্গের মধ্যে হিন্দু প্রতিবেশীই অধিকসংখ্যক, এইজন্য 'দিকু' বলিলে প্রধানতঃ হিন্দুগণকেই বুঝায়। আমাদিগের 'ম্লেচ্ছ' এবং সাঁওতালদিগের 'দিকু' শব্দ প্রায় একার্থের বোধক। উহাদিগের মধ্যে খাদ্যাখাদ্যের তত বিচার নাই, এবং গোমাংস খাইতে উহারা খুব ভালবাসে, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রস্তুত অন্ন কোন মতেই খাইবে না। বরং কুর্ম্মির হাতে খাইবে, তবু হিন্দু ব্রাহ্মণের হাতে খাইবে না। উহা তাহাদিগের মধ্যে একেবারে নিষিদ্ধ; এরূপ বিচিত্র প্রথার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ১৮৬৬ সালের 'মন্বন্তরে' (দুর্ভিক্ষে) সরকার বাহাদুর হইতে অন্ন বিতরিত হইয়াছিল, সরকারিক কর্ম্মচারীরা মনে করিয়াছিলেন—হিন্দু ব্রাহ্মণের প্রস্তুত অন্ন সকলেই খাইতে পারিবে, এইজন্য হিন্দু ব্রাহ্মণের দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু সাঁওতালেরা দলে দলে অন্নাভাবে মরিতে লাগিল, কেহই হিন্দু ব্রাহ্মণের অন্ন স্পর্শ করিল না! হিন্দু ব্রাহ্মণের উপর তাহাদের এ বিজাতীয় ঘৃণার উৎপত্তি কোথায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। বোধ হয় হিন্দু ব্রাহ্মণ হইতেই পুরাকালে এই জাতির সর্ব্বনাশ হইয়া থাকিবে, সেই জন্যই এই বিষম ঘৃণা।

সাঁওতালের প্রাণের জিনিষ নৃত্য আর বংশী। সাঁওতাল-নাচ পাঠক পাঠিকারা অনেকে হয়ত দেখিয়া থাকিবেন। চন্দ্রিকাবিধৌত পর্ব্বততলে দলে দলে সাঁওতাল বালক বালিকা এবং যুবক যুবতী সম্মিলিত হয়, মস্তকের লম্বা কোঁকড়ান চুল দোলাইয়া এবং কানে দু চারিটী ফুল গুঁজিয়া যুবতীগণ পুষ্পহার শোভিত যুবকগণের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া পাহাড়ের তলে আসিয়া সমবেত হয়। তাহার পর *যুবক যুবতী সম্মিলিত হইয়া হাতে হাতে ধরিয়া তালে তালে* পা ফেলিয়া চক্রাকারে কখনও তত্ত্ব, কখনও ওঘ, কখনও বা ঘন(১) গতিতে নৃত্য করিতে থাকে,—যেন সমবেত যুবক যুবতীর মণ্ডলী একখানি নৃত্যপর সজীব চক্রে পরিণত হইয়া সঞ্চলিত হইতেছে, পঞ্চাশ ষাট খানি হাত এবং পা এক সঙ্গে উঠিতেছে এবং পড়িতেছে, যেন সকলে মিলিয়া একখানি দেহ, একখানি প্রাণ। উপরে নীলাকাশে উৎসুক চন্দ্রমা মধু হাসি হাসিয়া এই মধুর দৃশ্য দেখিতেছেন, তাঁহার হাসিতে পাহাড়, নদী, জঙ্গল, মাঠ সকলই হাসিয়া উঠিতেছে। এই দৃশ্য দেখিলে দ্বাপরের যমুনাজল-পূত-বৃন্দাবন বিপিনে গোবর্দ্ধন-গিরিমূলে জ্যোৎস্নাময় নিশীথে নৃত্যকুশল বনমালাধর শ্রীকৃষ্ণের এবং নৃত্যপরায়ণা পুষ্পহারশোভিতা কর্ণে কুসুমাভারধারিণী গোপীদিগের সেই মণ্ডলাকারে রাসনর্ত্তনের একখানি রমণীয় ছবি যেন নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। এই কি সেই গোবর্দ্ধন গিরি! আর ওই কি সেই বৃন্দাবনের পরিসর-পরিগত পূতনীরা যমুনা! আর উহারাই কি সেই নৃত্য-বিভ্রান্ত সরলা প্রেমসর্ব্বস্ব গোপযুবতী! উহাই কি শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি! আহা কি মধুর সুর! যেন হৃদয় মন অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে! (২)

(১) নর্ত্তনে বিলম্বিতং দ্রুতং মধ্যং তত্ত্ব মোঘোঘনং ক্রমাদিতামরঃ।

(২) মার্শেল ডাল্‌টন্ সাঁওতাল-নৃত্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সহিত তুলনা করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"We have in both, the maidens decked with flowers and ornamented with tinkling bracelets, the young

বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে—
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে।

আমরা কথায় কথায় আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি—ভাদো মাঝির গৃহে তাহার পত্নী 'চুণী' এবং সপ্তদশ-বর্ষীয়া কন্যা 'লক্ষ্মী' ছাড়া আর কেহ নাই। কন্যাটি ভাদো মাঝির প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তাহার সংসারের সার, তাহার জীবনের বন্ধন। লক্ষ্মীর রংটি কাল, কিন্তু মুখ সুশ্রী, সরলতা তাহার বড় বড় কৃষ্ণ চক্ষুতে যেন ভাসিয়া উঠিতেছে, হস্ত পদ সবল এবং সুগোল, যৌবনের শ্রীতে সর্ব্বাঙ্গ সবে ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যুবতী লক্ষ্মী আজিও বালিকা, পাড়ার যুবক দাশো চুণ্ডা প্রভৃতির সহিত আজিও জঙ্গলে জঙ্গলে খেলিয়া বেড়ায়, বনে সাদা সাদা শাল ফুল ফুটিয়া উঠিলে সন্ধ্যায় সকলে মিলিয়া সেখানে গিয়া শালফুলের মালা গলায় পরে, লক্ষ্মী দাশোর গলায় মালা পরাইয়া পলাইয়া যায়, দাশো ভাল ভাল ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া লক্ষ্মীর মাথায় পরাইয়া দেয়, কাণে ফুল গুঁজিয়া দিয়া দেখিতে থাকে, আর যখন দাশো জ্যোৎস্না রজনীতে পাহাড়ের তলে নদীতীরে যাইয়া বাঁশী বাজাইতে থাকে, তখন লক্ষ্মী চুপি চুপি যাইয়া দাশোর চোখ টিপিয়া ধরে এবং দুজনে পাশাপাশি বসিয়া কত গল্প করে। যখন সকলে মিলিয়া বৈশাখের প্রাতঃকালে বনে মহুয়ার ফুল কুড়াইতে যায়, তখন দাশো অযাচিত ভাবে আপনার টুক্‌রি হইতে ঢালিয়া লক্ষ্মীর টুক্‌রিখানি সাদা মহুয়া ফুলে ভরিয়া দেয়, এবং লক্ষ্মীর সরল সুন্দর মুখে মৃদু হাসি দেখিয়া উচ্চ-হাস্যে বন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলে। লক্ষ্মীর সহিত দাশোর খুব ভাব, সেই অবাধ স্নেহবন্ধনে দু'জনেই খুব সুখী এবং দু'জনেই পরিতৃপ্ত। লক্ষ্মী যুবতী হইয়াও তাহার পিতৃ-প্রদত্ত স্বাধীনতাগুণে পালিত ব্যাঘ্রশিশুর ন্যায় চঞ্চল ক্রীড়াশীল এবং নির্ভয়ে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে নদীতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

men with garlands of flowers and peacocks' feathers, holding their hands, and closely compressed, so that the breast of the girl touches the back of the man next to her, going round in a great circle, limbs all moving as if they belonged to one creature ; feet falling in perfect cadence, the dancers in the ring singing responsive to the musicians in the centre, who, fluting, drumming, and dancing too, are the motive power of the whole, and form an axis of the circular movement."

লক্ষ্মীদের 'ওড়াঃ' (গৃহ) খানি নদীর তীরেই অবস্থিত। লক্ষ্মী প্রকৃতির শিশু, প্রকৃতির অঙ্কে প্রতিপালিত, বন জঙ্গলে পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে এত দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, সুতরাং যুবতী লক্ষ্মী যে বিলাস বিভ্রম আজিও শিখে নাই তাহা বিচিত্র নহে, কুটিলতা সঙ্কোচ যে আজিও তাহার নিকট অপরিজ্ঞাত, তাহাও বিচিত্র নহে।

এক দিন রাত্রি কালে দাশো নদীতীরে 'বুরু'তলে (১) একখানি 'ধিরি'র (২) উপরে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল, আর গান গাহিতেছিল। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে আসিয়া দাশোর পাশে বসিল, এবং দাশোর করুণ বংশীধ্বনি এবং গীত শুনিতে লাগিল। সে কি গান? দাশো গাহিতেছিল,—

দোং রাড়ু। (৩)

সুঃ দাঃ ডাডি দাঃ
দাঃ বেন লোলো কান গলের মালা
বাড়ায় গেআ বেন লেঙ্গো কেশোরি
আতি দুলাড় লিং তাহেঁ কানা।

অয়ি কণ্ঠমালা! নদীবালুকার গর্ত্ত হইতে এবং পথি-পার্শ্বস্থ কূপ হইতে তোমরা দু'জনে জল ভরিতেছ, অয়ি কোমল কিশোরি! তোমরা দুজনে জান, আমি আর সে পরস্পরকে কত—কত ভাল বাসিতাম।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দাশো কতবার কত রকমে এই গীতটী গাহিয়া লক্ষ্মীকে শুনাইল। শেষ চরণটী গাহিবার সময়ে সে উহার কথাগুলির মধ্যে কত উচ্ছ্বাস, কত আগ্রহ, কত করুণা, কত আশার মোহন সুর ঢালিয়া দিল। কত ভঙ্গিমায় বারবার গাহিল—'আতি দুলাড় লিং তাহেঁ কানা, 'আমরা দু'জনে কত – কত ভালবাসিতাম।'

লক্ষ্মীর দিকে সলজ্জ নেত্র তুলিয়া দাশো বলিল, "লক্ষ্মী দেখ, নদীর ওপারে আমাদের দেশ, এখানে আমাদের দেশ নয়। নদীর উত্তপ্ত বালুকার পর পারে আমাদের সুন্দর রাজ্য, এখানে আমাদের স্থান নাই।" এই বলিয়া দাশো গাহিল,—

দোং রাড়ু।

দে হোঁ দে লা হো দে তাড়াম মে
গাডা গিতিল দো লে'লো কান দো

(১) বুরু—পাহাড়। (২) ধিরি—পাথর। (৩) রাড়ু—সুর, রাগ।



নো আ গাডা লাং পারোম লে খান
ঞেলোঃ গেআ হো আলাং দিশোম।

হে প্রিয়, ওগো প্রিয়, চল, চল, নদীর বালুকা উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, এই নদীর পারে যাইলে—হে প্রিয় আমাদের দু'জনের দেশ দেখা যাইবে।

গান সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মী বলিল, "দাশো ঘরে চল, রাত হইয়াছে, তুমি আর অমন করুণ সুরে গান গাহিয়ো না। তোমার জন্য আমার মন কেমন করে। মনে হয় যেন তোমায় ছাড়িয়া আমি কোথায়, কোন 'বির বুরু' (১) দেশে চলিয়া যাইব, আর বুঝি তোমায় দেখিতে পাইব না। দাশো, তুমি অমন করিয়া আর গাহিয়ো না।"

দাশো বলিল, —"লক্ষ্মী, সত্যই আমার জন্য তোমার মন কেমন করে?"

এই কথা বলিয়া দু'জনে হাত ধরাধরি করিয়া গৃহে চলিয়া গেল। দাশোর বাড়ী লক্ষ্মীদের বাড়ীর পার্শ্বেই।

আজ 'দিবু শোহরাই'। ইহা সাঁওতালদিগের একটী প্রধান পর্ব্ব, হিন্দু প্রতিবেশীর নিকট হইতে গৃহীত কালীপূজা সাঁওতালগণের মধ্যে 'দাশাঁই' আর 'শোহরাই' এই দুটি প্রধান পর্ব্ব নামে পরিচিত। দাশাঁই দুর্গা পূজা, আর শোহরাই কালী পূজা। শোহরাইতে গ্রামবাসীরা 'পুরখা' (মৃত পিতৃপুরুষ) গণের উদ্দেশে পূজা দিয়া থাকে, মুরগী এবং পশু হনন করিয়া থাকে। প্রত্যেক পর্ব্বে নৃত্যগীত একটি সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। আবার ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বে বিভিন্ন প্রকারের নৃত্য হইয়া থাকে। দাশাঁইতে যেরূপ নাচ হইবে—শোহরাইর নাচ তাহা হইতে বিভিন্ন। সাঁওতালেরা অত্যন্ত নৃত্য কুশল জাতি।

আজ শোহরাই। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারময়ী রজনী, মহুয়া বৃক্ষতলে নৃত্যপর যুবক যুবতীরা সমবেত হইয়াছে। সকলে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে, লক্ষ্মী এবং দাশো পাশাপাশি হাত ধরাধরি করিয়া ঐ দলের মধ্যে রহিয়াছে। লক্ষ্মীর কাণে দুটি বন ফুলের তোড়া বাঁধা, এবং দাশোর গলায় একগাছি বনফুলের মালা। দু'জনেরই রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান। লক্ষ্মীর একধারে দাশো, অপর পার্শ্বে চুণ্ডা। চুণ্ডাও লক্ষ্মীর হাত ধরিয়াছে। নৃত্য আরম্ভ হইল। সকলে চক্রাকারে হাত ধরাধরি করিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া ঘুরিতে লাগিল। সকলেরই মুখে আনন্দ, প্রফুল্লতা, হাস্য। লক্ষ্মীর লাবণ্য-পরিপূর্ণ দেহ তালে তালে হেলিতেছে দুলিতেছে, তাহার উন্নত বক্ষের মনোমোহন স্পন্দন, তাহার যৌবনোচ্ছাসপূর্ণ দেহের নর্ত্তনজনিত ললিত তরঙ্গলীলা, তাহার সুন্দর মুখখানির হাস্যময় ভঙ্গিমা, তাহার উজ্জ্বল কৃষ্ণতার চক্ষুর অপার্থিব সৌন্দর্য্য প্রভৃতি একত্র হইয়া দাশোকে বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছে। দাশো যেন স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছে, যেন তাহার অর্চ্চনীয়া দেবী, তাহার পার্শ্বস্থিতা লক্ষ্মী, কোন স্বর্গের অপ্সরা, যেন তাহারই হাতে হাত দিয়া সে কোন্ অজ্ঞাত সুরপুরে মনের আনন্দে নৃত্য

(১) বির—জঙ্গল। বুরু—পাহাড়।

করিতেছে। যেন সে রাজ্যে সে আর তাহার লক্ষ্মী ব্যতীত আর কেহ নাই, যেন তাহারা দু'টীতে সুখে প্রেমে বিভোর হইয়া মনের আনন্দে সেই সুরপুরে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। দাশো চক্ষু ভরিয়া লক্ষ্মীর অপূর্ব্ব রূপসুধা পান করিতে লাগিল, আর তাহার শরীর যেন ক্রমশঃ কি এক নেশায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সে লক্ষ্মীর হাত চাপিয়া ধরিল, লক্ষ্মী দাশোর দিকে ফিরিয়া দাশোর মুখের দিকে তাকাইল। দাশোর মুখ দেখিয়া লক্ষ্মী একটু হাসিল, সেও দাশোর হাত খানি ঈষৎ চাপিয়া ধরিল, দাশোর কাণে কাণে বলিল, "দাশো তোমায় আজ বড় সুন্দর দেখাচ্চে।"

দাশো জাগিয়া জাগিয়া কত স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। একবার ভাবিল, সে যেন মরিয়া গিয়াছে, লক্ষ্মী যেন কতদিন তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, সে একবার লক্ষ্মীকে দেখিবার জন্য কত কাঁদিতেছে, লক্ষ্মী কোথায়? সে যে চক্ষু মুদিয়া লক্ষ্মীর রূপ ধ্যান করিতে লাগিল, স্বপ্ন দেখিল, যেন লক্ষ্মী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, তাহার দিকে আনত করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে, সে দৃষ্টিতে কত করুণা, কত প্রেম!—চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, লক্ষ্মী তাহার দিকে তেমনই করুণা এবং প্রেমপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতেছে। সে কিন্তু মরিয়া যায় নাই, সে এবং লক্ষ্মী হাতে হাত দিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতেছে।

এই দলের মধ্যে দাশোর ন্যায় আর এক জন যুবক লক্ষ্মীর মদিরাময় সৌন্দর্য্যে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইতেছিল। তাহার নাম চুণ্ডা। সেও লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া কত জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছিল, লক্ষ্মীর উজ্জ্বল মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া আত্মহারা হইতেছিল, এবং কখনবা নিমেষহীন দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর যৌবনপূর্ণ দেহের হেলনি, তাহার সমুন্নত বক্ষঃস্থলের মোহময় আন্দোলন, আর সর্ব্বাঙ্গের মদিরাময় লাবণ্যলীলা দেখিতেছিল। তাহারও মন প্রণয়ে লালসায় অধীর হইয়া উঠিতেছিল। নৃত্য করিতে করিতে চুণ্ডা একেবারে লক্ষ্মীকে বুকে টানিয়া লইয়া সকলের অলক্ষিতে লক্ষ্মীর গণ্ডদেশে চুম্বন করিল। আর কেহ ইহা দেখিল না, কিন্তু দাশোর সতর্ক চক্ষু উহা লক্ষ্য করিল। দাশোর দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইল, রাগে হিংসায় ঠোঁট ফুলিয়া উঠিল, মস্তিষ্কের মধ্যে প্রতিহিংসা ঘুরিতে লাগিল। লক্ষ্মী এই আকস্মিক ব্যাপারে নিতান্ত কুপিতা এবং দাশোর দিকে চাহিল। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, তাহার ঠোঁট দু'খানি ফুলিতে লাগিল। কেহ কিছু বলিল না। নৃত্যগীত চলিতে লাগিল।

নৃত্যগীত থামিয়া গিয়াছে। দাশো আর লক্ষ্মী বাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছে। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। দু'জনেই চিন্তিত মনে পথ চলিয়াছে। পশ্চাতে চুণ্ডার উচ্চহাস্য এবং কলরব শুনা যাইতেছে। নদীর পারে আসিয়া উভয়ে দাঁড়াইলে দাশো বলিল, "লক্ষ্মী, তুমি দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।" অল্প পশ্চাতে উচ্চশব্দ ধ্বনিত হইতেছিল। চুণ্ডার মন আনন্দে পরিপূর্ণ, তাহার হৃদয় উৎফুল্ল। সে নদীর পাড়ে আসিলে দাশো একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। চুণ্ডা সে আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, পড়িয়া গেল। তখন দাশো চুণ্ডাকে এক পদাঘাত করিয়া লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে নদী পার হইল। এখন দাশোর মুখে হাসি ফুটিয়াছে, তাহার মনের অমাবস্যা ঘুচিয়াছে। দাশো হাসিতে হাসিতে লক্ষ্মীকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিল, আসিবার সময় লক্ষ্মীর কানে কানে বলিয়া আসিল, "লক্ষ্মী, তুমি চুণ্ডার নও, আর কাহারও নও"।

পর দিন প্রাতে সকলে গত রাত্রির ঘটনা জানিল। চুণ্ডা মস্তকে গুরুতররূপে আহত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছে। তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে। পরগণা ভাদো মাঝি ও গ্রামের অপরাপর সকলেই দাশোকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাশো কোনও কথাই গোপন করিল না। সে স্বীকার করিল, প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সে চুণ্ডাকে নদীতীরে প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আহত করিয়াছিল, মনে ভাবে নাই যে, চুণ্ডা এরূপ সাংঘাতিক আঘাত পাইবে। দাশো কখনও মিথ্যা কথা কহে নাই, সে মিথ্যা কাহাকে বলে, তাহা জানে না। তাহাকে যে শাস্তি দেওয়া যাইবে, সে তাহাই অবনত মস্তকে বহন করিবে।

লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে লক্ষ্মীও সকল কথা যথাযথ বর্ণনা করিল, কিছুই গোপন করিল না। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পিতার চরণে ধরিয়া বলিল যে, তাহারই জন্য দাশো এইরূপ করিয়াছে, তাহারই ক্রন্দনে দাশো উত্তেজিত হইয়া জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল, দাশোর কোন দোষ নাই, সকল অপরাধ তাহারই।

তিন দিনের দিন চুণ্ডা প্রলাপে লক্ষ্মীর নাম লইয়া উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। চতুর্থ দিনে দাশোর বিচার হইল। লক্ষ্মী কত করিয়া, কত কাঁদিয়া দাশোকে ক্ষমা করিবার জন্য তাহার পিতাকে অনুরোধ করিল। পিতার জীবনসর্ব্বস্ব কন্যা, একমাত্র স্নেহের পুত্তলি লক্ষ্মী তাঁহার নিকট কত কাঁদিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত চক্ষু ফুলাইল, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ পিতা আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না। ভাদো মাঝি এবং গ্রামের পঞ্চায়তের বিচারে হতভাগ্য দাশো গ্রাম হইতে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইল।

সেইদিন রজনীর অবসানে দাশো আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে জন্মভূমির নিকট চিরজীবনের তরে বিদায় লইল। তাহার উন্মেষিত যৌবনের খরপ্রবাহী প্রেমস্রোত রুদ্ধ করিয়া, জীবনের সারাংশ, প্রাণের আশা আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা, সমস্ত চির জন্মের তরে ঐ ক্ষুদ্র কুটীরের অভ্যন্তরে রাখিয়া, শূন্যমনে কাঁদিতে কাঁদিতে দাশো চলিল। জন্মভূমি, প্রণয়, স্নেহ, সুখ, আশা, আজ তাহার সকলই ফুরাইল। হায়, দাশোর নবীন জীবনে এই আকস্মিক বজ্রাঘাত কেন হইল। কেন—কে বলিবে?

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী এখন অষ্টাদশবর্ষে উপনীত হইয়াছে। তাহার পিতা মাতা তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। 'নবখি' গ্রামের বুধা কিস্কুর পুত্রের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ স্থির হইয়াছে, বরপক্ষীয়েরা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন, এবং কন্যাপক্ষীয়েরাও যাইয়া বরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভোজ খাইয়া আসিয়াছেন। বুধা কিস্কু ভাদোমাঝিকে কন্যার জন্য ৩ টাকা পণও দিয়াছে। সাঁওতালদিগের বিবাহে বরপক্ষ হইতে কন্যাকর্ত্তাকে ৩, ৫, ৭, অথবা ১২ টাকা পণ দিতে হয়। আজ 'বার বার' (দূত) আসিয়া ভাদোমাঝিকে সংবাদ দিয়া গেল যে, আর ৫ দিন পরে বিবাহ হইবে, বরপক্ষ হইতে মোট ১২ জন লোক আসিবে। ভাদোমাঝি তদনুসারে বিবাহের, এবং বরপক্ষীয়দিগের অভ্যর্থনার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিল। গৃহে বিবাহের বাজনা বাজিতে লাগিল।

মাদল, নাগরা আর বাঁশী আজ প্রভাতে অতি মধুরস্বরে বাজিয়া উঠিল। আজ লক্ষ্মীর বিবাহ; লক্ষ্মী অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নদীতীরে গেল, দাশো আর সে যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিত, যেখানে বসিয়া দাশো জ্যোৎস্নাময়ী নিশায় বাঁশী বাজাইত ও লক্ষ্মীকে গান শুনাইত, ধীরে ধীরে লক্ষ্মী সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর যাইয়া উপবেশন করিল। তখনও অল্প অল্প অন্ধকার রহিয়াছে। লক্ষ্মী চিন্তিত মনে বসিয়া অপর পারের দিকে চাহিয়া রহিল। বুঝি ভাবিতে লাগিল, যদি এমন সময়ে দাশো আসিয়া একবার তাহার অন্তরের দুঃখ দেখিয়া যায়। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল প্রাণের মধ্যে হাহাকার উত্থিত হইল। আজ সে তাহার বাল্যের সহচর, যৌবনের প্রেমের দেবতা, তাহার সখা, বন্ধু এবং প্রণয়ীকে চিরজন্মের তরে বুঝি বিসর্জ্জন করিতে চলিয়াছে। তাহার বুক ভাঙ্গিয়া আসিল, সে প্রস্তরের উপর লুটাইয়া লুটাইয়া করুণস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

লক্ষ্মী এখনও দাশোকে ভুলে নাই। গ্রামের সকলেই ভুলিয়াছে, কিন্তু লক্ষ্মী কি ভুলিতে পারে? এত ভালবাসা কি কখনও বিস্মৃত হওয়া যায়? কখনও কি ভুলিতে পারিবে? প্রেম, হর্ম্ম্যবাসিনী রমণীর হৃদয়ে যে ভাবে প্রকাশিত হয়, অমার্জ্জিতা বন্যবালার হৃদয়েও তেমনই ভাবে বিকশিত হইয়া উঠে। প্রেমের মন্দাকিনীধারা সকলকে একই স্রোতে লইয়া যায়। রমণীর হৃদয় মানুষের হৃদয়, সভ্য ও অসভ্য সকল সমাজেই একপ্রকৃতিক। 'A touch of Nature makes the whole world kin'

প্রাতঃকালে বর আসিয়াছে। বরপক্ষীয়েরা গ্রামের বাহিরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। ভাদোমাঝি গিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিল। সকলে ভাদোর বাড়ীতে সম্মিলিত হইয়াছে, বিবাহের বাদ্য বাজিতেছে। বরের ভ্রাতৃসম্পর্কীয় ৫।৭ জন যুবক যাইয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টা পূর্ণযৌবনা শ্রীরূপিণী লক্ষ্মীকে বরের নিকট লইয়া আসিল। বর একটি ঘটি হইতে কন্যার অঙ্গে ৫ বার জল ছিটাইয়া দিল, কন্যাও তদ্রূপ করিল। তৎপরে বর কন্যার হাতে হাত দিয়া ৫ বার তাহার হাত ধরিয়া টানিল, কন্যাও বরের হাত ধরিয়া ৫ বার আকর্ষণ করিল। এইরূপে বিবাহ সম্পন্ন হইল। লক্ষ্মীর জীবনস্রোত ভিন্ন প্রবাহে বহিল।

বিবাহের পরে আহারাদি ও ভোজ হইল। বরপক্ষীয়েরা যে ছাগ সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহা কাটা হইল, কন্যা-

পক্ষীয়েরা অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়া উপস্থাপিত করিল। 'হাঁড়িয়া' (একপ্রকার মদ্য, ভাত হইতে প্রস্তুত, যাহাকে 'পচাই' বলে) চলিতে লাগিল। গ্রামের যুবক যুবতীগণকে লইয় যোগমাঝি উপস্থিত হইল, তখন নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। সকলে মহোল্লাসে তাহাতে যোগ দিল। সে সঙ্গীত এই,—

দাং রাড়।

মারাং বুরু দো আড়ি উস্মুল
আঁড়গো বাকাপ্‌তে ডাণ্ডাইং হুকেন
জামতোড়া লাড়ু দো আতি সেবেল
অজয় বড়াকর দাঃ লাং এ‍্যুইআ।

অর্থ :— বড় পর্ব্বত খুব উচ্চ,
উঠিতে নামিতে কটি ব্যথিত হইল ;
জামতাড়া সহরের মিঠাই (লাড়ু) খুব মিষ্ট,
এস, আমরা দুজনে মিঠাই খাইয়া অজয়
আর বরাকরের জল পান করি।

এইরূপে বিবাহ-বাসর কাটিয়া গেল। দুইদিন পরে লক্ষ্মীকে লইয়া বর তাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল।

* * * * *

তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। লক্ষ্মীর বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ তিনটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজ লক্ষ্মীর জীবনের দু'একটি দৃশ্য আমরা পাঠক পাঠিকার সম্মুখে ধরিব। দুঃখের কাহিনী শীঘ্র শীঘ্র সমাপ্ত হওয়াই ভাল।

লক্ষ্মী এখন কোথায়? কালের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে লক্ষ্মী আজ কোথায় উপনীত হইয়াছে, তাহা কেহ জান কি?

লক্ষ্মীর গৃহ হইতে ৬০০ ক্রোশ দূরে ঐ যে চা-বাগান দেখিতেছ, ঐখানে অনুসন্ধান করিলে লক্ষ্মীকে দেখিতে পাইবে। দৈবের বিড়ম্বনায়, অদৃষ্টের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মক্রমে, লক্ষ্মী, বৃদ্ধ ভাদোমাঝির নয়নতারা, স্নেহের পুতলি লক্ষ্মী, আজ চা বাগানের কুলি। কোথায় তাহার পরিজন, কোথায় তাহার স্নেহময় জনক জননী! আজ চক্ষের জলে ভাসিয়া, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া দরিদ্রা লক্ষ্মী তাহার জীবনের অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। হা বঙ্গদেশ! তোমার কত ঘরে ঘরে এইরূপ সোণার প্রতিমা হারাইয়া কত হাহাকার উঠিতেছে, কে তাহার গণনা করিবে?

প্রাতঃকালে সাহেব চাবুকহস্তে চা তোলা কার্য্য পরিদর্শন করিতে আসিলেন। লক্ষ্মীর নিকটে আসিয়া তাহার অনিন্দ্য বদনকান্তি দেখিয়া সাহেব বিমোহিত হইলেন। সাঁওতাল যুবতীর সৌন্দর্য্যে সাহেব অভিভূত হইলেন। এত যুবতীর যৌবনমধু পান করিয়াছেন, কই, সাহেব এমন লাবণ্যে ঢলঢল দেহলতা, এমন উন্মাদক সৌন্দর্য্য ত কখনও দেখেন নাই! সাহেব বিমুগ্ধ হইয়া, কৃষ্ণ মুখের অপূর্ব্ব শ্রী, বারবার সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীকে তাঁহার কুঠিতে লইয়া যাইবার জন্য সরদারকে উপদেশ দিয়া সাহেব অন্যমনস্ক ভাবে চলিয়া গেলেন। সে দিন তাঁহার পরিদর্শন কার্য্য ঐখানেই পরিসমাপ্ত হইল।

সন্ধ্যার সময়। তখনও অল্প অল্প আলো রহিয়াছে। আলো আঁধারে, সরদারেরা সাঁওতাল যুবতী লক্ষ্মীকে ধরিয়া সাহেবের কুঠিতে আনিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া লক্ষ্মীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, তাহার কেশ আলুলায়িত, তাহার মুখে এক ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার যৌবন, তাহার সৌন্দর্য্য তেমনই মোহময়, তেমনই বিভ্রমোৎপাদক। সাহেব সবে শিকার হইতে প্রত্যাগত হইয়া বারাণ্ডায় টেবিলের উপর বন্দুক রাখিয়া মদ্যপানে নিরত হইয়াছেন। লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী কিছুই বলিল না, সাহেবের মুখের দিকে তাহার উজ্জ্বল, মধুর অথচ ভীষণ নেত্রযুগল স্থাপিত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে চক্ষু হইতে যেন জলন্ত অগ্নি নির্গত হইতেছিল। সাহেব সরদারকে হুকুম দিলেন, "উপর ল্যাও"। সরদার লক্ষ্মীকে টানিয়া উপরে উঠাইল। সাহেব লক্ষ্মীকে ধরিয়া জোর পূর্ব্বক তাহাকে বেঞ্চের উপর বসাইল। সরদার এই সময়ে প্রস্থান করিল।

তারপর সাহেব মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

এমন সময়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া ধীরে ধীরে একজন কুলি আসিয়া বারাণ্ডার উপরে উঠিল, এবং সবলে সাহেবের মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিল। সাহেব আহত হইয়া লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া দিলেন। কুলি লক্ষ্মীকে বলিল, "লক্ষ্মী, আমার সহিত আইস, তোমার কোনও ভয় নাই"। কুলি লক্ষ্মীকে লইয়া দ্রুতপদে বারাণ্ডা হইতে অবতরণ করিল। উভয়ে প্রস্থানোদ্যত হইল। ইত্যবসরে সাহেব দক্ষিণ হস্তে বন্দুক উঠাইয়া কুলিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন,

কুলি আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পড়িয়া গেল। লক্ষ্মী পলাইল।



অমাবস্যার অন্ধকারময়ী রাত্রি। কুলি সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া আজ তিন দিন শয্যাশায়ী। তাহার ক্ষুদ্রগৃহে লক্ষ্মী আসিয়া দিবারাত্রি তাহার পাশে বসিয়া আছে। তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া লক্ষ্মী কাতর প্রাণে দেবতার কাছে কুলির জীবন ভিক্ষা করিতেছে।

অর্দ্ধরাত্রে কুলির চেতনা হইল। কুলি চক্ষু মেলিয়া লক্ষ্মীকে দেখিয়া বলিল, "লক্ষ্মী, তোমার দাশো আজ সুখে মরিতে পারিবে। সে যে তোমার জন্য জীবন দিতে পারিল, ইহাতে তাহার কত আনন্দ, কত সুখ। সে যে তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিয়াছে, ইহাতে সে চির জন্মের নির্ব্বাসন ক্লেশ এবং বিরহ দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী, আমার এই ঘরে—ঐ কোণে মাটীর তলে আমার সঞ্চিত সমুদায় অর্থ প্রোথিত রহিয়াছে, আমি মরিয়া গেলে তুমি উহা লইয়া তোমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দেশে যাইও। তোমার এগ্রিমেণ্টের সময় অতীত হইয়াছে। ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেই তোমায় ছাড়িয়া দিবে। তুমি দেশে যাইও, আর তোমার বাবাকে ও গ্রামের সকলকে বলিও, দাশো তাহার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। লক্ষ্মী, আইস, আমার হাতে হাত দিয়া আমার চক্ষুর নিকটে তোমার মুখখানি আন। আমি আর ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না। লক্ষ্মী, দাশো তোমায় এই চারি বৎসর ধরিয়া পূজা করিয়াছে, ধ্যান করিয়াছে। সে তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। তুমি তাহাকে ভুলিয়া যাইও না।"

রাত্রি শেষে দাশো প্রলাপ বকিতে লাগিল,—

গোআ গাডা লাং
পারোম লে খান
এেলোঃ গেআ হো
আলাং দিশোম।

এই নদীর পারে গমন করিলে, হে প্রিয়, আমাদের দু'জনের দেশ দেখা যাইবে।

রাত্রির অবসানে সাঁওতাল যুবা দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া অনন্ত পথে পুনর্যাত্রা করিল বুঝি এখনও, সে তাহার লক্ষ্মীর কথা ভুলিতে পারে নাই। তাই এখনও এতদিন পরেও, বিধবা লক্ষ্মী জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যায় নদীতীরে 'বুরু তলে' 'বিরি'র উপরে বসিয়া—মোহন বংশীধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠে, আর দূরে পরিচিত ক্ষীণ স্বরে গানের একটি চরণ শুনিতে পায়—"আডি দুলাড নিং তাহেঁ কানা।"

শ্রীমুরলীধর রায় চৌধুরী।

জামাই-ষষ্ঠী।

(চিত্র)

'জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠী' বঙ্গদেশের পল্লী অঞ্চলের বহু প্রাচীন আনন্দপূর্ণ পারিবারিক উৎসব। রথযাত্রা, দোলযাত্রা, দুর্গোৎসব কিম্বা অন্যান্য পার্ব্বণে উৎসবের যে উল্লাস-

ময় উৎসাহ ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ প্রত্যেক গ্রাম ও নগর মধ্যে তরঙ্গায়িত হইয়া পল্লীবাসিগণকে সংগ্রাম-কঠোর সংসারের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পথ হইতে সুখ ও আনন্দের আরামদায়ক নেপথ্যে সম্মিলিত করে—জামাই ষষ্ঠীতে সেই জাতীয় আনন্দের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা যেন ভিন্ন জাতীয় উৎসব, ইহার আনন্দ, সুখ ও পরিতৃপ্তি শুদ্ধান্তের পবিত্র সীমায় আবদ্ধ—বহিঃপ্রকৃতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই; বহির্জ্জগতের বিপুল কোলাহল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন এই পল্লী উৎসব বঙ্গললনার বিচিত্র প্রেমানন্দরাগে চিত্রিত হইয়া বঙ্গান্তঃপুরের মোহময় প্রভাবচ্ছায়ায় আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু তথাপি এই পুরাঙ্গনাগণের এই উৎসবকে ক্ষুদ্র বা নগণ্য বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। রমণীগণকে আমরা উৎসবের দেবতারূপে গ্রহণ করিতে পারি; তাঁহাদের অভাবে কোন উৎসব সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিত না; দুর্গোৎসবে আমরা দেখিতে পাই, বঙ্গরমণী শক্তিস্বরূপিণী হইয়া জননীর কন্যাপূজা ব্রতের উদ্যাপন করিতেছেন, সেখানে পুরুষ তাঁহার সহায়, জাতীয় সম্মিলনের প্রধান উদ্যোগী। সেখানে পুরুষ ও রমণীর সমবেত সাধনা, সমবেত চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়;—কিন্তু জামাই ষষ্ঠীর সহিত এক জামাতা ভিন্ন অপর পুরুষের সংস্রব নাই। রমণী অন্তঃপুরের অধিশ্বরী। তিনি তাঁহার গৃহ রাজধানীতে জামাতৃ পূজার আয়োজনের জন্য এই গার্হস্থ্য উৎসবে যোগদান করেন। জামাই ষষ্ঠী বঙ্গান্তঃপুরের প্রধান উৎসব।

কবে কিরূপে এই উৎসবের আরম্ভ, কেহ বলিতে পারে না, কেহ সে কথা জানে কি না, তাহাও বলা যায় না; কিন্তু যুগান্ত কাল হইতে বঙ্গের গৃহে গৃহে এই উৎসব বিরাজিত হইয়া বঙ্গীয় রমণীর স্নেহ, প্রেম ও মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সে দিন পল্লীগৃহে যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার পরিচয়-দান পুরুষ লেখকের পক্ষে সম্ভব নহে।

জ্যৈষ্ঠ মাস—স্কুল কালেজ সমস্ত বন্ধ হইয়াছে, ষষ্ঠীর পাঁচ সাত দিন পূর্ব্ব হইতেই জামাতৃবর্গ—বিশেষতঃ নবজামাতৃবৃন্দ শ্বশুর বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইতে লাগিলেন। নিমন্ত্রণ পত্রগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ শ্বশুর মহাশয় জামাতার অভিভাবকের নিকট পত্র লিখিয়া জামাতাকে ষষ্ঠী উপলক্ষে তাঁহার গৃহে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রগুলি অত্যন্ত সুমধুর, সাধারণতঃ তাহা শ্যালিকা-হস্ত বিরচিত। ষষ্ঠীর দুই এক দিন পূর্ব্বেই আমাদের ক্ষুদ্র পল্লী গোবিন্দপুর, গ্রামবাসিগণের নবজামাতৃবর্গের আবির্ভাবে নব শ্রী ধারণ করিল। প্রভাতে ও অপরাহ্নে জমীদারগণের বিভিন্ন সরিকের জামাতৃবর্গ ভিন্ন ভিন্ন আকার, বেশভূষা ও বিলাসিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া রাজপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পায়ে বিলাতি জুতা, মুখে সিগারেট, অঙ্গুলীতে হীরকাঙ্গুরীয়ক, কাঁধে সিল্কের চাদর; গরদের পাঞ্জাবীতে বরবপু সমাচ্ছন্ন, বুকের উপর সুবর্ণ চেন ও মাথার উপর কেশ রাশির মধ্যে 'চেরা সিঁথি' আত্মমহিমা বিকাশ করিতেছে। কাহারও গোঁফ পরিদৃশ্যমান, কাহারও গোঁফের রেখা দিয়াছে, হাতের ছড়ি আত্মরক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ, বিলাসের জন্যই তাহার আবশ্যক—কে বলিবে, সুরসেনাপতি মহাবীর ষড়ানন এই কলির শেষে তাঁহার সুপুচ্ছ বাহনের অনুসন্ধানে জামাতার ছদ্মবেশ গ্রহণপূর্ব্বক গোবিন্দপুরে আসিয়া দুর্গ স্থাপন করিয়াছেন কি না!

গৃহে গৃহে উৎসাহ ও কলরবের স্রোত অশ্রান্ত বেগে প্রবাহিত হইতেছে। পল্লীর অন্তঃপুরের সে উৎসব-দৃশ্য বর্ণনার উপযুক্ত ভাষা ও ক্ষমতা বর্ত্তমান লেখকের নাই, আমরা এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র প্রদান করিব।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামের শ্রেষ্ঠ জমীদার। জমীদার মহাশয়ের পঞ্চ কন্যা। তিনটি বিবাহিতা। জ্যেষ্ঠ কন্যা সংসীবালা স্বামীর নিকটে থাকেন। তাঁহাকে লইয়া তাঁহার স্বামী হরেন্দ্র বাবু পূর্ব্ব বৎসর শ্বশুরালয়ে আসিয়া জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। এবার তিনি আসিতে পারেন নাই, এজন্য জমীদার গৃহিণী কিঞ্চিৎ দুঃখিতা—কিন্তু আজ দুই দিন হইল, তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় জামাতা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। পল্লীযুবতীগণ ষষ্ঠীর পূর্ব্ব দিন অপরাহ্নে সরযূবালা ও সরলাবালাকে বেশভূষায় ভূষিত করিতে বসিয়াছেন। সেখানে বহু রমণীর সমাগম হইয়াছে—কেহ কন্যার রূপের, কেহ জামাতার গুণের, কেহ বেয়ানের অহঙ্কারের, কেহ বেহাইয়ের অমায়িকতার সমালোচনাপূর্ব্বক গৃহিণীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতেছেন। গৃহিণী অদূরে বসিয়া জামাতৃদ্বয়ের জলযোগের আয়োজন করিতেছেন—আম, কাঁঠাল, কালজাম, গোলাপজাম, লিচু, তালশাঁস, ফলসা, নারিকেল কোরা, শাঁক আলু প্রভৃতি নানা জাতীয় ফল মূল ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন রজতপাত্রে সজ্জিত হইতেছে। মায়ের কাছে বসিয়া সরোজবালা ও শৈলবালা সতৃষ্ণ নয়নে জামাই বাবুদের জলযোগের আয়োজন দেখিতেছে। ইতোমধ্যে গয়লা বৌ কদলীপত্রে আবৃত দুইটি পাত্রে ছানা ও ক্ষীর লইয়া উপস্থিত হইল। গয়লা বৌর পশ্চাতে একটি পঞ্চম বর্ষীয় উলঙ্গ বালক। একটী সুপক্ব আম্র উভয় হস্তে ধরিয়া গোপনন্দন ফেলারাম তাহার সুমিষ্ট রস পান করিতেছে, পীতরসে তাহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইতেছে। গয়লা বৌ ছানা ও ক্ষীরের বাটী গৃহিণীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিল, "কত্তামা কাঁঠালের ভুতুড়ীগুলো কোথায়?"—কামিনী ঝি একটা ঝোড়ায় কাঁঠালের ভুঁতুড়ীগুলি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল।

ঘোষাণী ঝুড়ি কক্ষে লইয়া মহানন্দে গৃহমুখে প্রস্থান করিবে এমন সময় গৃহিণী বলিলেন, 'হ্যাঁ লো ফেলার মা, তুই ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁঠালের ভুঁতুড়ী গরুর জন্যে নিয়ে যাস্, দুধে ত বাজ্যের জল ঢালিস্, জামাই এলো বাড়ী, এখন দিন কতক একটু ভাল দুধ দে দেখি।" ফেলারামের জননী ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অভিমানভরে বলিল, "দেখ কত্তামা, যে দিব্বি বল সেই দিব্ব করতে পারি, তোমার বাড়ীর দুধে এক ছটাকও জল দিইনে, তা তোমার যদি সে কথায় বিশ্বাস হবে, আমার শনি গাই আর মঙ্গলা গাই সে দিন বিইয়েচে, তা দুধ বটের আটার মত হবে কোথেকে? কত্তামা, আর কিছুতে তোমার মন পেলাম না।" গৃহিণী বলিলেন, কাল ষষ্ঠী আছে, সের খানেক ক'রে ছানা ক্ষীর, আর সের দশেক হিসেবে দৈ দুধ দিস্, দু পাঁচ জন লোক জনকেও আবার খেতে বল্‌তে হবে।"—'তা দেব কত্তামা, কাল আবার বচ্ছরকার দিন, দেখি যদ মনোরপুরে (মনোহর) কিছু দুধের জোগাড় কর্ত্তে পারি, ঘোষ আবার বাঁকে গিয়েচে।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোষ আবার কোথায় বাঁকে গেল রে।"—ঘোষাণী নূতন গল্প রসের আয়োজন সম্ভাবনায় যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কক্ষ হইতে কাঁটালের ভুঁতুড়ির ঝুড়িটা সম্মুখে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "কত্তামা, ঘোষ দুর্গাপুর মজুমদারদের জামাইয়ের ষষ্ঠীর তত্ত্ব নিয়ে গিয়েছে। আহা, মজুমদার গিন্নির ঐ একটি মেয়ে, কত সাধ আহ্লাদ করে বিয়ে দিলে, তা দেওয়া থোওয়া ভাল হয় নি বলে মেয়ে ছেড়ে দেয় না, বলে বাঁউড়ী সুট গয়না হাজির কর, করে মেয়ে নিয়ে যাও।" তা মজুমদারের ত আর অবস্থা আগের মত নেই, অত টাকার মাল কোত্থেকে দেবে? ষষ্ঠীতে মেয়ে জামাই পাঠালো না। সেদিন মজুমদার-গিন্নি একটু টাটকা ঘি চেয়েছিলো—দিতে গিয়েছিলেম, বলব কি কত্তামা, মাগী একঘর কান্না কাঁদলে, বেয়াই মিন্সে একেবারে চামার, চোকের চামড়া নেই গো, মায়ের ছেলে মায়ের কাছে পাঠায় না। মজুমদার-গিন্নি ঝি জামাইয়ের জন্যে দুভার জিনিষ পাঠালে। আহা মেয়ের চাঁদ মুখ খানা দেখবার জন্যে গিন্নির পেরাণড়া ছটফট করে।" গোপবধূর কথা শুনিয়া কোমলপ্রাণা বন্দোপাধ্যায়-গৃহিণীর হৃদয় সমবেদনা-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সরসী বালার সুমধুর মুখচ্ছবি সহস সকরুণ কন্যামূর্ত্তিতে তাঁহার মানসনেত্র-পথে উদিত হইয়া তাঁহার দুহিতাবিরহপ্রপীড়িত বক্ষের অভ্যন্তর হইতে একটি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস আকর্ষণ করিল। গৃহিণী কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "খাইয়ে দাইয়ে মানুষ ক'রে পরের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্যেই মেয়ে।"

গৃহিণীর ননদ রাঙা পিশিমা তখন রন্ধনশালায় ঘোরতর ব্যস্ত। পাকপ্রণালীর অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই তিনি বহু প্রকার পাকপ্রণালীতে অভ্যস্তা। তিনি জামাতৃ-দ্বয়ের জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছেন। পিঠা পুলি আঁদোশা গোকুল পিঠে, চন্দ্র পুলি, কলাবড়া প্রভৃতি খাদ্য-পাকে তিনি সিদ্ধহস্ত। এ সকল দ্রব্য ভিন্ন তিনি আর একটী অতি উৎকৃষ্ট মুখরোচক খাদ্য পাক করিতেন, তাহার নাম "রাধিকার সরোবর রসমাধুরী"—যাহার নাম এমন সুন্দর, তাহার আস্বাদন কিরূপ মধুর, তাহা যিনি রাঙা পিসিমার হস্ত-রচিত এই সুরস সুমিষ্ট মোলায়েম মিষ্টান্নের আস্বাদন না করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। কবির বর্ণনা শক্তিও যেখানে পরাভূত—সেখানে অকবির অনধিকার চর্চ্চা নিতান্তই ধৃষ্টতা এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জনীয়। রাঙা পিসিমা বিধবা, তাঁহার স্বর্গীয় স্বামী বনমালী বাবু ভোজনবিলাসী ছিলেন, পিসিমার 'রস মাধুরী'তে তিনি সদা পরিতৃপ্ত থাকিতেন। আজ নিদাঘের এই নিঃসঙ্গ অপরাহ্ণে একাকী সেই বহুদিনের অভ্যস্ত প্রাচীন সুখস্মৃতিবিমণ্ডিত 'রসমাধুরী' নির্ম্মাণ করিতে করিতে তাঁহার আনন্দময় যৌবন মধ্যাহ্নের কত সুখের, কত বেদনার, কত বাসনার কথা মনে পড়িতেছিল, তাহা কে বলিবে? জ্ঞাতি দেবরগণের চক্রান্তে বিধবা সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া প্রৌঢ়ত্বের অবসানকালে ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সংযত, পবিত্র উদার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া তিনি তাঁহার সহোদরের পুত্রকন্যাগণের মাতৃত্ব আংশিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার সুখ, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ ও পরিতৃপ্তি।

বেলা শেষ হইয়া আসিল। গ্রাম্য ললনাগণ কেশবিন্যাস শেষ করিয়া কলসী কক্ষে সুকোমল মলয় সমীরবিকম্পিত ললিত লবঙ্গলতার ন্যায় দেহ লতিকার সুচারু ভঙ্গিতে বিজন বনপথ বহিয়া ঘাটে চলিলেন। তাঁহাদের কাহারও পায় চারগাছি ডায়মণ্ডকাটা মল, কাহারও পায়ে গুজরী পঞ্চম, কটিতটে চন্দ্র হার, কণ্ঠে কণ্ঠমালা এবং কর্ণে সুদৃশ্য দুল। মলের ও গুজরী পঞ্চমের ঝুণুঝুনু শব্দে সমস্ত দিনের খর-রবিকর দগ্ধ সঙ্কীর্ণ বনপথ যেন নবজীবন লাভ করিল, ভাষা পাইলে সে যেন বলিতে পারিত—

"মরমে মুরছিয়া
পড়িতে চাহে হিয়া
ঐ চরণযুগ রাজীবে।"

নদীতে অধিক জল নাই। যে জলটুকু আছে, তাহা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, নদী তলস্থ বালুকাকণা ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে, ছোট ছোট ঝিনুক ও গুগ্‌লি গুলি দেখা যাইতেছে। তীরে তরুগুলি অপরাহ্নের মৃদু সমীরণের হিল্লোলে দুলিতেছে, নদীতীরে বসিয়া দুই একজন নিষ্কর্ম্মা লোক বড়সীতে কেঁচো গাঁথিয়া মাছ ধরিতেছে. শৈবালদলের লোভে দুই একটা গ্রাম্য অশ্ব নদী তীরস্থ পঙ্কের মধ্যে নামিয়া নাসিকা নিমজ্জন পূর্ব্বক ক্ষুন্নিবারণে মনঃসংযোগ করিয়াছে। পাঁচ সাতটা মহিষ নদীর অপর পাড় হইতে জলে নামিয়া জলক্রীড়া করিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া এক

একথার বৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট মস্তক জলের উপর তুলিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতেছে, রাখাল বালক তীরে দাঁড়াইয়া ঢিল ছুড়িয়া তাহাদিগকে গন্তব্য পথে প্রেরণের চেষ্টা করিতেছে। চুণ বোঝাই একখানা মহাজনী নৌকার উপর বসিয়া একজন জেলে জাল বুনিতে বুনিতে গাহিতেছে—

"তারে না দেখে রে মন প্রাণ যে আমার
ক্যামোন করে—
সে থাক্‌না ক্যানো পাবনা জ্যালায়
আর আমি হাজিপুরে,
তবুও তারি লেগে প্রাণটা আমার ক্যামোন করে।"

গানের সেই মেঠোসুরে যেন অপরাহ্নের ছায়াচ্ছন্ন অবসন্ন মৌন গ্রাম্য প্রকৃতি ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল। গ্রাম্যবধূগণ একবার কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে জলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এবং পরস্পরের মুখের দিকে সকৌতুকে একবার চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন।

'গা ধোয়া' শেষ হইলে সিক্তবস্ত্রে রমণীগণ গৃহমুখে চলিলেন, এমনই নিত্য তাঁহারা অপরাহ্নে নদীতে গা ধুইতে, জল লইতে আসেন, কিন্তু আজ সকলের ভাব সমান নহে, যাঁহার স্বামী জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছেন, তিনি কিছু ব্রীড়াবনতমুখী, সঙ্কুচিতা, চলিতে চলিতে সখীজনের প্রমোদ পরিহাস মন্দ লাগিতেছে না, তথাপি মুখে কৃত্রিম বিরক্তি—মাথা নাড়িয়া সখীর প্রতি সকোপ সভ্রূভঙ্গি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন, "নে ভাই থাম, তোর রঙ্গ দেখে গা জ্বলে যায়।"—কেবল চাটুয্যেদের মেয়ে সুলোচনা কোন কথা বলিল না। সুলোচনা যুবতী, বয়স সতর আঠার হইবে, আশ্চর্য্য সুন্দরী, প্রস্ফুটিত শুভ্র-মল্লিকা ফুলের মধ্যে যেমন একটা পবিত্রতার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, সুলোচনার মুখে চোখে সেইরূপ পবিত্রতা বিরাজ করিত, পরিপূর্ণ যৌবন, অসাধারণ রূপ, সুকোমল লাবণ্য তাহার সেই রূপজ্যোতিঃ নির্গলিতাম্বুগর্ভ শুভ্র



শরদ্ঘনে সমাচ্ছন্ন পূর্ণ চন্দ্রের কিরণ রাশির ন্যায় মাধুর্য্যসম্পন্ন,—সে রূপসাগরে তরঙ্গ নাই, তাহা নিশ্চল নিস্তরঙ্গ, প্রশান্ত। সুলোচনা কুলীন দুহিতা—কুলীন পত্নী, তাহার সপত্নী সংখ্যা অল্প নহে, তাহার কুলীন স্বামী বহু অনুরোধে একবার জামাই ষষ্ঠীর সময় শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন কিন্তু 'মর্য্যাদার' উপযুক্ত মূল্য দানে গরিব শ্বশুরকে অক্ষম দেখিয়া সেই যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আর ফিরিয়া আসেন নাই। সুলোচনার দুঃখ কি, তাহা কেহ জানিতে পারিত না, কাহারও নিকট সে তাহা প্রকাশ করিত না, কিন্তু তাহার সহচরীগণ তাহার বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিত।

ক্রমে সন্ধ্যা গভীর হইয়া উঠিল। আম বাগানের ভিতর হইতে রাখালেরা পাকা কাঁঠাল ও গেঁজেভরা আম মাথায় লইয়া প্রভুগৃহে চলিয়াছে। ভাঁটের শাখায় জোনাকির মৃদু আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুই একটি নক্ষত্রবালা গগনগবাক্ষ খুলিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে সন্ধ্যা ধূসর-

ধরণীর দিকে চাহিয়া আছে। গ্রাম্য দেব মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, গৌরদাস বাবাজীর আখড়ায় 'ভুজতা ভুজতাং' রবে মৃদঙ্গধ্বনি হইয়া হরি সংকীর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস জ্ঞাপন করিতে লাগিল, গৃহে গৃহে মৃৎপ্রদীপে আভ বিকাশ হইল। পরদিনের ষষ্ঠীর আয়োজন করিতে গৃহিণীদের অনেক রাত্রি হইল। হরিনামের মালা ফিরাইবার কাজটি আজ তাঁহাদিগকে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল।

কিন্তু গ্রাম্য বালকগণের আজ রাত্রে শুইয়া দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। কখন রাত্রি পোহাইবে, কখন তাহারা ফল সংগ্রহ করিতে যাইবে, এই চিন্তায় সকলেই অস্থির। ষষ্ঠী পূজার জন্য ফল-সংগহ, পল্লীবালকগণের মহা উৎসাহের কার্য্য। ছয় রকম ফল দিয়া ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করিতে হয়। অর্দ্ধজাগরণে অর্দ্ধনিদ্রায়, অর্দ্ধ আশায় অর্দ্ধ দুশ্চিন্তায় কোন প্রকারে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রত্যূষে তাহারা ফলের সন্ধানে বিভিন্নদিকে যাত্রা করিল, এবং একটু বেলা হইতে না হইতে তাহারা কোঁচড় ভরিয়া পেয়ারা, ডালিম, লিচু, ফলশা, খেজুর ও জাম এই ছয়রকম ফল সংগ্রহ করিয়া আনিল। পাড়ার রমণীগণের মধ্যে অধিকাংশ ফল বিতরণ করিয়া তাহারা পরম প্রীতি লাভ করিল, নিজের বাড়ীর জন্য অতি অল্পসংখ্যক ফল রাখিল।

গৃহিণীগণ আজ অতি সকালেই স্নান শেষ করিয়া আসিলেন, এবং সিক্তকেশে শুদ্ধবস্ত্রে পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অদ্য দেবী মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইবেন না বৃক্ষরূপে পূজিতা হইবেন, তাই এ পূজার নাম অনেক স্থলে 'গাছ ষষ্ঠী পূজা'। গৃহপ্রান্তবর্ত্তী তুলসীমঞ্চে সমস্ত বৈশাখ মাস 'ঝরা বাঁধা' ছিল, তুলসীবৃক্ষমূলে বৈশাখ মাসে জলসেক করিবার জন্য তাহার উর্দ্ধে যে সচ্ছিদ্র মৃন্ময়পাত্র ঝুলমান রাখা হয়, তাহাই 'ঝরা'। বৈশাখের অবসানের সহিত ঝরার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহারই সন্নিকটে অনেকখানি স্থান প্রত্যূষে গোময়ানুলিপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। প্রায় এক প্রহর বেলা হইলে গৃহিণীর আদেশক্রমে একটি ষষ্ঠীগাছ আনয়ন করা হইল, ইনি অশ্বত্থ-শাখা। ষষ্ঠীগাছ সেখানে প্রোথিত হইলে নানাপ্রকার ভীজে, সন্দেশ, বাতাশা, নৈবেদ্য আমজাম ও কাঁঠাল প্রভৃতি সময়োপযোগী ফল স্তূপাকারে ষষ্ঠীর পদমূলে রক্ষিত হইল। অধিকাংশ গৃহিণী কলার খোলায় আতব চাউল চূর্ণে জল ও হরিদ্রা মিশাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তলি নির্ম্মাণ করিয়া একপাশে রাখিলেন, কেহ কতকগুলি ক্ষীরের পুতুল গড়িয়া দিলেন,—অভিপ্রায় এই যে, "হে মা ষষ্ঠী, তুমি আমার সংসারে এতগুলি পুত্র কন্যা দান কর।" —মা ষষ্ঠী কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ভক্তিমতি গৃহিণী বৃন্দের এই আগ্রহপূর্ণ নিবেদনে-যদি কর্ণপাত করেন, তবে হতভাগ্যগণ চিরজীবন কমলার কৃপা হইতে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু জননীর মনে এসকল তর্ক উপস্থিত হয় না, তাঁহার মাতৃত্ব-গৌরব সামাজিক বিজ্ঞতার বহু উর্দ্ধে বিরাজিত।

ধূপ আসিল, দীপ আসিল, পূজার উপকরণ সেই ছয়টি ফল আসিল, অবশেষে দাড়ি গোঁপ কামান, বিলম্বিত বেণী বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যজমানগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে দেখিলে গ্রামের ছেলেরা অনুচ্চস্বরে বলাবলি করিত, "বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ।"—বোধ করি, তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানের উপর তাহাদের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সেজন্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য গৌরবের অভাব ছিল না, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নবগ্রহের স্তব করিতে পারিতেন এবং পুঁথি না খুলিয়াই দশকর্ম্ম সমাধা করিতেন। পুরোহিত মহাশয় একখানি টুলে বসিয়া চরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক বলিলেন "ছোট মাসী তোমাদের সব ডাকো, পূজো দেখুন"। তাহার পর রৌদ্র হইতে কেশবিরল মস্তকটি রক্ষা করিবার জন্য নামাবলী খানি তে করিয়া মাথার উপর রাখিয়া তিনি কুশাসনে পূজায় উপবিষ্ট হইলেন।

বাড়ীর বধূ ও কন্যাগণ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া পুরোহিতের সন্নিকটে ষষ্ঠীর অদূরে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া ভক্তি বিহ্বল চিত্তে পূজা দেখিতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র অশ্বত্থ শাখা পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ গুণে কোন্ মূর্ত্তিতে সেই সকল কোমলপ্রাণা ভক্তের হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা তাহারা ভিন্ন অন্যে অনুভব করিতে পারিবে না। কিন্তু পুরোহিতের পূজা শেষ হইলে যখন তিনি গৃহান্তরে যাত্রা করিলেন, তখন বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলে গললগ্ন-বাসে ভূমিষ্ঠা হইয়া ষষ্ঠী দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, গৃহিণী আগ্রহভরে বলিলেন, "মা বাছা সকলকে ধনেপুত্রে লক্ষেশ্বর কর, সকলের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখ।"—গৃহিণীর সেই আকুল কণ্ঠের একাগ্রতা পূর্ণ প্রার্থনা জগজ্জননীর বরাভয়প্রদ বাম চরণতলে আশ্রয় লাভ করিবে না, একথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না।

যাঁহারা পল্লীগ্রামের মধ্যে কিছু সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহাদেরই গৃহে অশ্বত্থ শাখা রোপণ করিয়া এই প্রকার ষষ্ঠী পূজার প্রচলন আছে। কিন্তু গ্রামস্থ সকলে এই ভাবে ষষ্ঠী পূজা করেন না। গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায়, হয় কোন বনের মধ্যে, নির্জ্জন পথ প্রান্তে কিম্বা নদীর ধারে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বিরাজ করে। এই সকল বৃক্ষ পল্লীগ্রামে 'ষষ্ঠী গাছ' নামে বিখ্যাত। সেই সকল 'ষষ্ঠী গাছ' আজ গ্রাম্য ললনাগণের পূজা লাভ করিতেছেন। অধিকাংশ পল্লীর রমণীই উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি হস্তে লইয়া ষষ্ঠীতলায় সমবেত হইয়াছেন। পুরোহিত পূজায় বসিয়াছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে পূজোপকরণ বিস্তৃত। রমণীগণ নিকটে দাঁড়াইয়া পূজা দেখিতেছেন, তাঁহাদের মৃদু মধুর গুঞ্জনে বনপ্রান্ত ধ্বনিত হইতেছে; কেহ অবগুণ্ঠনবতী, কাহারও নাকে নোলক, কাহারো নাসিকায় নথ; বলয় চুড়ে ঠুন্ ঠুন্ শব্দ হইতেছে, পট্ট বস্ত্র বায়ুপ্রবাহকম্পিত হওয়ায় খস্ খস্ শব্দ হইতেছে, কেশ-

তৈলের মধুর গন্ধ সমীরণহিল্লোলে ভাসিয়া যাইতেছে, দীপ্ত সূর্য্য অন্তরীক্ষ হইতে অশ্বত্থের নিবিড় পল্লব ভেদ করিয়া যুবতীজনের প্রীতিপ্রফুল্ল সন্তোষ ও শান্তিপূর্ণ হাস্যোজ্জ্বল মুখের মোহন ভাব নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছেন না। কাহারও পাঁচবৎসরের মেয়েটি নীলাম্বরী পরিয়া মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া কজ্জলরাগরঞ্জিত নেত্রে একদৃষ্টে পূজা দেখিতেছে। কাহার ক্রোড়ে এক বৎসরের শিশুপুত্র মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, কোমল ওষ্ঠাধর স্তনবৃন্ত পরিত্যাগ করে নাই, ঘর্ম্ম স্রোতে শিশুর নবনীসুকোমল দেহ প্লাবিত। স্নেহময়ী জননী তাহাকে তদবস্থাতেই ক্রোড়ে ধরিয়া বলয়বেষ্টিত সুগোল হস্তখানি দ্বারা অঞ্চল ঘুরাইয়া শিশুর ঘর্ম্ম নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, এক একবার পূজার দিকে ও এক একবার গভীর স্নেহে নিদ্রামগ্ন পুত্রের মুখের দিকে অতি সতৃষ্ণ করুণ নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন, স্নেহময়ী জননীর অন্য স্তনবৃন্ত ভেদ করিয়া অমৃত উৎসের ন্যায় ক্ষীরধারা নিঃসারিত হইতেছে—যেন ষষ্ঠী দেবী মাতৃ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই নিদাঘ মধ্যাহ্নে পল্লীপ্রান্তে ছায়াশীতল বৃক্ষ মূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন; এবং অসীম ধৈর্য্য সহকারে তাঁহার পবিত্র জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতেছেন। বিহগ-দম্পতি উচ্চ শাখায় বসিয়া কলরব করিতেছে, কৃষাণ অদূরবর্ত্তী ধান্য ক্ষেত্রের তৃণ বিনাশের জন্য নিড়ানী চালাইতেছে, তালপাতের ছাতা মাথায় দিয়া পরাণ মাঝি গ্রাম প্রান্তবাহিনী নদী বক্ষে খেয়া নৌকার লগি ঠেলিতেছে, দুই একজন ভারী ভিন্ন গ্রাম হইতে জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব লইয়া বাঁক ঘাড়ে করিয়া ষষ্ঠীতলা দিয়া গন্তব্য পথে চলিয়াছে, আম কাঁটালের ভারে তাহার স্কন্ধ ও বাহু মূলের মাংসপেশী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, তাহার 'বাঁকের' উভয় প্রান্ত নত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মধারা বহিতেছে। পথের ধূলা জানু পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে; ললাটের ঘর্ম্ম করতলে অপসারিত করিয়া সে ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়াছে।

ধূপ গন্ধে চতুর্দ্দিক সৌরভাকুল হইয়া উঠিল। যুবতীগণ হরষ সরস হৃদয়ে শুভ্র শঙ্খ উভয় হস্তে আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার নীরস কঠিন মুখ তাঁহাদের পুষ্পপুট তুল্য সুকোমল স্ফুটিতাধরে স্পর্শ করিলেন, সেই মোহময় সংস্পর্শে প্রাণহীন শঙ্খের অস্থিময় দেহে যেন নব প্রাণের সঞ্চার হইল। সে তাহার প্রাণের আনন্দ উচ্চ নিনাদে সমস্ত গ্রামে ঘোষণা করিতে লাগিল।

পূজা শেষ হইয়া গেল। পুরোহিত তাঁহার নৈবে[illegible] রাশি একজন ভৃত্যের স্কন্ধে চাপাইয়া অশ্বত্থ-মূল পরি[illegible] করিলেন, রমণীগণ ষষ্ঠী প্রণাম করিয়া শূন্য পাত্র হস্তে [illegible] ফিরিলেন, কেহ ষষ্ঠীর 'তেল ও হলুদ' লইয়া প্রিয় সহচরী[illegible] মুখে ও কপালে লিপ্ত করিয়া দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ষষ্ঠীতলা জনহীন হইয়া পড়িল, কেবল ষষ্ঠীগাছগাত্রে কতকগুলি সিন্দূর চিহ্ন ও পদতলে পূজার অর্ঘ্যাধারণ করিয়া একাকী দাঁড়াইয়া রহিল। পাঁচ সাতটা কাক বৃক্ষ শাখা হইতে নামিয়া নৈবেদ্যের তণ্ডুল কণা আহরণ করিতে লাগিল, এবং কাঁটালের গন্ধে লুব্ধ দুই একটি শৃগাল অদূরবর্ত্তী বাঁশের ঝাড় ও আশ্যাওড়ার ঘন-গুল্ম হইতে আত্ম প্রকাশ পূর্ব্বক বৃক্ষ মূলে অগ্রসর হইল।

আজ আর ভাত রাঁধিবার নিয়ম নাই, অবস্থাপন্ন পরিবারে আজ লুচি মণ্ডার আয়োজন; অধিকাংশ পল্লীবাসীই আজ চিপিটক ও দধির আয়োজন করিয়াছে। চিড়াদই, তাহার উপর আম, কাঁটাল, মর্ত্তমান কলা—ঘরে ঘরে মহোৎসব ব্যাপার! প্রতি গৃহে জামাতা ভোজনের আনন্দ। শ্যালিকার পল্লীসুলভ বিদ্রূপ, শ্যালকের সপ্রেম সম্ভাষণ, শাশুড়ীর জননীর ন্যায় স্নেহাদর, পত্নীর হৃদয়ভরা আনন্দ। জামাতৃবর্গ এই সকল আনন্দ রস পান করিতে করিতে প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছেন, "অসার খলু সংসারে, সারং শ্বশুরমন্দিরং।"

কিন্তু এমন আনন্দের দিনে কোথাও কি দুঃখ নাই? ভগবানের তাহা বিধান নহে। ঐ যে দত্তগিন্নি আজ এই সুখের দিনেও অন্ধকার গৃহে পড়িয়া মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছেন, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া তিনি তাঁহার কন্যাটির বিবাহ দিয়াছিলেন, আশা করিয়াছিলেন, আর যে কয়টী দিন বাঁচিবেন, কন্যা জামাতার মুখের দিকে চাহিয়াই হরিনাম করিতে করিতে তাহা অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ হইয়াছিল। গত চৈত্রে, আজ দুইমাস হইল, বিসূচিকা রোগে তাঁহার প্রাণ প্রতিমা কন্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া জগজ্জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে ষষ্ঠীর সময় তাহার শ্মশান তুল্য বিজন গৃহ জীবনাবলম্বন কন্যা জামাতার পদস্পর্শে নন্দনের শোভা ধারণ করিয়াছিল। আজ তাঁহার সকল আশা ফুরাইয়াছে; আজ আর কি সেই প্রাচীনা স্বামীপুত্রহীনা অবলম্বনবঞ্চিতা হতভাগিনীর কোন সান্ত্বনা আছে?—তাই তাঁহার সেই করুণ শোকোচ্ছ্বাস যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, তাঁহারই সহানুভূতি কাতর-বক্ষে দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে,—মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু আকুলকণ্ঠে মর্ম্মোচ্ছ্বাস প্রকাশ পূর্ব্বক যেন গাহিতেছে :—

"ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে।
মরমে মরে গেল, মুকুলে ঝরে গেল,
প্রাণভরা আশা—সমাধি—পাশে।
দুদিন [illegible]সেছিল, দুদিন হেসে ছিল,
দু[illegible]ছিল সুখ-বিলাসে।
না হতে [illegible]টি, নীরবে গেল টুটি'
[illegible]ময় [illegible] শুধু পিয়াসে!"

[illegible] জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ষষ্ঠী।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

২৬নং স্কট্‌স্‌ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত।



পরিব্রাজক বেশে

শ্রীযুক্ত জলধর সেন।

KUNTALINE PRESS

কল্পনার স্মৃতি।

যদিও শতধা হৃদি শত উপেক্ষায়,
আমি কি ভুলিতে কভু পারি মায়াবিনি।
এ হৃদয় মরুময় তুমি বাপী তায়,
রেখেছ শীতলি' বুকে দিবস যামিনী।
শুধু কি প্রবাসে বসি' একেলা আঁধারে,
অশ্রুগুলি গণি' যাবে জীবনের বেলা?
তোমার মধুর মুখ স্মৃতির আগারে,
জান না রয়েছে কিবা আনন্দের মেলা!
প্রাণময় সৌন্দর্য্যের পূর্ণিত বিকাশে,
অতৃপ্তি ভুলিয়ে গেছে দুটী আঁখিতারা;
যেন ধরা প্রান্তস্থিত দূর দেববাসে,
দুরন্ত বিয়োগ-দুঃখ হইয়াছে হারা।
তব স্মৃতি জীবনের তৃপ্তি নিকেতন,
সুন্দর অতিথি শূন্য আশ্রমে কেমন!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

যমুনা।

তোমার শ্যামল কূলে তমালের তলে
দাঁড়াতেন হে যমুনে, বনমালা গলে
বনমালী, বিলাসিনী রাধিকার সনে,
উজানে বহিত তাঁরি মুরলীর স্বনে
তোমারি তরঙ্গাকুল নীল জলধারা,
আজি তব কূলে বসি তাই আত্মহারা
হেরিতেছি, তব ওই হিল্লোল বিলাস,
শুনিতেছি, মুহুর্মুহু মুরলী নিশ্বাস
তোমারি কল্লোল গানে। মানস নয়নে
হেরিতেছি, দ্বাপরের সেই বৃন্দাবনে
নিকুঞ্জমন্দির মাঝে আহিরিণীগণ
নৈশ অভিসার আশে বাসর বচন।
রাখালকুলের খেলা গোচারণ মাঠে,
নগণ্য গোপীনিগণ ঐ তব ঘাটে
বিয়াকুল বিলুণ্ঠিত বসনের তরে।

হেরিতেছি, গোকুলের প্রতি ঘরে ঘরে
বাল গোপালের সেই গুপ্ত ননী চুরি,
ও কম কোমল করে সুকঠিন ডুরি
যশোদার কঠিন শাসন। মনে পড়ে
নাচিলে তবঙ্গ তব মরুত মন্থরে,
হে কালিন্দি, মহানন্দে শ্রীনন্দনন্দন
করিয়া সে মধুময় মুরলী মন্দ্রন
আভীরা যুবতী সহ তবণী-সঙ্গমে
(মাতাইয়া গোকুলের স্থাবর জঙ্গমে)
যাপিতেন মধুময় মাধবী প্রদোষ।
যমুনে লো, সবি আছে আগের মতন
সেই তরু সেই লতা সেই বৃন্দাবন,
তেমনি বহিছ তুমি সদা বেগ ভরে
কেবল গোপাল নাই যশোদার ঘরে।

শ্রীহারাণচন্দ্র দে।

সংগ্রাম সাহ।

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর অতীত হইল, বঙ্গদেশে সংগ্রাম সাহ নামে এক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে আজিও তাঁহার পরিচয়ের কতিপয় চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিয়া, তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি প্রভৃতি জেলা সংগ্রামের প্রধানতঃ লীলাক্ষেত্র ছিল বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন সুদূর মারবাড় বা যোধপুরের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেও সংগ্রামের গুণগ্রামের ও শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া স্বতঃই তাঁহার ধন্যবাদ করিতে ইচ্ছা হয়। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা একটি প্রবাদমূলক বাক্যকে কতকগুলি অসার উপকরণে সজ্জিত করিয়া পাঠকগণের ক্ষণিক মনস্তুষ্টি-বিধানে প্রয়াস পাইতেছি। বাস্তবিক প্রকৃত বিষয়ে সত্য ঘটনা পরম্পরার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই প্রস্তাবের ভিত্তিসংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তবে তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইব, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। আজ কেবল মহাত্মা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকগণের অবগতির জন্য এই স্থলে উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কবিকণ্ঠহারকৃত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভা, আলমগীর-নামার আংশিক অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত 'কলিকাতা রিভিউ'র কতিপয় প্রবন্ধ, মিঃ বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস এবং মহাত্মা কর্ণেল টড্ কৃত রাজস্থানের ইতিহাস এবং অন্যান্য কতিপয় প্রবন্ধাবলম্বনে এই প্রস্তাব সংক্রান্ত উপকরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে যথাক্রমে এতদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

যে সময়ে দিল্লীর মোগল বাদশাহগণ, ভারতে রাজ্য-বিস্তার করিয়া একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তৎসময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার একটুকু নমুনা প্রদান না করিলে, আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের একাংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই জন্য তৎসমসাময়িক কিছু বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

মোগল রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বাদসাহের প্রতিনিধি-স্বরূপ মুসলমান নবাবগণের দ্বারা বঙ্গদেশ শাসিত হইত বটে, কিন্তু তৎকালে সাধারণ প্রজা ও দেশরক্ষণাবেক্ষণের ভার দেশীয় জমিদারগণের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত। এইজন্য প্রত্যেক জমিদারের অধীনে পদাতিক, অশ্বারোহী ও নৌসৈন্যের গমনোপযোগী যান-সকল, সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। আইন-ঈ-আকবরীতে এই সকল বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। আকবরের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশের জমিদারেরা ২৩৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১১৫৮ জন পদাতিক, ১৭০টি হস্তী, ৪২৬০টি কামান এবং ৪৪০০ নৌকা সম্রাটকে যোগাইতেন।

এই সময়ে বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা একরূপ নিরাপদ হইলেও পূর্ব্বদক্ষিণ বঙ্গ দুইটি বিদেশীয় জাতির দ্বারা বড়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উহার একদল আরাকানবাসী মগ ও অপর দল ইউরোপের নরপিশাচ পর্ত্তুগীজ দস্যু। এতদুভয় দল কখনও একত্রভাবে কখনও বা বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়া, পূর্ব্বদক্ষিণ বঙ্গকে একরূপ জনহীন করিয়া তুলিয়াছিল। মুসলমান বাদসাহকুলতিলক আকবর বাদসাহের সময়ে এই উপদ্রবের প্রথম সূত্রপাত হয়। এই জন্য বাদসাহ সাহাবাজ নামক একজন সুদক্ষ সেনাপতিকে এই দস্যুদলনব্যপদেশে পূর্ব্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। সাহাবাজ খাঁ মেঘনা নদীর মোহানায় সেনানিবেশ

করিয়া স্বীয় নামানুসারে এই স্থানকে সাহাবাজপুর আখ্যা প্রদান করেন *। সাহাবাজ—১৫৮৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া মগ ও পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিয়াছিলেন। তৎপর আর এই জন্য তথায় কোনরূপ সৈন্য রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, বাদসাহ তৎপ্রদেশীয় ভূম্যাধিকারিগণের উপর দস্যুদমনের ভার দিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত থাকেন।

মোগলগৌরবের মধ্যাহ্নকালে যখন দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর সাহ অপ্রতিহত প্রভাবে ভারতশাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎসময়ে দ্বাদশ জন প্রধান ভৌমিকের উপর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল। তন্মধ্যে বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ), ও শ্রীপুর (বিক্রমপুর) দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের দুইটী রাজধানী ছিল। মিঃ রালফ্ সাহেবের লিখিত বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায়, ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে এক বৃহৎ নগরী বাকলা নামে অভিহিত হইত। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে যখন পাদ্রি মিঃ ফুইট্ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন তিনি তৎস্থানীয় দ্বাদশজন ভূমাধিকারীর আধিপত্য সন্দর্শন করেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সমুদ্রতীরস্থ অধিকাংশ অধিবাসীরা হিন্দু ছিল এবং সুন্দরবন অঞ্চলে বহুজনাকীর্ণ জনপদ সকল বর্ত্তমান ছিল। হয় ত কোনরূপ সংক্রামক-রোগের প্রকোপ অথবা অন্য কোনরূপ দৈব দুর্ঘটনার আয়ত্ত হইয়া তাহারা ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আইন-ঈ-আকবরী পাঠে জানা যায়, ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে একটি প্রবল বন্যার উৎপত্তি হইয়া প্রায় দুই লক্ষ লোক স্রোতোবেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে এই ঝড় ও বৃষ্টির সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করা গেল।† তৎপরে দুর্ভাগ্যের সহচর মহামারীতেও বহুলোক কালকবলিত হইয়া, জনহীনতার মাত্রা বর্দ্ধিত হয়। মিঃ গ্রাণ্ট উল্লিখিত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, এই সকল কারণে, বিশেষতঃ পরিশেষে মগদিগের উৎপাতেই সমুদ্রতীর জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ শেষোক্ত কারণটি প্রথমটির অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ছিল।

তৎসময়ে মগদিগকে এরূপ নরপিশাচ বলিয়া সাধারণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন পল্লীতে প্রবেশ করিলেই, তত্রত্য অধিবাসীরা অন্ত্যস্থানীয় লোকদিগের চক্ষে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। এই কারণে, সন্দীপ ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরবাসী কি শূদ্র কি নরসুন্দরেরা ভিন্ন দেশের হিন্দুর জলস্পর্শ করিতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ মঘে তেলি, মঘে কামার, মঘে কুমার প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে, যাহারা অন্য সম্প্রদায়ের সহিত কোনরূপেও মিশিতে পারে না।

মিঃ বিভারেজ বাখরগঞ্জের ইতিহাসে এবিষয়ের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। তাহা পাঠে অনুমিত হয় যে মঘেরা যদি কখনও সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইত, তথাপি তাহার ফল লোকে কু ব্যতীত সু বলিয়া বিশ্বাস করিত না। সাহেব লিখিয়াছেন, আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরবর্ত্তী রমজানপুরের দাসেরা বলে, তাহাদের একটি স্ত্রীলোক নদীতে স্নান করিতেছিল, সেই সময়ে একজন মঘ নদীতট দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল। মঘকে দেখিয়া ঐ রমণী তাহার দৃষ্টি হইতে আপনাকে অন্তরাল করিবার জন্য জলে ডুব দিল। কিন্তু মঘ বিবেচনা করিল, ঐ মহিলা বুঝি জল নিমগ্ন হইয়াছে! তখন সে দয়ার্দ্রচিত্তে জলে নামিয়া উহাকে তীরে উঠাইয়া লইয়া আসিল। এই ব্যাপারের পরিণামে ঐ স্ত্রীলোকটি তাহার আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং সাধারণে তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া

---

* বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ। অধুনা সাহাবাজপুর উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী পরগণায় পরিণত হইয়াছে। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভোলা সবডিভিসন্ এই পরগণার মধ্যে সংস্থাপিত।

† "বাকলা সরকার সমুদ্রতীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান পাতসাহের (আকবরের) রাজত্বের ঊনবিংশ বৎসরে একদিন অপরাহ্ন তিনটার সময়ে সমুদ্রজল বাড়িতে আরম্ভ হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন জলপ্লাবন হয় যে, সমস্ত বাকলা সরকার জলমগ্ন হইয়া যায়। বাকলার রাজা সেদিন একস্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, সমুদ্রের জল ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, তিনি একখানি নৌকায় আরোহণ করেন। রাজপুত্র কতকগুলি অনুচরসহ একটি উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় আরোহণ করেন। সদাগরগণ যেখানে একটু উচ্চস্থান পাইল, সেইস্থানেই আশ্রয়গ্রহণ করিল। ক্রমাগত পাঁচ ঘণ্টা ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি ও অশনিপাত হইয়াছিল। ঘরবাড়ী সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া স্রোতোবেগে প্রবল বায়ুর প্রকোপে কোথায় চলিয়া গেল! কেবল দেবমন্দির ব্যতীত আর কিছুরই চিহ্ন রহিল না। প্রায় দুইলক্ষ লোক জীবন বিসর্জ্জন করিল।"

'বসুমতী' আফিস হইতে প্রকাশিত আইন-ই-আকবরী।

বিবেচনা করিতে লাগিল। বাস্তবিক তৎকালে মঘেরা যে সকল অসভ্যোচিত উৎপাত করিয়া, সমুদ্রতীরটাকে ছারখার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের শত শত সাধুতায় তাহার একাংশও পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাহাবাজ খাঁর প্রতি প্রথমতঃ এই আততায়ী দস্যুদলের দমন করিবার ভার অর্পিত হয়। সাহাবাজ খাঁ উহাদিগকে একরূপ দেশবিতাড়িত করেন। তখন আর সাহাবাজপুরে সৈন্য রাখা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, বঙ্গীয় ভৌমিকগণের উপর দস্যুদলনের ভারার্পণ করিয়া সম্রাট সাহাবাজকে রাজধানীতে থাকিতে আদেশ করেন। সে সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে বাকলা ও বিক্রমপুরে, দুইটি প্রসিদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কুক্ষণে বারভূঞা দলের সহিত বাদসাহ জাহাঙ্গীরের মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। তাহারা সম্রাটের অবাধ্য হওয়ায় রাজা মানসিংহ আসিয়া তাহাদিগকে উৎসাদিত করেন। এই সুযোগে মঘ ও পর্ত্তুগীজেরা প্রশ্রয় পাইয়া পুনরায় সমুদ্রতীরে উৎপাত আরম্ভ করে। তখন পুনরায় আজিম ওসমানের প্রতি ঐ সকল দস্যুদলনের ভার অর্পিত হয়। আজিম ওস্মান মঘদিগকে বিতাড়িত করেন এবং কতকগুলি পর্ত্তুগীজকে ধৃত করিয়া চট্টগ্রামে ও ঢাকার নিকটবর্ত্তী মুন্সীগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত একটা স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। এই স্থানটি অধুনা "ফিরিঙ্গি বাজার" নামে পরিচিত। আজিও তথায় সেই সকল পর্ত্তুগীজদিগের বংশধরেরা বাস করিতেছে।

তৎপর হইতে ক্রমে একজন প্রধান সেনাপতির অধীনতায় কতকগুলি বাদসাহী সৈন্য মেঘনা নদীর মোহানায় নিয়ত অবস্থান করিয়া, মঘ ও পর্ত্তুগীজদিগের উৎপাত নিবারণ করিত। যখন ঔরংজেব বাদসাহ ভারতবর্ষের প্রায় একচ্ছত্র রাজা বলিয়া পরিচিত হন, তখন এই দস্যুদমনের ভার, হিন্দুসেনাপতি সংগ্রাম সাহের উপর অর্পিত হয়। বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সংগ্রাম সাহাবাজপুরে আগমন করেন। তখন তথায় এমন কোন দুর্গ ছিল না, যাহাতে নিরাপদে সৈন্য রক্ষা করিতে পারা যায়। এই জন্য সংগ্রাম তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর পর্য্যন্ত লোকে তাহাকে "সংগ্রামের কেল্লা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। আলমগীর-নামাতে এই দুর্গের কথা উল্লিখিত আছে। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে উহা নির্ম্মিত হয়। "কলিকাতা রিভিউ র ৫৩ ভল্যুমের ৭৩ পৃষ্ঠায় 'চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি' শীর্ষক প্রস্তাবে এই দুর্গ এবং সংগ্রামের প্রতিষ্ঠিত আরও দুইটি দুর্গের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। মিঃ বিভারেজ তাঁহার বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ৪২ পৃষ্ঠায় এই কেল্লা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"প্রফেসার ব্লক ডিব্‌লন এবং রাঙ্গার কৃত একখানা ক্ষুদ্র ম্যাপ আছে, তাহা (১৭২৪—২৬খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত) ফ্রাঙ্কনবেলটাইন্ কৃত পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, বাকলা একটা দ্বীপ মাত্র ছিল। সংক্রোণের অন্তর্দ্বীপ বলিয়া একটা চিহ্ন ঐ ম্যাপে দৃষ্ট হইত। ঐ চিহ্নিত স্থান দেখিলে অনুমিত হয়, মেহেন্দিগঞ্জের থানায় একটি প্রাচীন মোগলদুর্গ ছিল, তাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।"

আমরা সাহেবের এ কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি; কারণ সাহাবাজপুরনিবাসী অনেক প্রাচীন লোকের নিকট শ্রুত আছি, ঐ পরগণার অন্তর্গত গান্ধিয়া গ্রামের অনতিদূরে ইলিসা নদীর তীরে সংগ্রামের কেল্লা বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানটি মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত। পঞ্চসনার বন্দোবস্তের * কালেক্টরির কাগজ পত্রে সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত গান্ধিয়া গ্রামের যে সীমানির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সংগ্রামের গড়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় † এই কারণে সংক্রোণের অন্তর্দ্বীপ ও সংগ্রামের কেল্লা যে একই স্থান, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ বোধ হয় না। অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হয় নাই, এই প্রাচীন মোগলদুর্গ মেঘনার শাখা ইলিসা নদীর গর্ভস্থ হইয়া, সংগ্রামের নামের একরূপ বিলোপসাধন করিয়াছে।

বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঝালকাঠি থানার অধীন বামনগর গাবখান প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া সংগ্রামনীলের খাল বলিয়া একটা দোনের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ

---

* ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় জমিদারগণের সহিত প্রথম জমিদারি পাঁচসন মিয়াদে বন্দোবস্ত হয়, তাহাকে পঞ্চসনা বলে, পরে দশ বৎসরের জন্য দশসনা বন্দবস্ত হয়।

† জেলা বাখরগঞ্জের কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত ২৭৫০ নং তালুক দুর্গাপ্রসাদ সেনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১২০৪ সনের মৌজা ওয়ারি দেখ।

উহা সংগ্রামসাহ কর্ত্তৃক নিখাত হইয়াছিল। এই জন্য তাহার নামের সহিত ঐ খালের নাম সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে আরও বোধ হয়, সংগ্রাম সাহ একটা উপাধি মাত্র ছিল। নীল শব্দের সহিত অন্য কোনও শব্দ যুক্ত থাকিয়া তাহার নামকে পূর্ণাবয়ব করিত ; যেমন নীলকণ্ঠ বা নীলচন্দ্র প্রভৃতি। পূর্ব্বাপর যেমন অনেকের উপাধিতেই পরিচয় পর্য্যবসিত হইয়াছে, নাম কেহ ততটা পরিজ্ঞাত নহেন, তদ্রূপ সংগ্রাম সাহ এই উপাধিতেই তিনি পরিচিত ছিলেন, তাঁহার সম্পূর্ণ নাম লইবার আবশ্যকতা হয় নাই ; কাজেই নামটি একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

দস্যুদলের অপসারণ করিবার জন্য সংগ্রাম নানা স্থানে গড়বন্দী করিয়া, সৈন্য রক্ষার উপায় করিয়া লইলেন। পরে মঘ ও পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিকূলে সৈন্যপরিচালনা পূর্ব্বক তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এই সময়ে চাঁদরায় নামে বৈদ্য-বংশীয় অপর এক মহাত্মা সংগ্রামের প্রধান সহকারী ছিলেন। সংগ্রাম তাঁহার দ্বারা নানা বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্ত হন। সে যাহা হউক, এই সকল শত্রুদমনের কথা অচিরে সম্রাট্‌ ঔরংজেবের নিকট পৌঁছিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সংগ্রামকে পুরস্কারস্বরূপ ভূষণা, মামুদপুর ও চাঁদরায়কে সাহাবাজপুর পরগণার জমিদারী প্রদান করেন। বাখরগঞ্জের ইতিহাসে লেখক শ্রীযুত খোসালচন্দ্র রায় মহাশয় তৎকৃত ইতিহাসে তত্রত্য প্রাচীন বৈদ্য ভূম্যধিকারিগণের উল্লেখ স্থলে এই চাঁদরায়ের বংশকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস বা সরকারী রিপোর্ট প্রভৃতি পাঠ করিলে, তাঁহার এইরূপ ভ্রম হইত না। উল্লিখিত ঘটনার বহুকাল পরে যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির পঞ্চম রিপোর্ট প্রস্তুত হয়, তখন ১১৩৫ বঙ্গাব্দ হইতে ১১৭০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সাহাবাজপুরের বৈদ্য ভূম্যধিকারী চাঁদরায়ের বংশধর শ্রীরাম রায়ের নাম ব্যতীত আর কোন বৈদ্য-জমিদারের উল্লেখ বাখরগঞ্জের জেলায় দৃষ্ট হয় না। চাঁদরায়ের প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব বিগ্রহ ও তাহার অত্যুচ্চ মঠ আজি পর্য্যন্ত সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মেঃ বিভারেজ কৃত ও খোসালচন্দ্র রায়কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে এই কীর্ত্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের দ্বাদশ জন ভৌমিকের মধ্যে যাঁহারা রাজা মানসিংহের বঙ্গে আগমনের পরেও বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা হইয়াছিল। যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরায়, বিক্রমপুরের কেদার রায়, চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজি কোন মতে বাদসাহকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন না। কাজেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। অনেক ষড়যন্ত্রে ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি কতিপয় কূটবুদ্ধি বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের সহায়তায় মানসিংহ এই সকল বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন। তখন বিদ্রোহী রাজন্যগণের রাজ্য কতক সম্রাটের সরকারে খাস রাখা হইল, এবং উহার কতক অন্য জমিদারের হস্তে ন্যস্ত হইল। খাস অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত মহাল যুদ্ধ ও নৌপোতের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য নাওরা মহাল বলিয়া সরকারি খাস মহালের সামিল করিয়া রাখা হইল। মুকুন্দরায়ের ভূষণা মামুদপুর এইরূপে নাওরা মহালের অন্তর্গত রহিয়া গেল।

ঔরংজেব এই খাস নাওরা ভূষণা মামুদপুর, পুরস্কারস্বরূপ সংগ্রামকে প্রদান করেন। সংগ্রাম তথায় এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। আমরা অতঃপর সংগ্রামের পারিবারিক ও জাতীয় মর্য্যাদা সম্বন্ধে কতকগুলি কথার অবতারণা করিয়া তৎপরে তাঁহার প্রধানতম বীরত্বের ও সম্মানের বিষয় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত বর্ণনা করিতে হইলে, অগ্রে তাহার জাতি, বাসস্থান ও বংশাদির বিষয় উল্লেখ করাই রীতিসঙ্গত। কিন্তু আমরা সংগ্রাম সম্বন্ধে ঐ সকল বিবরণের যাথার্থ্য প্রমাণের ভার স্বীয় স্কন্ধে লইতে ইচ্ছুক নহি। কারণ, যাহা প্রকৃতির অসীম চিরতমসে সমাবৃত রহিয়াছে, যাহা অম্বুধির অতল জলে নিমজ্জিত, অথবা যাহা হিমাদ্রির উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াও পাইবার উপায় নাই, তাহা খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবে তদীয় জীবনের ঘটনা-পরম্পরা আলোচনা দ্বারা যতদূর বুঝিবার উপায় আছে, তাহাই এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারিবে।

আমাদের দেশে এইরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে যে, সংগ্রাম বঙ্গদেশে আগমন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

ব্রাহ্মণের নিম্নেই এদেশে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়? তদুত্তরে নাকি এইরূপ জানিতে পান যে, "বৈদ্য জাতিই ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ জাতি"; তখন তিনি আপনাকে "হাম বৈদ্য" বলিয়া পরিচিত করেন। এস্থলে কেহ কেহ বলেন, যখন এই কথা জিজ্ঞাসিত হয়, তখন কোন বৈদ্য উপস্থিত না থাকায়, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা, এই আপদটা বৈদ্যের উপর চালাইয়া দিবার জন্যই এই কূটনীতির অবতারণা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই কথার কোনও মূল্য নাই। কারণ যে কোন সময়েরই ইতিবৃত্ত পাঠ করা যাউক না কেন, তাহাতেই দেখা যায়, কোন রাজকার্য্য উপলক্ষে বঙ্গের কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, কি কায়স্থ, কেহই কখনও প্রতিযোগিতায় ন্যূন ছিলেন না। তবে বৈদ্যজাতীয়গণের অপর দুইটি জাতি অপেক্ষা সংখ্যার ন্যূনতা ছিল। সংগ্রাম যখন এদেশে আসিয়া, একটা প্রধান রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নিকটে যে দুই চারিটি বৈদ্য ছিল না, একথা কোন মতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। বৈদ্যবংশীয় চাঁদরায় যে তাঁহার চিরসহায় ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে, সংগ্রামের পিতৃ-পিতামহাদির পরিচয় পাইবার উপায় নাই কেন? তদুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, আমাদের কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টিই উহার প্রথম অন্তরায়; দ্বিতীয়তঃ কুলজীলেখকগণের নিগ্রহটাই উহার প্রধান কারণ। প্রস্তাবান্তরে বলিয়া গিয়াছি যে, আমাদের দেশে যাঁহারা কুলীনের সন্তান নহেন, তাঁহারা যেন ইহজগতেরও কেহ নহেন। তাঁহারা সজীব হইয়াও নির্জীব, বিদ্বান হইয়াও মূর্খ, আবার অন্যদিকে কুলীনের অসাধুনন্দনও কুলতিলক বলিয়া কতই না পূজনীয় ও সম্মাননীয় হন, এই জন্য মহাত্মা চক্রপাণি দত্ত, মাধবকর, বাভটগুপ্ত ও ত্রিলোচন দাস প্রভৃতি মহাত্মগণের বংশাবলী বা কুলকাহিনী বিবৃত হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করে নাই। অথচ কতকগুলি শুষ্কনামমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া কুলজীলেখকেরা কতই বাহাদুরী লইয়া গিয়াছেন। আমি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর * প্রবন্ধে লিখিয়াছি, বৈদ্যবংশের মধ্যে সিদ্ধ ও সাধ্য দুইটি থাক আছে। এতদ্ভিন্ন কষ্ট বলিয়াও নিম্নশ্রেণীর বৈদ্যের একটা থাক দৃষ্ট হয়। কুলপঞ্জিকালেখকেরা মাত্র সিদ্ধবংশ মধ্যে যাহারা কুলীন, কুলজ ও মৌলিক, তাঁহাদেরই বংশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এমন কি সিদ্ধবংশ মধ্যে যাহারা কার্য্যদোষে সাধ্যবৎভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের বংশাবলীরও উল্লেখ করা হয় নাই। সংগ্রাম সাহ, সালঙ্কায়ন গোত্রসম্ভূত ছিলেন, কষ্ট সাধ্য বংশ বলিয়া, তাঁহার বংশাবলী কোন কুলজী গ্রন্থেই খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। তবে সিদ্ধবংশের সহিত আদান প্রদান থাকায়, তদ্বংশের কার্য্যকলাপের উল্লেখ স্থলে, তাহার ও তদ্বংশীয় কোন কোন ব্যক্তির নাম মাত্র কুলজী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

কুলজীর শ্লোকাবলী পাঠ করিয়া যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে এই বোধ হয়, উচ্চ শ্রেণীর বৈদ্যগণের সহিত সাধ্যবৈদ্যগণ যখনই আদান প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই একটা বড় গোছের গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। নাগকন্যা গ্রহণ করিয়া ধন্বন্তরি সেন, দত্ত কন্যা গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মণ সেন, করকন্যা গ্রহণ করিয়া দুহি সেনের পিতা পুণ্ডরীকাক্ষ সেন এবং বিষ্ণুদাস প্রভৃতি যদি বা মার্জ্জিত হইয়াছিলেন কিন্তু অনেক সিদ্ধ বংশীয়দিগকে এই কারণে সাধ্যবদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল।

প্রবাদ বাক্যে এবং কুলজী পাঠে অবগত হওয়া যায়, সালঙ্কায়ন গোত্রীয় সংগ্রাম সাহ, সিদ্ধবংশীয় বৈদ্যগণসহ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলে, তাঁহার জাতি লইয়াই প্রথমে গোলযোগ উপস্থিত হয়। অনেক কার্য্য বলপূর্ব্বক হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎসম্পর্কিত মহাশয়েরা বহুকাল পর্য্যন্ত সমাজে আবদ্ধ ছিলেন। এখন সেরপুর, তুলসী ঘাট কি ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থ বৈদ্যগণের সহিত বঙ্গীয় বৈদ্যেরা কার্য্য করিতে গেলে, যেমন সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া যায়, তখনও তদ্রূপ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়া, বৈদ্যসমাজটাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই গোলযোগের প্রথম সূত্রপাত ভূষণা মামুদপুরের নিকটস্থ বাণীবহ, কালিয়া ও মামুদপুর প্রভৃতি স্থানেই উপস্থিত হয়। সংগ্রাম বাণীবহগ্রামবাসী শক্তিমাধব-

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৬ সন ২য় ও ৩য় সংখ্যা দেখ।

বংশীয় সদাশিব সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন * এবং তৎপুত্র রাধাকান্ত ধন্বন্তরি আদিত্যবংশীয় কাশীনাথ সেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ছয়টি কন্যা ক্রমে ধন্বন্তরি উচলি বিশ্বনাথ সেনের সহিত ও উচ'লি রঘুনাথ সেনের সহিত, আদিত্য রঘুনাথ সেনের সহিত ও বিকর্ত্তন রামচন্দ্রের সহিত ও শক্তি্ গণবংশীয় দুর্গাদাস্ সেনের সহিত ও আত্মগোত্রীয় রঘুনাথ মজুমদারের সহিত পরিণীতা হয়। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক শেষটির মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন †। অপর কয়েকটি সম্বন্ধের বিষয়ে রামকান্ত কবিকণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সংগ্রাম সম্ভবতঃ বঙ্গজ সমাজের সহিত আদান প্রদান আরম্ভ করিয়া পরিশেষে রাঢ়ীয় সম্প্রদায়ের সহিতও কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই কারণে ভরত মল্লিক কৃত গ্রন্থে, মাত্র একটি কার্য্যের উল্লেখ আছে। সংগ্রাম সাহ, কেবল অর্থব্যয়ে কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে না পারিয়া অনেক স্থলে বলপ্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। ধন্বন্তরি উচলিবংশীয় বিজয় সেনের অধস্তন চতুর্থ স্থানীয় রামচন্দ্র সেন বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের সমাজপতি পদে বরিত ছিলেন। অবশ্য তাঁহার ধনবল ও কুলকার্য্য-পরায়ণতা না থাকিলে, তিনি কথনও এতাদৃশ উচ্চ সম্মান পাইতে পারেন নাই। সংগ্রামের এইরূপ উচ্চপদস্থ সম্মাননীয় ঘরে কার্য্য করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ধন বা জমি জমা প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়াও তিনি তাঁহাদিগকে কোন মতে বাধ্য করিতে পারেন না। তথন বলপ্রকাশে রামচন্দ্রের পৌত্র রঘুনাথকে ধৃত করিয়া আনিয়া আপনার এক তনয়ার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কবিকণ্ঠহার কৃত গ্রন্থে উহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

"দুর্দ্দৈবাশনি-সম্পাতাদ্রঘুনাথো যুবা মৃতঃ।
সংগ্রামসাহতনয়া পাণিগ্রহণ পীড়িত॥"

ইহাতে বুঝা গেল, সংগ্রাম সাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া রঘুনাথ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, ধন্বন্তরি আদিত্যবংশ হইতেও এইরূপ আর একটি বালক ধৃত হইয়া, ভূষণাতে প্রেরিত হয়। কিন্তু বালক সংগ্রামের কন্যা বিবাহ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর বিবেচনায় নদীজলে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই সময়ে এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, সংগ্রামের কুটুম্বগণেরও সহিত যাহারা আদান প্রদান করিতে লাগিল, তাহারা পর্য্যন্ত সমাজচ্যুত হইয়া পড়িল। রাজদোষ বলিয়া বৈদ্যসমাজে যাহারা ন্যূনভাবাপন্ন হয়, এই সংগ্রামের এবং তৎসংসৃষ্ট লোকের সংস্রবই তাহার মূল কারণ। প্রায় দুই পুরুষ পরে এই গোলযোগ নিরাকৃত হয়।

এইরূপ শালঙ্কায়ন গোত্রীয় অনেকের কার্য্য কলাপের পরিচয় কুলপঞ্জিকা পাঠে অবগত হওয়া যায়। শালঙ্কায়ন বংশ আজিও বাথরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নলচিরা, কোটালিপাড়া এবং বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। কিন্তু পরে আর তাহাদিগের আদান প্রদান জন্য ততটা কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। শালঙ্কায়ন গোত্র, বৈদ্যের চতুর্ব্বিংশতি গোত্রের অন্তর্গত। সংগ্রাম এই শালঙ্কায়ন গোত্রীয় ছিলেন, যদি তাহা না হইত, তবে সাধারণতঃ লোকে "হারাইয়া তাড়াইয়া কাশ্যপ গোত্র" এইরূপ যে একটা কথার উল্লেখ করিয়া থাকে, সংগ্রাম সেই ভাবে আপনাকে কশ্যপ বা মৌদ্গল্য প্রভৃতি একটা সিদ্ধবংশের পরিচয় দিয়া সমাজে কতকটা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিতে পারিতেন। কারণ মৌদ্গল্য ও শালঙ্কায়ন এই উভয় গোত্রের উপাধিতেই দাস শব্দ লিখিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মহোদয়গণের মধ্যে যে এইরূপ দুই চারিটা প্রসঙ্গ শ্রুত হওয়া না যায়, এমত নহে। সংগ্রাম হয় ত বাল্যকালাবধি হিন্দুস্থানে থাকিয়া লেখা পড়া অভ্যাস করিয়াছিলেন। বহুকাল বিদেশে থাকা নিবন্ধন দেশীয় রীতি নীতি ততটা পরিজ্ঞাত ছিলেন না এবং হিন্দী ব্যতীত বাঙ্গলা বলিতে পারিতেন না। এখনও দেখা যায়, অনেক বঙ্গসন্তান বহুকাল বিলাতে অবস্থান করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলিতে সমর্থ হন না।

---

* সদাশিবের পুত্র গোপীরমা সেন তৎপুত্র মাধব রায় ও জগদানন্দ রায়। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোয়রপুর গ্রামে মাধবের বংশ এবং বাশীবহ গ্রামে জগদানন্দের বংশ বাস করিতেছে। কণ্ঠহার কৃত কুলপঞ্জিকা। ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

"রঘুনাথ মজুমদার রতিনাথ বিধানকৌ।
চত্বারো রঘুনাথস্য তনয়াং বিনয়ান্বিতাঃ।
রামকৃষ্ণো রামভদ্রো রমাকান্তস্তৃতীয়কঃ।
গঙ্গারামোঽনুজঃ সর্ব্বে মজুমদার ইতিশ্রুতাঃ।
ভূষণা রাজসংগ্রাম সাহাখ্যকস্য কোত্তমাঃ॥

চন্দ্রপ্রভা ২৪৯ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয়তঃ রাজসরকারে নিয়ত কার্য্য করিয়া তিনি পদোন্নতির সহিত সংগ্রাম সাহ উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার নীল শব্দের সহিত অন্য শব্দ যোগে যে পূর্ণ নাম ছিল, তাহা সাধারণে অবগত ছিল না। যেমন 'জঙ্গ বাহাদুর' নেপালের প্রধান সেনাপতির উপাধি মাত্র কিন্তু তিনি সাধারণের নিকট উক্ত নামেই পরিচিত, তাঁহার প্রকৃত নাম অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন।

কবিকণ্ঠহার কৃত কুলপঞ্জিকা ১৫৭৫ শকে বিরচিত হয়, যথা—

"পঞ্চসপ্ততিথৌ শাকে নমোঽস্তু শূলপাণয়ে।
সমাপ্তোঽয়ং কুলগ্রন্থো জগতাং শুভমস্তু চ॥"

অতএব দেখা গেল, ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে বা ১৭১০ সংবতে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হয়। এই সময়ে কবিকণ্ঠহার ও সংগ্রাম উভয়েই বর্ত্তমান ছিলেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে সংগ্রাম সাহাবাজপুরে স্বীয় নামে গড়বন্দী করেন। এতদ্দৃষ্টে বোধ হয়, এই গড়বন্দী হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, তিনি উচ্চ বৈদ্যগণের সহিত কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রয়াস পান। আমরা আবার এই সংগ্রামকেই ১৬৮৪ খৃঃ অব্দে পরিণত বয়সে রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে মারওয়াড় প্রদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই। তখন ঔরংজেব বাদসাহ দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। এতদ্বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

যোধপুরাধিপতি রাজা যশোবন্তসিংহ, ঔরংজেবের একজন বিখ্যাত সেনানায়ক ছিলেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে বহুদেশ ও জনপদ অধিকার করিয়া বাদসাহের প্রভুত্ব তথায় সংস্থাপিত করেন। সমগ্র বীরসমাজে তাঁহার সুযশের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু এরূপ দুরূহ কার্য্য সম্পাদনের জন্য কোথায় সম্রাট তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন, না তৎপরিবর্ত্তে যশোবন্তের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য তিনি কূট মন্ত্রণায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। যেখানে রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলা, ও শত্রুসঙ্কুল, সেই স্থানই যশোবন্তের জন্য ব্যবস্থিত হইতে লাগিল। বাদসাহের রাজত্ব মধ্যে কাবুলের তুল্য দুর্গম স্থান, আর কোথায়ও ছিল না। বাদসাহের আদেশে যশোবন্ত তথাকার শাসনকর্ত্তা হইয়া চলিলেন। ঔরংজেব যশোবন্তের জ্যেষ্ঠপুত্রকে বড়ই ভাল বাসার ভাণ দেখাইয়া আপনার সন্নিকটে রাখিলেন। কোথায় রাজপুত্র বাদসাহের প্রিয়পাত্র হইয়া সুনাম ও যশোরাজি অর্জ্জন করিবেন, না তদ্বিপরীত ঘটনা সংঘটিত হইয়া উহাকে সমূলে বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। একদা বাদসাহ পুরস্কারস্বরূপ যশোবন্তের পুত্রকে একটি অঙ্গাবরণ প্রদান করেন। মহাহৃষ্টচিত্তে সম্রাটদত্ত পুরস্কার গ্রহণ করিয়া তিনি উহা গাত্রে সন্নিবেশ করিলেন। অমনি যেন শত শত বৃশ্চিকে তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। রাজপুত্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অচৈতন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইলেন। সম্রাট প্রদত্ত বিষময়পরিচ্ছদে তাঁহার প্রাণবায়ু অচিরে বহির্গত হইল। রাজা যশোবন্ত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, পুত্রশোকে আর অধিক দিন জীবনধারণ করিলেন না, তাঁহার আত্মাও প্রিয়-পুত্রের আত্মার অনুসরণ করিল।

তৎপরে বাদসাহ যশোবন্তের প্রধান সেনানায়কগণকে প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার শিশুপুত্র অজিতসিংহকে হস্তগত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুভক্ত রাজপুতেরা তাহাতে কোন মতে সম্মত হইল না। পরে বাদসাহ তাহাদের সমবেত দল ধৃত করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও কোনরূপ ফল দর্শিল না। রাজপুতেরা আপন প্রভুর শিশুপুত্র ও বণিতাগণকে মারবাড়ে লইয়া গেল। খল স্বভাব সম্রাট তখন যোধপুর উচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে কতিপয় সুদক্ষ সেনাপতির সহিত আপন পুত্র আকবরকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তাহারা যোধপুরের রাজপুতগণকে পরাস্ত করা দূরে থাকুক, বরং তথাকার রাজপ্রতিনিধি দুর্গাদাসের সমরকৌশলে পরাস্ত হইয়া, সেই রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। আকবরের একটি রূপলাবণ্যবতী কুমারী রাজপুতদিগের হস্তে বন্দী হইল। অচিরে এই সংবাদ ঔরংজেবের নিকট পৌঁছিলে, পরাজয়ের জন্য তিনি যতদূর বিচলিত না হইলেন, পৌত্রী রাজপুতদিগের হস্তগত হইয়াছে এই সংবাদে তাহার মন তদপেক্ষা অস্থির হইয়া উঠিল। তখন একটা সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিয়া বিবাদের মীমাংসা করিয়া ফেলাই তিনি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। অচিরে সন্ধির প্রস্তাব রাঠোড়দিগের নিকট প্রেরিত হইল, তাহারা

উহাতে সম্মত হইল। রাঠোড়েরা ত আর সাধ করিয়া বিবাদ করিতে বসে নাই, তাহারা কেবল আত্মরক্ষা-কল্পেই অসি ধারণ করিয়াছিল। এখন সম্রাটের প্রস্তাব তাহারা সাদরে গ্রহণ করিয়া বাদসাহের পৌত্রীকে তৎকরে সমর্পণ করিল। এই ব্যাপারে সম্রাট যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন এবং কিছু দিনের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহের আর কোন আয়োজন বা চেষ্টা রহিল না।

খলের মন কখনও পরানিষ্ট চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে পারে না। রাঠোড়বাহিনীর শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় যতই বাদসাহের মনে উদিত হইতে লাগিল, ততই তিনি অধিকতর চিন্তিত হইতে লাগিলেন। যশোবন্তের বংশের বিলোপসাধন যেন তাঁহার এক মাত্র সঙ্কল্প হইয়া দাড়াইল। কেবল পৌত্রীর মোচনের জন্যই তিনি পূর্ব্বে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখন আর কোন আশঙ্কা নাই মনে করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর বাহিনীর সহিত কতিপয় প্রধান সেনাপতিকে যোধপুর আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে সংগ্রাম সাহ একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনানায়ক ছিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে বিবিধ যুদ্ধে বাদসাহের পক্ষে জয়লাভ করিয়া, বিশেষতঃ মঘ ও পর্ত্তুগীজদিগকে বিতাড়িত করিয়া, সংগ্রাম মধ্যবাঙ্গালায় কতকগুলি ভূবৃত্তি পান এবং সম্রাট তাঁহাকে মনসবদারের সম্মানীয় পদে বরণ করিয়াছিলেন। এখন সেই বয়োবৃদ্ধ সেনাপতিকে যোধপুর উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইল। সংগ্রাম যোধপুরে পৌছিয়া কয়েকটি যুদ্ধ করিলেন, বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইল, যোধপুরের বীরপুত্রেরা প্রমাদ গণিয়া যুদ্ধ করিয়াও যোধপুর রক্ষার আর কোন উপায় করিতে পারিল না। তখন তাহারা সেনাপতি সংগ্রামের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া প্রধান ভাট কবিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। মহাত্মা টড্ সাহেব তাঁহার রাজস্থান ইতিহাসের দ্বিতীয় ভল্যুমের ৬১ পৃষ্ঠায় এতৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বাবু তাহার যে সুন্দর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কতিপয় পংক্তি এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"সংবৎ ১৭৪১ অব্দের প্রারম্ভ কালে কি যুদ্ধ, কি বিভীষিকা, কিছুই শান্তি হইল না। সুজনসিংহ রাঠোড় সেনা লইয়া দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন। এদিকে লাক্ষ্য-চম্পাবত, কেশর কুম্পাবত, ভট্টি ও চৌহানদেব সৈন্যদের সাহায্যে যোধপুরস্থ যবন সেনাদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। সুজনসিংহ হত হইলে ভট্ট কবি সেনাপতি সংগ্রামের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন করিল,—আপনি স্বজাতীয় ভ্রাতৃদলে মিলিত হউন। সংগ্রাম তখন মনসবদার পদে অভিষিক্ত থাকিয়া ভূসম্পত্তি সম্ভোগ করিতেছিলেন।"

(বঙ্গবাসী প্রেস রাজস্থান ২য় খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।)

সংগ্রামও হিন্দু ছিলেন, সুতরাং হিন্দুদিগের দুর্গতি দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অচিরে রাঠোড় দলের সহিত তিনি সন্ধি করিলেন, এবং সম্রাটের সর্ব্ববাদিসম্মত প্রভুত্ব রাঠোরদিগকে স্বীকার করাইয়া, তথা হইতে সসৈন্যে চলিয়া আসিলেন। এতৎসম্বন্ধে টড্ সাহেব, তাঁহার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভল্যুমের ৬২ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহারও অনুবাদ নিম্নে প্রদান করা গেল। "সংগ্রাম যে কোন্ কুলসম্ভূত এবং কিরূপ উচ্চপদারূঢ় ছিলেন, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলাম না। তবে তাঁহার হৃদয় যেরূপ উচ্চ ছিল, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি কোন মহদবংশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।" মহাত্মা টড্ স্বীকার করিয়াছেন, সংগ্রাম ঔরংজেব বাদসাহের প্রধান সেনাপতি ও এক-জন মনসবদার ছিলেন। এই সময়ে আলিবর্দ্দিখাঁকেও একজন সেনাপতি ও মনসবদার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। পরে তিনি সৌভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালার নবাবী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একই সময়ে সংগ্রাম ও আলিবর্দ্দি, একই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সংগ্রাম যে কতকগুলি ভূবৃত্তি ভোগ করিতেছিলেন, তাহাও টড্ উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু তিনি সংগ্রামকে যতটা চিনিতে পারিয়াছিলেন আমরা তদপেক্ষা কিছু বেশী জানিয়া শুনিয়া সংগ্রামের পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এখন দেখা উচিত, কবিকণ্ঠহার ভরত মল্লিক-প্রোক্ত সংগ্রাম আর সাহাবাজপুরের কেল্লা সংস্থাপক ও রাঠোড়-বিজয়ী সংগ্রাম, একই ব্যক্তি কি না। কবিকণ্ঠহার ১৫৭৫ শকে অর্থাৎ ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে বা ১৭১০ সংবতে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপর ভরত মল্লিক চন্দ্রপ্রভা নাম্নী কুলপঞ্জিকা

প্রণয়ন করিয়াছিলেন, উহা কণ্ঠহারের গ্রন্থের ২২ বৎসর পরে বিরচিত হয়। কিন্তু উভয় গ্রন্থেই সংগ্রামের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কণ্ঠহার যখন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন সংগ্রাম সাহের পুত্র পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুরকুলের পরিচয় অনুসারে বোধ হয়, সংগ্রাম ও তৎপুত্র রাধাকান্ত এবং কবিকণ্ঠহার একসময়ের লোক ছিলেন। তৎপর ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে সাহাবাজপুরে, সংগ্রাম, স্বনামে গড়বন্দী করেন। আলমগির-নামাতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তৎপর ১৬৮৪ খৃঃ অব্দে সংগ্রামকে রাজস্থানের অন্তর্গত মারবাড় প্রদেশে রাঠোড়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখা যায়।

১৬৫৩ হইতে ১৬৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় একত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপে আমরা বঙ্গদেশে ও রাজপুতনায় সংগ্রামকে দেখিতে পাই। আবার এই সুদীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত ঔরংজেব বাদসাহই দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছিলেন। মোগল রাজবংশ মধ্যে ঔরংজেব যত দীর্ঘকাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, সেরূপ আর কেহই পারেন নাই। এই সম্রাটের অধীনে থাকিয়া যে একই সংগ্রাম বিভিন্ন স্থানে নানা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সম্রাট মধ্য-বাঙ্গালার ভূষণা মামুদপুর প্রভৃতি স্থান তাঁহাকে জায়গীর অর্পণ করেন এবং কালিয়াতেও তাঁহার একটা জায়গীর ছিল, যাহা আজিও 'নাওরা' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

ভূষণা পরগণার অন্তর্গত মথুরাপুর নামক স্থানে তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানটি অধুনা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোঁড়কদি ও মধুখালি স্থানদ্বয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। কোঁড়কদির মাননীয় ভট্টাচার্য্য বংশের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার গুরু ছিলেন। অদ্যাপি তৎপ্রদত্ত কতিপয় ভূবৃত্তির লিখন উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের নিকট বর্ত্তমান আছে। মথুরাপুর গ্রামে আজিও একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভ দৃষ্ট হয়, যাহাকে সাধারণে সংগ্রামের দেউল বলিয়া থাকে। সংগ্রাম ও তদ্বংশীয়গণের পর ভূষণা, রাজা সীতারাম রায়ের হস্তগত হয়। সীতারাম রায় বিদ্রোহী হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎপরে ধৃত হইয়া নিহত হন। এই সময় ভূষণার জমিদারী; নাটোররাজ রঘুনন্দনের হস্তগত হয়। নাটোর রাজবংশের বিখ্যাতনামা রাণী ভবানীর সময়ে ভূষণাবাসী কোন ব্রাহ্মণের বৃত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তখন ঐ ব্রাহ্মণ রাণীর নিকট যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে ভূষণার পূর্ব্বস্বামী সংগ্রাম ও সীতারাম রায়ের নামের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমরা প্রয়োজন বোধে, ঐ আবেদন পত্র হইতে একটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পূর্ব্বৈঃ সংগ্রাম সাহা-নৃপতি প্রভৃতিভিঃ পালিতা ভূষণা যা,
সীতারামেণ পশ্চাত্তদনু রসবতী রামকান্তেন চোঢ়া*
সা চেদানীং সপত্নীকরযুগলগতা স্বামিহীনা বিরূপা,
কেষাং বা নানুগাসৌ নচ ভবতি কথং কেন বা নানুদম্যা॥"

এখন নিঃসংশয়ের সহিত বলা যাইতে পারে, ভূষণারাজ, সাহাবাদপুরের কেল্লার সংস্থাপক ও রাঠোড়বিজয়ী সংগ্রাম একই ব্যক্তিই। সম্রাট্ ঔরংজেবের অধীনে থাকিয়াই আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যখন সংগ্রাম আপনাকে বাঙ্গালী বৈশ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং বঙ্গীয় সমাজের সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন তাঁহাকে আমাদের বাঙ্গালী বলিয়া গ্রহণ করিয়াই ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

* রাণী ভবানী নাটোররাজ রামকান্তের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। রামকান্তই ভূষণাধিপতি ছিলেন, তদন্তরে রাণী ভবানীর হস্তগত হয়; এইজন্য কবি ভূষণাকে "সপত্নী-করযুগলগতা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কার্য্যমূলক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি।

Heaven helps those who help themselves—যাহারা নিজের সাহায্য করেন, ঈশ্বর তাঁদের সহায় হয়েন—এই প্রবাদ বাক্যটি মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফল। মানবজীবনে আত্মসাহায্যের ইচ্ছাই ব্যক্তিগত চরিত্রের মূলস্বরূপ। ঐ মূল অনেক লোকের প্রকৃতিতে প্রোথিত হ'লেই জাতীয় বল ও শক্তির উৎপন্ন হয়। ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতীয় জীবনেও ভিতরের সাহায্য যত উপকারী ও ফলদায়ী, বাহিরের সাহায্য তেমন নয়। কোন লোক বা জাতি নিজে কষ্ট করিয়া একটি দ্রব্য পাইলে বা কার্য্য সাধিলে তাহার চরিত্র যেরূপ দৃঢ় ও সতেজ

হয়, পরের সাহায্য পাইলে বা সাধিলে সেরূপ হয় না, বরং আরও নিস্তেজ ও অসহায় হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের ইংরাজী শিক্ষার ও বিদ্যালয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই উপরের প্রবাদ বাক্যটির অর্থ অধিক বোধগম্য হইবে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এদেশে বিদ্যাশিক্ষার কি দ্রুত উন্নতিই হইয়াছে! পূর্ব্বে যেখানে একটি গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল, এখন সে স্থলে অন্ততঃ দুই তিনটি ছোট বড় স্কুল উঠিয়াছে—তালপাতা ও খাঁকের কলম ছাড়িয়া ছেলেরা স্লেট পেন্সিল বা পেন কাগজ ধরিয়াছে; শিশুশিক্ষার পরিবর্ত্তে হয় ত ফাষ্ট বুক পড়িতেছে, মাদুর ফেলিয়া বেঞ্চিতে বসিতেছে—তা ছাড়া, ম্যাপ, গোলক, ফুটবল ক্রিকেট—প্রভৃতি বিলাতী বিদ্যালয়গুলির সরঞ্জামের ঢেউ সহর ডিঙ্গাইয়া পল্লিগ্রামে পর্য্যন্ত ঢুকিয়াছে কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতেছেন, সকলে এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার যেরূপ সুফল আশা করিয়াছিলেন, সেরূপ কিছুই হইতেছে না। প্রকৃত শিক্ষার ফলে সে নিরেট ও দৃঢ় মানুষের পরিবর্ত্তে আমাদের চারদিকে কি এক ফাঁপা ও হাল্‌কা চরিত্রের উদয় হইতেছে। বালকেরা স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া কলেজে উঠিতেছে, প্রতি বৎসর কত ছাত্র বি,এ, এম্‌,এ, উপাধি ধরিয়া বাহির হইতেছে—অথচ যে চরিত্রগঠন ও জাতীয় উন্নতি শিক্ষার উদ্দেশ্য, তাহার কিছুই ফলিতেছে না। ইহার কারণ, এই সব বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য আমরা অন্য জাতিদ্বারা বাহির হইতে পাইয়াছি। এই শিক্ষার ইচ্ছা ও আবশ্যকতা যদি অন্তর্জাতীয় হইত, বালকেরা যদি কার্য্যতঃ শিক্ষার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা দ্বারা সুফল ফলিত।

ইউরোপের সর্ব্বত্রও দেখা যায় যে, অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষালয়গুলিও মানুষকে কার্য্যতঃ সাহায্য দিতে পারে না; উহা কেবল ব্যক্তিগত বা জাতীয় চরিত্র-গঠনে পথদর্শকস্বরূপ। বহুদিন হইতে সকলেরই এই ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, উত্তম শিক্ষানীতি বা রাজনীতি দ্বারাই মানুষ পৃথিবীতে সভ্য ও কর্ম্মিষ্ঠ হইতে পারে। কিন্তু উত্তমশিক্ষাপ্রণালী বা নিয়মের দ্বারা যদিও মানুষকে জ্ঞান পথে রাখিবার চেষ্টা করা যায়, এবং উৎকৃষ্ট আইনের সাহায্যে মানুষের জীবন, স্বত্ব ও সম্পত্তি রক্ষা করা হয়, কিন্তু কোনরূপ কঠোর শাসনেই অলসকে পরিশ্রমী, অমিতব্যয়ীকে মিতব্যয়ী ও মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী করিতে পারে না। এইরূপ আমুল উন্নতি কেবল ব্যক্তিগত কার্য্যশক্তি ও স্বার্থত্যাগের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে।

মানব ইতিহাসের সকল কালেই দেখিতে পাই যে, সকল জাতির শাসনরীতি সেই সেই জাতির লোক সমাজের চরিত্রের প্রতিকৃতি মাত্র। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ভালমন্দ জাতীয় চরিত্রের সমষ্টি দ্বারা সেই সেই জাতির আইন কানুন স্থিরীকৃত হয়। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ভাল লোকেরা ভালরূপে, আর মন্দেরা মন্দরূপে শাসিত হইয়া থাকে। ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা ইহারও স্পষ্ট প্রমাণ পাই যে, কোন জাতির বা রাজ্যের শক্তি তাহার শাসন-প্রণালী অপেক্ষা লোক সমাজের চরিত্রের উপরই অধিক নির্ভর করে। এমন কি, মানব জাতির সভ্যতা ও মানব সমাজের স্ত্রীপুরুষ ও ছেলে মেয়েদের আত্মোন্নতি দ্বারাই সাধিত হয়।

জাতীয় অবনতি যেমন ব্যক্তিগত অলসতা, স্বার্থপরতা ও পাপের ফল—জাতীয় উন্নতিও সেইরূপ ব্যক্তিগত পরিশ্রম, কার্য্যক্ষমতা ও সততার সমষ্টিমাত্র। যে সকল সামাজিক কুনীতি দেখিয়া আমরা মনস্তাপ পাই, তাহাও অধিকাংশ স্থলে মানুষেরই কলুষিত ও অকর্ম্মণ্য জীবনের শাখা প্রশাখা। অনেকে আইনের দ্বারা উহা কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা পাইতেছেন বটে, কিন্তু যতদিন না মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র ও অবস্থা আমূল বিশুদ্ধ ও উন্নত হয়, তত দিন উহা কোন না কোন প্রকারে বাড়িতে থাকিবে। গত ডিসেম্বর মাসে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন কালে—উহাতে রাজনীতির সঙ্গে সামাজিক বিষয়েরও আন্দোলন হইবে পড়িয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলাম। যে সকল স্বদেশহিতৈষী ভ্রাতারা ঐ মহৎকার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা যদি অল্প সময়ও দেশীয় লোকদিগকে কার্য্যমূলক জ্ঞান ও আত্মোন্নতির শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উদারতা অধিকতর উচ্চ, স্বদেশপ্রেম অধিকতর গভীর ও তাঁহাদের সাধু চেষ্টা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে।

মানুষ নিজেকে ভিতর হইতে যেরূপে শাসন করে তাহারই উপর ব্যক্তিগত সুখ ও শান্তি যত নির্ভর করে, বাহিরের শাসনের উপর ততদূর করে না। মানুষের পক্ষে নৈতিক অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও পাপাভ্যাসের দাস হওয়া যেরূপ ঘৃণাকর ও দুঃখজনক, যথেচ্ছাচার রাজার অধীনে ক্রীতদাস হওয়াও সেরূপ নয়। যে ব্যক্তি হৃদয়ে দাসত্ব ধারণ করে, রাজা বা শাসন নীতির পরিবর্ত্তনে সে কখন স্বাধীন হইতে পারে না।

সকল সভ্যজাতিই বহু শতাব্দীর চিন্তাশীল ও কর্ম্মিষ্ঠ লোকের দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। জীবনের সকল অবস্থাতেই অধ্যবসায়সম্পন্ন ব্যক্তিরা—সামান্য কৃষক হইতে অভিজ্ঞ দার্শনিক পর্য্যন্ত—সকল প্রকার শ্রমশীল ও কার্য্যকারী মানুষই জাতীয় উন্নতির ভিত্তি গাথিয়া থাকে। এক পুরুষের অবসানে আর এক পুরুষ—আর এক বংশ আসিয়া ঐ গুরু কাজ সম্পাদনে অগ্রসর হয়। এইরূপে নিরন্তর শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীদিগের কার্য্যমূলক জ্ঞানের দ্বারা সকল জাতির বিদ্যা, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে নিয়ম ও পারম্য স্থাপিত হয়।

এই কার্য্যতঃ শিক্ষাদ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা ইংরাজ জাতির ব্যক্তিগত চরিত্রে যেরূপ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়, সেরূপ অতি অল্প জাতির মধ্যেই দেখা যায়। উহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই সাধারণ ও সামান্য শ্রেণীর ভিতর হইতে চিন্তাশীল ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তির উৎপত্তি হইতেছে। প্রতিদিন গৃহে, দোকানে, রাস্তায় ও কারখানায় মানুষ যে কার্য্যতঃ শিক্ষা পায়, তাহাই আত্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায়। সকল জাতির এইরূপ কার্য্যতঃ শিক্ষাকেই জর্ম্মণ পণ্ডিত শিলর মানবজাতির প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া গিয়াছেন। কার্য্য, সদাচার ও আত্মসংযমের দ্বারাই মানুষ প্রকৃতরূপে শিক্ষিত হইতে পারে—উহাই মানুষকে জীবনের সকল কর্ত্তব্য প্রকৃষ্টরূপে সাধনের জন্য প্রস্তুত করে। যাবতীয় মহৎ চরিত্রের আখ্যায়িকা পড়িয়াও আমরা এই জ্ঞান শিক্ষা পাই যে, মানব জীবন—অধ্যয়ন অপেক্ষা অনুশীলন দ্বারা, সাহিত্য অপেক্ষা আদর্শ দ্বারা, জীবনী অপেক্ষা চরিত্র দেখিয়া অধিক কার্য্যমূলক জ্ঞানলাভ করে। আর ঐরূপ অভিজ্ঞ লোক সমাজের সমষ্টিতেই মানব জাতি ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে থাকে।

জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণের যেরূপ প্রভাব, মনের উপর কার্য্যমূলক জ্ঞানের সেইরূপ প্রভুত্ব দেখা যায়। উহা মানব জীবনের সমস্ত অংশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখে। আমরা কে, কোথায় আছি, আমাদের শক্তি কতদূর, আমরা কি কাজ করিতে সমর্থ—এই সব গুরু বিষয়ে উহাই আমাদের মনকে সর্ব্বদা চিন্তাশীল রাখে। উহাই আমাদিগকে সুখময় কার্য্যের ন্যায় নিরানন্দ কর্ত্তব্যের দিকেও অগ্রসর করে। উহা আমাদিগকে গতানুশোচনা বা মনস্তাপের দ্বারা কার্য্যশক্তি বৃথা নষ্ট করিতে দেয় না। যদি আমরা একবার কোন কাজে বিফলকাম হই, তাহা হইলে উহাই আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ অধিক সতর্কতার সহিত আবার সেই কাজ সাধিতে শিক্ষা দেয়।

অনেকে মনে করেন, কল্পনাপ্রিয় লোকের মধ্যেই এই কার্য্যমূলক জ্ঞানের অভাব দেখা যায়। অবশ্য, অতিরিক্ত কল্পনার মুগ্ধ ভাবুকদের পক্ষে এ কথা সত্য হইতে পারে। কেন না, শরীরের ন্যায় মনেরও কখন কখন কেবল একটি অংশেরই বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। বামনদিগের বৃহদাকার হাত, পা ও মাথা তাহাদের দীর্ঘতা গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু কেহ যদি ভাবেন যে, কল্পনাশক্তির সহিত কার্য্যমূলক জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা হইলে সময়ে তিনি স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। কেননা, আমরা সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাই, যাঁহারা মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই কল্পনাশক্তি প্রবল ছিল।

বেকন বলিয়াছেন এই মানব জীবনের নাটকের মধ্যে কেবল ঈশ্বর ও স্বর্গের দূতেরা দর্শক হইবেন, চিন্তাশক্তি ও কার্য্যশক্তির সর্ব্বদাই মিল থাকিবে। শনি ও বৃহস্পতি—এই দুটি প্রকাণ্ড গ্রহের যোগের ন্যায় বিশ্রাম ও পরিশ্রমের, চিন্তা ও কার্য্যের দৃঢ় যোগ থাকিবে। এইরূপ মিলনই কার্য্যমূলক জ্ঞানের উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডের অনেক প্রসিদ্ধ লোকের জীবনে আমরা এইরূপ কার্য্য ও কল্পনার যোগের স্পষ্ট প্রমাণ পাই। কার্য্যমূলক জ্ঞানের দ্বারাই অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকও উৎকৃষ্ট কাজ সাধন করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই সব কর্ম্মিষ্ঠ বিখ্যাত

ইংরাজদের মধ্যে আমরা সূতার কলের আবিষ্কারক স্যর রিচার্ড অকরাইট, চিফ জষ্টিস লর্ড টেণ্ডরডেন্ ও চিত্রকর টর্ণরকে দেখিতে পাই। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, এই সব প্রসিদ্ধ ও পূজ্য ব্যক্তিরা জীবনারম্ভে নাপিতের দোকানে কাজ করিতেন।

এমন কি, সর্ব্বদেশে আদৃত শেক্সপিয়রও অতি সামান্য শ্রেণীতে জন্মিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা কসাইয়ের কাজ করিতেন। আর কেহ কেহ বলেন, তিনি নিজেও পশম আঁচড়ানর কি কেরাণীর কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার নাটক সকল পড়িলে তাঁহাকে শুধু এক কাজের নয়—সকল কাজের ও সকল বিষয়ের কার্য্য-প্রধান জ্ঞানে দক্ষ বলিয়াই স্থির হয়। তিনি নিজ রচনায় সমুদ্র সম্বন্ধে এমন সব যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা পড়িয়া নাবিকেরা তাঁহাকে এক জন নাবিক বলিয়াই স্থির করে। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক লেখা পাঠে যাজক ও পুরোহিতেরা ভাবেন, তিনি নিশ্চয় কোন যাজকের কেরাণী ছিলেন। আবার তাঁহার অশ্ববিদ্যায় নিপুণতা দেখিয়া অশ্ব ব্যবসায়ীরা বলেন, তিনি ঘোড়ারও কাজ করিতেন। বাস্তবিক, জীবন নাটকে তিনি যে একজন প্রকৃত নট ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি জীবনে নানা খেলা খেলিয়া ও নানা দিক দেখিয়া যে অসীম কার্য্যমূলক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুস্তক সমূহে আমরা সেই জ্ঞানেরই পরিচয় পাই। যত দিন মানব জগৎ থাকিবে, তত দিন উহাও অবিনাশী থাকিয়া মানুষকে শিক্ষা দিবে।

আবার ইংরাজশ্রমজীবীদিগের মধ্যেও আমরা ইঞ্জিনিয়ার ব্রিণ্ডলে, নৌবিদ্ কুক, ও কবি বরণের আবির্ভাব দেখিতে পাই। বিখ্যাত বেন জনসনও রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে তাঁহার জীবনের প্রথমে কার্য্যমূলক জ্ঞান শিক্ষা পাইয়াছিলেন। মহৎ চরিত্রের ইতিহাস খুঁজিলে এইরূপ সহস্র সহস্র উদাহরণ পাই, সকল স্থলেই কঠিন পরিশ্রম মানুষের আত্মোন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছিল।

শ্রম ব্যতীত কোন কর্ম্মেই পারদর্শিতা লাভ করা যায় না। আত্মোন্নতি, কর্ম্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতি—সকল বিষয়েই শ্রমশীল হস্ত ও চিন্তাশীল মস্তক একত্র মিলিয়া জয়লাভ করে। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মিলেও কার্য্যক্ষমতা ভিন্ন কেহ কখনই বিখ্যাত হইতে পারে না। কারণ, উইলের দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেও কার্য্যজ্ঞান ও শিক্ষা উহা দ্বারা আত্মগত করা যায় না। লোকে অর্থ দিয়া অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে বটে, কিন্তু কেহই টাকা দিয়া আত্মচর্চ্চা কিনিতে পারে না। সে জন্য, এই সব সামান্য শ্রমজীবীদের মধ্যে এত মহৎ চরিত্র দেখিয়া ইহাই আমাদের বিশ্বাস হয় যে, মানুষের আত্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতির জন্য কার্য্যমূলক জ্ঞান যত আবশ্যক, অর্থ বা পরের সাহায্য তত নহে। সুখময় ও সচ্ছন্দ জীবন মানুষকে কষ্ট ও বিপদের সঙ্গে যুঝিতে শিখায় না। সৌভাগ্যের ক্রোড়ে পালিত হইলে মানুষের উদ্যম ও কার্য্যক্ষমতা চালনার অভাবে নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রকৃতরূপে, যে দারিদ্র্য বা সঙ্কটপূর্ণ জীবনকে মানুষ মহা-শাপ বলিয়া ভয় পায়, তাহাই আত্মসাহায্য দ্বারা মানব-জীবনে শুভ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইতে পারে। জীবনযুদ্ধের এইরূপ ব্যক্তিগত কার্য্যমূলক জ্ঞানই জাতীয় উন্নতির এক মাত্র উপায়।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

রসকদম্ব।

এই গ্রন্থ, কবিবল্লভ নামক কোন ব্যক্তির রচিত। কবিবল্লভ নাম কি উপাধি, তাহা জানা যায় নাই। গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোক গুলি অশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ অর্থাৎ আমার আদর্শ পুস্তক খানির সংস্কৃত শ্লোকগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখিত হয় নাই। গ্রন্থের আরম্ভ ভাগ এইরূপ,—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ। চূতা পুষ্পময়ী শিখণ্ড রুচিরা বয়ংসিচ বিম্বাধরৈঃ।
কৈশোরক বরঞ্চ নয়ন কন্দর্প দৃষ্টি প্রভো॥
রম্যং রত্নময়ং বপুশ্চ বসনং হেমপ্রভং।
বৃন্দারণ্যে কলানিধিবিজয়তে ক্রীড়া স রাসোৎসবঃ॥
শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজং রম্যং মধুব্রতং।
ন বা রাস কদম্বাখ্যং করোতি কবিবল্লভং॥

প্রথম পয়ার ছন্দ অহির রাগ—

জয় জয় নাগরশেখর রসগুরু।
অযাচক যাচক পূরক কল্পতরু॥
প্রেমরস ভক্তিদানে শুদ্ধ মহাশয়।
দোষলেশ নাহি ধরে গুণের আশ্রয়॥
নিজনামে অসীম……বিস্তারিল।
নিজগুণ কুসুম কীর্ত্তন প্রকাশিল॥

প্রেম নাম ফল দিয়া অপিল তুষিল।
অতি শান্ত হৈঞা প্রভু জীব নিস্তারিল॥
হেন প্রভুর রূপ করি নয়ান পুতোলি।
হৃদয়ে বান্ধিব গুণ প্রেমের গুতলি॥
রসনা নর্ত্তক করি সে গুণ আবেশে।
শ্রবণ পূর্ণিত করে সেই নাম যশে॥
সে তনু প্রসাদ ঘ্রাণে নাসিকা তুষিব।
প্রণাম কারণে নিজশির নিয়োজিব॥
সে পদকমলে করি মন মধুকর।
ভুজযুগ করি দিব কর্ম্মের কিঙ্কর॥
চরণ করিঞা অশ্ব দেখি তার লোকে।
নিজ দেহে নিয়োজি খণ্ডিব ভব শোকে॥
যার গুণ ভাবি ভব অজেয় বৈভব।
শ্রুতি সতী সঘনে বাখানে অনুভব॥
নারদ তুম্বরু গুরু সহস্রবদনে।
জনম গোঙায় এক চরিত্র মননে॥
হেন প্রভুর মহিমা বোলিতে কেবা পারে।
দরিদ্র গৃহস্থ যেন আশা করি মরে॥
জীবের যোগ্যতা এতি জানিব বিশেষে।
যেন তেন মতে দিবা রাণে কৃষ্ণরসে॥
কহিতে শুনিতে মাত্র করিব অভ্যাস।
ভাগ্যবশে আচরণ সে হয় প্রকাশ॥
সুজন সঙ্গতি যদি কৃষ্ণকথা কহে।
কমি মল আনল শীতল বসদহে॥
কর্ম্মেত সাহস করি ঈশ্বরের বলে।
প্রভুর বলে সিন্ধু যেন লঙ্ঘিল বানরে॥
অসাহসে কৃষ্ণকথা না কহিলে দোষ।
আপনে জল্পিঞা করে আপনে সন্তোষ॥
তবে যত কৃষ্ণরসে রসিক সকল।
নানাবেশে বাস করে ধরণীমণ্ডল॥
উত্তম মধ্যম যত যে করে জল্পনা।
সাধুগণ করে তাতে সরস কল্পনা॥
সেই সাধুগণ মনে করিঞা ভরসা।
বুদ্ধি অনুমানে কহি কৃষ্ণগুণ ভাষা॥
মধুহারী কীট পুষ্পে আসক্তি না করে।
যথা যথা মধু পায় তথা তথা হরে॥
উত্তম মধ্যম আর প্রাকৃত শকতি।
মনুষ্য শরীরে এই বুদ্ধি তিন জাতি॥
উত্তমে না দেয় দোষ গুণ মাত্র ভোগে।
শম্বুক ছাড়িঞা হংস সুখী পদ্ম যোগে॥
দোষ গুণ সমভাব মধ্যম বিচারে।
সর্ব্বদ্রব্য মূল্য যেন বণিকের ঘরে॥
দোষে দুঃখ গুণে সুখ ক্ষণেক প্রকাশে।
পল্লব ছাড়িঞা উষ্ট্র কণ্টক বিলাসে॥
অতএব ভাবরস সুদৃঢ় জানিব।
ভাব হৈতে প্রেমযোগে স্বকর্ম্ম সাধিব॥
ব্রহ্মাবিষ্ণু শিব শক্তি অভিন্ন স্বভাব।
অন্যোন্যে সকলে করে সর্ব্বদেহে ভাব॥
ভাব হৈতে পৃথক্ বুদ্ধি যেবা জন করে।
মস্তক ভুষিঞা যেন শরীর প্রহারে॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে আছে মহা মহা ধনী।
পসার সাজিঞা তারা লেয় ভক্তিমণি॥
প্রণাম করিঞা কহি পণ্ডিত চরণে।
কৃষ্ণের প্রসঙ্গ গুণ স্থাপিব যতনে॥
হীনের পরশে গঙ্গা নহে অপবিত্র।
কবি-দোষে দোষী নহে কৃষ্ণের চরিত্র॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে আছে মহা মহা ধনী।
ভক্তিমূল্য দিঞা তারা কিনে ভক্তিমণি॥
দুয়ারে দুয়ারে লঞা সাধুগণ ফিরে।
আর্ত্তিমূল্য যাচিঞা বিকায় প্রতি ঘরে॥
দরিদ্র অবল খঞ্জ অন্ধহীন জনে।
শ্রদ্ধাপণে সেই ভক্তি কিনে বিনি ধনে॥
তিক্ত মিষ্ট কটু কসা ক্ষার অম্ল নহে।
নিত্য নিত্য নবশ্বাস জন্মে নব দেহে॥
রাজায়ে নিবারে নারে না পোড়ে আনলে।
জ্ঞাতিগণে না হিংসয়ে না দেখে তস্করে॥
নাড়িতে বহিতে কিছু নাহি পরিশ্রম।
বিলাইতে অক্ষয় ভোগিতে অনুপম॥
অনায়াসে হেন দ্রব্য পাঞা সর্ব্বজনে।
অচৈতন্য হারায় আলস্য অভিমানে॥
চৈতন্যে করুক নিত্য চৈতন্য সঞ্চয়।
নিত্যানন্দে আনন্দ করুক অতিশয়॥
অদ্বৈতে অদ্বৈত যেন করে প্রেম সঙ্গ।
গদাধর ধারা যেন রসের তরঙ্গ॥
চৈতন্যের প্রিয় যত বৈষ্ণব সুজনে।
তা সভাতে চিত্ত যেন রহে অনুক্ষণে॥
শ্রীযুত উদ্ধব দাস জ্ঞানচক্ষু-দাতা।
সে পদকমলে মন রহুক সর্ব্বথা॥
জন্মে জন্মে এই মাত্র লভুক প্রসাদ।
যাহা হৈতে খণ্ডে ঘোর সংসার বিষাদ॥
শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা দেখি করিল আরম্ভ।
পয়ারে লেখিল তত্ত্ব সরস কদম্ব॥
চতুর্দ্দশ অক্ষরে লেখিল ক্ষুদ্র ছন্দ।
ছাব্বিশ বিংশতি দীর্ঘ মধ্যমে নির্ব্বন্ধ।
লেখক পাঠক শ্রোতা গাহক সকলে।
ভাব বিচারিবে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে।
শুনিলে প্রবন্ধ যদি বিচার না করি।
অন্তরে প্রবেশ তবে না হয় মাধুরী॥
অল্প অক্ষরে অর্থ অনেক সন্ধান।
পূর্ব্বপক্ষ বিচারিতে নহে সমাধান॥
তে কারণে দঢ়াঞা কহিল নিজমনে।
পূর্ব্বপক্ষ যে করে সন্ধান সেই জানে॥
গ্রাম্য কথা হেন মতি ছাড় সর্ব্বজনে।
নিরবধি কর প্রেম অমৃত ভোজনে॥
হাস্য অনুরাগ শান্তি শৃঙ্গার আলাপ।
যে রসে রসিক যেই সেই করে ভাব॥
ভক্তিরস অবশ্য লভিবে কৃষ্ণ গুণে।
শ্রীকবি বল্লভে কহে ধরিঞা চরণে॥

কবির গুরুর নাম উদ্ধব দাস। কবি, কৃষ্ণসংহিতা নামক কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। কবি, দ্বারকাপুরীর দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন, বর্ণনায় বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কথোপকথন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। উভয়ের কথোপ-

কথন বর্ণনায় কবি বিলক্ষণ লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর ও স্ত্রীর প্রতি পুরুষের ভাব সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ ও রুক্মিণী, রৈবতক পর্ব্বতে, তত্রত্য জনগণের প্রেমরীতি দর্শন করিতে যান। পথিমধ্যে রুক্মিণী যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, কৃষ্ণ তৎসমুদায়ের উত্তরদান করিয়াছেন। সৃষ্টি তত্ত্ব, ভূবর্ণনা, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের বর্ণনা, সপ্তসমুদ্র, সপ্তদ্বীপ ও সুমেরু পর্ব্বতের সুন্দর বর্ণনা আছে।

কবির গোলোক বর্ণনা—

সর্ব্বোপরি গোলোক সুরভি অধিকারী।
গোলোকের রূপ গুণ কি বর্ণিতে পারি॥
রত্নমণি ভূমি তাতে ধূলি চিন্তামণি।
পরশে রচিত বেদী পথ অনুমানি॥
মণিময় গৃহ শুদ্ধ কাননে রচিত।
সর্ব্বধাতু কোমল সুগন্ধি নানারীত॥
সরোবরের নীর সব অমৃত সমান।
মধু পরিপূর্ণ হৈঞা নদীর নির্ম্মাণ॥
জলযোগে সঘনে বিহরে দেবহংস।
সর্ব্বস্থপ মূর্ত্তিমান্ ভোগে নানা অংশ॥
সর্ব্ববৃক্ষ কল্পদ্রুম নানা গুণ ধরে।
ফলফুল মকরন্দ গন্ধে শোভা করে।
অযাচক যাচক কাহাকে নাহি জানে।
বাঞ্ছা বিনে পূর্ণ করে নানা রস দানে
নব নব সুখ সব শরীরে উদয়।
মানসে বিস্তর ভোগ না বুঝি নির্ণয়॥
রমণী রসিক যাতে অখণ্ড যৌবন।
বিনি পাঠে সর্ব্বশাস্ত্র জানে সর্ব্বজন॥
প্রেমরস সুখরস মূর্ত্তিমন্ত দেখি।
অখণ্ড আনন্দ সর্ব্বজীব মহাসুখী॥
কার্য্য বিনা কারণ সর্ব্বত্র উপাদান।
স্বাদুগন্ধ রূপবতী সর্ব্ব মূর্ত্তিমান্॥
গীতচ্ছন্দে কথা যাতে নৃত্যচ্ছন্দে গতি।
সহজ কথনে যাতে বেদের উৎপত্তি॥
না ভোগিলে সর্ব্বরস ভোগে সর্ব্বজন।
না দেখিঞা সর্ব্বরূপ করে নিরীক্ষণ॥
না বোলিলে সর্ব্বকথা বুঝে অনুমানে।
না শুনিলে সর্ব্বধ্বনি শুনে সর্ব্বজনে॥
না জানিঞা জানে সর্ব্ব না রমিঞা রমে।
ম নর সকল কর্ম্ম পূরে বিনি শ্রমে॥
গোলোকের রীতি অতি অসীম উপমা।
কোটি কোটি অনন্তে কহিতে নারে সীমা॥

কবির বর্ণনা অতি মনোহারিণী। মধ্যে মধ্যে সুন্দর অনুপ্রাসচ্ছটাও আছে,—

নলিনী লোলনী শোভে অমৃত লহরী।
উড়ে পড়ে মধু পিয়ে মাতল ভ্রমরী॥
মন্দ মন্দ বায়ু বহে শীতল সুগন্ধ।
অবিরত কুসুমে বরষে মকরন্দ॥

* বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে ষোড়শ দলস্থিত পদ্মের ক্রোড়ে যে যে সুন্দরীর ভাবনা করেন, তাহা এই

সম্মুখের দলে বসে বৃন্দা দেবী রামা।
শব্দরূপা মূর্ত্তি বটে অতি কৃষ্ণপ্রেমা॥
তার বামে লক্ষ্মীদেবী পরম সুন্দরী।
ঈশানে সুভদ্রা দেবী রূপ অধিকারী॥
তার বামে ভদ্রাদেবী রস গুণবতী।
তার বামে বস্ত্ররেখা মধ্যময়ী সতী॥
তার বামে শৈব্যাদেবী ভোগিনী সুন্দরী।
মর্দ্দিমতী ছয় শক্তি রূপ অধিকারী॥
ষট্‌কোণে বসতি এই প্রধান নায়িকা।
কৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেম আনন্দ দায়িকা॥
তার তলে বাম পাশে ভূশক্তি সুন্দরী।
স্নিগ্ধ দূর্ব্বাদল শ্যামা দিব্য বেশধারী॥
সুসংগীত রসগানে বীণা যন্ত্র ধরে।
সর্ব্বাঙ্গ শিথিল কৃষ্ণ প্রেমরস ভরে॥
শব্দাদি বিষয় চিত্ত কৃষ্ণেতে অর্পিতা।
কৃষ্ণের বশ্যতা ধৈর্য্য চরিত্রে পণ্ডিতা॥
ষট্‌কোণ দক্ষিণ ভাগে শ্রীশক্তি রমণী।
দিব্য বেশবাস অতি নূতন যৌবনী॥
কাচের অঙ্কুর তনু ননীর পুতলি।
ক্ষীণকটি উরুগুরু বিচিত্র ত্রিবলী॥
শুদ্ধহেম জিনি তনু দিব্যরূপ শোভা
কায়মনোবচনে সঘনে করে সেবা॥
ঘটস্থ আধার রূপে থাকে অনুরাগে।
তার বাহ্যে অষ্টদল শোভে অষ্টভাগে॥
সম্মুখে ললিতা দেবী শ্যামলা বায়ব্যে।
উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা অনুক্ষণ সেবে॥
প্রিয়প্রিয়া ঈশানে বিশাখা পূর্ব্বদিকে।
অগ্নিকোণে শৈব্যা পদ্মা সুদক্ষিণ ভাগে॥
নৈঋতে বসতি ভদ্রা সেবে প্রাণপতি।
কৃষ্ণ অঙ্গে ইন্দ্রিয় যোজিঞা করে স্থিতি॥
উপকোণে অষ্ট দলে শোভে অষ্ট রামা।
চারু চন্দ্রাবলী আর চিত্ররেখা নামা॥
চন্দ্রাবতী মদন সুন্দরী প্রিয়াপ্রিয়া।
মধুমতী শশিরেখা শোভে হরিপ্রিয়া॥
ষোলয় দলেতে শোভে ষোলয় সুন্দরী।
একজন সংহতি সহস্র অনুচরী॥

যথেষ্ট উদ্ধৃত হইল। আর উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক মনে করি। কবির বর্ণনায় বৈষ্ণবদের উপাসনা তত্ত্বের অনেক নিগূঢ় কথা জানা যায়। কবির পরকীয়া রসটী বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

প্রাচীন বাঙ্গালায় "অ" (নস্থানে উৎপন্ন) অব্যয়ের ব্যবহারে বৈচিত্র্য ছিল। অনেক স্থানে উহার কোন অর্থ থাকিত না। যথা—

অনাস্তিক জনের সুদৃঢ় নহে ভাব
একান্তিক জানে সত্য জমে প্রেমলাভ

এখানে অনাস্তিক শব্দের অর্থ নাস্তিক। এইরূপ কুমারী স্থানে অকুমারী ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ প্রত্যয় প্রায় হইত না। ঈপ্ ও নী প্রত্যয়ের ব্যবহারই অধিক ছিল। উহাই যেন বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি। এখনও সাধারণ লোকে পণ্ডিত, শিয়াল, শিশু, বিড়াল প্রভৃতির স্ত্রীলিঙ্গে পণ্ডিতনী শিয়াল্নী, শিশুনী, বিড়াল্নী প্রভৃতি ব্যবহার করে। মালদহ জেলায় কর্ত্তা ও সাহ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কর্ত্তানী ও সাহনী বা সাহোন্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রন্থের শেষ ভাগ এইরূপ—

কলিযুগে চৈতন্য সরস অবতার।
নিজগুণ সঙ্গে কৈল প্রেমের প্রচার॥
আনন্দে পড়িয়া প্রেম বিচার না কৈল
গুপ্তরস চরিত্র সভাকে জানাইল॥
তবে সে মহান্তগণ প্রেমে চিত্ত দিয়া।
ঘরে ঘরে বিভজিল যতন করিঞা॥
বৃন্দাবনে রূপ সনাতন মহাশয়।
বনমালী দাসস্থানে কহিল নিশ্চয়॥
তাহাতে শুনিল নিত্য লীলার প্রবন্ধ।
পয়ারে লিখিল তত্ত্ব সরস কদম্ব॥
জয় জয় ধ্বনি আছে সূত্রের সন্ধান।
দ্বারকা বর্ণন যার বৈভব নিদান॥
হাস্যরস মোক্ষ জানি রুক্মিণী বচসে।
রয়বত (?) চরিত জানিব প্রেমরসে।
বুঝিব অদ্ভুত রস ব্রহ্মাণ্ড চরিত্রে।
শিক্ষারস জানি তিন গুণ বিস্তারিতে॥
স্তুতিরস জানিব রুক্মিণী মিষ্টবাণী।
জীবজন্ম বিচারে ইন্দ্রিয় ভেদ জানি॥
বুঝিব শৃঙ্গার রস নিত্যলীলা স্থানে।
প্রেমরস জানি পুন গুপ্ত প্রেম গুণে॥
শান্তিরস অনুরাগ বৈরাগ্য লক্ষণ।
দ্বিতীয় তৃতীয় ভাবে জানিব ভজন॥
সংসারি বদ্ধতা ভাবে বীভৎস নিদান।
রণভেদে জানি আস্থা রসের সন্ধান॥
ভক্তিরস জানিব নারদ দরশনে।
ভীতরস জানিব সে নারদ কথনে॥
মুনি মন কথায়ে বিস্ময় রস জানি।
সত্যভামা বিরহে করুণ রস মানি॥
বীররস জানিব ইন্দ্রের অহঙ্কারে।
ক্রোধরস জানি পুন ঈশ্বর শরীরে॥
শৃঙ্গাল বিরহ সর্ব্বরস বিস্তারিল।
তেকারণে নাম রসকদম্ব রাখিল॥
ঈশ্বর চৈতন্য প্রেমভক্তি রসধাম।
ভব দুঃখ বিমোচনে নিত্যানন্দ নাম॥
অদ্বৈত ঠাকুর গদাধর মহাশয়।
জগতে ভাসাঞা দিল প্রেমের নির্ণয়॥
নিজগুরু ঠাকুর উদ্ধব দাস নাম।
তাহার প্রসাদে হৈল সংসার শুভান॥
শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা তত্ত্ব করিঞা প্রধান।
পুরাণ সংগ্রহ আর করিঞা প্রমাণ॥
সঙ্গোপন রস কেহো কেহো উপভোগী।
প্রাকৃতে নিখিল রস সর্ব্বজীবে লাগি॥
রুক্মিণীতে কৃষ্ণকথা বহুত বিস্তার।
সমুদ্র প্রমাণ তাহা জানি রস তার॥
মূঢ় মূর্খ হীন তাতে বুদ্ধি নাহি ঘটে।
দ্বাবিংশতি রস কহি অনেক সঙ্কটে॥
শুনিলেহি সাধুগণ প্রবেশিবে ভাগে।
পাষণ্ড প্রবেশ হৈবে পরিহাস যোগে।
প্রাকৃত কারণে লোক অনুভাব কহে।
বিচারিলে মহা তত্ত্ব গ্রাম্য কথা নহে॥
শাক্ত শৈব, সৌর, আর বৈষ্ণব জানিবে।
যার যেহ মত সেই বিচারে পাইবে॥
কবি দোষ ছাড়িঞা তত্ত্বেতে দেহ মতি।
ভজিঞা সংসার বন্ধ ছাড় শীঘ্রগতি॥
একপার ঠাকুর নরহরি দাস নামে।
স পদ মুকুট রায ভজিল যতনে॥
দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়।
অনুরোধে জন্ম হৈল প্রবন্ধ নির্ণয়॥
তাহার উদ্যোগে কিছু লিখিল কারণ।
অনুযোগে শব্দ যেন বোঝেন যক্ষিগণ॥
পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।
জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের ব্যথা।
আর যত বন্ধুগণ দিল উপদেশ।
তা সভাকে কৃষ্ণপ্রেম লভুক বিশেষ॥
করোত জাতির মহা স্থানের সমীপে।
গমবাড়া গ্রামেত বাস আছিল স্বরূপে॥
ফাল্গুনা ফাল্গুন ফাগু পৌষমাসী দিনে।
বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে॥
বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক।
তখনে রচিল রস-কদম্ব পুস্তক॥
রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর।
দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ শুন হয়ে এক মতি।
শ্রীকবিবল্লভে পুন বোলে এই স্তুতি॥

ইতি, শ্রীকবিবল্লভ বিরচিত রসকদম্ব গ্রন্থ সম্পূর্ণ। যথা দৃষ্টেত্যাদি॥
শশিবস বালশূন্য যুক্ত শাকেতদকে।
প্রতিপদি সিতপক্ষে বাহুলে মাসি নক্তং॥
রুক্মিণী কৃষ্ণসংবাদ, শ্রীআত্মারাম দেব শর্ম্মণস্য লিখিত।

কবির বাসস্থান "করোত জাতির মহাস্থান সমীপে" ছিল। করোত জাতি, কোন জাতি ও তাহাদের মহাস্থান কোথায়, আমরা বুঝিতে পারি নাই। কবির সম্বন্ধে আমরা কেবল এই কয়েকটী কথা জানিতে পারিয়াছি, কবির পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী। কবি, নরহরি দাস নামক ব্যক্তির শিষ্য,

মুকুট রায় নামক ব্রাহ্মণ বন্ধুর অনুরোধে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এ কোন্ নরহরি দাস? কবির গুরুর নাম উদ্ধব দাস, বৃন্দাবনস্থ রূপসনাতনের নিকট যে রস-তত্ত্ব শ্রবণ করেন, কবি, বনমালীর নিকট সেই তত্ত্ব শুনিয়া এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে দ্বাবিংশতি সর্গ আছে। এই গ্রন্থ ১৫২০ শকে রচিত হইয়াছে। কেবল পয়ার ও ত্রিপদী ব্যতীত এই গ্রন্থে অন্য ছন্দের ব্যবহার হয় নাই। চারি চরণে এক এক শ্লোক ধরা হইয়াছে, যথা—

সাতকালে পরমায়ু নিত্য করে ক্ষয়।
সংসারী সকলে কিছু না বুঝে নির্ণয়॥
প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রজনী যত জাগে।
সংসারী বিকল্প ভোগে নানা অনুরাগে।

ইহা এক পদ বা শ্লোক। এই গ্রন্থে এইরূপ সহস্র পদ আছে। গ্রন্থের অক্ষর সংখ্যা ২০৬০০০০। আমরা যে গ্রন্থ দেখিয়া এই প্রবন্ধ লিখিলাম, তাহা ১৬৫০ শকে লিখিত। সাহাপুর গ্রামের গণেশ দাস বৈরাগীর বাটীতে এই পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে রস-কদম্ব এক খানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার মুদ্রণ হইলে ভাল হয়।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

অভিধান-আলোচনা।

(Half hour with Amarakosh)

অভিধান পড়া আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথা। সংস্কৃত পড়িতে হইলে সাধারণতঃ অমরকোষ মুখস্থ করিতে হইত। এখন প্রাচীন প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। কতক প্রাচীন জিনিষের পুনঃপ্রচলন আরব্ধ হইয়াছে, কিন্তু অভিধান-পাঠ-প্রথার আজিও চলন হয় নাই।

অভিধান পড়ার গুণ অনেক ছিল। এখন প্রায়ই দেখা যায়, বি, এ, এম্, এ পাশ করিয়াও কি ইংরাজি, কি সংস্কৃত, উভয় ভাষারই অনেক শব্দ সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত সংস্কার অথবা একটা অস্পষ্ট সংস্কারমাত্র রহিয়াছে, প্রকৃত অর্থজ্ঞান আমাদের নাই। আবার অভিধান না পড়ায় আমাদের পরিজ্ঞাত শব্দসমূহের পুঁজি (Stock of Words) অত্যন্ত কম হইয়া গিয়াছে। এই দুইটি দোষ এখনকার শিক্ষিতসমাজে খুব দেখিতে পাওয়া যায়।

সে দিন অমরকোষের পাতা উলটাইতে উলটাইতে কতকগুলি শব্দ এবং তাহার অর্থসম্বন্ধে সাধারণের কিরূপ ভ্রান্ত সংস্কার আছে অথবা থাকিতে পারে, তাহাই মনে হইতে লাগিল। নিম্নে তাহারই কতকগুলি উদাহরণ দিলাম, এবং অমরধৃত অর্থও দিলাম। পাঠক পাঠিকা শব্দগুলির অর্থসম্বন্ধে তাঁহাদের নিজের সংস্কার এবং অমরের বচন, এই দুটি নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। আমি অনেক সময়ে আমার শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পাইয়াছি, তাঁহাদের অনেক ভ্রান্ত সংস্কার রহিয়াছে। কতকগুলি শব্দার্থ সম্বন্ধে আমার নিজেরই ভ্রান্তি দেখিয়া কত সময়ে লজ্জিত হইয়াছি।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। একার্থ-বোধক অনেকগুলি শব্দ সকল ভাষায় পাওয়া যায়। সেই শব্দগুলির অর্থ অথবা প্রয়োগবিষয়ে অনেক সময়ে অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য কল্পিত হইয়া থাকে। ইংরাজিতে যেমন Wit ও humour, wish ও desire প্রভৃতি। যে ভাষায় এইরূপ একার্থবোধক শব্দসমূহের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ সূক্ষ্ম পার্থক্য অধিক দেখা যায়, সে ভাষাকে তত অধিক উন্নত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। কারণ একই পদার্থের বোধের জন্য দশটি শব্দ অনাবশ্যক, সুতরাং এই দশটি শব্দের মধ্যে অর্থগত অথবা প্রয়োগ-গত সূক্ষ্ম পার্থক্যের কল্পনা করিয়া ভাষার মধ্যে বিচিত্রতা এবং শব্দবল সম্পাদিত করা ভাষার উন্নত এবং পরিণত অবস্থার পরিচায়ক। অভিধান পাঠের সময় অথবা ভাষা শিক্ষার সময়, এই বিষয়ের আলোচনা করিলে যেমন প্রভূত আনন্দ লাভ হয়, তেমনই প্রভূত জ্ঞানলাভও হইয়া থাকে—

(১) অরণ্যানী—মহারণ্য। "মহারণ্যমরণ্যানী"। উপবন—কৃত্রিম বন। আরামঃ স্যাদুপবনং কৃত্রিমং বনমেব যৎ।

বৃক্ষবাটিকা—অমাত্য এবং বেশ্যার গৃহের সমীপবর্ত্তী উপবন। অমাত্য "গণিকাগেহোপবনে বৃক্ষবাটিকা।" ইহাই অমরধৃত অর্থ। অন্য অর্থ যে হইতে পারে না, তাহা নহে। শকুন্তলায়, যথা,—"অয়ে! দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকা আলাপ-ইব শ্রূয়তে"।

উদ্যান—রাজার সাধারণ বন।

প্রমদবন—রাজার অন্তঃপুরবর্ত্তী বিহারকানন। "উদ্যানং রাজ্ঞঃ সাধারণং বনং স্যাদেতদেব প্রমদবনমন্তঃ-পুরোচিতং। কত লোকে 'প্রমোদবন' লিখিয়া থাকে।

(২) পংক্তি—শ্রেণীর সাধারণ নাম। "বীথ্যালিরাবলিঃ পংক্তিঃ শ্রেণী।"

লেখা-রাজি—নিবিড় পংক্তির নাম।

(৩) বানস্পত্য—যে বৃক্ষের পুষ্প হইতে ফল জন্মে।

বনস্পতি—পুষ্পব্যতিরেকে যে বৃক্ষে ফল জন্মে।

"বানস্পত্যঃ ফলৈঃ পুষ্পাৎ তৈরপুষ্পাদ্বনস্পতিঃ।"

(৪) বল্লী—লতা। "বল্লরির্মঞ্জরিঃ।"

বল্লরী—মঞ্জরী, পল্লবাঙ্কুর। "বল্লী তু ব্রততির্লতা।"

(৫) পত্রের সাধারণ শব্দ—পত্রং পলাশং ছদনং দলং পর্ণং ছদঃ (পুমান্)।

কচি নূতন পাতার নাম—পল্লব, কিসলয়। "পল্লবোঽস্ত্রী কিসলয়ং।"

(৬) কদলী বৃক্ষকে 'মোচা' বলে। বাঙ্গলায় কলার ফুলকে মোচা বলে।

(৭) সামান্য স্ত্রীর বাচক শব্দ—"স্ত্রী যোষিদবলা যোষা নারী সীমন্তিনী বধূঃ। প্রতীপদর্শিনী বামা বনিতা মহিলা তথা।"

স্ত্রী-বিশেষের নাম যথা—"বিশেষাশ্চাঙ্গনা ভীরুঃ কামিনী বামলোচনা। প্রমদা ভাবিনী কান্তা ললনা চ নিতম্বিনী। সুন্দরী রমণী রামা।"

কোপযুক্তা রমণীর নাম—"কোপনা সৈব ভামিনী।"

পিতৃগৃহস্থিতা স্ত্রীর বাচক শব্দ—"চিরণ্টী তু সুবাসিনী [স্ববাসিনী]।"

(৮) গুল্ফ ও জানুর (গোড়ালি ও হাঁটুর) মধ্য ভাগের নাম—জঙ্ঘা। ইংরাজিতে যাহাকে (ankle) বলে। "জঙ্ঘা তু প্রসৃতা।" জঙ্ঘা অর্থে উরু নহে।

জানু—হাঁটু। জানূরুপর্ব্বাঽষ্ঠীবদস্ত্রিয়াং।

(৯) অলক—চূর্ণ কেশ। অলকাশ্চূর্ণকুন্তলাঃ।

(১০) স্ত্রীর কটিভূষণের নাম—মেখলা,কাঞ্চী প্রভৃতি।

পুরুষের কটিভূষণের নাম—শৃঙ্খল। (!) "স্ত্রী কট্যাং মেখলা কাঞ্চী সপ্তকী রসনা তথা। ক্লীবে সারসনং চাথ পুংস্কট্যাং শৃঙ্খলং ত্রিষু।

(১১) পট্ট বস্ত্র—বাল্ক, ক্ষৌম।

সূক্ষ্ম পট্ট বস্ত্র—ক্ষৌম, দুকূল।

(১২) নিধুবন—ইহা কোন উপবন বা কুঞ্জবন নহে। ধুবনং কম্পনং। নিধুবন মৈথুনের বাচক শব্দমাত্র। "ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্ম্মশ্চ রতং নিধুবনঞ্চ সঃ।" গ্রাম্যধর্ম্ম শব্দটি প্রণিধান যোগ্য।

(১৩) ধেনু—নবপ্রসূতা গো। "ধেনুঃ স্যান্নব-সূতিকা।"

(১৪) প্রসূন—ফুল, ফল। "প্রসূনং পুষ্পফলয়োঃ।"

(১৫) পর্জ্জন্য—শব্দায়মান মেঘ। "পর্জ্জন্যৌরসদব্দেন্দ্রৌ।"

(১৬) অধর—নিম্ন ওষ্ঠ।

(১৭) পূর্ণিমার সাধারণ নাম—"পৌর্ণমাসী তু পূর্ণিমা।"

চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণিমার নাম—অনুমতি।

পূর্ণচন্দ্রযুক্তা পূর্ণিমার নাম—রাকা।

"কলাহীনে সানুমতিঃ পূর্ণে রাকা নিশাকরে।"

(১৮) মুহূর্ত্ত-দ্বাদশ ক্ষণ পরিমিত কাল। ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। সুতরাং এক মুহূর্ত্তে ৪৮ মিনিট্।

"ক্ষণস্তে তু মুহূর্ত্তো দ্বাদশাস্ত্রিয়াং। তে তু ত্রিংশদহোরাত্রঃ।"

(১৯) নিদাঘ—গ্রীষ্ম ঋতু। দুপুর বেলা নহে।

নিদাঘ অর্থে—ঘর্ম্মও হয়।

(২০) পরিমল—কুঙ্কুমাদির মর্দ্দনে উত্থিত মনোহর গন্ধ। "বিমর্দ্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে।"

আমোদ—অতি দূরপ্রসারী মনোহর গন্ধ। "আমোদঃ সোঽতিনির্হারী।"

সুরভি, ঘ্রাণ-তর্পণ, ইষ্টগন্ধ, সুগন্ধি—সাধারণ সুগন্ধি বাচক শব্দ।

আমোদী—কর্পূরাদিজনিত মুখ গন্ধের নাম। "আমোদী মুখবাসনঃ।"

(২১) ঈষৎ পাণ্ডু বর্ণের নাম—ধূসর। "ঈষৎ পাণ্ডুস্তু ধূসরঃ।"

নীল শব্দে কৃষ্ণবর্ণকেও বুঝায়। কৃষ্ণবর্ণের বাচক শব্দ, যথা—কৃষ্ণে নীলাসিত-শ্যাম-কাল শ্যামল-মেচকাঃ। কৃষ্ণ অর্থে নীল শব্দের প্রয়োগ বহুস্থলে দেখা যায়।

হরিৎ—সবুজ বর্ণ। "পলাশো হরিতো হরিৎ।" পত্রের বর্ণ। অনেকের হরিৎকে হলদে অর্থাৎ পীতবর্ণ বলিয়া ধারণা আছে।

অরুণ—ঈষৎ রক্তবর্ণ। "অব্যক্ত-রাগস্ত্বরুণ।"

(২২) আলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, বিলাপ, বিপ্রলাপ সংলাপ, সুপ্রলাপ, এবং অপলাপ, এই কয়েকটি শব্দ লপ্ ধাতু নিষ্পন্ন। উহাদের অর্থ, যথা,—"স্যাদাভাষণমালাপঃ, প্রলাপোঽনর্থকং বচঃ। অনুলাপো মুহুর্ভাষা, বিলাপঃ পরিদেবনং। বিপ্রলাপো বিরোধোক্তিঃ, সংলাপো ভাষণং মিথঃ। সুপ্রলাপো সুবচনমপলাপস্তুনিহ্নবঃ॥"

(২৩) স্মিত—অল্প হাস্যের নাম।

বিহসিত—মধ্যম হাস্য। আচ্ছুরিতক—অতিশয় হাস্য।

"স্যাদাচ্ছুরিতকং হাসঃ সোৎপ্রাসঃ স মনাক্ স্মিতং। মধ্যমঃ স্যাদ্বিহসিতং।"

(২৪) অন্ধকার—তমস।

অল্প অন্ধকার—অবতমস।

অতিশয় অন্ধকার—অন্ধতমস।

বিশ্বব্যাপক অন্ধকার—সন্তমস।

"ধ্বান্তে গাঢ়োঽন্ধতমসং ক্ষীণেঽবতমসং তমঃ বিশ্বক্ সন্তমসং।"

(২৫) নলিনী—পদ্মলতার বাচক শব্দ।

নলিন—পদ্ম। "নলিন্যান্তু বিসিনা পদ্মিনী।"

পুণ্ডরীক—শ্বেতপদ্ম। "পুণ্ডরীকং সিতাম্ভোজং।"

কোকনদ—রক্তপদ্ম। "রক্তোৎপলং কোকনদং।"

বিস—পদ্মের মৃণাল। "মৃণালং বিসং।"

(২৬) প্রান্তর—দূর এবং শূন্য পথ। "প্রান্তরং দূর-শূন্যোঽধ্বা।"

কান্তার—দুর্গম পথ। "কান্তারো বর্ত্ম দুর্গমং।" কান্তার অর্থে মহারণ্যও হয়। "মহারণ্যে দুর্গপথে কান্তারঃ পুন্নপুংসকং।"

(২৭) গণ্ডশৈল—পর্ব্বত হইতে চ্যুত স্থূল প্রস্তর। ইহার অর্থ ছোট শৈল নহে।

"গণ্ডশৈলাস্তু—চ্যুতাঃ স্থূলোপলা গিরেঃ।"

পাদ—মূল পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। "পাদাঃ প্রত্যন্ত পর্ব্বতাঃ।"

(২৮) উন্মাদ—উন্মাদ রোগ। "উন্মাদশ্চিত্তবিভ্রমঃ" উন্মাদ রোগবিশিষ্ট ব্যক্তির নাম—উন্মত্ত, উন্মাদবৎ। "উন্মত্ত উন্মাদবতি।" অনেক পুস্তকে উন্মত্ত অর্থে উন্মাদ শব্দের অপপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

আজ আর নয়। সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, ইহাতেই পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। সুতরাং এই খানেই বিদায় ইতি—

শ্রী—

হিমাচল বক্ষে।

১

অনেকদিন পরে আজ আবার নূতন করিয়া হিমালয় ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিলাম। বঙ্গের এই সমতলভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া, কর্ম্মকঠোরজীবনের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য মস্তকে বহনপূর্ব্বক অন্ধ আবেগে কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিয়া চলিয়াছি; সুখ, আশা, পরিতৃপ্তি, কিছু নাই; তথাপি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেতকী কুসুমের সৌরভাকুল ভ্রমরের ন্যায় সংসারের ধূলায় অন্ধীভূত আঁখি লইয়া ক্রমাগত কণ্টকাঘাত সহ্য করিতেছি; পক্ষদ্বয় ছিন্ন, বক্ষদেশ ক্ষতবিক্ষত; হৃদয়ে আর সে সাহস, সে বিশ্বাস নাই, মনের সে বল, অনন্ত দেবতার করুণায় তেমন অসীম নির্ভরের শক্তি নাই। তাই আজ মধ্যাহ্ন-জীবনের অবসানে, নিদারুণ-ক্লান্তিনিপীড়িত বক্ষে, হতাশ-ভাবে একবার চাহিয়া দেখিতেছি—কোথায়, কতদূরে আমার শান্তিসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আমার জীবনের সেই নিষ্কাম সাধনা কোন্ দেবতার পদতলে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া শিশুর ন্যায় কতকগুলি পুত্তলিকা লইয়া পুতুল খেলিতে বসিয়াছি! আষাঢ়ের এই নবীন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে, ধরাতল বর্ষার সলিলে সিক্ত প্রকৃতির শ্যামল সৌন্দর্য্যে সুসজ্জিত; নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিতেছে, শ্যামলা ধরণীর বিস্তীর্ণ বসনাঞ্চলের ন্যায় ধান্যভূষিত ক্ষেত্র, জল ও স্থল অপূর্ব্ব সুষমায় সমাচ্ছন্ন। মনে হয়, কতযুগ পূর্ব্বে এমনই একদিনে ভারতের অমর কবি রামগিরিতে নির্ব্বাসিত বিরহী যক্ষের হৃদয়বেদনা অশ্রুময়ী ভাষায় সুপ্রকাশিত করিয়া প্রত্যেক প্রবাসী বিরহীর অপূর্ণ কামনা দ্বারা তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এমন দিনে, এমন ঘনঘোর বর্ষার মধ্যে আমার বিরহিহৃদয়ে যে সুপ্ত বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা শান্ত করিবার জন্য আমার সেই চির সুখদুঃখের অচল দেবতা হিমালয়ের পবিত্র স্মৃতি-চর্চ্চাই

একমাত্র মহৌষধ। তাই একবার সংসার ভুলিয়া, মোহের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাহাদিগকে দুদিনের জন্য আপনার ভাবিয়া প্রতিপদে জটিলতর ভ্রান্তিজালে বিজড়িত হইতেছি তাহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া, একবার সেই অতীত জীবনের সুমধুর কাহিনীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। ইহাতে কাহারও হৃদয়ে আনন্দ বা তৃপ্তি দান করিতে পারিব, সে আশা নাই, সে সম্ভাবনাতেও অতীত কথার আলোচনা করিব না। মানুষ পৃথিবীতে নিজের তৃপ্তির জন্যই ব্যাকুল, অন্যে যখন ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার পথে আসিয়া পড়ে, তখন সে তাহাকে সঙ্গিরূপে গ্রহণ করিয়া ইপ্সিত পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু যে কুহকমন্ত্র সে অপরের হৃদয়াকর্ষণের জন্য প্রয়োগ করে, কখন কখন তাহা ছিন্নতার, বীণার তানলয়হীন ধ্বনির ন্যায় শ্রুতিকঠোর হয়। যে বীণার সহায়তায় আমার আকাঙ্ক্ষাপীড়িত হৃদয়ের হাহাকার সঙ্গীতরূপে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছিলাম, সে বীণা আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সে আগ্রহ, সে আন্তরিকতা আমার নাই; কেবল দগ্ধস্মৃতির অন্তর্জ্বালা সেই বহুদূরান্তর-ন্যস্ত হিমাচলের বৃক্ষলতাবর্জ্জিত, ধূসর, অপরিবর্ত্তনীয়, চিরউদাসীন প্রস্তর স্তূপের ন্যায় বক্ষের মধ্যে নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহাতে অশ্রু শুকাইয়া যায়, কোন্ বলে কবিত্বের অমৃত উৎস উৎসারিত করিব?

আমার সেই বহু পুরাতন, পর্ব্বতবাসের চিরসঙ্গী, শ্রীভ্রষ্ট ডাইরি খানির পৃষ্ঠা কতদিনের পর আজ নূতন করিয়া খুলিলাম। অনেক দিন ইহা খুলি নাই, কৃপণের ধনের মত অতি যত্নে ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ অত্যন্ত সন্তর্পণে তাহা খুলিয়া দেখিতেছি—ঐ পেন্সিলে লেখা পথের বিবরণ অপরিচ্ছন্ন ও নিতান্ত অশোভন হইলেও আমি ইহার ভিতর দিয়া বিশালকায় হিমালয়ের সুবিরাট, প্রশান্ত সুগম্ভীর শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি। ইহার প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রের ভিতর কত সুদীর্ঘ দিবসের অলিখিত কাহিনী, কত নিদ্রাহীন নিঃসঙ্গ যামিনীর দুঃসহ কণ্টকশয্যার সকরুণ বার্ত্তা আমার অতীত স্মৃতি উজ্জ্বলরূপে বিকসিত করিবার জন্য মূকভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে—তাহা মনে করিলে নানাভাবে হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। মনে হয়, এই কি সেই পৃথিবী, দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ কি চিরদিন একরূপই থাকে? একদিন যাহা ছিলাম, আজও কি তাহাই আছি? মনুষ্যজীবন প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কাল যে ধার্ম্মিক ছিল, আজ সে মহাপাপিষ্ঠ, কাল যে সন্ন্যাসী ছিল, আজ সে ঘোরতর সংসারী; কাল যে পরের সুখের জন্য হাস্যমুখে নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিত, আজ সে নিজের সুখের অনুরোধে পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে! তবে কে বলিল, পৃথিবীতে দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ চিরদিন সমান! যে রত্নাকর একদিন সামান্য উদরান্ন সংগ্রহের জন্য নরহত্যায় উন্মুখ হইয়াছিল, সেই রত্নাকর আর যাহার কবিত্বস্রোতে আজ সমস্ত শিক্ষিত জগৎ পরিপ্লাবিত, এবং যে সুধাতরঙ্গে অবগাহন করিয়া কতজন কবি বিজয়ী সাধকের বেশে যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন সেই বাল্মিকী, একজন? সেই হিমালয় বক্ষবিহারী, লোটা-কম্বলধারী,কপর্দ্দকহীন, উদাসীন লক্ষ্যহারা সন্ন্যাসী, আর এই সংসারজ্বালা-সংক্ষুব্ধ, বিষয়লিপ্ত, অতি সাবধান, সাধনমার্গ-বিচ্যুত গৃহী, এ উভয় কি একজন? কে জানিত, কোন্ অলক্ষ্যে বসিয়া বিধাতা এই হতভাগ্য গৃহহীন, উদাসীন সন্ন্যাসীর জন্য এত সুদৃঢ় পাশ নির্ম্মাণে রত ছিলেন। কিন্তু এজন্য আমি বিধাতাকে অপরাধী করিতে পারি না। তিনি চিরকরুণাময়; আমার এই উত্তপ্ত মস্তকে তাঁহার চিরমঙ্গলময় আশীর্ব্বাদধারাবর্ষণে তিনি কোন দিন উদাসীন নহেন। আমিই মাতৃ-অঙ্কারূঢ় দুরন্ত শিশুর ন্যায় কতবার তাঁহার স্নেহালিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছি। পৃথিবীর ধূলায় দেহ মলিন ও কলঙ্কিত করিয়াছি, তাই এ দুদ্দিনে ঝটিকা বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে অবসাদগ্রস্ত, উৎকণ্ঠিত একক জীবনের শুষ্ক মরুস্তর ভেদ করিয়া উভয় বাহু উর্দ্ধে প্রসারণপূর্ব্বক আবেগভরে সেই মহিমাময়ী, অনাথের চিরনির্ভর, বিশ্বজননীকে ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

"কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে;
ঠেলিস্‌নে মা ধূলো কাদা মেখেছি ব'লে।
সারাদিনটে ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁজের বেলা
(আমার) খেলার সাথী, যে যার মত, গিয়েছে চ'লে।
কত আঘাত লেগেছে গায়,
কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
কত প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই চরণে দ'লে।

কেউ তো আর চাইলে না ফিরে,
নিশার আঁধার এল ঘিরে,
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে।"

—কিন্তু যাহার চিত্তে চাপল্যের সীমা নাই, তাহার অনুতাপ অনর্থক !

হিমালয়ের বহুসংখ্যক উপত্যকা ও অধিত্যকা, চড়াই ও উৎরাই অতিক্রম করিয়া, নগাধিরাজের কত নয়ন মনোমোহন নয়শোভা নিরীক্ষণ করিয়া ডাইরীর ভিতর দিয়া যেস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, সে স্থানের নাম শ্রীনগর—এ ভূস্বর্গ কাশ্মীর রাজধানী শ্রীনগর নহে, হিমালয়বক্ষে বিস্তীর্ণ, গিরিপাদপসমাবৃত গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর। গাড়োয়াল রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত, বৃটীশ গাড়োয়াল ও স্বাধীন গাড়োয়াল। শ্রীনগর এই বৃটীশ গাড়োয়ালের রাজধানী। বৃটীশ গাড়োয়ালের রাজধানী বলিলে ঠিক বলা হইল কি না বলা কঠিন; তবে কলিকাতাকে যদি বৃটীশ ভারতের রাজধানী বলিলে অত্যুক্তি না হয়, তাহা হইলে শ্রীনগরকে বৃটীশ গাড়োয়ালের রাজধানী বলিলেও অন্যায় হইবে না। কারণ ভারত-রাজপ্রতিনিধি সুহৃৎসহ গ্রীষ্মতাপ প্রশমনোদ্দেশে ও রাজকর্ম্ম সংসাধনার্থ বৎসরের নয়মাস শিমলাশৈল ও ভারতের বিভিন্ন নগরে অবস্থান করিয়া অবশিষ্ট তিন মাস অতি কষ্টে কলিকাতায় অতিবাহিত করিলেও যেমন কলিকাতা বৃটীশ ভারতের রাজধানী, সেইরূপ গাড়োয়াল রাজ্যের বিচারকবর্গ ও বিচারালয়, শান্তিরক্ষণ ও শাসন-বিভাগের মুকুটমণিগণের নিকেতন শ্রীনগরের কিছু দূরবর্ত্তী একটি মনোরম পার্ব্বত্য উপত্যকায় অবস্থিত হইলেও শ্রীনগরই গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত। রাজপুরুষগণ কখন কখন অনুগ্রহপূর্ব্বক অবসর-কালে শ্রীনগরের সেই সুমোহন পার্ব্বত্যশোভা নিরীক্ষণ করিতে গমন করেন। তাঁহাদের শ্রীনগরে পদার্পণের অন্য কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না, তথাপি শ্রীনগর গাড়োয়াল রাজধানী। যখন স্বাধীনতার মহিমাময়ী জয়শ্রীতে সমগ্র গাড়োয়াল-প্রদেশ উদ্ভাসিত ছিল, যখন গাড়োয়ালের প্রত্যেক বৃক্ষ-লতা, প্রত্যেক গিরি-নির্ঝর, অরণ্যের প্রত্যেক সুকণ্ঠ বিহঙ্গ আপনার বিজন বনস্থলীতে উপবেশন করিয়া অক্লান্তকণ্ঠে স্বাধীনতার গৌরব-গাথা গান করিত, যে দিন গাড়োয়ালের প্রত্যেক গিরি শৃঙ্গ স্বাধীনতার অটল গৌরব-স্তম্ভের ন্যায় সুনীল অম্বরপথে আপনার উন্নত মস্তক প্রসারিত করিয়াছিল—সে দিন শ্রীনগর গাড়োয়ালের প্রকৃত রাজধানী ছিল। তখন ইহা সমগ্র গাড়োয়াল প্রদেশের দ্যুতিমান কণ্ঠহারস্বরূপ বিরাজ করিত, এখনও সযত্নে অতীত শোভার বিলুপ্ত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া মৌনভাবে বিরাজ করিতেছে—অতীতের সকলই গিয়াছে, কেবল তাহার সুনামের সৌরভ অশ্রান্তগতি কালের চির-কলতানের সহিত ভাসিয়া আসিতেছে। সুতরাং এখন শ্রীনগরকে রাজধানী নামের গৌরব হইতে বঞ্চিত করিলে প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতির অবমাননা করা হয়। হয় ত সেই জন্যই এখনও শ্রীনগর গাড়োয়াল রাজধানী। যদিও প্রকৃত রাজধানী এখন পাউরীতে এবং শ্রীনগরের প্রাচীন, সমৃদ্ধসম্পন্ন, গৌরব শ্রীবিভূষিত অট্টালিকারাশির উপকরণ লইয়া পাউরীর সুন্দর সুন্দর শৈলনিকেতন নির্ম্মিত হইয়াছে। বড়কে ভাঙ্গিয়া ছোট করা, ছোটকে টানিয়া বড় করা বিধাতার কাজ। এ পৃথিবীতে নিরন্তর এ দৃশ্য দেখিতেছি—ইংরাজ আজ ভারতের বিধাতা, তাঁহারা বড় শ্রীনগরকে ভাঙ্গিয়া ছোট করিয়া ছোট পাউরীকে বড় করিয়াছেন। এজন্য আক্ষেপ বৃথা !

নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, কত অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদ্‌রাশি ভেদ করিয়া, কত গিরি নদী, উপত্যকা অধিত্যকা, কত পার্ব্বত্য জনপদ, তুষারসমাচ্ছন্ন গিরিপ্রান্তর, রৌদ্রদগ্ধ অগ্নিময় বন্ধুর-পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া—শ্রান্ত দেহে, ক্লান্ত হৃদয়ে যে দিন গাড়োয়ালরাজধানী পূর্ব্বশ্রীহীন শ্রীনগরে উপস্থিত হইলাম—সে দিন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন মঙ্গলবার। আমার উদ্দেশ্য, এইবার শ্রীনগর হইতে তিহরী যাইব। পূর্ব্বে একবার যখন শ্রীনগরের ভিতর দিয়া বদরিকা শ্রমে গিয়াছিলাম, তখন তিহরীর পথে যাই নাই; আমরা হরিদ্বার হইতে বরাবর শ্রীনগরের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। পথেরও শেষ নাই, আকাঙ্ক্ষারও বিরাম নাই, তাই এবার আমি এই নূতন পথ ধরিলাম; কিন্তু পথ নূতন হইলেও দেরাদুন গমনের ইহাই ঠিক পথ। শ্রীনগর হইতে দেরাদুন যাইতে হইলে হরিদ্বার প্রদক্ষিণ

করিয়া যাওয়া ঠিক নহে, অনেক ঘুরিতে হয়। জীবন যখন শোকতাপে প্রপীড়িত হইয়া ব্যগ্র বাহুদ্বয় বিস্তার-পূর্ব্বক মরুভূমির মরীচিকার মোহে শান্তির মৃগতৃষ্ণিকার সন্ধানে ব্যাধশরাহত পিপাসাতুর মৃগের ন্যায় উদ্ভ্রান্তভাবে ধাবিত হইয়াছিল, কোনও কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে নাই, সহস্র বিপদের মেঘমালা মস্তকের উপর ঘনীভূত দেখিয়াও বহুদূরবর্ত্তী লোকালয়ের দিকে ফিরিয়া চাহে নাই, তখন সেই বক্রপথে পরিভ্রমণে কিছুমাত্র শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না—কিন্তু এখন সেই শ্মশানের চিতাগ্নি-শিখা ধীরে ধীরে, নির্ব্বাপিত হইতেছে, চিন্তা আসিয়া চিতার স্থান অধিকার করিয়াছে, অবসাদ আসিয়া উন্মত্ততার প্রখরতা মন্দীভূত করিতেছে এবং হৃদয়-নির্ব্বাসিত গৃহ-সুখের কাতর আর্ত্তনাদ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ভারতের এই সীমান্তরালবর্ত্তী বিজন গিরিপদমূলে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়াছে। কাজেই এখন ঠিক পথেই চলিতে হইবে, এখন শ্রীনগর ভেদ করিয়া তিহরীর অভ্যন্তরপথে মসুরী পৌঁছিতে হইবে—সেখান হইতে ঐ ত দেরাদুন দেখা যাইতেছে, সে তাহার পাষাণ-বক্ষপঞ্জরে স্নেহবাহু দ্বারা বাঁধিবার জন্য অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঐ ক্রমাগত আমাকে আহ্বান করিতেছে। দেরাদুন আমার উন্মত্ত অধীর হতাশ হৃদয়ের প্রথম অবলম্বন, আমার প্রথম সন্ন্যাসের পবিত্র তপোবন, আমার নিরাশার উর্ম্মিমুখর অকূল সমুদ্রের আলোক-স্তম্ভ, আমার ইহকাল ও পরকাল, জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান লোপ করিবার সুবর্ণ সেতু। কত দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিলাম, হিমালয়ের সুমহান্ বিরাট সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না, পার্ব্বত্য নির্ঝরের নিত্য উৎসারিত রজত দ্রব তুল্য সুনির্ম্মল অমৃতধারা অঞ্জলী ভরিয়া পান করিয়াও মর্ম্মভেদী পিপাসার তীব্র জ্বালা প্রশমিত হইল না, তাই এখন ভগ্নমনে শূন্য হৃদয়ে, কম্পিত পদে, ক্লান্ত দেহে উৎকণ্ঠাকুল প্রিয়জন-সন্দর্শনলোলুপ প্রবাসীর ন্যায় আমার অন্তিম অবলম্বন দেরাদুনের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি—এখন বাঁকা পথ ধরিয়া আর কেন চলিব? তাই আজ সরল পথ ধরিয়া যাত্রা করিয়াছি। জানি একদিন এ যাত্রার অবসান হইবে, কিন্তু জীবনের শেষ দিন মহাযাত্রার আরম্ভের পূর্ব্বে এই বিয়োগ-বিষাদ-সমাচ্ছন্ন জীবন-নাটকের কয়েকটা শোচনীয় অঙ্ক কি ভাবে অভিনীত হইবে তাহা কে জানে? দুর্ভেদ্য অন্ধ-কার-যবনিকায় ভবিষ্যৎ আচ্ছন্ন!

শ্রীনগর হইতে বাহির হইয়াই আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে অলকনন্দার বক্ষে প্রসারিত লৌহ সেতু অতিক্রম করিলাম। নির্জ্জীব, ধূসর, বক্রতাবহুল ভুজঙ্গ দেহের ন্যায় যে পার্ব্বত্যপথ হরিদ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত, তাহা অলকনন্দার বাম পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা মন্থরগতিতে নদী পার হইলাম, নদীতীর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অলকনন্দা গিরিনদী, জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে তুষারবিগলিত জলধারা অলকনন্দার জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি করিয়াছে। গিরিনদী, বিস্তৃত-কায়া নহে, কিন্তু খর-স্রোতা। তাহার উপলবন্ধুর বক্ষ ভেদ করিয়া তুষার-নির্ম্মল সলিলরাশি, ফেনময় কলহাস্য তরঙ্গে প্রাণের সকল বাসনা ভাসাইয়া লইয়া, অধীর প্রবাহ নাদে তটভূমি ঝঙ্কারিত করিয়া প্রেমসিন্ধু অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। নদীবক্ষে কোথাও আবর্ত্ত, কোথাও জলরাশি পাষাণ অবরোধ লঙ্ঘন করিয়া প্রপাতের ন্যায় সশব্দে ঝরিয়া পড়িতেছে। গতির বিরাম নাই, বাধার প্রতি লক্ষ্য নাই, ভক্তের নিষ্ঠার ন্যায়, সাধুর পবিত্রতার ন্যায়, সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের ন্যায় এবং প্রবাসীর গৃহানুরাগের ন্যায় তাহা একান্ত একাগ্রতা পূর্ণ।

সেই পথ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া কতক্ষণ অলকনন্দার সেই রজত প্রবাহের দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহার অস্ফুট মর্ম্মকাহিনী যেন এক অর্থহীন রহস্য-ভাষের ন্যায় আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। একবার মনে হইল, কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় লক্ষ্যহীন হইয়া জ্বালাময় বক্ষে, অশান্তি ও অকল্যাণের কলঙ্কধ্বজা স্কন্ধে লইয়া কি উদ্দেশ্যে আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, জীবনের কোন সাধ, কোন আশা পূর্ণ হইল না, তথাপি জীবনধারণের এ বিড়ম্বনা কেন? তাহা অপেক্ষা যদি ঐ প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণীর ন্যায় জীবনের উভয় কূল প্লাবিত করিয়া চিরপ্রেমের অনন্ত পারাবারে, কৃপাসিন্ধুর বিশালতায় আপনার এই ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে পারিতাম! কিন্তু হায় সে সাধ্য আমার নাই, সাহস নিতান্ত সামান্য, বিশ্বাস নিতান্ত অল্প, অনন্ত

নির্ভরের প্রতি নির্ভর করিবার শক্তির একান্ত অভাব। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমি সেই তীর পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রবাহিণী আমার দুর্ব্বলতা দেখিয়া আত্মসম্মানভরে স্পর্দ্ধান্বিতা, আলোকে, পুলকে, গৌরবে ও তরলতায় ঝঙ্কারময়ী, বিপুল সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা বিশ্ববিমোহিনীর ন্যায় তাহার শুভ্র তরঙ্গের অঞ্চল হেলাইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিতে করিতে তাহার গতি-পথে ছুটিয়া চলিল।

পূর্ব্বে অনেকের কাছেই শুনিয়াছিলাম, 'এ সড়ক বহুৎ উমদা' অর্থাৎ চড়াই উৎরাইএর একান্ত অভাব। প্রকৃত পক্ষে অলকনন্দা পার হইয়া এক মাইলের মধ্যে পথের দুর্গমতা দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। কিন্তু এক মাইল পরে আমাদিগকে অলকনন্দার তীরভূমি পরিত্যাগ করিতে হইল; কারণ, সে পথ দেবপ্রয়াগে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং গতি পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক আমাদিগকে পর্ব্বতের উপর দিয়া তিহরীর পথ ধরিতে হইল। সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া একবার নূতন পথের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, উহা অসমতল, দুরারোহ, দুর্গম ঊর্দ্ধ ভূমি দিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতে আমি ভীত হইলাম না। কারণ এ বিদ্যায় আমি অনভ্যস্ত নহি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়াই ত আমি আমার জীবনের অনন্য অবলম্বন হিমালয়ের বক্ষে, তাহার দুর্গম উপত্যকায়, তাহার বিপদসঙ্কুল পথহীন অধিত্যকায় উন্মত্তের ন্যায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। ইহাই যদি আমার একমাত্র সাধনা হয়, তবে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ভগবান আমার সে সাধনা সিদ্ধ করিয়াছেন। আমি রত্নের সন্ধানে পর্ব্বতের শিখরে শিখরে বৃথা পরিভ্রমণ করিয়াছি। সমস্ত দিন পার্ব্বত্য-পথের সহিত সংগ্রাম করিয়া দিবাবসানে যখন শ্রমখিন্ন অবসন্ন চরণদ্বয় আর উঠিতে চাহিত না, যখন সমস্ত দিনের নিদারুণ রৌদ্রসন্তপ্ত, বিদীর্ণ-প্রায় ব্রহ্মরন্ধ্র লইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিতাম, সন্ন্যাসী জীবনের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অবলম্বন লোটা কম্বল ও উদ্দেশ্যহীন গুরু জীবনভার যখন অসহ্য বোধ হইত, তখন অভিমানী সন্তান স্নেহময়ী মাতার উপর রাগ করিয়াও যেমন তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে—আমিও সেইরূপ পর্ব্বতের উপর রাগ করিয়া ক্লান্ত দেহে উপলশয্যা অবলম্বন করিতাম। ধীরে ধীরে অন্ধকারে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হইত, চরাচর-ব্যাপী অন্ধকারের ক্রোড়ে সমুন্নত গিরিশৃঙ্গসমূহ লুপ্ত হইয়া যাইত, ঊর্দ্ধে অনন্ত বিস্তীর্ণ কোটীনক্ষত্রখচিত নীলাকাশ—স্তব্ধতার দিগন্তব্যাপী মহাসমুদ্র—চতুর্দ্দিকে শিখরে শিখরে নানা জাতীয় ওষধি মাধবের নীলবক্ষে কৌস্তুভের ন্যায় শোভা বিকীর্ণ করিত, সে কি এক রঙ্গ? তাহার উপর বিচিত্র বর্ণের প্রস্তর খণ্ড হইতে লাল, নীল, পীত, হরিত, প্রভৃতি বিচিত্র প্রভা ফুটিয়া উঠিত। শুইয়া শুইয়া মনে হইত যেন বিশ্বের অনাদি দেবতা তাঁহার অনন্ত রূপকে সান্ত করিয়া তাঁহার অস্তিত্বের অসীমতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া এই সীমা-হীন নৈশনিস্তব্ধতার মধ্যে যোগমগ্ন মহেশ্বরের ন্যায় দণ্ডায়-মান হইয়া পর্ব্বতবিহারী ভক্তগণের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী গ্রহণ করিতেছেন। নানা বর্ণের পুষ্প দ্যুতিমান হীরক খণ্ডের ন্যায় হারের আকারে তাঁহার কণ্ঠে বিলম্বিত, অর্ঘ্যের ন্যায় চরণোপান্তে প্রসারিত। দেখিতে দেখিতে গিরি অস্তরাল হইতে শশধরের রজতকৌমুদী-সংস্পর্শে অন্ধকারের স্বপ্ন-কুহেলিকা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইত। চন্দ্র আরও ঊর্দ্ধে উঠিত, তাহার বহু নিম্নে তুষারকিরীটিশুভ্র গিরিশিখর চন্দ্রা-লোক-চুম্বিত নিস্তরঙ্গ বারিধিবক্ষের ন্যায় প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করিত। আমি নিদ্রালস নেত্রে ঊর্দ্ধ গগনে চাহিয়া দেখিতাম, সেই খণ্ডচন্দ্র শুভ্রদেহ ব্যোমকেশের তৃতীয় নেত্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে, তাহা হইতে শান্তি ও প্রসন্নতা ক্ষরিত হইয়া রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু প্রপীড়িত ধরণীর বক্ষে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে—সেই অমৃতধারা ধীরে ধীরে আমার শ্রান্ত ললাটে আমার উত্তপ্ত মস্তকে বর্ষিত হইত—আমি অজ্ঞাতসারে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইতাম; দেহের জড়তা, মনের অবসাদ, প্রাণের হাহাকার বিশ্বজননী আমার শিয়রে বসিয়া কিরূপে দূর করিতেন তাহা জানিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রভাতে যখন সুখস্পর্শ সমীরণের মৃদু কম্পনে, অদূরবর্ত্তী বৃক্ষরাজির শরশর শব্দে, বনবিহঙ্গের সুমধুর বৈতালিক সঙ্গীতে আমি নয়ন উন্মী-লন করিতাম। তখন দেখিতাম, নবজীবন লাভ করি-য়াছি—ইহাই আমার দুর্গম গিরিপথের বৈচিত্র্যবিহীন ইতিহাস,—আমার তুচ্ছ জীবনস্বপ্নের চরম সার্থকতা।

নদী তীরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম, সম্মুখে আড়াই মাইল দীর্ঘ একটি চড়াই। এই চড়াই অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে সাড়ে তিন মাইল অবতরণ করিলে, তবে এক বেলার জন্য বিশ্রাম লাভের অবসর হইবে। মধ্যাহ্ন কালে আশ্রয়-স্থান ও আহার লাভের আশা ফলবতী করিতে হইলে, এই ছয় মাইল চড়াই ও উৎরাই পার হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কারণ, পথিমধ্যে অন্য কোন স্থানে চটি বা পান্থনিবাস থাকা দূরের কথা, এই ভয়ানক গ্রীষ্মের সুতীক্ষ্ণ সৌরকর হইতে মস্তক রক্ষা করিবার জন্য একটি শাখা-পত্র-ভূষিত ছায়া শীতল তরুতল পর্য্যন্ত কোন স্থানে বর্ত্তমান নাই—ছয় মাইল দূরে যে আশ্রয়স্থান, তাহাও আবার সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে। সেখানে তিহরীর রাজার একখানি বাংলা আছে—এই বাংলা অতিথিশালা নহে ডাক বাংলা, সাহেবেরা যাহাকে Dawk Bungalow বলেন, তাহাই। ইহা রাজকর্ম্মচারিগণের বিরামগৃহ, গৃহীর কর্ম্মক্ষেত্র। সাধু সন্ন্যাসীগণকে তাহার শত হস্ত দূরে দাঁড়াইয়া বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে রাজ কর্ম্মচারিগণের অখণ্ড প্রতাপের পরিচয় লাভ করিতে হয়। মস্তকের উপর দীপ্ত সূর্য্যকিরণ অধিক সুতপ্ত কি ধরাতলের এই সকল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর দণ্ডের উত্তাপ অধিক অসহনীয়—তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ অনুভব করিতে পারিবেন না। সেখানে যে আমাদের ন্যায় সন্ন্যাসীর মস্তক রক্ষা করিবার স্থান পাওয়া যাইবে, সে আশা আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। কিন্তু শুনিয়াছিলাম, ডাকবাংলার অদূরে একখানি ক্ষুদ্র দোকান আছে। তাহাকেই আমরা ডাকবাংলাতে পরিণত করিব, এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া দুস্তর চড়াই অতিক্রমের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

কি সঙ্কটাকীর্ণ সংকীর্ণ পথ! সূর্য্যদেব এখনও পূর্ব্বাকাশে, পূর্ব্বাহ্ণের অধিকার এখনও অক্ষুণ্ণ, কিন্তু তথাপি সেই দুঃসহ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করা কি কঠিন! পদতলে গিরিপৃষ্ঠ সূর্য্যোত্তাপে আলোকহীন উত্তাপসার কৃষ্ণবর্ণ বহ্নির ন্যায় জ্বালাময় হইয়া উঠিয়াছে; বৃক্ষ নাই, লতা নাই, ক্ষুদ্র তৃণ গাছটি পর্য্যন্ত নাই,—কেবল বক্রপথ, ক্রমাগত চড়াই; পদদ্বয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, নিশ্বাস রোধ হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া দরবিগলিত ধারায় ঘর্ম্ম ঝরিতেছে। তথাপি বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সমান সহিষ্ণুতার সহিত সেই প্রস্তরীভূত অগ্নিরাশির উপর দিয়া চলিতেছি; নিম্নে অগ্নি রাশি, ঊর্দ্ধে বহ্নিচক্র। একবার হৃদয়ের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, সেখানেও অগ্নির অভাব নাই, সেখানকার অগ্নি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসহ, সেই অগ্নিস্রোত বক্ষে ধরিয়া যুড়াইবার আশাতেই এই সুদুস্তর বহ্নিচক্রে ঝাঁপ দিয়াছি। সুতরাং নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া সেই অতি দুঃসময়েও মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ দার্শনিক তত্ত্বের উদয় হইল। মনে হইল, আজ এই পথকষ্টে এত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছি কেন, এত অশান্তি বোধ করিতেছি কেন? জীবনে শান্তি কবে পাইয়াছি, জ্ঞান সঞ্চারের পূর্ব্বেই শৈশবের অদ্বিতীয় অবলম্বন দণ্ড—জ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, ভক্তির প্রথম সোপান পিতৃদেবকে হারাইয়াছি, মায়ের অভাবের কথা আর বলিব না।—তাহার পর, যৌবন-মধ্যাহ্নে যখন চিরপ্রেমময়ী, প্রসন্নতাস্বরূপিণী, অসীম ধৈর্য্যশালিনী, মহিমতী শ্রদ্ধার ন্যায় মহিয়সী প্রণয়প্রতিমা পত্নীর প্রগাঢ় প্রেমসরোবরকূলে উপবেশন করিয়া ব্যাধ-তাড়িত, কম্পিতপক্ষ, ঘর্ম্মাপ্লুত বক্ষ, পিপাসী কপোতের ন্যায় আকণ্ঠ জলপানে পিপাসা পরিতৃপ্তির বাসনা করিতেছি, এমন সময়ে সহসা—কোন্ ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ড স্পর্শে সেই সরোবর মুহূর্ত্ত মধ্যে শুষ্ক হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইল—আমি সেই দিন হইতে সেই মরুভূমির উপর দিয়া মহাবেগে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছি—দিবা নাই, রাত্রি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্রমাগত চলিতেছি। এখন আবার কিসের ভয়, কিসের কষ্ট? আশাহীনের কোন কষ্ট নাই। হৃদয়ের যে অনলদাহ, বাহিরের উত্তাপে তাহার জ্বালা বাড়িবে না।

আমি ললাটের ঘর্ম্ম অপসারণ করিয়া, বিধাতার চিরমঙ্গলময় উদ্দেশ্যের প্রতি আমার সন্দেহান্দোলিত দুর্ব্বল হৃদয়ের সকল আগ্রহ কেন্দ্রীভূত করিয়া পর্ব্বত-ভ্রমণোপযোগী সুদীর্ঘ যষ্টির সহায়তায় কম্পমান পদে অবসাদবিকল উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে আরোহণ করিতে লাগিলাম। মনুষ্য যদি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের সময়ে, জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দিনে

ভগবানের করুণায় নির্ভর করিতে না পারিত, তাহা হইলে তাহার সকল সান্ত্বনার পথ যুগপৎ রুদ্ধ হইয়া যাইত, তাহার জীবনধারণ করা অত্যন্ত সুকঠিন হইত। আজ এই বিপদ্‌কালে যখন দেহ শ্রান্ত ক্লান্ত, পদদ্বয় অবসন্ন ও কম্পান্বিত, চলৎশক্তি রহিতপ্রায়, তখন ভগবানের করুণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। রৌদ্র-তপ্ত ধূসর মরুময় পর্ব্বতবক্ষে অনেক উর্দ্ধ চড়াইয়ে শ্যামল মেঘের ন্যায় যে দৃশ্য সন্দর্শন করিতেছিলাম, ক্রমে তাহা শালবনে পরিণত হইল। দেখিলাম প্রকাণ্ডকায় শাল বৃক্ষগুলি পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব পাদভূমি ছায়াসমাচ্ছন্ন করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার পত্ররাশি শর শর কম্পিত হইতেছে, নিবিড় পত্রান্তরালে বসিয়া বিহগদম্পতি মধুর স্বরে কূজন করিতেছে—মরুবক্ষোবিহারী পথশ্রান্ত তৃষাতুর পথিকের নয়ন সমক্ষে যেন ঢল ঢল বিমল সলিলপূর্ণ সবিৎ-চ্ছবি আমার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইল। মৃতের নিরানন্দময়, নিদারুণ শ্মশান ভূমি হইতে আমি যেন অমৃতের নবজীবন হিল্লোলিত শান্তিময় স্বর্গে উপস্থিত হইলাম। সেই পার্ব্বত্য শাল তরুনিচয়ের নিবিড় ছায়া আমার দগ্ধ মস্তকের উপর জগজ্জননীর মধুময়ী করুণাপরিপূত অঞ্চলের ন্যায় প্রসারিত হইল, কলকণ্ঠ বনবিহঙ্গের সেই মৃদু কাকলি যেন বহুদিনের বিস্মৃত বান্ধবের প্রীতি-ভরা মর্ম্মকাহিনী বহন করিয়া আনিতে লাগিল। পথ-শ্রান্ত সন্তান বহুদূর পথভ্রমণ করিয়া ঘর্ম্মাপ্লুত দেহে অবসন্ন চরণে স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ের কাছে আসিয়া পড়িলে মা যেমন সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অঞ্চল আন্দোলন করিয়া সন্তানের শ্রান্তদেহ শীতল করেন, সেইরূপ আমার বোধ হইল, প্রকৃতি জননী এই সুখহীন শান্তিহীন গৃহহীন অনাথ সন্তানের অসহনীয় ক্লান্তি দূর করিবার জন্যই শালবৃন্ত হস্তে আমার অলক্ষ্যে বসিয়া ধীরে ধীরে বীজন করিতেছেন। আমার নয়ন কোণে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইল, বিশ্বেশ্বরের অপার করুণার প্রতি সুগভীর বিশ্বাসে আমার ক্ষুদ্রতা ভরা মূঢ়তাপূর্ণ সন্দিগ্ধ হৃদয় ভরিয়া উঠিল, মাতৃমহিমায় মাতৃহীনের নিরাশ্রয় মরুচিত্ত বর্ষার প্লাবনে ক্ষুদ্র তটিনীর ন্যায় কূলেকূলে পরিপূর্ণ হইল। চড়াইএর সর্ব্বোচ্চ স্থানে আমি একটি শাল বৃক্ষমূলে আমার অবসন্নদেহভার স্থাপন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। বিহঙ্গের সেই কলগীতি, সমীরণের সেই অব্যাহতগতি, শালপত্রের সেই শরশর কম্পন ও আমার কল্পনামুখর কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাস কবির সুমধুর সঙ্গীতের ভাষায় যেন বিশ্বজননীর মহিমাময়ী প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। আমি অনুভব করিলাম—

"স্নেহ-বিহ্বল, করুণা ছল ছল
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে।
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগি রে।
* * *
করুণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা-
শান্ত করি মম অসীম যন্ত্রণা;
স্নেহ অঞ্চলে মুছায়ে আঁখি-জল,
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি-সাথে, আশীষ রাখে মাথে
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি রে।"

কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর সত্যই আমার সুপ্ত হৃদয় জাগিয়া উঠিল, আমার পথশ্রম অপনীত হইল। বেলা ক্রমে অধিক হইতেছে দেখিয়া আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিলাম। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চড়াইএ উঠিয়াছিলাম, এবার নামিতে হইবে। সম্মুখে "খাড়া উৎরাই" আমি দ্রুতপদে নামিতে লাগিলাম। পর্ব্বতারোহণ যেমন কঠিন, অবরোহণ তেমন কঠিন নহে, সাড়ে তিন মাইল নামিতে অধিক সময় লাগিল না। বেলা দশটা বাজিয়া গেলে, আমি পূর্ব্বকথিত রাজার বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। করোগেটেড্ আয়রণের ছাদ-বিশিষ্ট একখানি ক্ষুদ্র বাংলা। বাহিরের দিকে একটি অনতি-দীর্ঘ বারান্দা আছে, সেই বারান্দায় উঠিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, দ্বার রুদ্ধ, শিকলে তালা লাগান, কোন দিকে জন মানবের সম্পর্ক নাই। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া একবার তালা নাড়িয়া দেখিলাম, কিন্তু তালা খুলিল না। তখন উঠিয়া অগত্যা অদূরবর্ত্তী দোকানে চলিলাম। দেখিলাম, সে দোকান খানিও বন্ধ, তাহাতেও তালা লাগান রহিয়াছে।

বাংলার চৌকীদারের কোন সন্ধান নাই, দোকানের দোকানীও নিরুদ্দেশ! তাহাদের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে এমন লোকও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম এই নিদারুণ পরিশ্রমের পর ভগবান এবেলা আমাদের অদৃষ্টে একাদশার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ ব্যবস্থায় কিছুমাত্র নূতনত্ব ছিল না। কারণ পর্ব্বতভ্রমণ আরম্ভ করিয়া একাদশীতে আমরা নিত্য অভ্যস্ত। এ ত আর সখের পথভ্রমণ নহে, আবশ্যকানুরোধে 'রিফ্রেশ-মেণ্ট রুমের' বন্দোবস্তও কোথাও নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া কখন কখন দুই দিনও নিরম্বু একাদশী করা গিয়াছে, পুর্ণিমা প্রতিপদ তাহাতে বাধাদান করিতে পারে নাই। তাই সম্মুখে আহারাভাবের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রাণে কিছুমাত্র আতঙ্কের সঞ্চার হইল না; বেশ নিশ্চিন্তচিত্তে বসিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম। মনে হইল, আজ যদি আমার সঙ্গে বদরিকাশ্রম ভ্রমণের সঙ্গী পরম বৈদান্তিক শ্রীমান অচ্যুতানন্দ স্বামী থাকিতেন, তাহা হইলে এই জনহীন গিরি প্রান্তবর্ত্তী পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া মূর্ত্তিমতী ক্ষুধার আক্রোশের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার বিরক্তিপূর্ণ বদনব্যাদান, তাঁহার নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভ্রুকুটীভঙ্গী এই অবিচল স্তব্ধ পান্থশালাকেও বিচলিত করিয়া তুলিত। শ্রীমান্ সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন কেন, কোন দিন তাহা আমার ন্যায় সুহৃদ্বরের নিকটও প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যত দিন তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তাহার সন্ন্যাসের একমাত্র অবলম্বন লোটা কম্বল, তাঁহার উৎকট পাণ্ডিত্যের একমাত্র পরিচয় কঠোর বেদান্ত দর্শনের কূট যুক্তি তাঁহার ক্ষুধার দাহিকাশক্তি কোন দিন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই। কিন্তু অচ্যুত স্বামী আর আমাদের সঙ্গে নাই। কক্ষচ্যুত ভ্রাম্যমান ধূমকেতুর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ আমরা একত্র হইয়াছিলাম, সুখে দুঃখে কত দিন একত্র কাটিয়া গিয়াছে। কত দিন অবোধ শিশুর যুক্তিহীন আবদারের ন্যায় তাহার স্নেহের আবদার সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহার আদর তাহার অভিমান, তাহার ক্রোধ এবং অনুনয় বিনয়ের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ছিল না। তাহার প্রকৃতি ঠিক পার্ব্বত্য প্রকৃতির অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সহসা এক দিন পথপ্রান্ত হইতে সে সেই উচ্ছ্বসিত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তপক্ষ বন-বিহঙ্গের ন্যায় কোথায় উড়িয়া গিয়াছে কে জানে? তাহার কথা এখন এই অকিঞ্চিৎকর জীবন নাটকের একাংশ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

তিহরী রাজের ডাকবাংলার বারন্দায় কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর শ্রান্ত দেহ বিস্তীর্ণ করিয়া নিমিলিত নেত্রে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম; কতক্ষণ সে ভাবে ছিলাম বলিতে পারি না। সহসা চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, পাকা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে লইয়া একটা লোক সেই বাংলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে একটা মানুষ দেখিয়া প্রাণে কিছু আশার সঞ্চার হইল। লোকটা হয় ত ভাবিয়াছিল, কোন সাধু এখানে শুইয়া শুইয়া ভগবানের চরণ ধ্যান করিতেছে—আমি যে সংসার ছাড়িয়া তখনও সংসারের মায়ামোহ ও ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা চিন্তা করিতেছিলাম, তাহা সেই মানবচরিত্রানভিজ্ঞ পর্ব্বতবাসী সরল মূর্খ কি করিয়া বুঝিবে? সে আমাকে প্রসারিত নেত্রে সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিল। গেরুয়া বসনের মাহাত্ম্য! আমি উঠিয়া বসিয়া তাহাকে বসিবার জন্য অনুমতি করিলাম। সে একটু সঙ্কুচিত ভাবে দূরে বসিয়া কথা প্রসঙ্গে আমাকে জ্ঞাত করিল যে, এই বাংলা-রক্ষক চৌকিদার মহাশয় কোন বিশেষ রাজকার্য্য ব্যপদেশে তিহরী গিয়াছেন, আজ প্রত্যাগমনের কোন সম্ভাবনা নাই। দোকানদার মহাশয়ও দোকান বন্ধ করিয়া ঘরে গিয়াছেন, তাঁহার ঘর কিছু দূরে। এ পথে সর্ব্বদা লোক জনের গতিবিধি না থাকায় দোকান খানি অনেক সময়েই বন্ধ থাকে। হাতে বিশেষ কাজ কর্ম্ম না থাকিলে আর তিনি তাঁহার পণ্যশালায় শুভাগমন করেন না। আগন্তুক লোকটি এই স্থান হইতে তিন মাইল নিম্নবর্ত্তী কোন গ্রামের জমীদারের পাইক। জমীদার মহাশয়ের সহিত সে দূরবর্ত্তী কোন এক গ্রামে গিয়াছিল, কার্য্য শেষে ফিরিয়া আসিতেছে। শুনিলাম, জমীদার মহাশয়ও পশ্চাতে আসিতেছেন। পাইক আশ্বাস দিল, জমীদার মহোদয়ের আগমন হইলে সাধুসেবার আয়োজন হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনার কথা শুনিয়া সাধুর মনে যে নিরতিশয় আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা পাইক বেচারা বুঝিতে

পারিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সাধুজি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত জমীদারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পাইকের মুখে শুনিলাম, এখান হইতে ছয় মাইল দূরে বাজার আর একখানি বাংলা আছে কিন্তু সেখানে দোকান পাট কিছু নাই, সেখান হইতে যদি আরও ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারা যায়, তবে এক খানি দোকানে ঘি আটা মিলিতে পারে। নিদাঘ মধ্যাহ্নের এই ভয়ানক রৌদ্রে পরিশ্রান্ত দেহে পাহাড়ের উপর দিয়া এই দ্বাদশ মাইল পথ ভ্রমণের উৎসাহ আগ্রহ বা সামর্থ্য আমার ছিল না। বিশেষতঃ সেই দোকানদারও যদি এই দোকানীর মত তাহার দোকান বন্ধ করিয়া 'ঘর' গিয়া থাকে, তবে ক্ষোভ ও বিরক্তি ভিন্ন অন্য কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং জমীদার মহাশয়ের আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকাই সঙ্গত জ্ঞান হইল।

অবশেষে জমীদার মহাশয় সেই বাঙ্গলায় আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে আরও দুজন লোক। এতগুলি লোক নিশ্চয়ই একত্র একাদশী করিবে না ভাবিয়া আমি কিছু প্রসন্ন হইলাম। জমীদার মহাশয় সাধুর অভিবাদন করিলেন। বলিলেন বহুপুণ্যফলে এমন নির্জ্জন স্থানে তাঁহার সাধুসন্দর্শন হইল। পুণ্যফল কাহার অধিক, সে কথা চিন্তা করিয়া আমি সহাস্যমুখে জমীদার মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিলাম।

সাধুসেবা প্রসঙ্গের আশায় পাঠক পাঠিকাগণকে উৎকর্ণ রাখিয়া এখন বিদায় গ্রহণ করি। তাঁহাদের ধৈর্য্য অপেক্ষা পরিশ্রান্ত সাধুর ক্ষুধাতৃষ্ণা অল্প নহে।†

শ্রীজলধর সেন।

অমিতাভ।*

(সমালোচনা)

বুদ্ধদেব-কথা চিরকালই হিন্দুর, বিশেষতঃ বঙ্গবাসী হিন্দুর, আদরের সামগ্রী। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের অনতিদূরে চিরতুষারমণ্ডিত হিমাচলের পাদদেশে কপিলবস্তু নগরে সিদ্ধার্থের জন্ম ও হিন্দুর পরমতীর্থ গয়ার সন্নিকটে বোধিদ্রুমমূলে তাঁহার বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি হয়। মগধ (বর্ত্তমান বিহার)—অধিপতি রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম তদ্দেশে অতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। নালন্দার বৌদ্ধমঠে সহস্র সহস্র ছাত্র বৌদ্ধধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনশিক্ষা করিত। ভক্ত বাঙ্গালী কবি জয়দেব কর্ত্তৃক বুদ্ধ হিন্দুদিগের নবম অবতাররূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শাক্যসিংহের সুন্দর উন্নত ও পবিত্র জীবন মনুষ্যমাত্রেরই প্রীতিপদ। বিশেষতঃ 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' প্রভৃতি সর্ব্বভূতে দয়াত্মক নীতিগুলি অতি সহজেই কোমল বাঙ্গালীচিত্তের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। বৌদ্ধ দর্শনের ন্যায় হিন্দুদিগের সাংখ্যদর্শনের মতেও সংসার অশেষ দুঃখের আকর, সাংসারিক সুখ কুপিত-ফণিফণাচ্ছায়াতুল্য। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই হিন্দুদার্শনিকের 'মুক্তি', জন্ম পরিগ্রহজনিত অবশ্যম্ভাবী ক্লেশনিবৃত্তি বৌদ্ধদিগের 'নির্ব্বাণ'। কপিল দর্শন প্রকৃতির কোন সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব মানেন না, বৌদ্ধধর্ম্মও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব। কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ভিত্তি, উভয়ই হিন্দুধর্ম্মে স্বীকৃত। সুতরাং হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। "প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধমতে অনুপ্রাণিত। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট ও নিবিষ্ট।" বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইলেও সংস্কৃতভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ, বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য, ভাস্কর্য্য ও অশোক প্রভৃতির তাম্রশাসনে ভারতের সর্ব্বত্র তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং নেপাল, তিব্বত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, সাইবিরিয়া প্রভৃতি এসিয়া খণ্ডের অধিকাংশ স্থলে অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা সমধিক অনুচর-পরিবৃত হইয়া চতুর্ব্বিংশতি শতাব্দী ধরিয়া সতেজে বিরাজ ও সাতচল্লিশ কোটি মানবের পথপ্রদর্শন করিতেছে। যে মহাত্মা হইতে এহেন ধর্ম্মের উৎপত্তি, তাঁহার শিক্ষাপ্রদ চরিতাখ্যান একজন বাঙ্গালী হিন্দুকবির পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক।

বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত বৌদ্ধলেখকগণ কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে সংস্কৃত, পালি, নেপালী, তিব্বতীয়, চীন ও জাপানী ভাষায় রচিত হইয়াছে। তাঁহার কোন জীবনচরিতই সুশৃঙ্খল ও সুসম্বদ্ধ নহে; সকলগুলিই অসম্ভব অলৌকিক জনশ্রুতি ও পরস্পরবিরোধী ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ, এবং ভক্তজনসুলভ অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট। তদুপরি

† লেখক মহাশয় যে বেশে হিমাচল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার একখানি প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।—প্রদীপ-সম্পাদক।

* শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত।

বৌদ্ধধর্ম্ম বেদাদিষ্ট যাগযজ্ঞ ও জাতিভেদের বিরোধী হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধের জীবনাখ্যায়িকা নানাবিধ কুৎসিতবর্ণে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সুতরাং এই সকল আবর্জ্জনাময় মূল পুস্তক হইতে বুদ্ধের জীবনের একটি ধারাবাহিক বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রস্তুত করা সম্ভবপর নহে। বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত হয়, তাহাদিগকে ত্রিপিটক বলে। তাহার প্রথমভাগ সূত্র, অর্থাৎ বুদ্ধের স্বীয় উপদেশাবলী, দ্বিতীয়ভাগ অভিধর্ম্ম অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শন, তৃতীয় ভাগ বিনয় অর্থাৎ বৌদ্ধ নীতি-বিজ্ঞান। সূত্রসমূহই বুদ্ধের জীবনেতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি; তৎপরেই গাথা, অর্থাৎ সমসাময়িক ভাটগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্মমণ্ডলীর সমক্ষে গীত বুদ্ধের জীবনী, উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কেবল সূত্র ও গাথা হইতে বুদ্ধের জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। খ্রীষ্টের জন্মের ৩০০—৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত 'ললিত বিস্তর' নামক গ্রন্থে বুদ্ধের জন্ম হইতে সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, এবং বহু অলৌকিক ঘটনা-সম্বলিত হইলেও তাঁহার জীবনের সেই অংশ সম্বন্ধে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। অবশিষ্টাংশ সূত্র প্রভৃতি হইতে সঙ্কলন করিতে হয়। পালি ভাষায় বুদ্ধঘোষ প্রণীত বুদ্ধের যে জীবনী আছে, তাহাতে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বুদ্ধের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বিবৃত হইলেও তাহা সম্পূর্ণ প্রামাণিক নহে। কারণ, উহা বুদ্ধদেবের প্রায় সহস্র বৎসর পরে বিরচিত।

বুদ্ধের কোন সুশৃঙ্খল জীবনী না থাকায় এতাবৎ কয়েকজন পণ্ডিত ব্যতিরেকে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ঘোরতর অজ্ঞতা বর্ত্তমান ছিল। পনের বৎসর হইল, সুকবি এড্‌উইন্ আর্ণল্ড Light of Asia নামক একখানি উচ্চশ্রেণীর কাব্যরচনা দ্বারা এই অজ্ঞান তিমির অনেকাংশে দূরীভূত করিয়াছেন।* পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় বিরচিত হওয়াতে যদিও আমাদের সমালোচনার সীমাবহির্ভূত, তথাপি বিষয়ের ঐক্যনিবন্ধন 'অমিতাভ' সমালোচনায় তুলনার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে উহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইব।

মহাকাব্যরচনার পক্ষে অমিতাভের জীবনী অপেক্ষা উচ্চতর ও যোগ্যতর বিষয় কল্পনা করা দুরূহ। মহাকাব্যের বিষয় যেরূপ মহান্ ও উন্নত হওয়া আবশ্যক, উহা তাহার অনুরূপ, এবং মহাকাব্যের উদ্দেশ্য যে লোকশিক্ষা, শাক্যজীবনী অপেক্ষা তদ্বিষয়ে অধিকতর অনুকূল আমরা আর কিছু জ্ঞাত নহি। উহাতে কাব্যসুলভ লাবণ্য ও রোমান্স্‌দ্বারা ভূষিত হইবার উপযুক্ত অলৌকিকত্বেরও অপ্রতুল নাই। বিষয়টিতে শান্ত,করুণ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক রসোদ্রেকের যথেষ্ট উপাদান আছে। মানবহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কোমল, গম্ভীর, মধুর প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকার ভাবরাজি মন্থন করিয়া প্রত্যেক মানবের সহানুভূতি আকর্ষণদ্বারা অন্তঃকরণ উন্নত ও মার্জ্জিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আবার বিষয়টি কবির কল্পনাশক্তি, শিল্পকুশলতা ও রচনা চাতুর্য্যের উত্তম বিকাশক্ষেত্র। কারণ, জগতের যাবতীয় বিলাস সামগ্রীতে পরিবৃত ও নিরন্তর ভোগসুখে নিরত থাকিয়াও গৌতমের হৃদয়ে যে মহান্ বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার ক্রমবিকাশ-প্রদর্শন প্রতিভাশালী কবি ব্যতিরেকে অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। নবীনচন্দ্রে এরূপ একজন কবি পাইয়া আমার আলোচ্য কাব্যখানির সম্বন্ধে যতদূর আশান্বিত হইয়াছিলাম, ততদূর সফলকাম না হইলেও অনেকাংশে উহা চরিতার্থ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

প্রকাশক বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন যে, কোন কোন সমালোচকের মতে পলাসির যুদ্ধের পর অমিতাভের ন্যায় কাব্য নবীন বাবুর লেখনী হইতে বাহির হয় নাই। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমরা কোন ক্রমেই এই মতের সমর্থন করিতে পারিতেছি না। পলাসির যুদ্ধের সেই জ্বালাময়ী ভাষা, আশ্চর্য্য বর্ণনাশক্তি, অদ্ভুত

* Perhaps the work which has brought Buddhism to a larger circle of Western readers than it had hitherto reached is Mr. Edwin Arnold's Light of Asia—a poem which has undeniable merits, and is likely to maintain its rank among the narrative poems of modern times…………I doubt if all that has been done by oriental scholars has contributed so much to the sympathy of Christians with a great religion foreign to their own as this entrancing poem. The surprise and delight with which it was greeted was remarkable and was really painful evidence that the Western community at large were in a state of densest ignorance concerning Buddha and Buddhism before the publication of this work."—**Rev. S. Fletcher Williams** (*Reported in The Indian Mirror, November 3, 1899*).

"শব্দ-চতুরতা"—অমিতাভে বড় পরিদৃষ্ট হয় না। আমাদের মতে পুস্তকখানি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত না হইয়া মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্টের ন্যায় আদ্যোপান্ত এক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হইলেই ভাল হইত; অবশ্য ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট যে গীতিকবিতা আছে, তৎসম্বন্ধে একথা প্রযুজ্য নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী ও অমিত্রাক্ষর প্রভৃতির একত্র সমাবেশে যেন বিষয়ের গাম্ভীর্য্য, গুরুত্ব, ও ধারাবাহিকতা রক্ষার পক্ষে ব্যাঘাত হইয়াছে। আর্ণল্ডও শেষ সর্গের কতক অংশ ব্যতীত সর্ব্বত্র এক অমিত্রাক্ষর ছন্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন।

বর্ণনাশক্তিতে যে নবীন বাবুর পূর্ব্বাপেক্ষা অধঃপতন হইয়াছে, 'অমিতাভে' তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বোধ হয় রুরি পলাসির যুদ্ধ ও কুরুক্ষেত্রেই তাঁহার সমগ্র বর্ণনাশক্তি নিঃশেষ করিয়াছিলেন' অতঃপর আমরা কেবল মধ্যে মধ্যে তাহার বিকাশ দেখিতে পাই মাত্র। এবিষয়ে আর্ণল্ডের সহিত তুলনায় তিনি নিতান্তই খাট হইয়া পড়েন। হলোৎসবের দিন বাসন্তিক প্রকৃতির মুক্তদৃশ্যের আর্ণল্ড কি সুন্দর বর্ণনাই করিয়াছেন। নবীন বাবু সে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। সিদ্ধার্থের প্রমোদভবন নির্ম্মাণের একটি বিস্তৃত মনোহর বিবরণ Light of Asiaর দ্বিতীয় সর্গে দেখিতে পাই, নবীনবাবু কয়েকটি ছত্রেই তাহার নিঃশেষ করিয়াছেন। এইরূপ কপিলবস্তুর নাগরিকগণের দৈনিক জীবন, রাজগৃহে সূর্য্যোদয়, সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভে প্রকৃতির আনন্দোৎসব প্রভৃতির বর্ণনাতে আর্ণল্ডের শ্রেষ্ঠ বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সে দিনের মত মহান্, গম্ভীর, কবিকল্পনা উদ্দীপক ও সুফল প্রসূ ঘটনা মানবের ইতিহাসে অতি অল্পই ঘটিয়াছে। যে দিন গৌতম স্বীয় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া মানবের হিতার্থ বনবাসী হইয়াছিলেন, একবার সেই ঘটনাটি কল্পনা করা যাউক। প্রথম দৃশ্য,—সিদ্ধার্থ গোপাপ্রমুখ অপ্সরাবিনিন্দিত রমণীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ ও বিলাসিতাপূর্ণ ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রমোদভবনে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার এক দেবকান্তি পুত্র জন্মিয়াছে; সমগ্র রাজপুরী আনন্দে মগ্ন; কিন্তু সিদ্ধার্থের চিত্ত নিরানন্দ। তিনি বার্দ্ধক্য, জরা, মৃত্যু ও সন্ন্যাস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন যে, সংসারে সুখাশা মরীচিকায় জলভ্রমমাত্র, যদি কিছু সুখ থাকে—তাহা সংসারে বীতরাগ সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেই আছে। পরবর্ত্তী দৃশ্য,—নিশীথ সময়, সমগ্র পুরী নিস্তব্ধ ও নিদ্রামগ্ন; গোপা একবার স্বপ্নদর্শনে চমকিয়া উঠিয়াছেন, সিদ্ধার্থ আশ্বাসবাণী দ্বারা পুনরায় তাঁহার নিদ্রাসম্পাদন করিয়াছেন, সিদ্ধার্থের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তিনি ইহাই উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া যাবতীয় ভোগবিলাস স্ত্রী পুত্র, রাজ্য প্রভৃতি জীবনে যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক মানবের উদ্ধারের নিমিত্ত স্বার্থত্যাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও উচ্চ লক্ষ্যানুসরণের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ধর্ম্মে সিদ্ধ হইবার নিমিত্ত নির্গত হইলেন। সেই ধর্ম্মের আলোকে এখনও জগতের এক তৃতীয়াংশ মানব স্বীয় জীবন পরিচালিত করিতেছে। কবির কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি কত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, তাহা প্রদর্শনের বোধ হয় এতদপেক্ষা উচ্চতর, ভাবময়, মহান্ বিষয় কল্পিত হইতে পারে না। আর্ণল্ডের Light of Asiaর তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এবং বর্ণনাগুণে এই অংশটি তাঁহার কাব্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। অমিতাভের 'বৈরাগ্য', 'মহানিশি' 'বিদায়' ও 'মহানিষ্ক্রামণ' এই চারিটী অধ্যায়ে উহা বিবৃত হইয়াছে। যদিও উহাতে নবীন বাবুর কবিত্বশক্তি ও উজ্জ্বল কল্পনার পরিচয়ের অভাব নাই, তথাপি বর্ণনাগুণে উহা আর্ণল্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।*

অমিতাভ পাঠে পাঠকের চিত্তে কবি-প্রতিভার অবনতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকিলেও পুস্তকের সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ কবির হস্তাক্ষর প্রতীয়মান হয়। নিম্নে বারাণসীর বর্ণনা উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতেই পাঠক উপরিউক্ত বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

> বঙ্গদেশ জনপদ করি অতিক্রম
> হইলেন উপনীত বারাণসী ধামে
> ভারতের মহাতীর্থ। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে

* যে রাত্রে সত্যের উদ্দেশে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগী হন, সেই স্মরণীয় নিশীথে গোপা স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলে সিদ্ধার্থের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয়, সে দৃশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া ঠকবি আর্ণল্ড উভয়ের প্রেমের একটি সুন্দর আভাস দিয়াছেন। গিরিশ বাবু তাঁহার 'বুদ্ধদেব চরিতে' তাহার অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু অমিতাভে তাহা নাই।

শোভিতেছে কাশী নীলা ভাগীরথী তীরে
নীলাকাশে অৰ্দ্ধশশী। হৰ্ম্ম্য শত শত
সোপান চরণ জলে করি নিমজ্জিত
দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ মহাযোগী মত
ভস্ম আচ্ছাদিত দেহ শান্ত প্রতিবিম্ব
পড়ি শান্ত সলিলেতে দুইটি শিবির
বিকাশিছে কিবা শান্তি পবিত্রতাময়
দেবালয় বিদ্যালয় শত সংখ্যাতীত
শোভিতেছে স্থানে স্থানে। যোগী শত শত
পণ্ডিত সন্ন্যাসী বিপ্র তাহে নিমজ্জিত
অধ্যয়নে কিম্বা নানা শাস্ত্র আলাপনে।
ঢাক ঢোল কাংস্য ঘণ্টা করতাল রব
পরিপূর্ণ কাশীধাম লোক কোলাহলে
সোপান সৈকত জল স্থল রাজপথ
আচ্ছন্ন মানবে নানাবাসে বিচিত্রিত।
সোপানে সৈকতে জলে বক্ষ নিমজ্জিত
কত কণ্ঠে কত স্তোত্র হইতেছে গীত
কত নরনারী কণ্ঠে মন্ত্রের রহিয়া
যাইছেন ভাগীরথী বহি পুষ্পভার
অগুরু চন্দন পুষ্প ... সম্ভাষিত
ধর্ম্ম কোলাহলে পূর্ণ বারাণসী ধামে
বদ্ধ করিলেন স্থির করিতে প্রচার
নবধর্ম্ম ভেরী রবে দুন্দুভি নিনাদে
*   *   *   *   *
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা দেবী ধূসরা যোগিনী
ধূসরা কুন্তলা বালা ধীরে নিশীথিনী
উপাসিকা কুলনারী নীলমণিময়
পুষ্প পাত্রে মনোহর শ্বেত পুষ্পনিভ
লইয়া নক্ষত্ররাশি অনঙ্গরূপিণী
আসিলেন মহাতীর্থে। ধীরে আরতির
কোলাহল নীরবিল হইল নীরব
চরাচর কাশীধাম সুষুপ্ত নীরব (৪৫—৪৭ পৃ)

যিনি প্রদোষকালে নদী বক্ষ হইতে বারাণসীর শোভা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনিই এই বর্ণনার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। রাজগৃহ, গয়া, নৈরঞ্জনা তীরস্থ বনভূমি প্রভৃতির বর্ণনাও মনোহর, পাঠক স্বয়ং তাহা দেখিয়া লইবেন, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

অমিতাভ Light of Asia অপেক্ষা ঘটনাবহুল, এবং ললিত বিস্তরের অধিকতর অনুগামী। আর্ণল্ড যে সকল বিষয়ের কোন উল্লেখই করেন নাই, নবীন বাবু তাহা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গৃহ পরিত্যাগ কালে সিদ্ধার্থ পিতার নিকট বিদায় লইতে গিয়াছিলেন, আর্ণল্ড তাহার কোন উল্লেখই করেন নাই। সিদ্ধিলাভের পর প্রচার কালীন অনেকগুলি ঘটনা তিনি বাদ দিয়া গিয়াছেন, নবীন বাবু তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত গাথাটি নবীন বাবু কেমন সরল ও সহজ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, পড়িলে মনে হয় না ইহার ভাবগুলি অন্য কোন পুস্তক হইতে গৃহীত। কিন্তু পাঠক ললিত বিস্তরের একাদশ অধ্যায় খুলিলে দেখিতে পাইবেন, নবীন বাবু কত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মূলের অনুগামী হইয়াছেন। ইহা অবশ্য তাহার বিশেষ প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই ;—

জরা মৃত্যু দুঃখ ভরা হায়। এই ত্রিভুবন,
মরণ অগ্নিতে দীপ্ত অনাশ্রয় অকিঞ্চন।
কুম্ভগত ভ্রমরের মত হায়। জীব আর
মর ণর হস্ত হতে নাহি কি উদ্ধার তার ?
শারদীয় অভ্র সম অনিত্য এ রঙ্গালয়,
জন্ম মৃত্যু নিরন্তর করিতেছে অভিনয়।
বেগবতী নদী মত চঞ্চল বিদ্যুৎপ্রায়
মানব জীবন দ্রুত কোথায় চলিয়া যায়।
অজ্ঞান আঁধারে ঘোর তৃষ্ণায় পীড়িত নর
কুম্ভকারের চক্র মত ঘুরিতেছে নিরন্তর
ইন্দ্রিয়ের সুখ লুব্ধ হায়রে মানব যত,
জড়িত ব্যাধির জালে প্রবুদ্ধ মৃগের মত।
বাসনা জ্বলন্ত বহ্নি তাহার ইন্ধন ভোগ
ভোগ সুখ স্বপ্ন সম জলে চন্দ্র ছায়া যোগ।
যৌবনে সুন্দর দেহ হলে জরা ব্যাধি গত
করে নর পরিহার মৃগে শুষ্ক হ্রদ মত।
ফলিত পুষ্পিত চারু বৃক্ষসম দেহ হায়।
জরা আসি মিলে হয় তাড়িৎ আহত প্রায়।
কহ মুনে। মানবের কি আছে উপায় বল ?
জরা দহে দেহ যথা তপ্ত বিষ বনস্থল।
হবে পরাক্রম বেগ সুরূপ বিরূপ করে
হরে সুখ হবে শান্তি ব্যাধি দগ্ধ করে নরে।
কহ মুনে। মানবের কি আছে উপায় বল !
নির্ব্বাণ হইবে কিসে জরা ব্যাধি দুঃখানল ?
শিশিরে তুষারপাত প্রফুল্ল কমল প্রায়
হায়। দেহ, বল রূপ,—সকলই শুকায়ে যায়।
নিপতিত নদীবক্ষে বিশুষ্ক পত্রের মত
এ সংসারে প্রিয়জন ভাসিয়া যায় সতত।
যে যায় সে যায় হায়। কেহ ত না ফিরে আর,
মিলন তাহার সহ নাহি হয় আরবার।
সকলি মৃত্যুর বশে মৃত্যু বল বশে কার ?
জন্ম জরা মরণের বিষে পূর্ণ এসংসার।
ক'রেছিলে প্রণিধান সিদ্ধার্থ ! কি মনে হয়—
উদ্ধারিতে এ সংসার ? উপস্থিত সে সময়।
(৩৮—৪০ পৃঃ)

পাঠক উদ্ধৃত গাথাটি মূলের সহিত মিলাইয়া পড়িয়া দেখিবেন, যে সকল উপমাদ্বারা উহার রমণীয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই মূল হইতে গৃহীত। এই-রূপ অনেক স্থলে নবীন বাবু ভাব, শব্দ, উপমা, এমন কি এক একটি সমগ্র পদ মূল হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু

তাঁহার প্রশংসার কথা এই যে, তাহাদিগকে পুস্তক মধ্যে এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে বর্ণনার ধারাবাহিকতা বা পারম্পর্য্য কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই, অথচ কবিতার সৌন্দর্য্য অধিক মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবির কাব্যশিল্পের একটি প্রধান পরিচয় উপমার উৎকর্ষ ও উপযোগিতা, অমিতাভে নবীন বাবুর কাব্য-শিল্পের সেরূপ পরিচয় যথেষ্ট আছে, নিম্নলিখিত উপমা-টিতে অন্যান্য রমণীগণের তুলনায় গোপার শ্রেষ্ঠত্ব কেমন পরিস্ফুট হইয়াছে।—

একে একে ভাও শিবে গেল বালাগণ,
গেল চন্দ্র কিরীটিনী যামিনী যেমন।
*   *   *   *
*   *   *   একি দরশন!
কৌমুদী যামিনী শেষে উঠিল কি ভাসি
উষার আলোক রাশি সুপ্রভাতে হাসি!
দণ্ডপাণি-সুতা গোপা অতি ধীরে ধীরে
প্রবেশিল দিবা যেন অশোক মন্দিরে। (২৯ পৃ.)

শব্দের সহিত ভাবের সামঞ্জস্য (onomatopœia) দ্বারা ভাষাটী অনেক স্থলে মনোরম করা হইয়াছে যথা—

ঢলাঢলি করি রঙ্গে, করি গলাগলি
করিতেছে হুলুধ্বনি পুরাঙ্গনাগণ,—
হাসির তরঙ্গ ভঙ্গে কটাক্ষ ঢালিয়া। (৫৫ পৃ)

এখানে 'ঙ্গ' এবং 'ল' এই দুটী বর্ণের বাহুল্যদ্বারা হাস্যের তরলতা সূচিত হইতেছে।

এস্থলে নবীন বাবুর রচনা পদ্ধতির (Style) একটী দোষোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শব্দ-বিশেষের পুনরুক্তি স্থলবিশেষে শ্রুতিসুখকর হয় এবং পদটীকেও সুন্দরতর করে, কিন্তু পুস্তকের যত্র-তত্র এইরূপ পুনরুক্তি করিতে গেলে তাহা কবির একটি মুদ্রাদোষ (mannerism) বলিয়া পরিগণিত হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভেই আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই :—

শাক্য-রাজ্য সুখে ভরা, ধন ধান্যে প্রেম পুণ্যে
পরিপূর্ণ দেশ মনোহর,
ধন ধান্যে, প্রেম পুণ্যে পরিপূর্ণ রাজপুরী,
পরিপূর্ণ রাজার অন্তর।
প্রেম পুণ্যে বিভাসিত শান্তির সুনীলাকাশে
তবু যেন হয়েছে সঞ্চার— ইত্যাদি। (৩ পৃঃ)

আবার ৬ পৃষ্ঠায়ই—

প্রকৃতি মেলিছে আঁখি, ভাসিছে নির্ম্মলাকাশে
বসন্তের প্রথম নীলিমা।
প্রথম মলয়ানিলে ফুটেছে প্রথম ফুল,
ফুটিছে প্রথম কিশলয়।
প্রথম পাখীর গান, পুষ্পের প্রথম ঘ্রাণ,
কানন করিছে সুধাময়।
প্রথম বসন্তোন্মেষে দেবীর হৃদয়ে যেন
কিবা স্বর্গ খুলিল প্রথম, ইত্যাদি।

এইরূপ ১২৯ পৃষ্ঠায় 'স্থির' ১৫২ পৃষ্ঠায় 'আকুল' ১৫৩ পৃষ্ঠায় 'মধুর' ও 'মাধুরী,' ১৮৪ পৃষ্ঠায় 'নীরব,' ১৮৮ পৃষ্ঠায় 'দুঃখ' ইত্যাদি শব্দের পুনরাবৃত্তি বড় শ্রুতিকঠোর বোধ হয়। যেখানে সেখানে না হইয়া পুস্তকের দু এক স্থলে এরূপ হইলে কঠোর না লাগিয়া মধুরই লাগিত।

নবীন বাবু সূচনায় বলিয়াছেন, "আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে (বুদ্ধদেবকে) মানুষিক ভাবাপন্ন দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতিলাভ করে, তাঁহাদিগকে অধিক আমাদের আপনার বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মও সম্পূর্ণরূপে দর্শনমূলক। অতএব তাঁহাকে অতি-মানুষভাবে চিত্রিত করিবার প্রয়োজনও বিশেষ নাই।" কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নবীন বাবু বুদ্ধদেবকে সম্পূর্ণ মানুষিক-ভাবে চিত্রিত করিতে পারেন নাই! তবে তিনি যে সকল অলৌকিক ঘটনার বর্ণন করিয়াছেন, সেগুলিকে যোগবল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জম্বু বৃক্ষতলে সিদ্ধার্থ ধ্যানমগ্ন থাকিয়া ব্যোমচারী পঞ্চ মহর্ষির দৃষ্টি আক-র্ষণ করিয়াছিলেন, মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলেও বৃক্ষচ্ছায়া তাঁহার মস্তকোপরি স্থির থাকিয়া তাঁহাকে ছায়ান্বিত করিয়াছিল, সিদ্ধিলাভানন্তর ভাগীরথী পার হওয়ার কালে নাবিক বিনাপণ্যে পার করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় বুদ্ধ শূন্য-মার্গে নদী পার হইয়াছিলেন, ইত্যাদি ব্যাপারের নবীনবাবু উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু যোগবল দ্বারা সেগুলির স্বাভাবিকতা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। বস্তুতঃ মহাপুরুষ-দিগের জীবনী হইতে অতিমানুষ ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা অসম্ভব। কারণ ভক্তশিষ্যগণ তাঁহাদিগকে অতিরঞ্জিত করিয়া চিত্রিত করে, এবং তাহাদের সেই সকল চিত্র হইতেই আমরা মহাপুরুষদিগের প্রথম বিবরণ প্রাপ্ত হই। এতদ্ব্যতীত মানবের অন্তঃকরণ স্বভাবতই পূজ্য ব্যক্তিদিগকে সাধারণ মনুষ্যশ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র ও উচ্চ করিয়া কল্পনা করিতে ভালবাসে। নিজে যে সমুদায় মানসিক দুর্ব্বলতা ও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তাঁহারা তৎসমুদায় হইতে মুক্ত, এরূপ ধারণা সে করিতে

চায়। এই জন্য তাঁহাদের কার্য্যকলাপ বিজ্ঞানের আলোকে বিচার না করিয়া ভক্তির চক্ষে বিশ্বাস করিয়া লয়। ইহা হইতেই miracleএর সৃষ্টি। মানব-হৃদয়ের এই বীর-পূজা-প্রবণতা কেবল কুফলপ্রদ নহে; ইহা হইতে এক দিকে যেমন কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়, অন্য পক্ষে তেমনই ইহাতে আমাদের লক্ষ্যের উচ্চতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে পারে না এবং আমাদের উপাস্য দেবতার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অনেক প্রকার দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে মুক্ত থাকি। 'সিদ্ধি' ও 'মহানির্ব্বাণ' এই দুই অধ্যায়ে কবি বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সূত্রগুলির আভাস দিয়াছেন। প্রথমোক্ত অধ্যায়ে সে গুলি সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

দুঃখের কারণ (১) জন্ম, জন্মের কারণ
(২) কর্ম্মফল, কর্ম্মফল উপজে চেষ্টায় (৩)
শারীরিক মানসিক, চেষ্টার কারণ
(৪) সুখ-তৃষ্ণা, বুঝিলেন, সুখ দুঃখ-বোধ (৫)
তৃষ্ণার কারণ, সুখ-দুঃখ অনুভব
জন্মায় ইন্দ্রিয়গণ, তাহার কারণ
জগতের সহ মন ইন্দ্রিয় (৭) সংযোগ।
জগতের রূপ রস গন্ধ মনোহর (৮)
এই সংযোগের হেতু। গন্ধ রূপ রস,—
সমস্ত জগৎ,—সূক্ষ্ম পরমাণু জাত,
করে প্রকটিত নানারূপে (৯) এক জ্ঞান।
বুঝিলেন, সংসার এ জ্ঞানের মূল,
সংসার ভ্রমজ্ঞান অবিদ্যা-সম্ভূত।
নহে সত্য রূপ রস,—একে দেখে যাহা
স্বরূপ সুন্দর, অন্যে দেখে তা বিরূপ।
এ অসত্য রূপ রস ভাবে সত্য নর
অবিদ্যার মোহে ঘোর, আমি ও আমার—
এই অহঙ্কার জ্ঞানে হ'য়ে প্রতারিত।
বুঝিলেন মহাযোগী, হইলে নিরোধ
অহঙ্কার, ভ্রম জ্ঞান হ'লে তিরোহিত,
জানিলে অসত্য রূপ রস জগতের,
হইবে না মুগ্ধ তাহে ইন্দ্রিয় ও মন,
করিবে না পাপকর্ম্মরত মুগ্ধ নর।
পাপ কর্ম্ম-ফলে জন্ম হইবে না আর,
জরা-ব্যাধি-মরণের হইবে নির্ব্বাণ। (১৩২-৩৩ পৃঃ)

শেষ অধ্যায়ে এগুলি আরও বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। দার্শনিক তত্ত্বগুলি যেরূপ দুরূহ, তাহাতে —[illegible] তাহাদিগকে যথাসাধ্য সরল ভাষায় প্রকাশ করি[illegible] বলিতে হইবে।

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে কেবল ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডি[illegible] মধ্যে নহে, বৌদ্ধদিগের মধ্যেই যেরূপ বিভিন্নমত প্রচলিত, তাহাতে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আয়তনে তাহার সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর নহে। অতএব এতৎসম্বন্ধে যে দুটি ধারণা প্রধানতঃ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকিব। একটি অভাবাত্মক (negative) আর একটি ভাবাত্মক(positive)। সোজাসুজি বলিতে গেলে অভাবপক্ষে নির্ব্বাণ অর্থ আমিত্বের আত্যন্তিক বিনাশ (absolute nihility)। ইহা শূন্যবাদে পর্য্যবসিত। ভাবপক্ষে নির্ব্বাণ অর্থ আত্মার অবিনশ্বর ভাব ও বিকাররহিত নির্ম্মল সত্তা (a state of Eternal repose and bliss)। ইহা শূন্যবাদ নহে, আত্মার একটি বিশেষ অবস্থা। নবীনবাবু নির্ব্বাণের এই শেষোক্ত মতটিই অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি নির্ব্বাণের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

কর্ম্ম নাই, জন্ম নাই, নাই মৃত্যু আর!
সুখের তৃষ্ণায়, দুঃখ-তাড়নায় আর,
নহে বিচলিত, আত্মা শান্তাকাশ মত
অনন্ত, অসীম, শান্ত, শান্তি পারাবার! (১০৬ পৃঃ)

আর্ণল্ডও নির্ব্বাণের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, * এবং গিরিশ বাবু তাঁহার নাটকে ইহারই সমর্থন করিয়াছেন—

এস নব রাজ্যে
চিরশান্তি করিছে বিরাজ,
রোগ-শোক মৃত্যুভয় নাই
আনন্দ সদাই,
নাহি প্রলোভন,
হিংসা-কীট করে না দংশন,
আশায় না ফেলে আর দুঃখের সাগরে;
পরম পুলকে নির্ব্বাণ আলোকে
অমৃত জীবন হয় লাভ!

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এই মতই বোধ হয় সাধারণের গ্রাহ্য ও সমীচীন বলিয়া প্রতীতি হইবে। তাহার কারণ আর্ণল্ডই উত্তমরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"মানব জাতির এক তৃতীয়াংশ কখনই কতকগুলি অর্থশূন্য শুষ্ক তত্ত্বে আস্থা স্থাপন করিতে অথবা শূন্যতাকে জীবের চরম লক্ষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না।" †

---

(১) জাতি (২) ভব (৩) উপাদান (৪) তৃষ্ণা (৫) বেদনা (৬) স্পর্শ (৭) ষড়ায়তন (৮) নামরূপ (৯) বিজ্ঞান।

* "——Nameless quiet, nameless joy,
Blessed Nirvana,—sinless, stirless rest—
That change which never changeth." *Book VI.*
"If any teach Nirvana is to cease
Say unto such they lie." *Book VIII.*

† The views, however, here indicated of "Nirvana" ......are at least the fruits of considerable study, and also of a firm conviction that a third of mankind would never have been brought to believe in blank abstractions, or in Nothingness as the issue and crown of Being."



শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

Harasundara Press

গ্রন্থশেষে আমরা কবিবরের উদারধর্ম্মের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। তিনি হিন্দু হইয়াও ঈশা ও মহম্মদকে ঈশ্বরের অবতারস্বরূপ স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কবি ঈশার জীবনী লিখিয়াছেন, মহম্মদের জীবনী লিখিতে পারিবেন না বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন ও চৈতন্যদেবের প্রেম লীলা বর্ণনা করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন। স্বীয় জীবনের ব্যক্তিগত কাহিনীর এইরূপ একটু আভাস দিয়া তিনি অমিতাভের নিম্নলিখিত রূপে পরিসমাপ্তি করিয়াছেন,—

যাও দেব। লীলা শেষ। এসেছিলে তুমি
একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী,—
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর।
আসিলে আবার তুমি কপিল নগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্য পাদমূলে—
দেখিলাম এত লীলা আত্ম বিসর্জ্জন—
রাজপুত্র মহাযোগী। আসিলে আবার
নবল মানব শিশু জর্দ্দানের তীরে
দেখিয়াছি সেই লীলা আত্ম বলিদান।
আরবের মরুভূমে, অমৃত নির্ঝর
আবার আসিলে তুমি—নাহি পুণ্য মন
দর্শিব সে লীলা তব। আসিয়া আবার
পতিতপাবনী তীরে পতিত পাবন
পাষাণ করিলে দ্রব প্রেম অশ্রু জলে,—
ভাসি প্রেম অশ্রু জলে, বড় সাধ মনে
দেখিবে বাঙ্গালী কবি সে লীলা করুণ
প্রেমময়। এত আশা করিও পূরণ। (২০ ২০১ পৃঃ)

'অমিতাভ' আদ্যোপান্ত উচ্চভাবে পরিপূর্ণ। ইহার সর্ব্বত্রই শান্তরসে (sublimity) ভরপুর, ইহার কোন অংশেও লঘুতা বা চপলতা, মলিনতা অথবা নীচতা প্রবেশ করে নাই—দুই শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানি কাব্যগ্রন্থের পক্ষে ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। আমরা জানি, রৈবতক কি কুরুক্ষেত্রে নবীন বাবু এই দোষ হইতে একেবারে মুক্ত ছিলেন না। প্রথমোক্ত পুস্তকে জরৎকারু ঋষিপত্নী ও সত্যভামার সখিসহ কথোপকথন উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। আমরা এই পুস্তক খানি সম্পূর্ণরূপে সেই দোষ বর্জ্জিত দেখিয়া নিতান্ত সুখীহইয়াছি।

বারাণসী।

বারাণসী আনন্দ কানন, এখানে দিবারাত্র আনন্দধ্বনি। সাধু সন্ন্যাসী, দণ্ডী গৃহী, যুবক যুবতী, প্রৌঢ়া বৃদ্ধারা, যখন প্রভাতে বারাণসীর গঙ্গাতীরস্থ অগণ্য সোপান শ্রেণীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়া "বোম্ বোম্ বিশ্বেশ্বর" রবে, বিশ্বনাথের জয়গান করিতে থাকেন,—আর উপরের ত্রিতল গৃহাদি হইতে, দেবালয় হইতে, ভৈরবীর প্রভাতী সুর তাহার সঙ্গে মিশিয়া যায়—তখন প্রাণটা বড়ই মাতিয়া উঠে। কেহ গান করিতেছে, কেহ গাত্র-মার্জ্জনা করিতেছে, কেহ অঙ্গুলিতে যজ্ঞোপবীত জড়াইয়া উর্দ্ধমুখে সূর্য্যদেবের স্তোত্র পাঠ করিতেছে—কোন দণ্ডাশ্রমী বা সিক্ত গৈরিকবাস—অঙ্গেই শুখাইতেছেন—আর চক্ষু মুদিয়া "বোম বিশ্বনাথ বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। কোন বঙ্গীয়া প্রৌঢ়া হয়ত তাঁহার হিন্দুস্থানী মিতিনের সহিত আধা হিন্দী আধা বাঙ্গালায় রসালাপ করিতেছেন—কোথাও বা প্রফুল্লমুখী গৌরবর্ণা সুন্দরীগণ, প্রভাতে শিশিরসিক্ত নব মল্লিকার পবিত্র উজ্জ্বলমূর্ত্তির ন্যায় জলপূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে লইয়া, পুষ্পপাত্রে পুষ্পচন্দনাদি লইয়া বিশ্বনাথের মন্দিরপথবর্ত্তিনী হইয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিলে —সেই প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের অতীত সুখের স্মৃতি মনে পড়ে। স্ত্রীলোক পুরুষের দিকে চাহিতেছে না—পুরুষ স্ত্রীলোকের জন্য সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতেছে—সকলেরই হাতে বিশ্বনাথের অর্চনার জন্য পবিত্র গঙ্গাবারি, পুষ্পপাত্রে সুগন্ধি পুষ্পচন্দনাদি—মুখে বিমল পবিত্রতা—শান্তি, এক[illegible]চিন্ত্য ভাবনীয় স্বাধীনতা। একদিন উজ্জয়িনীতে মহাকালের মন্দিরপথবর্ত্তিনী কুলাঙ্গনাদিগকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম, হিন্দুসন্তান বলিয়া মনে বড় একটা অহঙ্কার হইয়াছিল। আর বারাণসীতে প্রত্যহ প্রাতে যাহা দেখিতাম—তাহাতে সেই স্মৃতিই উজ্জ্বল হইত।

বারাণসী—"মন্দির-ময়ী" নগরী। দিল্লীশ্বর জাঁহাগীর সাহ—অন্ততঃ বারাণসীকে এই আখ্যা দিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেবমন্দির, ধর্ম্মকূপ, পবিত্র সরোবর, আর পৌরাণিক স্মৃতিজড়িত ক্ষেত্রসমূহ। ঘাটগুলির মধ্যে মণিকর্ণিকা, দশাশ্বমেধ, মানমন্দির, পিশাচমোচন, সিন্ধিয়া, নাগপুর বা ভোঁসলা, ত্রিলোচন, গয়া, পঞ্চগঙ্গা, শঙ্কটা, রামঘাট, বরুণা ঘাট, শিবালা ঘাট, গোস্বামী ঘাট ও পাঁড়ে ঘাটই প্রসিদ্ধ। কূপের মধ্যে জ্ঞানবাপী কূপ, কাশী করবৎ কূপ—চাল কূপ, মণিকর্ণিকা কূপ, ধর্ম্মকূপ, নাগকূপ, লোলার্ক কূপ ও চন্দ্রকূপই প্রসিদ্ধ। তালাওগুলির মধ্যে কর্ণঘণ্টা তালাও,

পিশাচমোচন তালাও, ভৈরব তালাও, মানস সরোবর, দুর্গাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, কুরুক্ষেত্র কুণ্ড, প্রভৃতি কয়েকটীই প্রসিদ্ধ। এগুলির পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রদান করিলে—বোধ হয় দুই বৎসরের প্রদীপেও তাহার স্থান সংকুলান হইবে না, কাজেই আমরা সে সংকল্প ত্যাগ করিলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, "কাশীখণ্ড" ও অন্যান্য পুরাণাদি পাঠ করিয়া সে কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারেন।

বিশ্বেশ্বর- কাশীর দেবতাকুলের মধ্যে রাজরাজেশ্বর। তাঁহার নিম্নে রত্নালঙ্কার-ভূষিতা অন্নপূর্ণা। তিনি কাশীর রাজরাজেশ্বরী। বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার নিম্নে—কাল ভৈরব, ভূত ভৈরব (ভঁয়রো) ভৈরবনাথ, অষ্টাঙ্গ ভৈরব, গুণেশ্বর, তারকেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর,দক্ষেশ্বর অথবা মিত্রেশ্বর, রত্নেশ্বর, দিবোদাসেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, কোটী-লিঙ্গেশ্বর, কাননেশ্বর, যোগেশ্বর, ধ্রুবেশ্বর, সোমেশ্বর, তিলভাণ্ডেশ্বর, দুলালেশ্বর, মানেশ্বর, শনৈশ্চর, দণ্ডপাণি, মহাকাল, বৃদ্ধকাল, রাজেশ্বরী, জ্বরহরেশ্বরী, আদি মহাদেব, কাশীদেবী, গৌরজী, বড় গণেশ, জগন্নাথ, সতীশ সিদ্ধেশ্বরী, শঙ্কটাদেবী,বালকৃষ্ণ, ছত্রভুজ ও আদি কেশব—প্রভৃতি কয়েকটা বিখ্যাত দেবতা। ইহাদের ইতিবৃত্ত প্রদানও পূর্ব্বোক্ত কারণে অসম্ভব।

আমরা অতি পুণ্যদিনে সর্ব্বপ্রথম বি[illegible]র্শনে যাই। সে দিন শারদীয়া মহাষ্টমী। কাশীর—পবিত্রভাব সে দিন বড়ই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দির লোকে লোকারণ্য,—মন্দিরের ত কথাই নাই - রাজপথে এত জনতা যে, তাহা ঠেলিয়া যাওয়া বড় দুঘট। সে দিন অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাহা দেখিয়াছি তাহা জীবনে ভুলিব না। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, গৌরব করিতে হইলে, আর্য্য বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতে হইলে, তাহা ভুলা অসম্ভব! অন্নপূর্ণার সদরের প্রাঙ্গণে, চত্বরে, নাটমন্দিরে পিপীলিকা-প্রবেশের স্থান নাই। কত গৈরিকমণ্ডিত শান্তিমূর্ত্তি, দণ্ডী, পরমহংস, অধ্যাপক, পুরোহিত—মাল্য চন্দনে, ত্রিপুণ্ড্রকে শোভিত হইয়া রাগলয়-সংযুক্ত স্বরে চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। এক বাহু, ঊর্দ্ধ বাহু, গৈরিকভূষিত, ত্রিপুণ্ড্রকালঙ্কৃত, রুদ্রাক্ষশোভিত, বিভূতিমণ্ডিত—কত সাধু সন্ন্যাসী তন্ময়চিত্তে, চক্ষু মুদিয়া—"বোম্ মহাদেব" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। কোথাও বা—গম্ভীরমূর্ত্তি গৈরিকধারী দণ্ডী বেণুদণ্ড হস্তে ইতঃস্তত পাদচালনা করিতেছেন, কোথাও বা সিন্দুরমণ্ডিতা, ত্রিশূলহস্তা ভৈরবী, জটাজাল বিলুলিত করিয়া নির্মীলিতনেত্রে মাতৃনাম উচ্চারণ করিতেছেন। কোথাও মঙ্গলব্রত শুচি কায় পুরোহিত যজমানের মঙ্গলোদ্দেশে চণ্ডীপাঠ করিতেছেন—কোথাও বা কোন সন্ন্যাসী আত্মহারা হইয়া, উচ্চকণ্ঠে শিবগুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন। কেহ বা, শিবশতকের স্তোত্র আওড়াইতেছে—কেহ বা পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য অপরের সহিত শাস্ত্রীয় তর্কে মাতিয়াছে—কেহ বা ঘণ্টা বাজাইয়া কোলাহলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। আর মন্দিরের মধ্যে গন্ধদীপে, অগুরুচন্দনে, মঙ্গলমাল্যে—বিল্বপত্রে, ফলপুষ্পে— সেই অনাদিলিঙ্গ বিশ্বেশ্বর মহাভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। উচ্চবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ হইতে নীচ অস্পৃশ্য চণ্ডাল পর্য্যন্ত, এই অনাদিলিঙ্গের পূজা করিয়া চরিতার্থ বোধ করিতেছে। আর বিশ্বেশ্বরের কৃপায় পরিপুষ্ট—নন্দদুলালাধরণে পরিপুষ্টকায় পাণ্ডাগণ নিঃসঙ্কিচিত্তে—যাত্রীদের নিকট হইতে তাহাদের রাজকর আদায় করিতেছে।

বিশ্বেশ্বরদেবের বর্ত্তমান মন্দিরটী ত্রিচূড় এবং তাহার আদ্যোপান্ত সুবর্ণে মণ্ডিত। সেই সোণার মন্দিরে যখন প্রভাতের বালার্ক কিরণ প্রতিফলিত হয়, তখন সে স্থান দেখিলে ভুলিতে পারা যায় না। মনে হয়, এই বুঝি স্বর্গ—এই বুঝি ইন্দ্রনিকেতন। মন্দিরের আদ্যোপান্ত প্রস্তরনির্ম্মিত। রাজ্ঞী অহল্যা বাঈ ইহার নির্ম্মাণকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তার পর পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ—চূড়াগুলি আদ্যোপান্ত স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির বিশ্বকর্ম্মার স্বহস্তনির্ম্মিত বলিয়া খ্যাত। তাহা মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের দারুণ ধর্ম্মপিপাসার উন্মাদিনীশক্তিতে বহুদিন পূর্ব্বে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন সেখানে একটী মস্‌জেদ বিরাজ করিতেছে।

বিশ্বেশ্বরের আরতি—বিশ্বেশ্বরই উপযুক্ত। বিশ্বেশ্বর অনাদিলিঙ্গ বলিয়া সর্ব্বজাতিতেই ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে। এই জন্য পূজার সময়, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল, ইতর, ভদ্রে কোন প্রভেদ নাই। ভদ্রকুলাঙ্গনার পার্শ্বে বসিয়া হয়ত নীচজাতীয় এক ব্যক্তি মালা পরাইয়া গেল—বেদাধ্যায়ী সংযতচিত্ত নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের গাত্রস্পর্শ করিয়া

হয়ত একজন—বিল্বপত্র-রাশি ঢালিয়া দিয়া গেল—কোন আশঙ্কা নাই। তবে সন্ধ্যার সময় স্নান ও অভিষেক না হইলে বিশ্বনাথের উদ্ধার নাই। এই অভিষেকের পর আর সকলের স্পর্শ করিবার ক্ষমতা থাকে না। পাঠক যদি কখন বিশ্বনাথ দর্শনে যান, অভিষেক ও আরতিটা দেখিতে ভুলিবেন না।

এখন আমরা দেবদেবীর কথা ছাড়িয়া অন্যান্য বিবরণ পাঠককে জানাইব। সর্ব্বাগ্রে মানমন্দিরের কথা বলা যাক্। দৃপ্ত দৈত্যের ন্যায় গঙ্গাগর্ভ হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া রাজা জয়সিংহের কীর্ত্তিস্তম্ভ আজও দণ্ডায়মান। অম্বর-রাজা জয়সিংহ—দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নূতন বৎসর গণনার সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রগণের গতি নিরুপণ করিবার জন্য, এই মন্দির প্রস্তুত করেন। মহারাজ জয়সিংহ, বারাণসী ভিন্ন—দিল্লী জয়পুর, মথুরা ও উজ্জয়িনীতে আরও চারিটী মানমন্দির স্থাপন করেন। এই মানমন্দিরে—সেই প্রবীণ হিন্দু নৃপতির উদ্ভাবিত ভিত্তিযন্ত্র, চক্রযন্ত্র, যন্ত্র সম্রাট, দিগংশচন্দ্র, প্রভৃতি ভগ্ন বস্থাতেও অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী বর্ণিয়ার এই মানমন্দিরে কয়েক জন রাজপুত রাজকুমারকে জ্যোতিষালোচনা করিতে দেখিয়াছিলেন।

কাশী বাণিজ্যপ্রধান স্থান, তীর্থস্থান—সেইজন্য ভারতের সকল কেন্দ্রের লোক ধর্ম্মার্থে, ব্যবসারার্থে এখানে সমবেত। এখানে কাজেকাজেই মেলাও অনেক আছে। তবে এখন সেগুলি কালধর্ম্মে—আমোদ প্রমোদের স্থান হইয়া দাঁড়াইতেছে। কতকগুলি বা উৎসাহের অভাবে উঠিয়া যাইতেছে। এতন্মধ্যে নবরাত্রি মেলা, গোঘর মেলা, রামনবমী মেলা, নরসিংহ চতুর্দ্দশী মেলা, সপ্তমী মেলা, একাদশী মেলা, বৃদ্ধকাল মেলা, কাজরী মেলা, ঢেলা চৌথ মেলা, বামন দ্বাদশী মেলা, রামলীলা, ধনুতে রাশ মেলা, রোটা ভুট্টা মেলা, নগর প্রদক্ষিণ মেলা, ও বুঢ়ামঙ্গল মেলা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

এতদ্ভিন্ন বারণসীতে আরও ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক মেলা আছে। প্রদীপে স্থান সংকুলান হইবে না বলিয়া, তাহাদের উল্লেখে বিরত হইলাম। এই সব মেলার জন্য বারাণসী সংবৎসর আনন্দধ্বনিতে ডুবিয়া আছে।

কাশীরাজ বংশ। পূর্ব্বে যে প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ কাশীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা অতি দুরূহ। মহম্মদঘোরি যে সময় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেই সময় সমগ্র কাশীপ্রদেশ মহারাজ জয়চন্দ্রের অধীন ছিল। মোগলরাজত্বে ইহা বাদসাহদিগের খাসে আসে। আকবর-নামাতে বারাণসীর নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আকবরের আমলে ইহা মঙ্গলরাও নামেতে একজন রাজপুত সর্দারের অধীন ছিল বলিয়া উল্লিখিত। হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক স্বয়ং আকবর বারাণসীর শ্রীবৃদ্ধি করোণোদ্দেশে মঙ্গলরাওকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তাঁহার সুশাসনে বারাণসীতে চোর ডাকাতের ভয় ছিল না, তাহার পর আবার রাজা মানসিংহের হস্তে বারাণসী অর্পিত হয়। জনশ্রুতি এই, মানসিংহ কোন ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে বারাণসীর মধ্যে এক দিনে সহস্রাধিক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহার পর মোগলসাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বারাণসী অযোধ্যার নবাবদিগের অধীন হইয়া আইসে।

বর্ত্তমান রাজবংশ দিল্লীর পতনের সময়েই বিশেষ প্রাদুর্ভাব লাভ করেন। ক্ষেত্রমিশ্রের বংশোদ্ভব—মনসারাম নামক একজন প্রতিভাশালী সৈনিক রস্তম আলি নামক এক বাদসাহী সুবাদারের অধীনতায় চাকুরী করিতেন। রস্তম নিজে সকল সময় কাজ কর্ম্ম দেখিতেন না, মনসারামই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। "বলবন্তনামা" নামক কাশীর রাজবংশের ইতিহাসে এক স্থানে লিখিত আছে—"মনসারামের ক্ষমতা সরকারে এই সময়ে বড় বৃদ্ধি পাইল। রস্তম নামে মাত্র সুবাদার। রস্তম মনসারামের জন্য দিল্লী সরকার হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি ও সনন্দ চাহিয়া পাঠাইলেন। সনন্দ আসিল, কিন্তু মনসারাম নিজে রাজোপাধি গ্রহণ না করিয়া পুত্রকে তাহা অর্পণ করিলেন। মনসারাম ১৭৭৫ অব্দে সংসার ত্যাগ করিলে তাহার বীর্য্যবান পুত্র বলবন্ত রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া অযোধ্যার সুবাদারকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। রাজাবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইয়া তিনি চুণার, বেণারস, গাজিপুর ও জোয়ানপুর সরকার হস্তগত করিয়া গঙ্গাতীরের সমস্ত দুর্গগুলি দখল করিয়া যথেষ্ট বলসঞ্চয় করিলেন। তিনি

নাম মাত্র অযোধ্যার সুবাদারের অধীন ছিলেন। যে কয়েকটা টাকা সুবাদারকে খাজনাস্বরূপে প্রদান করিতেন, তাহা ইচ্ছা করিলেই বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৭৬৩ অব্দে যখন বাদসাহ সাহ আলম ও নবাব সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে বলবন্ত সিংহ সুজার ও বাদসাহের পক্ষ হইয়া সৈন্য লইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রথম হইতেই চতুর বলবন্ত সিংহ বাদসাহ ও নবাবের পক্ষে ছিলেন; কিন্তু বক্সারের যুদ্ধের পর যখন ইংরাজগণ জয়ী হইলেন, সুচতুর বলবন্ত তৎক্ষণাৎ ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ইহার পর বৎসর এলাহাবাদে গিয়া কর্ণেল ক্লাইব নবাবের সহিত সন্ধির সূত্রানুসারে বলবন্তের অধীন সমস্ত বিষয়গুলি কোম্পানির অধীনতায় আনিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এই প্রস্তাব ডাইরেক্টরেরা অগ্রাহ্য করায় বলবন্ত সিংহ পুনরায় সুজার অধীন হইয়া পড়েন। সুজা উদ্দৌলা বলবন্তের উপর বড়ই চটিয়া গিয়াছিলেন, বিশেষতঃ বক্সারের ব্যাপার তাঁহার মনে জাগিতেছিল। তিনি এক্ষণে তাঁহাকে চক্রে পাইয়া জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুজা তাইবার ছল ও কৌশলাবলম্বনে (১৭৬৭ ও ৭৮ খৃঃ অব্দ) তাঁহার জমীদারিগুলি বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বলবন্তের প্রতি ক্লাইবের সহানুভূতি থাকায় কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

১৭৭০খৃঃ অব্দে বলবন্ত সিংহ গতাসু হন। তাহার ঔরসজাত এক মাত্র কন্যা গোলাপকুমারী তাঁহার পরিত্যক্ত বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। গোলাপ কুমারীর মহীপনারায়ণ নামে এক নাবালক পুত্র ছিল। কিন্তু বলবন্তের ঔরসজাত দাসীপুত্র, চেতসিংহ ইংরাজের সহায়তায় ও স্বীয় বুদ্ধিবলে গদী অধিকার করিলেন। ইংরাজ ১৭৭৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে এক সনন্দ দ্বারা চেৎসিংহকে পাকা করিয়া দিলেন। আমিনী, ফৌজদারী ও টাঁকশালের ক্ষমতা তাঁহার হস্তে দেওয়া হইল। তিনি তৎপরিবর্ত্তে কোম্পানিকে ২৩ লক্ষ টাকা বার্ষিক খাজনা দিতে স্বীকার করিলেন। যখন এই বন্দোবস্ত হইল, তখন বারাণসী প্রভৃতি প্রদেশ নূতন সন্ধির সর্ত্তানুসারে অযোধ্যার নবাবের হস্ত হইতে ইংরাজের দখলে আসিয়াছে।

চেৎসিংহের সহিত ইংরাজের সখ্যভাব ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিলেও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রকৃতি দোষে শীঘ্রই তাহা ভঙ্গ হইয়া যায়। হেষ্টিংস সে সময়ে কলিকাতা কৌন্সলে ক্লেভারিং, মন্সন, ও ফ্রান্সিস প্রভৃতির প্রবল ক্ষমতার মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় যথেচ্ছা পরিচালিত হইতেছিলেন। ফ্রান্সিসপ্রমুখ সভ্যগণ, জোসেফ কক নামক এক ইংরাজকে কাশীতে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কক্ সাহেবের সহিত চেৎসিংহের বড় ঘনিষ্ঠতা হইতেছে দেখিয়া হেষ্টিংস চেৎসিংহের উপর মর্ম্মান্তিক চটিলেন ও তাহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন মন্সন সাহেব মরিয়া গেলে হেষ্টিংসের ক্ষমতা বাড়িয়া উঠিল। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বীয় প্রিয়পাত্র গ্রেহামকে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া কাশী পাঠাইলেন। গ্রেহাম অতি নীচপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বারাণসী গিয়া চেৎসিংহের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে (১৭৭৮ অব্দে) ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হওয়াতে হেষ্টিংস চেৎসিংহকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "নির্দ্ধারিত রাজস্ব ছাড়া এবৎসর আপনাকে পাঁচ লক্ষ টাকা অধিক দিতে হইবে।" চেৎসিংহ বেগতিক দেখিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা অর্পণ করিলেন, হেষ্টিংস পর বৎসর পুনরায় সেইরূপ দাবী করিলেন, চেৎসিংহ প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু গবর্ণর জেনারেল সৈন্য পাঠাইবার আদেশ করাতে তিনি ভীত হইয়া পুনরায় সেই টাকা অর্পণ করিলেন। পর বৎসর এই দাবীর সহিত আর একটা নূতন দাবী উপস্থিত হইল। বাঙ্গালার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় চেৎসিংহ সৈন্য দিয়া ইংরেজের সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সূত্র ধরিয়া তাঁহার নিকট হেষ্টিংস সাহেব দুই হাজার অশ্বারোহীর দাবি করিলেন। চেৎসিংহ এবার পারিয়া উঠিলেন না। তিনি দুই হাজারের পরিবর্ত্তে সার্দ্ধ দুই শত অশ্বারোহী দিতে স্বীকৃত হইলেন।

হেষ্টিংস শুনিয়াছিলেন, বলবন্ত সিংহের অনেক টাকা ছিল। চেৎসিংহ তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন ও সেই টাকা বিজয়গড় ও লতিফপুরে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। হেষ্টিংস এতদিন বিবাদের ছল খুঁজিতেছিলেন, এক্ষণে সিদ্ধকাম হইলেন। চেৎসিংহ তাঁহার

আদেশ মত কাজ করিলেন না দেখিয়া, হেষ্টিংস সাহেব বিজয়গড় ও লতিফ্‌পুরের ধনের লোভে, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন। এবার চেৎসিংহ যুক্তির সহিত বিনয়পূর্ণ বচনে প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র পাঠাইলেন, তাহাতে কোনও ফল হইল না। ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৮১ অব্দে স্বয়ং বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন ও চেৎসিংহের নামে "বিদ্রোহ চেষ্টা" "আজ্ঞাবহেলা" প্রভৃতি কয়েকটী গুরুতর অপরাধ সাজাইয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন। হেষ্টিংসের মতে রাজা যে উত্তর দিলেন, তাহা ঔদ্ধত্য-দোষে পরিপূর্ণ ও তাঁহার (হেষ্টিংসের) পত্রের প্রকৃত উত্তর নহে। তিনি রেসিডেণ্ট মার্কহ্যাম সাহেবকে একদল সৈন্য লইয়া রাজাকে বন্দী করিতে হুকুম পাঠাইলেন। রাজা এই সময় গঙ্গার উপর শিবালাঘাটে অবস্থান করিতেছিলেন। মার্কহ্যাম সসৈন্যে উপস্থিত হইলে চেৎসিংহ কোনরূপে বাধা না দিয়া সহজে ধরা দিলেন। ইহার পর আরও তিনদল সৈন্য রেসিডেণ্টের সাহায্যার্থ আসিল। তিনি আনন্দিতচিত্তে রাজার অবরোধবার্ত্তা হেষ্টিংসকে জানাইতে গেলেন। গড়ের ভিতর, অবরুদ্ধ রাজা, কয়েক দল ইংরাজ সৈন্য ও সেনাপতি রহিলেন। এদিকে মহাবিপ্লবের আয়োজন হইতে লাগিল। রাজার লোকেরা প্রভুর এই বিপদ দেখিয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ফিরিঙ্গীকে তাড়াইয়া দিয়া তাহারা দুর্গ অধিকার করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিল। শ্যামনগর হইতে দলে দলে সহস্র সিপাহী বোটে করিয়া গঙ্গাপার হইতে লাগিল। এসংবাদ হেষ্টিংসের নিকট পৌঁছিলে তিনি বড় চিন্তিত হইলেন। সৈন্যগণ দুর্গ প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, ইংরাজসৈন্য রাজভবনের চারিদিক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে গুলি চালাইতে লাগিল। সে গুলির মুখে অনেক ইংরাজসৈন্য হত ও আহত হইতে লাগিল, চারিদিকে মহা কোলাহল উঠিল। রঘুদয়াল সিং নামে একজন বিশ্বস্তকর্ম্মচারী রাজাকে সংবাদ দিল— "মহারাজ আপনার লোক আসিয়া ফিরিঙ্গিকে আক্রমণ করিয়াছে। নদী বক্ষে নৌকা প্রস্তুত, পারে ঘোড়া প্রস্তুত, আপনি শীঘ্র জানালা দিয়া বোটের উপর পড়িয়া পলায়ন করুন। ইংরাজ আবার নূতন ফৌজ পাঠাইতেছে—"চেৎসিংহ ধীরে ধীরে জানালার নিকট উপস্থিত হইলেন— জন্মের মত একবার চিরপ্রিয় রাজভবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—পরে জানালার গবাক্ষে বহুমূল্য মণি খচিত উষ্ণীষ-বস্ত্র বাঁধিয়া তদবলম্বনে অবতরণ করিলেন। ও একটী ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। নৌকা তাঁহাকে লইয়া চলিল। চেৎসিংহ নিরাপদে ইংরাজের কবল হইতে মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু এক দিনেই সেই বিপুল রাজ্যেশ্বর পথের ভিখারী হইলেন। ভবিষ্যতে উদর-পূরণের জন্য তাঁহাকে সিন্ধিয়ার অধীনে সৈনিকের কাজ করিতে হইয়াছিল। সেই অবস্থাতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। বহুকাল হইল, চেৎসিংহ মরিয়া গিয়াছেন কিন্তু তত্রাচ তিনি অমর। মহামতি এড্‌মণ্ড বর্ক তাঁহাকে যে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন, যত দিন ইংরাজের রাজত্ব থাকিবে, তত দিন কেহ তাহা লোপ করিতে পারিবে না। সে যাহা উহক, সহসা পূর্ব্বোক্ত বিপদের সংবাদ পাইয়া হেষ্টিংস প্রাণভয়ে মধুসূদন দাসের বাগান হইতে চুনারে পলাইলেন। সেই ক্ষুদ্র যুদ্ধে ৩।৪ শত ইংরাজ নিহত হইল। হেষ্টিংস পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন—সৈন্যেরা আসিয়া রাজপুরী লুণ্ঠন করিতে লাগিল। হেষ্টিংসের সঙ্গে তাঁহার প্রিয় দেওয়ান কান্তবাবু বারাণসী আসিয়াছিলেন। যখন উন্মত্তপ্রায় ইংরাজ সৈন্য দ্রুত বেগে অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইল, তখন কান্তবাবু অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দুরাজরাণীদের উপর অত্যাচার আশঙ্কা করিলেন— হিন্দুরমণী যবনের দ্বারা পীড়িতা ও অবমানিতা হইবে— হিন্দুর তীর্থ বারাণসীতেই এই বীভৎস কাণ্ডের সূচনা হইবে, ইহা কান্তবাবুর সহ্য হইল না।

সৈন্যগণ যতক্ষণ বহির্ব্বাটীতে লুণ্ঠনাদি কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, ততক্ষণ কান্তবাবু কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তাহাদিগকে সবেগে সশস্ত্র অন্তঃপুরের দিকে যাইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভীষণ ঝটিকা বহিল। তিনি হৃদয়ে শত গুণ বল পাইলেন। সদর্পে, সরোষে, তড়িদ্বেগে অন্তঃপুরের দ্বারস্থ হইয়া দুই হস্তে বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া শিকল দিয়া সেই দ্বার মুখে দাঁড়াইয়া সৈন্যগণকে বাধা দিতে লাগিলেন ও হেষ্টিংসের নিকট এই ভয়ানক সংবাদ পাঠাইলেন। কান্তবাবুর অনুরোধে হেষ্টিংস সৈন্যগণকে

অন্যত্র গমনের আজ্ঞা দিলেন। কান্তবাবুও নিজ জীবনের সহিত অন্তঃপুরিকাগণের জীবনরক্ষা করিয়া প্রীত হইলেন। অন্তঃপুরে রাজ্ঞীরা বাঙ্গালীর এই মহত্ত্বের কথা স্থির কর্ণে শুনিলেন। কান্তবাবু পাল্‌কী করিয়া রাণীদের নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। রাজ্ঞীরা এই উপকারের জন্য কৃতজ্ঞচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বহুমূল্য মণিময় অলঙ্কার দিয়া পুরস্কৃত করিতে চাহিলেন। কান্তবাবু প্রথমে অসম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু পীড়াপীড়িতে শেষে স্বীকার করিলেন। এতদ্ভিন্ন বারাণসীর রাণীদিগের নিকট হইতে তিনি লক্ষ্মী-নারায়ণ শিলা, একমুখ রুদ্র প্রভৃতি বিগ্রহ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ও আর দুই একটী শালগ্রাম প্রাপ্ত হন। সেগুলি অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণের নিকট আছে। এই কান্তবাবুই কাশিমবাজার রাজবংশের সংস্থাপয়িতা।

চেৎসিংহের গোলযোগ শান্তির পর হেষ্টিংস সাহেব, বলবন্ত সিংহের দৌহিত্র মহীপনারায়ণকে গদী প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার হস্ত হইতে দেওয়ানি ফৌজদারি ক্ষমতা কাড়িয়া লয়েন। ডনকান সাহেবের আমলে বারাণসীতে দশশালা বন্দোবস্তের প্রচার হয়। মহীপনারায়ণের পর—মহারাজ উদিতনারায়ণ বারাণসীর গদী লাভ করেন। এই সময়ে তথায় পাঁচ আইন প্রচলিত হয়। বারাণসীর রাজা স্বাধীন বলিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট কতকগুলি বিশেষ স্বত্বের দাবি করেন। গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। উদিতনারায়ণের পর রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ বারাণসীর রাজা হন। সিপাহি যুদ্ধে বিশেষরূপে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়া ইনি মহারাজ বাহাদুর ও জি, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। অপুত্রতা হেতু এই মহারাজ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। এক্ষণে তাঁহার উত্তরাধিকারীই বারাণসীর বর্ত্তমান মহারাজা।

বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বারাণসী বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠাপন্ন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পণ্ডিত—বারাণসীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—তাহাদের এক তালিকা আমরা বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। পাঠক-বর্গের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। নারায়ণ ভট্ট—প্রয়োগ-রত্ন,—শঙ্কু বা শঙ্কর ভট্ট, (নারায়ণের পুত্র) দায়াদ-নির্ণয়,—কমলাকর ভট্ট—নির্ণয়-সিন্ধু,—লক্ষ্মীধর ভূধর—অদ্বৈত মকরন্দ—ভট্টোজি দীক্ষিত—সিদ্ধান্ত কৌমুদী (লক্ষ্মীধরের পুত্র) মনোরমা শব্দ-কৌস্তভ, ও মণি মেখলা,—নাগেশ ভট্ট শব্দেন্দু-শেখর, পরিভাষেন্দু-শেখর, ও মনাঙ্কুশ,—রঘুবীর—মুহূর্ত্ত-সর্ব্বস্ব,—রামাচার্য্য — মুহূর্ত্ত-চিন্তামণি, — নীলকণ্ঠ— নীলকণ্ঠী, কবীর—(কবীর পন্থীমত স্থাপয়িতা) শাখী রামায়ণ,—তুলসীদাস রামায়ণ গীতাবলী, বিনয় পত্রিকা, দোঁহাবলী ও জানকী-মঙ্গল, কবীন্দ্র সরস্বতী (সাহজাহান বাদসাহের সমকালবর্ত্তী) কবীন্দ্র কল্পলতা,—মণিদেব (১৮৩৫) মহাভারত,—লাল দাস্ দয়াল অনুরাগ-বাগ, অন্যোক্তি-কলঙ্ক, বৈরাগ্য দানেশ, ও দৃষ্টান্ত তরঙ্গিণী প্রভৃতি,—বিবি রতনকুমারী (রাজা শিবপ্রসাদের পিতামহী)—প্রেম রত্ন,—বোপদেব শাস্ত্রী বাজগণিত, প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

বারাণসী সম্বন্ধে বলিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। পাঠকের ধৈর্য্যেও কুলাইবে না—প্রদীপেও স্থানাভাব—কাজেই মনস্থোগে এই স্থানেই শেষ করিতে হইবে। প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ বারাণসীতে অনেক আছে। সেগুলি অনুসন্ধান করিলে দেশের ইতিহাস উদ্ধার হয়। বেণারসে দেখিবার শিখিবার আলোচনা করিবার অনেক জিনিস আছে। প্রাচীন ধ্বংশাবশেষ কীর্ত্তি-গুলির কালধর্ম্মে বিলোপ সম্ভব। সারনাথের বৌদ্ধস্তূপ, বকারিয়াকুণ্ড, প্রাচীন রাজ ঘাট দুর্গ, বুঁদাও মহল্লার ক্ষুদ্র মসজেদ, লাট ভৈরব, বত্রিশকুণ্ড, আড়াই-কঙ্গুরা মসজিদ্ কীর্ত্তি, বিশ্বেশ্বরের মন্দির আলমগির মসজিদ, দোনাত লোওএর প্রস্তর স্তম্ভ প্রভৃতির ধ্বংশাবশেষ আজও হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে।

মধ্যাহ্নে নির্জ্জন কক্ষে বিশ্রাম করিতেছি—একখানি পত্র আসিল। বেণারসে বৃথা কালক্ষয় করিতেছি বলিয়া ——বাবু এক সুদীর্ঘ তিরস্কার-পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার হুকুম এলাহাবাদে না গিয়া সরাসর জব্বলপুরে যাইতে হইবে। তিনি এলাহাবাদ ষ্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন।

তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না—কাজেই তৎপর দিন পঞ্জাব মেলে গিয়া উঠিলাম। বারা-

ণসীব অগণ্য অট্টালিকামণ্ডিত দৃশ্য—নাট্যালয়েব দৃশ্য পটের মত আমাব চক্ষেব উপব হইতে ধীবে ধীবে অপসৃত হইল। আমি আনন্দকাননের নিকট কিছু দিনেব জন্য বিদায় লইলাম।

রণরঙ্গিণী রমণী।

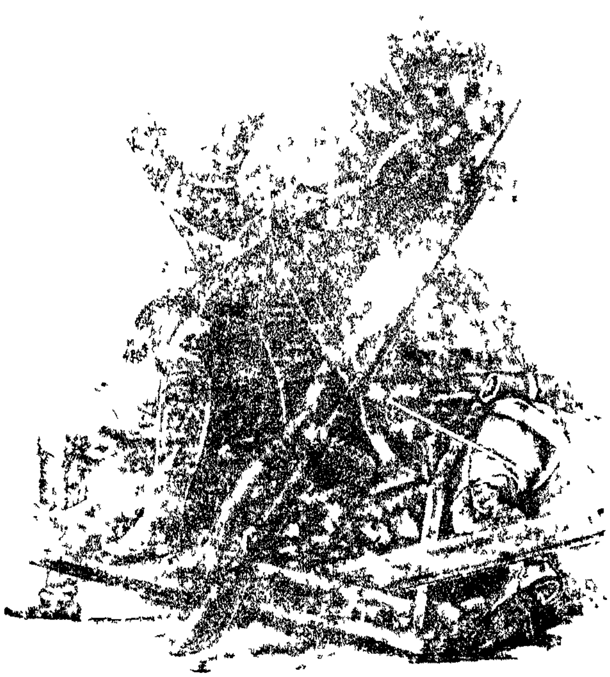
আমবা বাঙ্গালী। মেযে মানুষ বলিতে তাহাব অবগুণ্ঠনবতী অনুস্বাব-বিসর্গবৎ আশ্রয় স্থান-ভাগিনী মূর্ত্তি আমাদেব মনে আসে। আমাদেব ভাষায় অবলা আব নাবী একই কথা, তাই বমণীব উপমা ভয়ে কুবঙ্গিনী, লজ্জায় লজ্জাবতী লতা, পবাবলম্বনে বিটপাশ্রিতা বল্লবী। কুবঙ্গিনী ভয় পাইলে পলাইয়া আত্মবক্ষাব প্রযাস পায়, কিন্তু এ বাঙ্গালী চবণ যুগলে সে শক্তি নাই, ছুঁইলে লজ্জাবতী লতা কুঞ্চিত হয়, কিন্তু বঙ্গবালা দস্যু তস্কব দর্শনেবও অপেক্ষা কবে না, তাহাদেব বিভীষিকা বা কল্পিত ছাযা দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হয়, লতিকা স্বয়ং যত্নে বৃক্ষাশ্রয অবলম্বন কবে, বঙ্গবধুব পিতৃসম্প্রদানেই পতিব আশ্রয়লাভ ঘটে। সুতবাং তাহাব তুলনা খুঁজিয়া মেলা ভাব। অথবা সে নিজেই নিজেব তুলনা। আমবা বমণীব এই কুসুম সুকোমল স্নিগ্ধাতিস্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়াই অভ্যস্ত। কেহ কখনও বঙ্গবধূব হস্তে সম্মার্জ্জনী ও আঁসকাটা বটি বই অন্য অস্ত্র দেখিয়াছ কি? বাক্যবাণ কি তাহাব একমাত্র শস্ত্র নয়? উপবাস ও চোখেব জলেই ত তাহাব বলেব পবিচয়? এহ জাতিব শান্তি ও দেবীচৌধুবাণী কেমন কবিয়া পুরুষমর্দ্দিনীরূপে আবির্ভূতা হইযাছেন, জানি না। অথবা প্রাকৃত জন মহাজনের পন্থাই আমাদেব অনুসবণীয়, তাঁহাব কার্য্যের তথ্যানুসন্ধান আমাদেব পক্ষে ধৃষ্টতা। তবে মনেব কেমন উঁকিমারা অভ্যাস,—কেন, কেমন করিয়া, না জানিতে পারিলে আর কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। তাই অবোধমনকে প্রবোধ দিবার জন্য ভাবিয়া লইয়াছি যে, এ জাতির মধ্যে বিচিত্রতার আবির্ভাব ত অভিব্যক্তিরই ভ্রম। ইহাতে আমার মন ঈশানমূল-পীড়িত সর্পের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়াছে, মুখে কথাটী নাই।

আমি ইত্যবসরে সাহিত্যব্যূহ ভেদ করিলাম, কিন্তু নিষ্ক্রামণপথ শাস্ত্রদ্বারে দেখি, দশভুজা ত্রিনয়না অসিভল্লধারিণী এবং মেঘবরণা লোলজিহ্বা নৃমুণ্ডমালিনী দুই ভৈববীমূর্ত্তী দ্বাব আগুলিযা দণ্ডাযমানা। আমি দেখিযা অবাক। ভাবিলাম, বাঙ্গালীব সামাজিক জীবনে যাহা নাই, শাস্ত্র সাহিত্যে তাহা আসিল কি কবিয়া? মানবীকবণেই না দেব-সৃষ্টি? বাঙ্গালীব মেযেমানুষ ত কুসুম-কোমল, তবে তাহাব দেবতাব এ ভৈববী মূর্ত্তি কোথা হইতে? সৌখীন কার্ত্তিককে দেখিলে বেশ বুঝিতে পাবা যায, এই বাঙ্গালীব দেবতা বটে। বঙ্গদেশেব আব হাওযায় দেবসেনাপতিব সৈনিকত্ব ঘুচিযা গিযা বাবুত্ব প্রাপ্তি ঘটিযাছে। কিন্তু কালী দুর্গা দেখিযা ত বাঙ্গালীব দেবতা বলিযা মনে হয় না। বাঙ্গালী ত তালেব মধ্যে এক খেমটাই জানে, কদ তালে ত কখনও নাচে নাই, তবে কেন তাহাব দেবতাব এ রুদ্রমূর্ত্তি? *বঙ্গ পৌণ্ড্রদেশ, অনার্য্যভূমি। আর্য্য-*সমাজে নৃমুণ্ডমালিনীব অসিভল্লধাবিণীব অসদ্ভাব ছিল না। অনার্য্যসৃষ্ট আদিদেবতাব ছাঁচে এই কালী দুর্গা গঠিত। সে দিনকাব সত্যপীব যে ভাবে এখনকাব সত্যনাবায়ণ, ঠিক সেই ভাবেই অনার্য্যবমণীব প্রতিবিম্বরূপিণী কোন এক বা একাধিক অজ্ঞাত নাম্নী দেবতা আমাদেব কালী দুর্গায় প্রতিফলিত। এ বঙ্গদেশে কৃষ্ণনামে আর্য্য অনার্য্যেব সম্মিলন ঘটিবাব পূর্ব্বে কালী দুর্গা নামেই ঘটিয়াছিল। কালী দুর্গা এখনও বাঙ্গালীব বিশেষ দেবতা। পূজা বলিতে বাঙ্গালা দুর্গাপূজাই বোঝে। মোটামুটি একটা মীমাংসায় আসিয়াছি। তবে হলপ কবিয়া বলিতে পারি না, এই মীমাংসা ঠিক।

আমাদেব এ মীমাংসা ঠিক হউক আব না হউক, ইহা নিতান্তই ঠিক যে, বমণীব বণবঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিতে হইলে তাহা বঙ্গসমাজেব বাহিরে খুঁজিতে হইবে। রাজপুতনা, ও মহারাষ্ট্রেব ইতিহাসে দেখিবে এ ভৈরবীমূর্ত্তি চিত্রিত। ভারতে বণবঙ্গিণীগণেব অগ্রণী কর্ম্মদেবী, দুর্গাবতী ও লক্ষ্মীবাঈব নাম মনে পড়ে। কিন্তু বমণীব রুদ্রমূর্ত্তির পূর্ণবিকাশ যুরোপায়। সেখানে শুধু উগ্রচণ্ডা রূপ নয়, কালান্তক রূপও পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রদীপের পাঠক। বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে চাহিয়া দেখুন বমণীর রণবঙ্গিণী রূপই বা কেমন!

খৃষ্টিয়ানা ডেভিস আইরিস রমণী, ডবলিন সহরে ১৬৬৭ খৃঃঅব্দে তাঁহার জন্ম। ওল্ড মাদারবস্ (Old mother Ross) নামেই তিনি সাধারণ্যে পরিচিত। ঘটনা

ক্রমে পল্টনের আড়কাঠিরা তাঁহার স্বামীকে ধরিয়া হলাণ্ডে লইয়া যায়। খৃষ্টিয়ানা এ সংবাদে যারপরনাই ব্যথিত ও-ভাতা হইলেন, কিন্তু বিহ্বলচিত্তা হইলেন না। প্রাণ যায় যাক, থাকে থাক, স্বামীর উদ্ধার করিব, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অন্য বিরহবিধুরা বালা এ ক্ষেত্রে সহকার-চ্যুতা মাধবীর ন্যায় আকস্মিক বিপদ তাপে শুকাইয়া যাইত, কিন্তু খৃষ্টিয়ানার হৃদয় রমণীর হইলেও ভিন্ন ধাতুতে গঠিত। মৃণালভুজে গাণ্ডীব ধরিবার বল আসিল। প্রথমতঃ তিনি কোন বিশ্বস্ত সুহৃদের নিকট সন্তানগুলিকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, পরে (Golden Las) গোল্ডেন লাস নামক স্থানে যাইয়া পুরুষবেশে এক সৈন্যস গ্রাহকের সৈনিক দলভুক্ত হইলেন।



খৃষ্টিয়ানা ডেভিস।

দলভুক্ত হইবার কিছুদিন পরেই তাঁহাকে লাণ্ডেনের (Landen) যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইল। সমরাঙ্গনে এই প্রথম বন্দুক কামানের করাল ক্রীড়া দেখিয়া তাঁহার প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার হইল। দেখিতে দেখিতে একটা ভগ্ন গোলা আসিয়া তাহার পদসন্ধিতে গুরুতর আঘাত করিল। এ আঘাতে তাঁহাকে দুই মাস কাল শয্যাগত থাকিতে হইল। বিপদ ঘনীভূত হইতে লাগিল, তিনি ফরাসীদের হস্তে পড়িয়া অবরুদ্ধ হইলেন। বিনিময়ে মুক্তি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু স্বাধীনতা-সুখ অধিক দিন ভোগ করিতে পারিলেন না। কোন সুন্দরী ছদ্মবেশী খৃষ্টিয়ানার প্রতি অনুরক্তা হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া সুন্দরীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী খৃষ্টিয়ানার দলের একজন সৈনিক ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রেমের সমুদ্র মন্থনে হলাহল দেখা দিল। সৈনিক খৃষ্টিয়ানাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। খৃষ্টিয়ানা প্রকৃত রহস্য অবগত থাকিলেও তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটনে অক্ষম ছিলেন। অপর দিকে আত্মসম্মান রক্ষার্থে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পশ্চাৎপদও হইতে পারিলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাংঘাতিক রূপে আহত করিবার অপরাধে খৃষ্টিয়ানা ডেভিসের ভাগ্যে আবার কারাবাস ঘটিল।

যে নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য খৃষ্টিয়ানা পদাতিক সৈন্যদল ভুক্ত হইয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে তাহা ফুরাইল, কিন্তু তাঁহার ভাগে স্বামীর সাক্ষাৎ লাভ ঘটিল না। তখন তিনি লর্ডজন হের (Lord John Hay) অশ্বারোহী সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। এই সেনাদলে অবস্থানকালে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নামুর (Namur) অবরোধ ক্ষেত্রে অসাধারণ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া তিনি যশোলাভ করিয়াছিলেন। রিসয়ুইক নামক স্থানে (Ryswick) সন্ধি স্থাপিত হইবার পর খৃষ্টিয়ানা স্বদেশ গমন করিয়া ছদ্মবেশে তাঁহার সন্তানগুলিকে একবার দেখিয়া আসিলেন। ইহার পর পুরুষের বেশ পরিয়া এবং রমণীর প্রাণ লইয়া বিভিন্ন রণক্ষেত্রে তিনি স্বীয় রণনৈপুণ্যপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন খৃষ্টিয়ানার স্বামীসাক্ষাৎকার লাভ হইল। সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর বিরহিযুগলের মিলন বঙ্কিম-প্রোক্ত জীবানন্দ-নবীনানন্দ সংবাদের ন্যায় হাস্যরসাত্মক কি করুণরসাত্মক হইয়াছিল, বলিতে পারি না। রসিক পাঠক স্বয়ং রসোদ্ধার করিয়া লইবেন।

মার্লবরোর দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধে খৃষ্টিয়ানা আপন শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া ভাবিতেও পারিল না। রামিলিসের যুদ্ধাবসানে একটা গোলা ভাঙ্গিয়া আসিয়া তাহার মাথায় লাগে। এই আঘাতে তাহাকে তিনমাস শয্যাগত থাকিতে হয়। সেই সময়ে, তিনি যে রমণী, একথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। চারিদিক হইতে সম্মানসূচক উপহার আসিতে লাগিল। তাঁহার স্বামী তাঁহার নিকটে আনীত হইলেন। সৈন্য-দলের কাপ্তান এক নববিবাহের উদ্যোগ করিলেন। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ এই বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টিয়ানা আর রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। বিবিধ যুদ্ধে আপনার রণ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগি-লেন। মালপ্ল্যাকুয়েটের যুদ্ধে তাঁহার স্বামী নিহত হইলে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। এতদুপলক্ষে রাণী এন্ তাঁহাকে ৭৫০৲ টাকা উপহার দেন ও রাজকোষ হইতে তাঁহাকে জীবনব্যাপী বৃত্তি দেওয়া হয়। ডিউক অব্ মার্লবরোর মৃত্যু হইলে খৃষ্টিয়ানা তাঁহার সৈনিকসঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে ও ছলছল চক্ষে মৃত সেনাপতির সম্মানার্থ তদীয় শববাহী শকটের অনুগমন করিয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। চেলসী হাসপাতালে তাহাকে সমাহিত করা হয়। তাঁহার সৈনিকসঙ্গিগণ তদীয় সম্মানার্থ তাঁহার সমাধির উপর তিনবার বন্দুকধ্বনি করেন।



হানাস্নেল।

হানাস্নেল আর এক রণরঙ্গিণী। তাঁহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নাবিকরূপে সমুদ্র যাত্রা করিলে তিনি পুরুষ বেশে স্বামীর অন্বেষণে বাহির হন। প্রথমে কভেণ্টি্তে যাইয়া তিনি গাইসের সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমাগত বাইশ দিন ধরিয়া তাঁহাকে কার্লাইল অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিতে হয়। তিনি যখন কার্লাইলে ছিলেন, তখন কোন অপরাধের জন্য তাঁহার ছয় শত বেত্রাঘাতের আদেশ হইল। এই ছয়শতের মধ্যে ন্যূনকল্পে চারিশত আঘাত তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। তিনি নীরবে সে যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারিল না যে, তিনি রমণী।

অনন্তর তিনি সেই দল ত্যাগ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পোর্টস্মাউথে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি কপর্দ্দক-বিহীনা এবং নিতান্ত অসহায়া। অগত্যা তিনি জেমস্ গে নাম গ্রহণ করিয়া বস্কোয়েনের ভয়েষ্ট ইণ্ডিজ যাত্রী মানোয়ার বহরের নৌ সৈন্যদলভুক্ত হইলেন। এদেশে আসিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। পণ্ডিচারি অবরোধকালে হানাই স্বীয় দলের অগ্রণী হইয়া অগ্ন্যুদ্গিরণকারী ফরাসী কামানের সম্মুখবাহিনী নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। কেহ কখনও তাঁহাকে কঠোর কর্ত্তব্যসম্পাদনে পরা-ঙ্মুখ হইতে দেখে নাই। একদা তিনি পরিখা খননে নিযুক্ত ছিলেন। ক্রমা-গত সাতরাত্রি পরিখান্তরালে কোমর জলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং ন্যূনকল্পে দ্বাদশটি গুলি লাগিয়া তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া-ছিল। পাছে তাঁহার রমণীত্ব প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় তিনি স্বয়ং এক এদেশীয়া স্ত্রীলোকের সাহায্যে আপনার ক্ষতস্থানের প্রক্ষালন ও তাহাতে ঔষধ প্রদান করিতেন,—চিকিৎসকের সাহায্য আদৌ গ্রহণ করিতেন না। হানার সুমসৃণ মুখমণ্ডল দেখিয়া কেহ বা তাহাকে কুমারী মলী গ্রে বলিয়া ডাকিত, আবার কেহ বা তাঁহার হাসিখুসি মেজাজ দেখিয়া তাহাকে হার্ট্ জিমি বলিত। কিন্তু কেহ কখন তাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে নাই।

এইরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েক বৎসর যাপন করিয়া পরে তিনি শুনিতে পাইলেন, যে স্বামীর অন্বেষণে তিনি আপন

গৃহ ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া রণক্ষেত্র সার করিয়াছেন, নরহত্যা অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াগিয়াছে!

এই সংবাদ শুনিবামাত্র তিনি রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। রণরঙ্গিণী বেশ বর্জ্জন করিয়া আবার রমণী সাজিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার আবার বিবাহ হইল। কিন্তু এই বিবাহিত জীবন তাঁহাকে অধিকদিন যাপন করিতে হইল না। একটী পুত্রসন্তান রাখিয়া তিনি ৬৯ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন।

মহাবীর নেল্‌সন্ যুদ্ধে বামচক্ষুহীন হন, একথাটা সর্ব্বজন-বিদিত। নিকারাগুয়া সাধারণতন্ত্রের সেনাপতি সিগর ডি লিবারেটো আবারকা বলেন যে, একজন রণরঙ্গিণীর হস্তে এই অদ্বিতীয় বীরপুরুষকে চক্ষু হারাইতে হইয়াছিল!

১৭৮০ খৃঃ অব্দে নেল্‌সন্ আপন নাবোয়ার বহর সমভিব্যাহারে মধ্য আমেরিকার উপকূলাস্থিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্পেনীয় উপনিবেশগুলির যথাসম্ভব নিগ্রহ করিতেছিলেন। ক্যাসল অব স্যানকার্লস ডি নিকারাগুয়া অধিকার মানসে হঠাৎ একদিন স্যানজুয়াল নদী বাহিয়া দুর্গসম্মুখীন হইলেন। প্রতিরোধ-প্রয়াস বৃথা ভাবিয়া দুর্গস্থ সৈন্যেরা দুর্গ ত্যাগ করিল। শুধু ডোনামোরা নাম্নী একটি রমণী দুর্গ ত্যাগ করিলেন না। তিনি একটা



মেরি সেলিয়েক্ক ও নেপোলিয়ন।

জলন্ত দেশলাইয়ের সাহায্যে নভোভিমুখীন কামানগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। যুগপৎ কামানগুলি ভৈরবরবে গোলা বর্ষণ করিল। একটা গোলা ভাঙ্গিয়া নেল্‌সনের চক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি যন্ত্রণায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন দেখিয়া দুর্গাবরোধ-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যক্ত হইল। এইরূপে এক রমণীর অলোক সাধারণ শৌর্য্যে শত্রুহস্ত হইতে দেশ রক্ষা পাইল। এই স্বদেশহিতৈষণার জন্য ডোনামোরা রাজাদেশে জীবন-ব্যাপী বৃত্তি, কাপ্তেন উপাধি ও সম্মান-সূচক পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

মেরী সেলিয়েক্ক নাম্নী আর এক রমণী স্বীয় শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য মহাবীর নেপোলিয়ানের হস্ত হইতে লিজিয়ন অব অনার চিহ্নিত ক্রুশ পুরস্কার পাইয়া সুবিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। প্রথমে ১৭৯২ খৃঃ অব্দে তিনি দ্বিতীয় সংখ্যক সৈন্যদলে পুরুষ ভলাণ্টিয়াররূপে প্রবেশ করেন। অষ্টারলিজের যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ শৌর্য্য প্রদর্শন করিতে দেখিয়া নেপোলিয়ন তাঁহাকে সাতশত ফ্রাঙ্কের জীবনব্যাপী বৃত্তি প্রদান করেন। ইতালি হইতে প্রত্যাগত হইয়া মেরী সেলিয়েক্ক যখন সম্রাট্-পত্নী যোসেফিনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন তাঁহাকে মূল্যবান্ মকমলের পোষাক পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত হয়। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত লিজিয়ন অব্ অনারসম্মান প্রাপ্ত প্রত্যেকে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালীন মিছিলে (Procession) উপস্থিত ছিলেন।

ফরাসী প্রলয়কাণ্ডের ভৈরব যুগে (Reign of Terror) পারী ও অন্যান্যনগরে উগ্রচণ্ডা নাম লইয়া স্ত্রীলোকেরা দলে দলে বাহির হইত। ইহারা অনাহারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, কাস্তে কুড়াল হস্তে লইয়া সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্থান করিত ও উদরান্নের দাবী করিত। এই সময় দুটী রমণী আপনাদের অসীম সাহসের জন্য বিশেষ বিখ্যাত হন। তন্মধ্যে এক জনের নাম রোজ লাকোম (Rose Lacomb) অপরের নাম থিয়রন ডি মেরীকোর্ট। প্রথমা সামান্য অভিনেত্রী ছিলেন। অভিনয় ছাড়িয়া তিনি রণরঙ্গে মাতিলেন। দ্বিতীয়ার অসাধারণ রূপলাবণ্য দেখিয়া সকলে তাঁহাকে লা বেলি লিগজ বা লিজবাসিনী সুন্দরী (La Belle Liegoise) বলিত। লা বেলি লিগজ রক্তবর্ণরেসমবস্ত্র পরিহিতা হইয়া পালক শোভিত উষ্ণীষ মস্তকে দিয়া সর্ব্বদাই আপন সঙ্গিনীগণের অগ্রণী হইতেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইনভালিডেসের (the Invalides) সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া ছিলেন। তিনিই অগ্রণী হইয়া ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে বাস্তিল (the Bastille) আক্রমণ করেন। রোজ লাকোমের সমভিব্যাহারে তিনিই আবার সহস্র সহস্র অনাহারক্লিষ্ট ও ক্ষিপ্তপ্রায় পারীবাসিনীগণের অগ্রণী হইয়া ভার্স্লেল (Versaille) আক্রমণ করেন। চিত্রে তাঁহার বাস্তিল আক্রমণ চিত্রিত। কি রোমহর্ষণ চিত্র! কুসুমকোমলা রমণীর কালান্তক রূপ কি ভয়াবহ!



থিয়রণ ডি মেরিকোর্ট।

রমণি! আমি না জানিয়া এতকাল তোমাকে রোদনসম্বলা অবলা বলিয়া ভাবিয়াছি। অপরাধ ক্ষমা কর। প্রসন্ন হও। তোমার রণরঙ্গিণীরূপ সম্বরণ কর। অর্জ্জুনের অনুরোধে বাসুদেব কালান্তক রূপ সংবরণ করিয়া চিরপরিচিত চতুর্ভুজ নারায়ণ হইয়াছিলেন। আবার বাঙ্গালী বৈষ্ণব ভক্তের আগ্রহে দ্বিভুজ মুরলীধর সাজিয়াছিলেন। রমণি! তুমি একবার বাঙ্গালীর ঘরণীরূপে ভয়ত্রস্ত বাঙ্গালী লেখক ও পাঠকের হৃদ্‌পদ্মে বিহার কর। তোমার বলয়শোভিত বাহুদ্বয়,মল পরিহিত অলক্তরঞ্জিত পদযুগল আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হউক। তোমার গজেন্দ্রগমনে চক্ষু জুড়াক, মঞ্জীরসিঞ্জন শ্রবণে অমৃতধারা বর্ষণ করুক। আর অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে ও বিধুবদনসুধা প্রাণে সঞ্চারিত হইয়া বিষাদমণ্ডিত মৃতপ্রায় প্রাণকে সঞ্জীবিত করুক।

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম।

প্রতিহিংসা।

(গল্প।)

১

সিপাহী বিদ্রোহ তখন শেষ হইয়াছে, ইংরাজের প্রবল পরাক্রমে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বিদ্রোহিগণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু ইংরাজের ক্রোধবহ্নি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, অস্ত্রধারী সিপাহী দেখিলেই ইংরেজ-সৈনিকগণ তাহাদিগকে ধরিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারিতেছে, কিম্বা গাছে লটকাইয়া সঙ্গীনের আঘাতে উদরবিদারণপূর্ব্বক নিদারুণ প্রতিশোধপিপাসা প্রশমিত করিতেছে।

সিপাহী বিদ্রোহের বিভীষিকা তখনও দূর হয় নাই। এক এক দিন এক একটা নূতন হুজুগ উঠিয়া রণশ্রান্ত ইংরেজ সৈনিকগণের হৃৎকম্প উপস্থিত করিতে লাগিল। এই সকল হুজুগ হয় ত সর্ব্বৈব মিথ্যা। কিন্তু এক দিনের হুজুগে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না; একদিন সকালে জনরব উঠিল,ছত্রভঙ্গ সিপাহীরা আবার জোট বাঁধিতেছে, শীঘ্রই টুপিওয়ালার গোফে আগুন লাগাইয়া দিবে; বেরেলী, বিদ্রোহী সিপাহীদিগের প্রধান আড্ডা হইয়াছে। এই জনরব প্রচারের পর একদিন বেরেলীর ইংরাজদুর্গ হইতে আধ ডজন বন্দুক চুরী গেল। সকলে বুঝিল, ইহা নিরস্ত্র সিপাহীদিগেরই কাজ।

চারিদিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ইংরেজ সেনাপতির আদেশে বেরেলী দুর্গ হইতে দলে দলে অশ্বারোহিসৈন্য বন্দুকচোর সিপাহীদিগের সন্ধানে ছুটিল। কিন্তু চোর ধরা পড়িল না, তথাপি নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণ চৌর্য্যাভিযোগে দণ্ডিত হইতে লাগিল। যিনি ফরিয়াদী তিনিই বিচারক, সাক্ষী ইংরাজ সৈন্য; অপরাধ সপ্রমাণ ও অপরাধীর প্রতি দণ্ডদান উভয়ই সমান উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল।

কিন্তু ইহাতে চুরীর হ্রাস হইল না। বন্দুকচুরীর সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তাহা চতুর্দ্দিকে সংক্রামিত হইয়া পড়িল, ইংরেজের উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। শেষে সেনাপতিগণ মন্ত্রণা করিয়া এক মিলিটারী কমিশন বসাইলেন। তাহার সভ্যসংখ্যা দশ জন। কমিসনের সভাপতির প্রতি অপরাধিগণের সরাসরি বিচার করিয়া দণ্ডদানের ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। এই সভাপতি মহাশয়ের নাম কাপ্তেন থরন্‌টন্‌।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে একদিন অপরাহ্ণে কাপ্তেন থরন্‌টন্‌ অশ্বারোহণে বায়ু সেবনার্থ সেনানিবাস হইতে বহির্গত হইবেন, এমন সময় একজন এডজুটাণ্ট একখানি আদেশপত্র তাঁহার স্বাক্ষরের জন্য

লইয়া আসিল। মিঃ থরনটন্ অশ্বগতি সংযত করিয়া তাঁহার সহকারী এডজুটাণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ?"

"আবদুল গফুর নামক একজন মুসলমান সিপাহীর কোতলের পরওয়ানা। একজন সারজেণ্ট তাহাকে পাহাড়ের উপর গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

"আসামীর জবাব কি ?"

"কোম্পানীর সৈন্য দেখিয়া সে তাহার হাতের বন্দুক তাড়াতাড়ি পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। আসামী বলে, সে তাহার ভাই আবদুল আব্বাসের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে, তাহার কোন কু-মতলব নাই। আবদুল আব্বাস পঞ্জাবে সওদাগরী করে, আজ কয়েক দিন এ দেশে আসিয়াছে। আসামী আবদুল গফুরের এ কথায় বিশ্বাস করা যায় না। সে সরকারের বন্দুক চুরী করিয়া বিদ্রোহীদিগের সাহায্যের জন্য যাইতেছিল, তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।"—এই বলিয়া এডজুটাণ্ট নীরব হইল।

"ঠিক কথা। বদমায়েসকে গুলি করিয়া পশুর মত হত্যা কর।" কাপ্তেন অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই অকম্পিত হস্তে হত্যার আদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন।

অবিলম্বে এই আদেশ নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপালিত হইল।

২

যাহাদিগের চক্ষুর উপর এই হত্যাব্যাপার সংসাধিত হইল, তাহাদের মধ্যে আবদুল গফুরের ভ্রাতা আবদুল আব্বাস একজন দর্শক ছিল। নীরবে সে তাহার ভ্রাতার শোচনীয় হত্যা সন্দর্শন করিল, তাহার শোকসন্তাপবিদ্ধ হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া তাহার হৃৎপিণ্ডকে সবলে বিদলিত করিতে লাগিল, তাহার অশ্রুহীন চক্ষে প্রতিহিংসার অনল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।

আবদুল আব্বাস তাহার ভ্রাতার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার বিধবা ভ্রাতৃবধূ ধরাতলে পড়িয়া অশ্রুধারায় মৃত্তিকা সিক্ত করিতেছে, শিশুপুত্র দুটি তাহাদের মায়ের কোলের কাছে পড়িয়া মাটিতে লুটাইতেছে। আবদুল দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, এই অত্যাচারের প্রতিশোধ দানের জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। গৃহে একটা পিস্তল ঝুলিতেছিল,—পিস্তলটি কিছু পুরাতন ও মরিচা ধরা। সেই পিস্তলে সে কাপ্তেনের প্রাণবধের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল।

ঠিক এই সময়ে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আবদুল গফুরের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী প্রাচীন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় তাঁহার দেহে যুবজনোচিত সামর্থ্য বর্ত্তমান। সন্ন্যাসীর নাম কি, তাহা কেহ জানিত না, কিন্তু হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে সমভাবে ভক্তি করিত। মুসলমানেরা তাঁহাকে 'ফকির সাহেব' বলিয়া ডাকিত, হিন্দুরা বলিত 'স্বামীজি'। কোম্পানীর নফরেরা তাঁহাকে কোন বিদ্রোহপরায়ণ ক্ষত্রিয়-রাজার 'পলিটিক্যাল স্পাই' মনে করিয়া তাঁহার প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিয়াছিল, কিন্তু কোন বিষয়েই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সংসারের সুখদুঃখ ও জাতিভেদের গণ্ডির অনেক ঊর্দ্ধে তিনি বিচরণ করিতেন।

সন্ন্যাসী একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভূম্যবলুণ্ঠিতা বিধবা ও তাহার ক্রন্দমান সন্তানদ্বয়ের দিকে চাহিলেন; তাহার পর আবদুল আব্বাসকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আব্বাস মিঞা, প্রতিহিংসার জন্য প্রস্তুত হইতেছ ?"

আবদুল আব্বাস অবিচলিতভাবে বলিল, "যাহারা আমার নিরপরাধ ভ্রাতাকে অবিচারে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের স্বহস্তে বধ করিয়া ভ্রাতৃশোক নিবারণ করিব, প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার।" সে অবিচলিত উৎসাহের সহিত বন্দুক ঘসিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস, ক্ষান্ত হও, অত্যাচারের দণ্ড বিধানের কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান, তোমরা যাঁহাকে খোদা বল, তিনিই। প্রতিদিন প্রচুর রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তুমি আর সে স্রোতের বৃদ্ধি করিও না। পরমেশ্বর তাঁহার কাজ করিবেন, অনুতাপে পাপীর হৃদয় দগ্ধ হইবে, রক্তপাত করিয়া আর তুমি তাহার অপেক্ষা কি অধিক দণ্ড-বিধান করিবে।"

আবদুল আব্বাস দৃঢ়হস্তে বন্দুক চাপিয়া ধরিয়া সন্ন্যাসীর মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি সংস্থাপনপূর্ব্বক বলিল, "ফকির সাহেব, আপনি হিন্দু, তাই হিন্দুর মত পরামর্শ দিয়াছেন। কাফেরের প্রাণবধেই মুসলমানের পরম পুণ্য, তাহাই মুসলমানের পরম ধর্ম্ম। আমি সেই ধর্ম্ম পালন করিব, আপনি বাধা দিবেন না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আব্বাস মিঞা, তোমার এই ক্রোধের জন্য আমি তোমাকে অপরাধী করিতে পারি না। কিন্তু হিন্দুমুসলমান সকল ধর্ম্মের উপর এক ধর্ম্ম আছে, তাহা পরমেশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তুমি এই হিন্দু সন্ন্যাসীর অনুরোধ রক্ষা করিলে কখন কর্ত্তব্যচ্যুত হইবে না। আমি কাহাকেও কখন অন্যায় অনুরোধ করি নাই।"

আব্বাস মিঞা বন্দুক হাতে করিয়া কতক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, "আমরা সকলে আপনাকে পীরের ন্যায় মান্য করি, কখন আপনার অবাধ্য হই নাই, আজও হইব না। প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ হস্ত শত্রু-শোণিতপাতে বিরত হইবে। কিন্তু প্রতিশোধ স্পৃহায় আমার হৃদয় জলিয়া যাইতেছে, কতদিনে এ অন্যায় অত্যাচারের প্রতিফল প্রদত্ত হইবে ?"

সন্ন্যাসী একবার আকাশের দিকে চাহিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। সেই স্তব্ধ সান্ধ্য আকাশে নবোদিত

তারকার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া তিনি ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর দূরবর্ত্তী বনভূমির দিকে চাহিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলিলেন,"এক বৎসরের মধ্যে।"

বন্দুকটা যেখানে ঝুলান ছিল, কক্ষমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আবদুল আব্বাস্ তাহা সেখানেই ঝুলাইয়া রাখিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দেখিল, সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়াছেন।

৩

রাত্রি আটটা। কাপ্তেন থরন্টন্ তাঁহার শয়ন গৃহের বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন। তাঁহার মন আজ চিন্তা-পূর্ণ। আজ হঠাৎ তাঁহার মনে হইয়াছে, এই যে তিনি ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত মনুষ্যবধের আদেশ প্রদান করিতেছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কতদূর সঙ্গত বা বৈধ হইতেছে, তাহা কি কোন দিন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? কতকগুলি অসহায় দুর্ব্বল মনুষ্যকে ধরিয়া তিনি তাহাদিগের বধের আদেশদান করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের কতটুকু অপরাধ আছে, তাহারা সত্যই অপরাধী কি না, তাহার কি কোন দিন প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি ক্ষমতালাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার দায়িত্ব বিস্মৃত হইবার কিছুমাত্র অধিকার নাই; তিনি তাঁহার এই ব্যবহারে বৃটিশরাজমহিমাই যে কলঙ্কিত করিতেছেন তাহা নহে, তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও মনুষ্যত্বকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞাত করিতেছেন।—এ সকল চিন্তা আজ প্রথম তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে। তিনি মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্বচ্ছন্দতা, কিছু কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

একজন দেশীয় অশ্বারোহী সৈনিকসবার সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সে মিলিটারি প্রথায় কাপ্তেন সাহেবকে অভিবাদন করিয়া তাহার হস্তে গালা মোহর করা নীলবর্ণের লেফাফা মোড়া একখানা পত্র প্রদান করিল। কাপ্তেন থরন্টন্ যদি সে সময় একবার তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, তাহার মুখ মলিন, ভীতিবিস্ময়সমাকুল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে জলন্ত গোলা অগ্নিস্রোতের ন্যায় সবেগে ছুটিয়া আসিতে দেখিলেও তাহার মনের ভাব হয়ত এরূপ হইত না; আজ সহসা তাহার এ ভাব কেন?

কিন্তু সে দিকে লক্ষ্যপাতমাত্র না করিয়া মিঃ থরন্টন্ লেফাফার গালা মোহর ভাঙ্গিয়া পত্রখানি টানিয়া বাহির করিলেন। দেখিলেন, নীলবর্ণের চিঠির কাগজ, ভিতরে ইংরাজীতে এই কয়টি কথা মাত্র লিখিত:—

"১৮৫৮ সালের ১৭ই জুলাই আবদুল গফুর নিহত হইয়াছে।

"১৮৫৯ সালের ১৭ই জুলাই কাপ্তেন থরন্টন্‌কে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

"পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর এক বৎসর মাত্র বিলম্ব।"

পত্রের নীচে একটা স্বাক্ষর, অতি অস্পষ্ট স্বাক্ষর, তাহা কাহার হস্তাক্ষর কাপ্তেন সাহেব বহু চেষ্টাতেও তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

কাপ্তেন থরন্টন্ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া পত্রবাহী পদাতিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই পত্র আনিয়াছে?"

"আবদুল গফুর, একজন মুসলমান সিপাহী।"—ভগ্নস্বরে পদাতিক এই উত্তর দিল।

"অসম্ভব। আবদুল গফুরের প্রাণদণ্ড হইয়াছে।"

"হাঁ খোদাবন্দ, যাহাদের গুলিতে আবদুল গফুরের প্রাণ বাহির হইয়াছে, আমি তাহাদের মধ্যে একজন; তাহার প্রাণদণ্ডের পর যখন তাহার মৃতদেহ পর্ব্বতগুহায় নিক্ষিপ্ত হয়, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু আমি আমার চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি না, আবদুল গফুর এই কেল্লার ভিতর আসিয়া স্বহস্তে আমাকে এই পত্র দিয়া গিয়াছে।"

কাপ্তেন থরন্টন্ কুসংস্কারান্ধ লোক ছিলেন না, সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, পদাতিকের নিশ্চয়ই কোন রকম চক্ষের দোষ ঘটিয়াছে। তথাপি একটা অজ্ঞাত ভয়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার হৃদয় বিকম্পিত হইল—এই সংক্ষিপ্ত ও সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত ভাষায় লিখিত পত্র খানি প্রেতলোকের এক অপরিজ্ঞাত রহস্যময় ইঙ্গিতের ন্যায়, তাঁহার বোধ হইল। কিন্তু তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একজন সাহসী কাপ্তেন, স্বহস্তে অনেক সিপাহী বধ করিয়াছেন; এক সপ্তাহের মধ্যেই এই অপ্রীতিকর পত্রের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলেন।

৪

কাপ্তেন থরন্টনের স্ত্রী বিবি থরন্টন্ তখন আগ্রায় ছিলেন। ১৬ই আগষ্ট রাত্রে কাপ্তেন সাহেব বেরেলী হইতে স্ত্রীকে দেখিবার জন্য আগ্রায় আসিলেন। স্ত্রীর নিকট হইতে এক জরুরী পত্র পাইয়া হঠাৎ তাঁহাকে আগ্রায় চলিয়া আসিতে হয়। ১৭ই আগষ্ট প্রভাতে কাপ্তেন সাহেব দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সুখসুপ্তিমগ্ন ছিলেন। পূর্ব্বদিনের পথশ্রমে তাঁহার শয্যাত্যাগে কিছু বিলম্ব হইল। বেলা প্রায় আটটার সময় তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া সশরীর বাহিরে আসিতেই বিবি থরন্টন্ তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন, পত্রখানি সেই পূর্ব্বের পত্রের মত নীল লেফাফায় আঁটা। পত্রখানি দেখিয়াই সহসা কাপ্তেনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, কম্পিতহস্তে মেম সাহেবের নিকট হইতে পত্র লইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে তিনি তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন পত্রের ভাষা ও নাম স্বাক্ষর আবকল পূর্ব্বের ন্যায়; প্রভেদের মধ্যে এই পত্রে লেখা আছে, "পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর এগার মাস মাত্র বিলম্ব।"

কাপ্তেন কিয়ংকাল চিন্তা করিয়া তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ পত্র কোথায় পাইলে ?"

"সাতটার সময় বাঙ্গলোর বারান্দায় বেড়াইতেছিলাম, একটা দীর্ঘদেহ মুসলমান সিপাহী পত্রখানা আমার হাতে দিয়া কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।"

কে এই সিপাহী ? সাহেব শয়নের বস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়াই কক্ষমধ্যে অধীরভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। বিবি থরনটন্ সহসা স্বামীর এই প্রকার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার পত্র, কি সংবাদ ?"

"কিছু নয়"—বলিয়া কাপ্তেন পত্রখানি শত খণ্ডে ছিন্ন করিয়া বাতায়নপথে কক্ষের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন, এক খণ্ড উড়িয়া তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সাহেব সেই কাগজ টুকরা হাতে করিয়া পুনর্ব্বার বাহিরে ফেলিতে যাইবেন, হঠাৎ তাহার উপর দৃষ্টি পড়িল, লেখা আছে,—"এগার মাস।"

কাপ্তেন সাহেবের হৃদয় চিন্তাভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। আজ তাঁহার মনে হইল, নিশ্চয়ই কোন অতিপ্রাকৃত ঘটনার সহিত এই পত্রের সংস্রব আছে। তিনি বেরেলী হইতে পূর্ব্ব রাত্রে হঠাৎ আগ্রায় আসিয়া পৌছিয়াছেন, তাঁহার বেরেলীত্যাগের কথা তাঁহার দুই একটা বিশ্বস্ত বন্ধু ও উদ্ধতন কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্যের বিদিত ছিল না। তথাপি কে কিরূপে তাঁহার আগ্রা আগমনের সংবাদ পাইয়া এই পত্র পাঠাইল ? ইহা কি কেবল মিথ্যা ভয় প্রদর্শন মাত্র ? কোন ক্রমে তাঁহার দুশ্চিন্তা দূর হইল না, এক চিন্তার পর আর এক চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। তাঁহার ক্ষুধা নিদ্রা দূর হইয়া গেল ; হুইস্কির সাহায্যে তিনি এই চিন্তা, এই অজ্ঞাত ভয় নিবারণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বৃথা হইল, ঘোর অসচ্ছন্দচিত্তে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর কোন রাজকার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে দিল্লী যাইতে হইল। ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রি নয় ঘটিকার সময় দিল্লীর ইংরাজ সেনাপতির গৃহে এক প্রকাণ্ড 'ডিনরের' আয়োজন হইয়াছে। কাপ্তেন, কর্ণেল, লেফটেনাণ্ট, মেজর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোট বড় সকল 'মিলিটারি জিনিয়াস' টেবিল পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন ; মিলিটারি কুললক্ষ্মীগণ দেশের টেলরসপ অন্ধকার করিয়া সুপক্ষ প্রজাপতিবৃন্দের ন্যায় যোদ্ধৃবর্গের পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক "None but the brave deserves the fair" সুকবি ড্রাইডেনের এই স্মরণীয় উক্তির সারবত্তা সপ্রমাণ করিতেছেন। ব্রোচ, ব্রেসলেট, নেকলেসের ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত, আলোকে পুলকে উদ্ভাসিত সুন্দরীগণের রূপজ্যোতিঃ সৌরকর প্রতিফলিত নির্ঝর-ধারার ন্যায় বিচ্ছুরিত হইতেছে। কাপ্তেন থরনটন্ একটি সুন্দরী যুবতীর স্বাস্থ্যপানের আকাঙ্ক্ষায় গ্লাসটি তুলিয়াছেন, এমন সময় একজন আরদালি টেবিলের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রখানি নীল লেফাফার ভিতর বন্ধ গালা মোহর করা। পত্রখানি দেখিয়াই সাহেবের হাত হইতে গেলাস পড়িয়া গেল, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, সর্ব্বশরীর বাতাহত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। সহসা তিনি ভয়ানক অসুখ বোধ করিতেছেন বলিয়া ডিনার টেবিল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে পত্র খুলিতে সাহস হইল না। অনেক চেষ্টার পর পত্র খুলিয়া দেখিলেন, সেই এক কথা ; নূতনের মধ্যে তাঁহার পরমায়ুর আর একমাস হ্রাস হইয়াছে, তাহাই লেখা আছে। পরদিন কাপ্তেন সাহেব দিল্লী ত্যাগ করিলেন। তিনি যেখানেই থাকুন, পর পর কয়েক মাস ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে লাগিল।

৫

কয়েক মাস পরে একদিন কাপ্তেন সাহেব দেবাদুনের সন্নিকটবর্ত্তী কোন পার্ব্বত্য অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। দিবাবসান কালে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তিনি অত্যন্ত শ্রান্তি-বশতঃ একটি ক্ষুদ্রকায়া গিরিতরঙ্গিণী তীরে সংকীর্ণ পার্ব্বত্যপথের উপর বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং অদূরবর্ত্তী গিরিগুহা প্রান্তে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনীভূত হয় নাই ; কাপ্তেন সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন—সেই নিশ্চল নির্ব্বাক দেহ আবদুল গফুরের।

সেই সায়ংকালে নির্জ্জন গিরিনদী তটে, অপরিসর পথের উপর ছয় মাস পূর্ব্বে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ সজীব দণ্ডায়মান দেখিয়া কাপ্তেন থরনটন্ নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল ; কিন্তু তিনি বীর পুরুষ, কাপুরুষের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার কক্ষস্থিত চর্ম্ম-নির্ম্মিত কোষ হইতে একটি রিভলবার আকর্ষণ পূর্ব্বক আগন্তুকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। কিন্তু আগন্তুক নিশ্চল, গুলি খাইয়া অক্ষত দেহে সে হা হা করিয়া হাসিয়া যে দিকে পূর্ব্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছিল, সেই দিকেই দ্বিতীয় বার তাহার অকম্পিত হস্ত প্রসারিত করিল। তাহার সেই অবজ্ঞাপূর্ণ জীবনের হর্ষোচ্ছ্বাসবর্জ্জিত, নীরস উচ্চহাস্য সেই মৌনসায়াহ্নের শত গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া ধীরে ধীরে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাহার নির্নিমেষ চক্ষুর তারকাদ্বয় দীপ্তিমান অগ্নিগোলকের ন্যায় জ্বলিতে

লাগিল; সেই অবজ্ঞাব্যঞ্জক, রোষানলপ্রদীপ্ত তীব্রদৃষ্টি মনুষ্যেরও নহে, পশুরও নহে, তাহা উৎপীড়িত আহত প্রতিহিংসা-লোলুপ পিশাচের পৈশাচিকতায় পরিপূর্ণ। ক্যাপ্তেন থরনটন্ চক্ষু অবনত করিলেন। তাহার পর চক্ষু তুলিয়া যখন তাহার দিকে পুনর্ব্বার চাহিলেন, দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই, অস্তমান অংশুমালীর অন্তিমকিরণ রেখার ন্যায় তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। শব্দহীন, গতিহীন ভাবে সে ছায়ামূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল? ছায়া না কায়া? কিছুই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। সেই মূর্ত্তি যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল, ক্যাপ্তেন অবসাদ শিথিল পদক্ষেপে অত্যন্ত মন্থরগমনে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। গুহাপ্রান্তে চাহিয়া দেখিলেন, নীল লেফাফায় মোড়া একখানা পত্র পূর্ব্ব পত্রের ন্যায় গালা মোহর করা সেখানে পড়িয়া আছে। লেফাফার উপরে তাঁহারই শিরোনামা। সাহেবের ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইল, বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল, তিনি সেই গুহাপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর পত্রখানি তুলিয়া লইয়া মোহর ভাঙ্গিয়া সন্ধ্যার মৃদু আলোতে তাহা পাঠ করিলেন। পত্রখানি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় সংক্ষিপ্ত পত্রে তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইয়াছে, তাঁহার আয়ুঃকাল আর ছয় মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে।

৬

ইহা নিশ্চয়ই যে অনৈসর্গিক ঘটনা, ক্যাপ্তেন সাহেবের অতঃপর সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাঁহার মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ শতগুণ সংবর্দ্ধিত হইল, তাঁহার মুখ হাস্যহীন, পাংশুবর্ণ, চক্ষু জ্যোতিহীন, কোটরগত, দেহের সে লাবণ্য নাই, মনের সে দৃঢ়তা নাই, সংকল্পের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, এক একখানি পত্র কেবল যে তাঁহার পরমায়ু হ্রাসের সংবাদ বহন করিয়া যথানিয়মে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইতে লাগিল, তাহা নহে, প্রত্যেক পত্র তাঁহার দেহের শোণিতশোষণ করিতে লাগিল; ক্রমে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, কি দিবসে, কি নিশীথে, কি আলোকে, কি অন্ধকারে, কি জাগরণে, কি নিদ্রায় বিধাতার অলঙ্ঘ্য কঠোর বিধানের ন্যায়, অনির্দ্দেশ্য হস্তলিখিত সেই সংক্ষিপ্ত পত্র সর্ব্বক্ষণ তিনি তাঁহার হৃদয়পটে মুদ্রিত দেখিতেন।

বেরেলী ক্যাণ্টনমেণ্টের বাহিরে একদিন ক্যাপ্তেন থরনটন্ অশ্বারোহণে প্রাতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অন্যমনস্কভাবে অশ্বচালন করিয়া অবশেষে তিনি অনেক দূরে একটী সেতুর উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি অনতিদীর্ঘ খালের উপর এই সেতু প্রসারিত।

সংকীর্ণ সেতু। ক্যাপ্তেন সাহেব সেতুর অপর প্রান্তে উপস্থিত হইবেন, সম্মুখেই দেখিলেন, একটি বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নাম—রামহিত তেওয়ারি। মিঃ থরনটন্ রামহিতকে চিনিতেন। তাহার পুত্র পরীক্ষিৎকে বিদ্রোহী সন্দেহে সাহেব তোপের মুখে উড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার আদেশে তাহার অধীনস্থ সিপাহীরা তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে; অবশেষে তাহার একমাত্র অবলম্বন ক্ষুদ্র কুটীরে অগ্নি সংযোগ করিয়া তাহা ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছে। পৃথিবীতে রামহিত তেওয়ারির আপনার বলিতে আর কেহ নাই, কিছু নাই।

সেই শিরাবহুল জীর্ণ বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া সেই জীবিতকঙ্কাল মিঃ থরনটনের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পরে সাহেবের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "ক্যাপ্তেন সাহেব, চিনিতে পার কি? আমি তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি।"

সাহেব বলিলেন, "আমার অপেক্ষায়? আমার কাছে বিদ্রোহীর পিতার কি দরকার থাকিতে পারে? ভিক্ষুক পথ ছাড়িয়া দে নতুবা তোর বুকের উপর আমার অশ্বের ক্ষুর বিদ্ধ হইবে।"

"আমি সে ভয়ে ভীত নহি। ভগবান নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, উৎপীড়কের দমনকর্ত্তা, তোমার দমনের জন্য তাঁহার ন্যায়দণ্ড উত্তোলিত রহিয়াছে, সাহেব সাবধান!"

ক্যাপ্তেনের দেহের সমস্ত রক্ত তাঁহার মুখে আসিয়া জমা হইল, তিনি বলিলেন, "নিমকহারাম, আমার অপমানে সাহস হইতেছিস্?" সাহেব বন্দুক তুলিয়া রামহিতের মস্তক লক্ষ্য করিলেন।

বৃদ্ধ অচঞ্চল। বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি পত্র উন্মোচন করিয়া দক্ষিণহস্ত সাহেবের দিকে প্রসারিত করিল। বলিল, "সাহেব, তুমি দিন দুনিয়ার মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছ, তোমার অপমান করে, আমার এমন কি সাধ্য? খাপা হইও না, তোমার নামে একখানি পত্র আছে লও।"—সেই নীল লেফাফা, গালা মোহর করা পত্র। সাহেবের হস্ত হইতে বন্দুক খসিয়া পড়িল, বৃদ্ধ রামহিত সে দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া পত্রখানি ক্যাপ্তেনের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল। মিঃ থরনটন্ মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্ষণকাল নিশ্চলভাবে সেখানে অবস্থান করিলেন, তাঁহার চক্ষুর উপর চরাচর ঘুরিতে লাগিল, প্রভাতের উজ্জ্বল দিবালোক নিবিয়া গেল। দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল। কিন্তু অনেক কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন, সেই ভীষণ দৈববাণী। স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে—তাঁহার পরমায়ু আর এক মাস!

'মেডিক্যাল লিভ' লইয়া সাহেব পরদিন বিলাতযাত্রা করিলেন। এত দিনে তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে, এক মাস পরেই তাঁহাকে দেহ বিসর্জ্জন করিতে হইবে, দেশত্যাগ করিয়া যদি কোন ক্রমে অব্যাহতি লাভ করা যায়!

৭

মিঃ ম্যাকফারসন বোম্বের একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী, তিনি কাপ্তেন থরনটনের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন সাহেব জীর্ণদেহ,উদ্বেগ তাড়িত হৃদয় লইয়া বোম্বে নগরে ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। স্নেহময়ী ভগিনী দীর্ঘকাল পরে ভ্রাতার দেহ ও মনের অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, “এ অবস্থায় তুমি কোন ক্রমেই জাহাজে উঠিতে পাইবে না, আমার এখানে থাকিয়া কিছু সুস্থ হও, পরে দেশে যাইও।”

কাপ্তেন ভগিনীর অনুরোধ ব্যর্থ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, “এই রৌদ্রদগ্ধ অভিশপ্ত ভারত-বক্ষে আমার সমাধি রচনা না করিয়া তুমি ছাড়িবে না। আর এক মাসের মধ্যেই আমার জীবনের অবসান হইবে।”

“এ বিশ্বাস তোমার কেন হইল? তোমার মস্তিষ্ক খারাপ হইয়াছে দেখিতেছি। তুমি সংসারের সকল চিন্তা ছাড়িয়া দাও।”

“চিন্তা আমি ছাড়িয়াছি, কিন্তু সে রাক্ষসী আমাকে ত্যাগ করিবে না! প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে সে আমার বক্ষে বসিয়া আমার হৃদয়শোণিত শোষণ করিতেছে—আমি আর সহ্য করিতে পারি না।”—কাপ্তেনের মস্তক সোফার উপর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

মিঃ থরনটনের স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বিবি ম্যাকফারসন তাঁহার নিকট প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিবি থরনটন্ কিছুই জানিতেন না।

ভ্রাতার সুখশান্তি বিধানের জন্য বিবি ম্যাকফারসন প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন, আমোদ ও আনন্দের মধ্যে সর্ব্বদা তাঁহাকে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আমোদের প্রবৃত্তি কাপ্তেনের হৃদয়-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়াছিল। সহস্র চেষ্টাতেও পিঞ্জরের বিহঙ্গম পিঞ্জরে ফিরিয়া আসিল না।

ভগিনীর আগ্রহে কাপ্তেন থরনটন্ কোন খ্যাতনামা বিলাতী থিয়েটারে একদিন সায়ংকালে অভিনয় দেখিতে গমন করিলেন। সে দিন মহাকবি সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের অভিনয় ছিল।

অভিনয় দেখিতে দেখিতে ‘বক্সের’ উপর হইতে কাপ্তেন সাহেব আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আত্মীয় বন্ধুগণ নিকটেই ছিলেন, তাঁহারা যুগপৎ উঠিয়া ব্যস্তভাবে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, কাপ্তেন মূর্চ্ছিত। বহুচেষ্টায় তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। সাহেব বলিলেন, “তোমরা হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা দেখিয়াছ? আমি দেখিয়াছি, সে প্রেতাত্মা হ্যামলেটের পিতার নহে, আবদুল গফুরের প্রেতাত্মা।”

বিবি ম্যাকফারসন ভ্রাতার মস্তকে পাখা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি? আবদুল গফুর কে?”

“একজন সিপাহী। বিনা বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছি।”

* * *

কাপ্তেন সাহেবকে তৎক্ষণাৎ গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার আসিয়া বিবিধ যন্ত্র সংযোগে তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “কাপ্তেনের ‘ব্রেণ ফিবার’ হইয়াছে, অনেক দিনের রোগ—অবস্থা জটিল হইয়া উঠিয়াছে।”—তিন দিন সাহেব শয্যাগত রহিলেন।

চতুর্থ দিন সাহেবের অবস্থা অল্প ভাল বোধ হইল, অপরাহ্ণে একখানি ইজিচেয়ারে তিনি বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। বাঙ্গলোর সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর, সমুদ্রের দিক হইতে মুক্ত বায়ুপ্রবাহ আসিয়া সাহেবের ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু ধীরে ধীরে অপসারিত করিতেছিল।

নীল পরিচ্ছদধারী, নীল-উষ্ণীষ-শোভিত, নীল পতাকাধারী একজন মুসলমান সৈনিক পুরুষ সেই বারেন্দায় আসিয়া একেবারে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। কাপ্তেন তাহাকে দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিলেন, সৈনিক-পুরুষ একখানি নীল বর্ণের পত্র বাহির করিয়া সাহেবের স্থির, নিষ্প্রভ চক্ষুর উপর ধরিল। আজ পত্র লেফাফায় আবদ্ধ নহে, খোলা পত্র,—অক্ষরগুলি লোহিত কালিতে অঙ্কিত। সাহেব নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্পষ্টাক্ষরে পাঠ করিলেন—

“আজ ১৮৫৯ সালের ১৭ই জুলাই,
সূর্য্যাস্তের সঙ্গে তোমার পরমায়ু শেষ হইল।”

সাহেব চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সে মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হইল না। বিবি ম্যাকফারসন নিকটেই ছিলেন, তিনি ছুটিয়া আসিয়া তীব্রস্বরে সেই মুশলমান সিপাহীকে [illegible] করিলেন, “কে তুই?”

“[illegible]তের প্রেতাত্মা।”

সন্ধ্যার [illegible] ছায়ামূর্ত্তি [illegible] ধীরে মিলাইয়া গেল।

[illegible]দীনেন্দ্রকুমার রায়।

কলিকাতা ৯৮নং হেরিসন রোড, হরসুন্দর মেসিন প্রেসে শ্রীকুঞ্জ বিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।



শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

KUNTALINE PRESS



চতুর্থ ভাগ। } ভাদ্র, ১৩০৮। { ৯ম সংখ্যা।

অবগুণ্ঠিতা।

অস্ফুট বীণার মত কার স্বর শুনি
ধীরে ধীরে জাগিল চেতনা ? এযে স্নেহ
ভরা আহ্বানের মত মর্ম্মে মর্ম্মে পশি
নিদ্রিত কামনা-রুদ্ধ মুগ্ধ প্রকৃতিরে
প্রাণময়ী করিল সহসা। রুদ্ধকক্ষে
বন্দী সম চিন্তা নিমগন, আপনাতে
আপনি মগন ছিনু, কিন্তু এ কল্পনা-
কারা ভাঙ্গি কে আমার নয়নের আগে
উন্মোচিল বিশ্ব-আবরণ ? কার পানে
চাহি জাগিল সহসা সৌন্দর্য্যের স্মৃতি
পুরাতন ? আবার সে নব সাজে সাজি
ভাতিল নয়ন পথে সৌন্দর্য্যের রাণী
বহুদিন অন্ধ ছিনু যাহে। গাহিল যে
পুনঃ সঙ্গীত সুতান লয়ে, ব্যর্থ বীণা
ফিরিয়া পাইল তার চির মধুরতা।
স্নেহের অঞ্জন যেন নয়নে আমার
স্নেহময় করিল ভুবন, তাই আজি
কূজনিছে কলকণ্ঠে বিহঙ্গমকুল
সপ্তস্বরা বীণার মতন, তাই আজি
হাসিছে কৌমুদী-নিশা ঘুমন্ত শিশুর
মত শান্ত ও মধুর। উঠিছে জাগিয়া
গ্রহকুঞ্জ হ'তে মধুর গুঞ্জন নব
সঙ্গীত পরশে।
সুদীর্ঘ প্রবাসক্লান্ত
সুপ্ত প্রবাসীর স্বদেশ-স্বপন যথা
তুমি মোর জীবন প্রবাসে। কোন দূর
লোক হ'তে নামি' দরিদ্র হৃদয়ে মম
রচিলে আসন ? মোর অদৃষ্টের অংশ
লইবে সবলে ? সে যে ব্যথিত নির্ম্মম।
তুষার-শীতল পরিত্যক্ত কুলায়ের
মত জীবন আমার, তা'র রাণী-হ'তে
ভাগ্যলিপি তব, নহে মম সাধ।

মোহন পরশে তব জাগে যদি মম
হৃদয়-নিকুঞ্জে পিককুল, ফোটে যদি
ফুল, বহে কুলকুলে বনজা তটিনী
তুমি বনদেবী তাহে হইও ভাগ্যবতি।
নহে—এস, মুগ্ধে মরণের শ্রান্ত পথে
তুমি মোর ছায়া-সঙ্গী-সলিল আশ্রয়!

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।



সীতা-বনবাসে।

স্বপনে দেখিনু তোমা বৈদেহি সুন্দরি
নীরব গহন বনে, গভীর আলসে
শ্যাম তৃণোপরি দেবী নিদ্রায় মগনা,
ভূতলে লুণ্ঠিত যেন কনক বল্লরী
ছড়াইয়ে রূপ বিভা, তড়িতের হার
নীরদে জড়িত মরি! ঝরে স্বেদ নীর,
উষার শিশির যথা গোলাপ অধরে
মুক্তাসম ঢল ঢল, স্নিগ্ধ আঁখি ছুটি
মুদিত রয়েছে আহা মোহ-মগ্ন ভাবে!
শোভিতেছে এলায়িত শিথিল কুন্তল
ও মুখ-কমল'পরে, বক্ষে আলিঙ্গিত
মৃণাল বাহুর লতা, কুশাঙ্কুরে বুঝি
বিঁধিছে নবনী তনু। তাই তরুরাজী
বরিছে করুণ প্রাণে কুসুম আসার
দশদিক আমোদিয়া শীতল সৌরভে,
মধুর নিকুঞ্জ সৃজি' অরণ্য বিজনে।
কোথা রম্য হেমহর্ম্ম্যে বিরামশয়ন
অযোধ্যার? এ শয্যা কি সাজে গো তোমায়
রঘু বধূ? রঘুকুলরাজলক্ষ্মী তুমি!
আঁধার সে পুরী আজি তোমার বিহনে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

মঙ্গলের গৃহে বিধিবৈচিত্র্য।

সৌরজগতের মধ্যে মঙ্গল একটী গ্রহ। মঙ্গলে পৃথিবীর ন্যায় জল, স্থল ও বায়ু আছে; তাই একবার পাঠকদিগকে মঙ্গলে বেড়াইতে লইয়া যাইব মনে করিয়াছি। আসুন, সকলে মিলিয়া তড়িদ্বেগে যাত্রা করা যাউক। সুচারু পরিচ্ছদ পরিধান করিতে,—বিশেষতঃ সকলে আপন আপন ঘড়িটী সঙ্গে লইতে, ভুলিবেন না। কারণ মঙ্গলে যদি জীব থাকে তাহারা কি হিসাবে সময় গণনা করে তাহা হয়ত আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিব না; তাই নিজের ঘড়িটী কাছে থাকিলে সময় জানিতে কোন গোল হইবে না।

এখন মনে করা যাউক যে, আমরা দুপর ১২ টার সময় এখান থেকে বিদ্যুদ্বেগে মঙ্গলে গিয়া এমন স্থানে অবতীর্ণ হইলাম, যেখানে সূর্য্য ঠিক মাথার উপর আসিয়াছে। (মঙ্গলেও আমাদেরই সূর্য্য আলোক প্রদান করিয়া দিন রাত্রি ঘটাইয়া থাকে।) পৃথিবীতে থাকিতে সূর্য্যকে যত উত্তপ্ত বোধ হইতেছিল এবং যত বড় দেখাইতেছিল, এখানে আর তাহা অনুভব করিতেছি না। পৃথিবীতে সূর্য্যোত্তাপ যত প্রখর, মঙ্গলে তাহার পাচ ভাগের দুই ভাগের কিঞ্চিৎ অধিক মাত্র; এবং পৃথিবী হইতে সূর্য্যকে যত বড় দেখায় মঙ্গলে তাহার পাঁচ ভাগের সওয়া তিন ভাগ দেখাইতেছে। পৃথিবী হইতে এখানে আসিয়া যে অতিশয় শীত বোধ হইতেছে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইতেছে না। তবে একটি সুবিধা আছে, মঙ্গলে জল অপেক্ষা স্থল অনেক বেশী। তাই মঙ্গলের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অতিশয় অল্প। এ কারণ শর্দ্দীর ভয় কম আছে।

আমরা ঠিক ১২টার সময় মঙ্গলে আসিয়াছি। এখানেও ঠিক দুপর; অতএব মনে করা যাউক যে পৃথিবীর নরকল্পিত ঘড়িতে এখানেও ১২ টা বাজিল। পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলও স্বীয় মেরুদণ্ডে ঘুরিতেছে, তাই এখানেও দিন রাত্রি ঘটিবে। আজ দিবসের অবশিষ্ট ভাগ কাটিয়া গেল, রাত্রি হইল! আবার রাত্রিও কাটিয়া গিয়া দিন আসিল। ক্রমে সূর্য্য মাথার উপর আসিল। কাল ১২ টার সময় এখানে দুপর হইয়াছিল; কিন্তু আজ দেখিতেছি ১২ টা বাজিয়া ৩৮ মিনিট ১৯ সেকেণ্ড হইয়া গেলে পর দুপর বাজিল! পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডে এক আবর্ত্তন পূর্ণ করিতে যে সময় লাগে তাহা হইতে আমাদের সৌর দিনমান প্রায় ৪ মিনিট বেশী; কারণ ঐ সময়েতে পৃথিবী আপন কক্ষপথে অগ্রসর হইয়া যায়, অতএব সূর্য্যের পুনরায় মাথার উপর আসিতে প্রায় ৪ মিনিট বেশী লাগে।

মঙ্গলের স্বীয় মেরুদণ্ডে এক আবর্ত্তন পূর্ণ করিতে আমাদের ঘড়ির ২৪ ঘণ্টা, ৩৭ মিনিট, ২৪ সেকেণ্ড লাগে; কিন্তু ঐ সময়ে মঙ্গল আপন কক্ষে কতকটা পথ চলিয়া যায় বলিয়া, সূর্য্যের পুনরায় মাথার উপর আসিতে ৫৫ সেকেণ্ড বেশী লাগিয়াছে! মঙ্গলের দিন গুলি আমাদের দিন অপেক্ষা খুব যে বেশী বড় তা নয়, বরং জ্যোতিষের হিসাবে ছোট হইবারই কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবাসী কেহ থাকিলে, এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারিলে, জানা যাইত, যে মঙ্গলে দিনমান এককালে আরও ছোট ছিল, ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছে।

মঙ্গলে দিনমান শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হইবার এই কারণ অনুমাণ করা যাইতেছে যে, মঙ্গলের জল পার্থিব জলের ন্যায় এত অধিক তরল নহে, অথচ সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে তাহাতে জোয়ার ভাটা হইয়া থাকে। (পরে দেখা যাইবে যে মঙ্গলে দুইটী চাঁদ আছে!) সেই জোয়ার ভাটার জন্য জলে এবং স্থলে ঘর্ষণ হয় ও তাহাতে মঙ্গলের ঘূর্ণনের হ্রাস হয়। কিন্তু মঙ্গলের জল পৃথিবীর জল অপেক্ষা অধিক গাঢ় হওয়াতে, তথায় জলে ও স্থলে ঘর্ষণ বেশী হয় এবং তদনুক্রমে ঘূর্ণন-বেগেরও অধিক হ্রাস হয়। ঘূর্ণনের বেগ কমিতে গেলেই তাহার সময় বাড়িয়া যায়। এই কারণে মঙ্গলের দিনমান পৃথিবীর দিনমান অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে।

চলুন সকলে মিলিয়া মঙ্গলে এক বৎসর বাস করা যাউক। মঙ্গলের জল আমাদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইবে, এই কারণে পৃথিবী হইতে জল নেওয়াইতে হইবে। মঙ্গলের একবৎসর তথাকার দিন হিসাবে ৬৬৮ দিনে হয়! আমাদের ঘড়ি যদি বরাবর ঠিক চলে, তবে ২৪ ঘণ্টায় এক এক দিন গণনা করিলে দেখিতে পাইবে যে আমাদের দিন হিসাবে মঙ্গলের বৎসর ৬৮৭ দিনে হয়। এইরূপ দীর্ঘকাল-ব্যাপী বৎসর দিয়া আমাদের জীবন মাপিতে গেলে দেখিতে পাইবে সংখ্যার হিসাবে আমাদের জীবন ছোট হইয়া যায়। অর্থাৎ পৃথিবীতে যাহার বয়স ৩৫ বৎসর,

মঙ্গলে গেলে তথাকার হিসাবে তাহার বয়স ১৮½ বৎসর মাত্র হইবে। পৃথিবীতে পার্থিব বৎসর হিসাবে যে বয়সে যৌবনারম্ভ হয়, মঙ্গলেও যদি মাঙ্গলিক বৎসর হিসাবে সেই বয়সে যৌবনারম্ভ ঘটে, তবে দেখিতেছি পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা যৌবনের মধ্যাহ্ন পার হইয়া আসিয়াছেন--তাঁহারা মঙ্গলে আসিয়া যৌবনের আরম্ভ কালে উপনীত হইয়াছেন। ইহা বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে!

মঙ্গলে শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুভেদ অনুভব করা যাইতেছে। একেইত মঙ্গলে রৌদ্রতেজ অনেক কম, তাহাতে আবার তথায় শীত যাপন করিতে গিয়া পাঠকদিগের বড়ই লাঞ্ছনা হইল। তবে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিলে কষ্টের অনেক লাঘব হইবে। চলুন সকলে মিলিয়া মঙ্গলের উত্তর গোলার্দ্ধে বাস করা যাউক। তথায় গ্রীষ্ম ৩৭২ দিন ও শীত ২৯৬ দিন। বৎসরের শীতার্দ্ধ হইতে গ্রীষ্মার্দ্ধ অধিক হওয়াতে কথঞ্চিৎ আরামে থাকা যাইবে। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে থাকিতে গেলে তাহার ঠিক বিপরীত ঘটিবে। পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলেরও মেরু প্রদেশ হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকাই বিধেয়।

ইংরাজি হিসাবে বৎসরে চারি ঋতু হইয়া থাকে। হিন্দুমতে বৎসরে ছয় ঋতু হয়। চলুন আমাদের হিসাবেই মঙ্গলের ঋতুভেদ গণনা করা যাউক। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মঙ্গলের ঋতুকাল মাঙ্গলিক দিন হিসাবে এইরূপ হইবে :—

গ্রীষ্ম ১২৪ দিন, বর্ষা ১২১ দিন, শরৎ ৯৯ দিন, হেমন্ত ৯৯ দিন, শীত ৯৮ দিন, বসন্ত ১২৭ দিন।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মঙ্গলে শীত ঋতুতে দিনের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম, এবং বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। হিসাবে যদিও বর্ষা ঋতু ধরা হইয়াছে, কিন্তু মঙ্গলে বৃষ্টি কি পরিমাণে হয় তাহা পাঠকগণ থাকিয়া জানিতে পারিবেন। মঙ্গলে মেঘের লক্ষণ ত কিছু দেখা যাইতেছে না, কখনও বৃষ্টি হইবে কিনা, কে বলিতে পারে? তবে একটী কথা জানিয়া রাখা ভাল, যে মঙ্গলের জল যেরূপ ভারী, তাহাতে বাষ্প জন্মান সহজ ব্যাপার নহে। তাহাতে আবার রৌদ্রের উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম।

এই বর্ষণাভাব হেতুই বোধ হয় মঙ্গলবাসীরা অতি বিস্তৃত পয়ঃপ্রণালী কাটিয়া ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করে। সে সকল পয়ঃপ্রণালী এত বিস্তৃত যে পৃথিবী হইতে দূরবীক্ষণ সহযোগে তাহাদের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে।

আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া জানিয়াছি যে, যে বৎসর বর্ষাতে বৃষ্টির অভাব হয়, সে বৎসর বর্ষা ঋতু গ্রীষ্মে পরিণত হইয়া যায়; মঙ্গলে তাহা ঘটাতে আমাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে বলিতে হইবে। এইরূপ সুদীর্ঘ গ্রীষ্মেতে রৌদ্র ভোগ করিয়া বাঁচা যাইবে।

মঙ্গলের ঋতু কিন্তু মাস হিসাবে গণনা করিলে চলিবে না; তথাকার মাস অতি অদ্ভুত জিনিশ। ইহার আলোচনা পরে হইবে।

মঙ্গল পৃথিবী হইতে ছোট। ইহা'র আয়তনের ব্যাস ৪৫০০ মাইলের বেশী হইবে না। পৃথিবীর সহিত তুলনা করিলে মঙ্গলের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের এক ষষ্টাংশের বেশী নয়।

এক বিষয়ে মঙ্গলে বেশ সুবিধা দেখিতেছি। পৃথিবীতে বাস কালে এই নরদেহটীকে বহিয়া নিয়া বেড়াইতে যত কষ্ট পাইতে হইত, এখানে তাহা হইতেছে না। পৃথিবীতে যে নরদেহের ওজন একমণ ত্রিশ সেরের কম ছিল না, মঙ্গলে আসিয়া দেখা যাইতেছে তাহা ৬২½ সেরের বেশী হইতেছে না। পৃথিবী হইতে আগত একটী আড়াই মন ওজনের বিরাট বপু মঙ্গলে কিছুতেই ৩৮ সেরের বেশী হইতেছে না। কেহ যেন মনে না করেন যে, পৃথিবীতে অতি যত্নে লালিত পালিত সুখোচিত দেহটী মঙ্গলে আসিয়া আয়তনে কমিয়াগেল; বাস্তবিক দেহটী কোন অংশেই ক্ষুণ্ণ হইল না, কেবল মঙ্গল দেব আমাদের দেহের অধিকাংশ ভার হরণ করিয়া লইলেন মাত্র। পৃথিবী যে বলে এই দেহটিকে টানিয়া আপনার অঙ্গে লিপ্ত রাখিতেছিলেন, মঙ্গল সে বল প্রয়োগ করিতেছেন না; এই কারণেই আমাদের ভারের লঘুতা জন্মিয়াছে। নতুবা দেহে যতখানি জড় পদার্থ ছিল তাহার কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। পৃথিবী হইতে আসিবার সময় দেখিয়া আসিলাম, একটা গাছে খুব জাম পাকিয়া রহিয়াছে; একটি বালক গাছে চড়িয়া জাম পাড়িতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহার মা বলিতেছেন "গাছ থেকে পড়ে হাত পা ভাঙ্গবি?" যদি সেই জাম গাছসহ ঐ বালক ও তাহার মাতাকে এখানে আনা যাইত, তবে মাতা দেখিয়া অবাক্

হইতেন, যে বালক অবলীলা ক্রমে একলাফে গাছের মাথায় উঠিয়া পড়িতেছে, আবার ২০ হাত ঊর্দ্ধ হইতে অনায়াসে বানরের ন্যায় লাফাইয়া পড়িতেছে। তাহাকে আর গাছের গোড়া ধরিয়া বহুকষ্টে গাছে উঠিতে কিম্বা নামিতে হইতেছে না। মঙ্গলে যদি একটা বাড়ী দেখা যাইত, তবে দেখিতে পাইতাম, যে ১৬ হাত উচ্চে উপরের বারেন্দা হইতে ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি যেন পাখীর ন্যায় উড়িয়া মাটিতে নামিতেছে।

পাঠকগণ এতদিন মঙ্গলে থাকিয়া একটা সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র জিনিশ দেখিয়াছেন, এবং সে বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য অতিশয় কৌতূহলী হইয়া থাকিবেন। সেই বিচিত্র জিনিশটী মঙ্গলের মাস। আমাদের পৃথিবীতে কিরূপে মাসের উৎপত্তি হয়, তাহা পাঠকেরা সকলে না জানিতে পারেন। চন্দ্র হইতেই প্রথমে মাসের উৎপত্তি হয়। বাঙ্গালা দেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অপর সর্ব্বত্রই সাধারণ লোকেরা চান্দ্র দিন হিসাবে ৩০ দিনে মাস গণনা করিয়া থাকে। মাসের শুক্লার্দ্ধকে "সুদী" ও কৃষ্ণার্দ্ধকে "বদী" কহে। কোন তারিখ বলিতে হইলে "কার্ত্তিক সুদী পঞ্চমী" অথবা "শ্রাবণ বদী দশমী" কিম্বা "চৈত্র পুনো (পূর্ণমাসী) এইরূপ বলা হইয়া থাকে। ক্রমে সৌর বৎসরের সহিত চান্দ্রমাসের সামঞ্জস্য করিতে গিয়াই পৃথিবীর নানা স্থানে চন্দ্রমাস গণনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা মঙ্গলের মাস চন্দ্রমাস হিসাবে গণনা করিব।

পৃথিবীতে থাকিতে আমরা একটী মাত্র চাঁদ দেখিয়াছি। মঙ্গলে আসিয়া দেখিতেছি, এখানে দুইটী চাঁদ রহিয়াছে। একের নাম "শম" ও অপরের নাম "দম"।*

পৃথিবীতে এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক চান্দ্রমাস হয়, ইহার কালমান ২৯½ দিন। মঙ্গলে দুইটী চাঁদ থাকাতে তাহাদের মাস ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। দমের মাস তাহার এক আবর্ত্তন-কালের অর্দ্ধেকেরও কম, অর্থাৎ তাহার এক আবর্ত্তন পূর্ণ না হইতেই দুইবার পূর্ণিমা ও দুইবার অমাবস্যা হইয়া যায়। শমের মাস তাহার আবর্ত্তন-কাল হইতে প্রায় ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট কম। ইহার ফলে শমের চারিমাসে মঙ্গলের একদিন হয়। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মঙ্গলের চাঁদ গুলি এত দ্রুত চলে যে তাহাদের মাস দিনের ভগ্নাংশ মাত্র হইয়া থাকে।

দেখিতে দেখিতে একদিনে দমের দুইমাস ও শমের চারিমাস হইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে মঙ্গলে কখনও সমস্ত রাত্রি অন্ধকার পাওয়া যাইতেছে না। মঙ্গলের চাঁদ গুলি আয়তনে ছোট হইলেও মঙ্গলের অতিশয় কাছে বলিয়া আকারে ছোট দেখায় না, তাই রাত্রিকালে যথেষ্ট জ্যোৎস্না পাওয়া যাইতেছে তাহার উপর আবার দুইটী চাঁদ থাকাতে রাত্রিকালে আকাশের শোভা আরও চমৎকার হয়।

মঙ্গলের চন্দ্রদ্বয়ের গতি অতিশয় বিচিত্র। আমরা পৃথিবীতে চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছি যে, আকাশের সকল জ্যোতিষ্কই পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। কিন্তু মঙ্গলে তাহা হয় না। তথায় সূর্য্য যদিও পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, কিন্তু চাঁদ দুটী নিয়ত পশ্চিমে উদয় হইয়া পূর্ব্বদিকে অস্ত যাইতেছে! ইহার কারণ চাঁদ দুটির দ্রুতগতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সকল চাঁদেরই গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে হইয়া থাকে। আমাদের পার্থিব চাঁদ এক রাত্রিতে ৬° ৪০′ মাত্র চলিয়া থাকে—ততক্ষণে পৃথিবী ১৮০° ঘুরিয়া যায়, এই কারণে চাঁদকে পশ্চাতে ফেলিয়া যায় বলিয়া আমরা তাহাকে পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখি। যদি চাঁদের গতি পৃথিবীর ঘূর্ণন-বেগের ন্যায় দ্রুত হইত, তবে পৃথিবীর ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদও পূর্ব্বদিকে চলিয়া যাইত, অতএব চাঁদকে পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখা যাইত না। মঙ্গলের চাঁদ দুটী অতিশয় দ্রুত চলে। দম সওয়া দিনে এক আবর্ত্তন পূর্ণ করিতেছে এবং দমের এক আবর্ত্তন কালে শম চারিবার আবর্ত্তন করিয়া আসিতেছে।

আজ সন্ধ্যাবেলা ঠিক সূর্য্যাস্ত সময়ে দুইটী চাঁদেরই

---

* এই চাঁদ দুইটীর আজ নূতন নামকরণ হইল। ইহাদের বিলাতী নাম "Phobos" ও "Deimos"। উচ্চারণ বিভ্রাট ঘুচানই এই নাম করণের উদ্দেশ্য।

অনেকদিন গত হইল আমি Uranus ও Neptune গ্রহদ্বয়ের বাঙ্গলা নামকরণ করিয়াছিলাম। আমার নামকরণ সে স্থলে কেবল মাত্র অর্থগত ছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবু মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন হেতু না দর্শাইয়া আমার প্রদত্ত নাম দুটীকে উল্টাইয়া এক নামকরণ বিভ্রাট ঘটাইয়াছিলেন। (১২৯৯, অগ্রহায়ণের, ও ১৩০৪, জ্যৈষ্ঠের "ভারতী" দ্রষ্টব্য।) আশা করি এস্থলে তাহা ঘটিবে না। মঙ্গলের অনুচর শান্ত ও দান্ত হওয়া প্রয়োজন (নতুবা 'মঙ্গল' কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?) একারণ অনুচরদ্বয় 'শম' ও 'দম' হইল। বিলাতী নাম দ্বয়ের অর্থ Fear এবং Panic!

অমাবস্যা ঘটিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সূর্য্য ডুবিয়া গেল এবং চাঁদ দুটী পশ্চিমাকাশ ছাড়াইয়া উপরে উটিতে আরম্ভ করিল। দম অপেক্ষা শম অতি দ্রুত চলিতেছে, এবং দুই ঘণ্টা না হইতেই শম মাথার উপর আসিয়াছে। এই টুকু সময়ে আবার চাঁদ দুটীর কলা পরিবর্ত্তনও ঘটিয়া গেল; শম ইতিপূর্ব্বেই অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর তিন ঘণ্টা রাত্রি না হইতেই শম পূর্ব্বাকাশে হেলিয়া পড়িল, এবং তাহার পূর্ণিমা ঘটিল। এদিকে দম তিন ঘণ্টায় আকাশের প্রায় অর্দ্ধেক (অর্থাৎ দিগ্বলয় ও শীর্ষের মাঝামাঝি) উঠিয়াছে এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকার ধারণ করিয়াছে। রাত্রি একটার সময় দম প্রায় শীর্ষের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তখন তাহার পূর্ণিমা ঘটিল। ওদিকে শম ঐ সময়ের মধ্যে মঙ্গলের অপর দিক্ বেষ্টন করিয়া অপর পার্শ্বস্থ মাঙ্গলিক দেশে দিবাভাগে অমাবস্যা ঘটাইয়া পুনরায় পশ্চিমাকাশে উদয় হইবার উপক্রম করিতেছে। ক্রমে ৩ টা বাজিল, দম পূর্ব্বাকাশে অনেক দূর হেলিয়া পড়িল, কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ পরেই শমের পুনরায় পূর্ণিমা হইল। প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শম পুনরায় অস্তগমন করিতেছে। দম তখনও ক্ষীণ দেহে আকাশে বিরাজমান। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল ও এক ঘণ্টা পরে দমের অমাবস্যা ঘটিল এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরেই পুনরায় কলা বৃদ্ধি হইতে হইতে দম অস্তগমন করিল।

ইতিমধ্যে মঙ্গলের অপরপার্শ্বে শম পূর্ণচন্দ্র হইয়া বসিয়াছিলেন এবং বেলা ৯ টা না বাজিতেই আবার এদিকে উদয় হইয়া পড়িয়াছেন। ১১টা না বাজিতেই তাঁহার আবার অমাবস্যা ঘটিল এবং ১ টার পূর্ব্বেই তিনি পুনরায় অস্তগত হইলেন। শম কিন্তু আর সমস্তদিন দেখা দিবে না এবং রাত্রি ১০ টার আগে উদয় হইবারও সম্ভাবনা নাই। ইতিমধ্যে মঙ্গলের অপর পার্শ্বে তাহার এক পূর্ণিমা ও এক অমাবস্যা ঘটিয়া যাইবে। শমও অপর পার্শ্বে এক পূর্ণিমা ঘটাইয়া অপরাহ্নে প্রায় ৪½ টার সময় উদয় হইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুনরায় অমাবস্যা করিয়া ফেলিল এবং সন্ধ্যা হইতে হইতে প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রাকার ধারণ করিল। সন্ধ্যার কিয়ৎ-পরে পূর্ণচন্দ্র হইয়া রাত্রি প্রায় ৮½ টার সময় আবার অস্তগমন করিল। এদিগে রাত্রি ১০ টার আগে দম উদয় হইতেছে না, এই কারণে প্রায় ১½ ঘণ্টা কাল আমাদিগকে মঙ্গলের রাত্রিতে জ্যোৎস্নার অভাব ভোগ করিতে হইতেছে।

এই অন্ধকারে বসিয়া কি করা যায়? আসুন, সকলে মিলিয়া খানিক বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা যাউক।

লাপ্লাশের জগদুৎপত্তিবিধানের মতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, সূর্য্যের দেহ হইতে পদার্থ খণ্ড সকল সময়ে সময়ে স্খলিত হইয়া গ্রহের, এবং গ্রহের দেহ হইতে পদার্থ খণ্ড স্খলিত হইয়া চাঁদের উৎপত্তি হইয়াছে। গতিবিজ্ঞান দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, কোন গ্রহ যে বেগে ঘুরিতেছে তাহা হইতে চালিত কোন চাঁদ তদপেক্ষা অধিক বেগে ঐ গ্রহকে পরিক্রমণ করিতে পারে না। অর্থাৎ পৃথিবী যেমন ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিয়া যাইতেছে, তাহার চাঁদ তাহাকে উহা অপেক্ষা কম সময়ে পরিক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং জগতে সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু মঙ্গলে এই সাধারণ বিধির অতিশয় বিচিত্রতা লক্ষিত হয়। মঙ্গলের ছোট চাঁদ শম এই বিধি একেবারেই মানিয়া চলিতেছে না। এই গ্রহ পার্থিব ঘণ্টা হিসাবে প্রায় ২৪½ ঘণ্টারও বেশী সময়ে একবার ঘুরিয়া যাইতেছে, কিন্তু শম ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিটেরও কম সময়ে গ্রহকে বেষ্টন করিয়া একবার পরিক্রমণ করিতেছে। উক্ত বিধির এই প্রকার অতিবিচিত্র লঙ্ঘন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই বৈচিত্র্য লাপ্লাশের জগদুৎপত্তিবিধানের সত্যতা সম্বন্ধে মহা সন্দেহ উপস্থিত করে!

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মঙ্গলের দিনগুলি বৈজ্ঞানিক হিসাবে আরও ছোট ছিল। সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে জল এবং স্থলের ঘর্ষণ হওয়াতে গ্রহের ঘূর্ণন-বেগের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইতেছে; এ কারণে তাহার দিনমান বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু কোন প্রকারেই উহা সম্ভব মনে করা যায় না, মঙ্গলের ঘূর্ণনবেগ কোন কালে শমের পরিক্রমণ বেগের সমান ছিল।

সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ জর্জ্জ ডারউইন্ সাহেব গণনা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, গ্রহের ঘূর্ণনবেগের হ্রাস হওয়ার ফলে চাঁদের উপর তাহার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে, অতএব মঙ্গলের চাঁদ ক্রমশঃ মঙ্গলের দিকে চলিয়া আসিতেছে। এই দূরত্বের খর্ব্বতাহেতু আকর্ষণ প্রবল হইয়া চাঁদকে অতি দ্রুত চালাইতেছে। ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, মঙ্গলের চাঁদ

ক্রমশঃ মঙ্গলের দিকে সরিয়া আসিতেছে ও তাহার পরিভ্রমণ-কালের হ্রাস হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ সহজ কথায় বলিতে গেলে এই বুঝায় যে, মঙ্গলের দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও মাসের পরিমাণ হ্রাস হইয়া পড়িতেছে।

এইরূপ দিনের বৃদ্ধি ও মাসের হ্রাস যে কেবল মঙ্গলেই ঘটিতেছে তাহা নহে। যেখানে জল এবং স্থলে ঘর্ষণ হয় সেখানেই এইরূপ ঘটিতে পারে। পৃথিবীতে ইহার ফল কি হইবে তাহা, ১৩০. সালের আষাঢ়ের ভারতীতে 'প্রলয়' শীর্ষক প্রবন্ধে একবার আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু মঙ্গলে ইহার ফল বড়ই ভীতির সঞ্চার করিতেছে।

মঙ্গলের জলীয়াংশ পৃথিবীর জলভাগের ন্যায় এত বিস্তৃত নহে, এই কারণে চাঁদের উপর তাহার আকর্ষণও তত প্রবল নহে। অতএব শমের গতিরোধের কোন প্রবল কারণ পাওয়া যাইতেছে না। আবার ইহাও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, শমের গতিরোধ না হইলে কোন দিন মঙ্গলের গাত্রে তাহার পতন অনিবার্য্য। অর্থাৎ সোজা কথায় বলিতে গেলে আমাদের আর মঙ্গলে বেশী দেরি করা সুবিবেচনাজনক বোধ হয় না, কারণ একদিন শম চাঁদটী আসিয়া ঘাড়ে পড়িবে বোধ হইতেছে।

মঙ্গলের চাঁদ দুটীর মধ্যে শম ছোট। তাহার পতনে সমস্ত মঙ্গলে প্রলয় না হইলেও মঙ্গলের নিরক্ষমণ্ডলে কোথাও না কোথাও প্রলয় ঘটিবে ইহা নিশ্চয়। মঙ্গলের 'নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল' ছাড়াইলে এই প্রলয়ের হাত এড়ান যাইতে পারে। শম মঙ্গলের এত সন্নিকটে যে, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ছাড়াইয়া মেরুর দিকে গেলে, মঙ্গলপৃষ্ঠের গোলত্ব-হেতু শমকে আর একেবারেই দেখা যায় না। কিন্তু এদিকে আবার নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ছাড়াইলে শীতে প্রাণ বাঁচান দায় হইবে। অতএব এই বেলা পৈত্রিক সম্পত্তি মানবদেহ-টীকে মানে মানে মঙ্গল হইতে বিদায় দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

যাইবার সময় একটী কথা বলিয়া দিতেছি—পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন যে, পৃথিবীতে যত ঠাণ্ডাতে জল জমিয়া বরফ হয়, মঙ্গলে তাহা হইতেছে না। পৃথিবীর মেরু প্রদেশে যত শীত, এখানে তত শীতেও জল জমিয়া বরফ হইবে কি না সন্দেহ। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যে কারণে মঙ্গলের জলে বাষ্প জন্মিতে পারে না, সেই কারণে ঐ জল সহজে জমিতেও পারে না। তবে শীতের অতিশয় প্রকোপে মঙ্গলের মেরুদেশই কিয়ৎপরিমাণে বরফাচ্ছাদিত অবস্থায় দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গলে হিমালয়ের ন্যায় তুষারাবৃত পাহাড় সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

এখন সকলে এইবেলা সরিয়া পড়ি, নতুবা দুই চাঁদ দেখার সখ তাহাদের একটা চাঁদের সংঘাতে মিটিয়া যাইবে।*

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

সাহজাহান বাদসাহের রাজৈশ্বর্য্য।

(মূল পারসী গ্রন্থ হইতে গৃহীত।)

উৎসব দিনের বিবরণ।

"বাদসাহদিগের দৈনিক জীবনের প্রতি কার্য্যে যেরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হয় লোকে তাহা দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। উৎসবের দিনে এই লোকবিশ্রুত ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ দেখিলে অনেককে আত্মহারা হইতে হয়। নব বর্ষের প্রথম দিনে অর্থাৎ নবোজার সময় ময়ূর সিংহাসনকে নানাপ্রকারে সুসজ্জিত করা হয়। সিংহাসনের জ্যোতিঃ এই দিনে এত বাড়িয়া উঠে যে, চন্দ্রমা-শালিনী, নক্ষত্র কিরিটিনী নীলাকাশের গায়ে চন্দ্রের ও তারকার জ্যোতিঃ তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়। এই সিংহাসন নির্ম্মাণে এক ক্রোড় স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। এই মুদ্রা ইরাকের প্রচলিত মুদ্রার হারে ত্রিশ লক্ষের উপর দাঁড়ায়। মেওয়ার উল্-নেহারের (?) "খাসী" মুদ্রার পরিমাণে, ইহা চারি কোটীতে পরিণত হয়। সিংহাসনের উপর মখমল-মণ্ডিত, জড়োয়া খচিত, প্রকাণ্ড আস্তরণ। এই মখমল আস্তরণের আগাগোড়াই সোণারূপা ও মতির কাজ করা। ঝালরে কপোত ডিম্বাকারে নানাবিধ মুক্তা দোদুল্যমান। প্রধান

---

* (পুনশ্চ) পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিতে পাইতেছি যে, মঙ্গলের "শম" চাঁদটী মঙ্গলের দেহ হইতে জন্মিয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, কোন উদ্ভ্রান্ত উল্কাপিণ্ড সৌর জগতে আসিয়া হঠাৎ মঙ্গলের এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, মঙ্গলের হাত ছাড়াইয়া আর তাহার পালাইবার পথ রহিল না। একেবারে অনেকটা কাছে আসিয়া পড়াতে অমনই অতিদ্রুতবেগে মঙ্গলকে বেষ্টন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে যাহা হউক, তাহার এই অতিরিক্ত বেগে পরিক্রমণের ফল যে একদিন মঙ্গলের গাত্র-সংঘাতে পর্য্যবসিত হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। শ্রীঅ:—

সিংহাসনের দুইপার্শ্বে, দুইখানি ছত্র-শোভিত সিংহাসন থাকিত। দুইখানি কাষ্ঠাসনের (চেয়ারের) উপর হীরা-মতি-খচিত লোহিত বর্ণের ছত্র সংলগ্ন ছিল। এই ছত্র-সিংহাসনে মণি-খচিত কয়েকটী তারকা, নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে, জ্বলিত। এই তারকা গুলির এক একটীর নির্ম্মাণ ব্যয় ৭৫ সহস্র মুদ্রা। প্রধান সিংহাসনের চারিদিকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের রেলিং করা। দরবার গৃহের আশে পাশে স্বর্ণ ও রৌপ্যময় গন্ধপাত্রে অগুরু ও চন্দন কাষ্ঠের সূক্ষ্ম চূর্ণ ও বিবিধ মূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্য দগ্ধ হইয়া চারিদিকে সুগন্ধ বিকীরণ করিত। এতদ্ভিন্ন প্রধান সিংহাসনের উপর বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত চন্দ্রাতপ তুলিয়া সভার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিত।*

বাদসাহ অগুরু, গোলাপ প্রভৃতি দ্রব্যের সুগন্ধ উপভোগ করিয়া উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে দরবারে বসিতেন। "আর্‌গুজে" নামক একরূপ গন্ধসার এই সময়ে তাহার শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিত। বহুবিধ সুগন্ধ দ্রব্যের সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হইত। বাদসাহের অনুকরণে আমির ও উচ্চ পদস্থ সভাসদগণ ইহা ব্যবহার করিতেন। উৎসব দিনের আনন্দ-কোলাহলে দরবার গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত। খুস্‌বো বরদারেরা নানাবিধ সুগন্ধ স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে করিয়া বাদসাহের সম্মুখে ধরিত, তিনি তাহা হইতে কিছু তুলিয়া লইতেন, পরে তাহার করুণাদৃষ্টি যে যে সভাসদের উপর নিপতিত হইত, তাহারা পদমর্য্যাদাক্রমে প্রসাদ উপভোগ করিত। "মঘী" নামক ক্ষুদ্রাকার স্বর্ণ বর্ণের এক প্রকার তাম্বূল বাদসাহ বড় ভালবাসিতেন। রত্নখচিত সোণার

* বর্ত্তমান বর্ষের সাহিত্যের প্রথম সংখ্যায় মাসিক সাহিত্য সমালোচনাব্যপদেশে প্রদীপের প্রবন্ধগুলির সমালোচনার স্থলে সমালোচক মহাশয় যে এই অধম লেখকের "সাহজাহানের দৈনিক জীবন" সম্বন্ধে কৃপাকটাক্ষপাত করিয়াছেন, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু সমালোচক মহাশয় যিনিই হউন না কেন, তিনি যে মুদিত নেত্রে, না বুঝিয়া শুঝিয়া, বা এলিয়াটের পত্রোদ্ঘাটন না করিয়াই, এলিয়াট হইতে প্রবন্ধটী গৃহীত হইয়াছে বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট আভাস দিয়াছেন, তাহা আমাদের কাছে সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। সমালোচক মহাশয় যে ভ্রান্ত, তিনি আমাদের নিকট আসিলে তাহা প্রমাণ করিতে পারিব। এলিয়াটের কোন একটীও ক্ষুদ্র প্যারার সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধের তিলমাত্র সংশ্রব নাই। ইহা একখানি মূল পারসী গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ। আজ পঞ্চদশ বৎসর ধরিয়া একাগ্রচিত্তে মোগল রাজত্বের ইতিহাস আলোচনায় কালক্ষেপ করিয়া বুঝিয়াছি, ইংরাজের লেখা ইতিহাস ছাড়িয়া মূল গ্রন্থ অবলম্বন করিলে অনেক নূতন কথা জানিতে পারা যায়। একার্য্যে আমি কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদারের নিকট প্রভূত সাহায্য পাইতেছি। আরবী ও পারস্য ভাষাবিৎ সুপণ্ডিত মৌলবী আবু মনসুর আবদুল হক সাহেব তাঁহারই আদেশে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন, এ সংবাদটী সমালোচক মহাশয়ের শ্রুতিপ্রিয় না হইলেও, প্রদীপের ও অন্যান্য পত্রিকার গুণগ্রাহী পাঠকদের চিত্তরঞ্জক হইবে। তাঁহারই সাহায্যে আমি এই অনুবাদগুলি প্রদীপে প্রকাশ করিতেছি। এইরূপ অক্লান্ত নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের ফল যদি কোন সংকীর্ণহৃদয় সমালোচকের অঙ্গুলী হেলনে বা প্রতিকূল মন্তব্যে পাঠকের মনে কোন কুসংস্কারের আবির্ভাব হয়, তাহার প্রতিবিধানার্থ আমায় এই কৈফিয়ৎ দিতে হইল। সাহিত্যের এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনায় আমার লাভ ক্ষতি অতি অল্প। প্রদীপের পাঠক বর্গকে জানাইয়া রাখি, সাহজাহান বাদসাহের প্রায় ৩০।৪০ খানি মূল পত্র আমার কোন সহৃদয় দিল্লীনিবাসী উচ্চপদস্থ মুসলমান বন্ধু অতিকষ্টে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। সে গুলি ইতিহাসের পক্ষে অতি মূল্যবান্। সময়ান্তরে হয়তঃ প্রদীপেই তাহার অনুবাদ দেখিতে পাইবেন। দিল্লীর রাজসভার কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপি এবং আকবর ও সাহজাহানের সময়ের কয়েকজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারির প্রতিমূর্ত্তিও তিনি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। তবে সাহিত্যের সমালোচক মহাশয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, এ পত্রগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হইলে তিনি যেন মনোযোগ দিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সমালোচনা করেন। আগে হইতেই না জানিয়া শুনিয়া বলিয়া বসেন, ইহা অমুক হইতে গৃহীত। 'প্রবাসী'র সমালোচনা করিতে গিয়া সমালোচক মহাশয় যে অভিজ্ঞতার (?) পরিচয় দিয়াছেন—তাহা প্রবাসী-সম্পাদক সঞ্জীবনীতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আশা করি ইহাতেও সমালোচক মহাশয়ের কথঞ্চিৎ চৈতন্য হইবে। প্রদীপ আপিসে আসিলে, প্রদীপের কৃতবিদ্য সম্পাদক মহাশয় ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে সাহজাহানের দৈনিক জীবনের মূল পারসী গ্রন্থগুলি দেখাইতে পারেন। সাহিত্যের 'সবজান্তা' সমালোচক মহাশয়ের বোধ হয় অজ্ঞাত নহে যে, বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যের প্রবন্ধ লেখকদের ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া পরিশ্রম ও শরীর পাত করিয়া, "মাসিকে" প্রবন্ধ যোগাইতে হয়। এরূপস্থলে—অনুদার বা অনভিজ্ঞতাপূর্ণ সমালোচনায় সহযোগী পত্রিকাগুলির প্রবন্ধের পসার মাটী করিয়া আপনি বড় হইবার জন্য মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া—গুরুগিরি করিতে গেলে সমদর্শী ও জ্ঞানবান লোকের পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে। তিনি যদি বুঝিতেন—তাঁহার এরূপ সমালোচনায় বা কটাক্ষপাতে প্রকৃত কার্য্যশীল-লেখকের তিলমাত্র বিচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই—বা সাধারণে তাঁহার এরূপ সমালোচনা পড়িয়া তাঁহার আন্তরিক ঈর্ষা ও সঙ্কীর্ণতা উপলব্ধি করিয়া থাকে, তাহা হইলে হয়ত তিনি অন্য পথে যাইবার চেষ্টা করিতেন। সম্প্রতি তিনি আষাঢ় মাসের সাহিত্যে প্রকৃত কর্ম্মশীল ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি. এল্ মহাশয়ের সম্বন্ধে যেরূপ অনুদার মত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার চপলতাই প্রকাশ হইয়াছে। সাহিত্য সমালোচনা করিতে গিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ করিবার কি আবশ্যকতা আছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অথচ 'সাহিত্যে' প্রায়ই এরূপ হইয়া থাকে। অক্ষয় বাবু অক্ষয় বাবুই থাকিবেন। তাঁহার গুণগরিমার তিলমাত্র হ্রাস হইবে না। যদি সাহিত্যের মঙ্গলকল্পে "সাহিত্যের" আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা আশা করি সমালোচক মহাশয় ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলির সমালোচনায় কেবল মুরুব্বিয়ানা না দেখাইয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিবেন। নতুবা তাঁহার এই ঈর্ষাপ্রণোদিত সমালোচনায় তিনি নিজেই জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন।—লেখক।

তাম্বূলাধারে নানাবিধ সুগন্ধি মসলাপূর্ণ "মঘী"রাখিয়া তাম্বূল বাহকেরা বাদসাহের সম্মুখে ধরিত। বাদসাহের পরে সভাস্থ সকলে এই তাম্বূলোপহার পদমর্য্যাদাক্রমে গ্রহণ করিতেন। এই জন্মোৎসব দিনে, অনেক আমীর ও ওমরাহ নূতন উপাধি, জাইগীর ও পুরস্কারাদি পাইতেন, সভায় নানা শ্রেণীর গায়কের সমাবেশ হইত, এবং এই দিনের সংগীত-সংগ্রামে যাহারা জয়লাভ করিত, তাহারা রাশীকৃত স্বর্ণমুদ্রা লাভ করিত। ইহাদের এক এক জনের কণ্ঠস্বর এত সুমিষ্ট ও প্রাণ-মুগ্ধকর ছিল যে, আকাশের উড্ডীয়মান পাখীগুলিও তাহাদের সংগীত তানে মোহিত হইয়া, স্থির হইয়া শুনিত এবং আর উড়িতে চেষ্টা করিত না। নানা স্থান হইতে রাজবর্গ ও ওমরাহগণ দুর্লভদর্শন দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া, বাদসাহের সম্মুখে উপঢৌকন রূপে উপস্থিত করিতেন। জন্মোৎসব ভিন্ন পর্ব্বাহ ও অন্যান্য উৎসবাদির দিনেও এইরূপে মহাসমারোহ হইত। এই সকল পর্ব্বোৎসবের প্রত্যেকটীরই কিছু বিশেষত্ব ছিল। "ইদ গুলাবি" একটী আনন্দ পর্ব্বোৎসব। এই দিনে বাদসাহ গুপ্ত দরবারে বসিতেন, ইহাতে সাধারণের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ থাকিত। কেবল উচ্চপদস্থ আমীর, ওমরাহ, ও রাজা রাজড়ার সমারোহ হইত। এই পর্ব্বোৎসবে বড় বড় রাজারা অথবা রাজপুত্রগণ বা সাহজাদা ও আমীর ওমরাহগণ পদমর্য্যাদানুক্রমে বাদসাহকে স্বর্ণময়-ভৃঙ্গার গোলাপ জলে পরিপূর্ণ করিয়া উপহার দিতেন। বাদসাহ সেগুলি একবার হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে, দাতারা কৃতার্থ বোধ করিতেন। সংখ্যাতীত সুবর্ণ পাত্রে এইদিন দরবার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তারপর আর একটী মহোৎসব ছিল। বসন্তকালে প্রকৃতি-সুন্দরী যখন নব পল্লবাদিতে ভূষিতা হইতেন, দিকবলয় সুগন্ধি পুষ্পাদির মনোহর বাসে আকুলিত হইয়া উঠিত, বাদসাহী উদ্যান সমূহ নববেশে পুষ্পোপহার লইয়া যখন সম্রাটের সম্মাননার জন্য প্রস্তুত হইত, তখন—"বাসন্তী" উৎসব হইত। এই বাসন্তী উৎসব, সম্রাটের অন্তঃপুরস্থ উদ্যানেই হইত। বাদসাহ ও অন্তঃপুরিকারাই এই বসন্তোৎসবে মাতিতেন। যখন কোন প্রকাশ্য রাজোদ্যানে ইহা সম্পন্ন হইত, তখন বিশেষরূপে অনুগৃহীত ওমরাহগণ ইহাতে প্রবেশাধিকার পাইতেন।

বাদসাহের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার।

এইবার ধন ভাণ্ডারের বিবরণটা দিব। রাজকোষে এত স্বর্ণ মুদ্রা সঞ্চিত থাকিত, যে তাহা গণনা করা অসম্ভব। রাজধানীর কোষাগারে, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচুর পরিমাণে থাকিত, এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সুবা ও দুর্গমধ্যে স্বতন্ত্র ধন-ভাণ্ডার ছিল। সকলের অপেক্ষা রাজধানীর ধনভাণ্ডারের ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি অবর্ণনীয়। খালসা জমীর রাজস্ব, পেশ্‌কশ্‌ প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত, অথবা উদ্বৃত্ত রাজস্ববাবতে ক্রোর ক্রোর মুদ্রা রাজভাণ্ডারে স্তূপাকার হইয়া থাকিত। আর একটী সুরক্ষিত গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রাদি, মণি-মুক্তা ও স্বর্ণালঙ্কারাদি উপযুক্ত প্রহরীর দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া থাকিত। প্রতিদিন এক এক প্রস্থ করিয়া নূতন স্বর্ণ পাত্র বা রৌপ্যময় ভোজন পাত্র ব্যবহৃত হইত। কোন শুভকার্য্যে বা উৎসবের দিনে বা সাধারণ ভোজক্ষেত্রে এই সব অপারমেয় স্বর্ণ-রৌপ্য পাত্রাদি ভাণ্ডার হইতে বাহির হইয়া, সাধারণের চক্ষে বাদসাহের অতুল ঐশ্বর্য্য-দীপ্তি প্রকাশ করিত। বাদাক্শানের লোহিতমণি, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিময় হীরকহার, সম্পূর্ণ গোলাকার এবং তারারাজির ন্যায় জ্যোতি বিশিষ্ট দীর্ঘাকার মুক্তা সমূহ, নানা আকারের উজ্জ্বল মণি, মুক্তা, নানাবিধ উজ্জ্বল রত্নালঙ্কার, আলিপো দেশের স্বর্ণ খচিত নানাবিধ সুদীর্ঘ মুকুর, নানাবিধ রত্ন-খচিত চন্দ্রাতপ, শয্যাস্তরণ, উপাধান প্রভৃতি জগতের যাহা কিছু দুর্লভ, তাহা এই সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের শোভা বর্দ্ধন করিত।

অশ্বশালা।

আরব, ইরাক্, খোরাসান, তুর্কীস্থান প্রভৃতি বহুদেশ হইতে বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী, রণদুর্ম্মদ, দৃঢ়কায় অশ্ব-সমূহ সংগৃহীত হইত। এক একটী অশ্বের মূল্য ৫০০ শত হইতে সহস্র 'তুমান' পর্য্যন্ত উঠিত। এই মূল্যবান অশ্বগুলিও আমীর ও ওমরাহদিগের ন্যায় বাদসাহের আদর লাভ করিত। তাঁহার প্রিয় অশ্বগুলির সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত দেখিলে অনেককেই স্তম্ভিত হইতে হইত। কাহারও স্বর্ণ-পাত্রে আহারের ব্যবস্থা, কাহারও গৃহতল মর্ম্মর মণ্ডিত, কাহারও বা গাত্র মণিখচিত-বস্ত্রাচ্ছাদিত, কাহারও বা সুবাসিত জলে স্নানের ব্যবস্থা। স্বয়ং সাহানসাহ

অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের কার্য্যে ত্রুটি হইতেছে কিনা, দেখিবার জন্য, মধ্যে মধ্যে সহসা অশ্বশালায় উপস্থিত হইতেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পরিচিত ও আদৃত অশ্বগুলি যেন অনুগ্রহ লাভে কৃতার্থ হইয়া, হ্রেষারবে তাঁহার সম্মাননা করিত। বাদসাহ অশ্বদিগের হিন্দী ও পারসী নামকরণ করিয়া ছিলেন। বাঙ্গলায় তাহার অনুবাদ করিলে, কোনটীর নাম "বিশ্ব-প্রিয" কোনটীর নাম "বিজয" কোনটীর নাম "শ্বেত-হস্তী" কোনটীর নাম "বায়ুবিজয়ী"—এইরূপ হয়।

হস্তীশালা।

বাদসাহের হস্তীশালায় বঙ্গদেশের ও গুজরাটের বৃহৎকায় হস্তী সমূহ অতি যত্নে রক্ষিত হইত। হস্তী ও হস্তিনীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। একদল কেবল যুদ্ধকার্য্য ও শিকারের জন্য ব্যবহৃত হইত। অন্য দল কামান টানিবার, বোঝা বহিবার ও ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হইত। অশ্বের ন্যায় হস্তীদিগেরও থাকিবার বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। মাহুতেরা হস্তিবৃন্দকে নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়া, বাদসাহের সম্মুখে চিরবিনীত ভৃত্যের ন্যায় কাজ করাইত। বাদসাহ নিজে হস্তিদিগের নামকরণ করিয়াছিলেন। কোনটীকে তিনি "সুমেরু" কোনটীকে "আলমগজ্" কোনটীকে "গজরাজ" কোনটীকে "বনরাজ" কোনটীকে "ঔরঙ্গরাজ" কোনটীকে "মহাস্বরূপ" কোনটীকে "মহাসুন্দর" কোনটীকে "জগৎ শোভা" প্রভৃতি নানাবিধ নাম দিয়াছিলেন। এই সমস্ত রাজহস্তী তাহাদের প্রভুর স্বর খুব ভাল করিয়া চিনিত। বাদসাহ নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহারা অবনত মস্তকে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইত। মাথা নোওাইয়া, হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া, শুড় নাড়িত। বাদসাহ ছাড়া বাদসাজাদাদিগেরও এইরূপ অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি পৃথকরূপে থাকিত। বাদসাহের সৈন্যদলের মধ্যে ভারবাহী "বগ্‌দি" জাতীয় উষ্ট্র, বৃষ, অশ্বতর প্রভৃতি জন্তুও অসংখ্য থাকিত। সফরের সময়ে মালপত্র বহিবার জন্য গুজরাটি শকটাদিও অনেক ছিল।

অস্ত্রাগার।

বাদসাহের অস্ত্রাগারের দৃশ্যে একদিকে যেমন প্রাণে আনন্দ সঞ্চার হইত, অন্যদিকে একটা আতঙ্কও জন্মিত। এমন সুন্দর "শেলেখানা" আকবর সাহের আমলেও ছিল কি না সন্দেহ। শেলেখানার একটি গুপ্ত অংশ ছিল। ইহাকে "কবরখানা" বলিত। এখানে বহুমূল্য, সাংঘাতিক অস্ত্রাদি গোপনে রাখা হইত। ইমেন দেশীয় বিখ্যাত তরবারি, ইহার অন্যনাম (আকবর সাহী) "খুন-রেজ" "সফ্‌সেকান্দ" "জামধার" "খুঞ্জার" কপ্‌ওয়াহ্‌ প্রভৃতি তীক্ষ্ণধারসম্পন্ন রত্ন খচিত অস্ত্রাদি এই শেলেখানায় স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিয়া দীপ্তি বিকাশ করিত।* গণ্ডারের কঠিন চর্ম্মে নির্ম্মিত, সুন্দর শিল্পীর হস্তে চিত্রিত ছোট বড় ঢাল, গুজরাটী তীর, তাতারী ধনু, লাহোরী, সুলতানী ও ইউরোপীয় বর্ষা, দায়ুদী বর্ম্ম, ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত ছিল। কামান, গোলা, গুলি প্রভৃতিরও অভাব ছিল না। "কিল্লাকুশাহ্‌" "দুষমন্-কশহ্‌" "ফিরোজজঙ্গ্‌" 'দুষমন গোদাজ্‌' প্রভৃতি আখ্যাধারী ভিন্ন ভিন্ন আকারের কামান শ্রেণীও এই শেলেখানার শোভা সম্বর্দ্ধন করিত। † 'গজ্‌নাল্‌' "সতর্ নাল" "হঠ্‌নাল" প্রভৃতি নানাশ্রেণীর বন্দুকও যথেষ্ট ছিল। বাদসাহী তোপখানায়, ইউরোপ দেশের উৎকৃষ্ট কারিকরদিগের দ্বারা এই সমস্ত কামান ঢালাই করা হইত। কেবল রাজধানীতে নহে, প্রধান সুবার সকলগুলিতেই এইরূপ এক একটী শেলেখানা থাকিত। এই বিভাগের কর্ম্মচারীরা এ সম্বন্ধে এতদূর কার্য্যতৎপর ছিল যে, হুকুম প্রাপ্তি মাত্রেই, যথাস্থানে যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্রাদি উপস্থিত করিত।

বাদসাহী সফর্।

বাদসাহ যখন তাঁহার পতাকা শোভিত, বিজিত ও অধীনস্থ রাজ্য সমূহের মধ্য দিয়া সফরে বা শিকারে যাইতেন, তখনকার বন্দোবস্ত অতি সুশৃঙ্খল হইত। বাদসাহের আগমন সংবাদ প্রত্যেক স্থানে জ্ঞাপন

---

* খুনরেজ=শত্রুর রক্তপাতকারী,
সফ্‌সেকান্দ=উচ্চ পদবীর ধ্বংশকারী
জামধার=দুইদিকে তীক্ষ্ণধার তরবারী
খুঞ্জার=বক্র তরবারী
কপ্‌ওয়াহ্‌=রত্ন-খচিত তরবারী।
} বাদসাহেরা অস্ত্রাদির কার্য্যানুসারে তাহাদের নানাবিধ নামে অভিহিত করিতেন। এ নামগুলির যথাযথ বঙ্গানুবাদ শ্রুতি-সুখকর নহে।

† কিল্লাকুশাহ্‌=দুর্গধ্বংশকারী
দুষমনকশহ্‌=শত্রুর বিনাশকারী
ফিরোজজঙ্গ=সর্ব্ববিজয়ী, ইত্যাদি কামানের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল।

করিবার জন্য, ঢক্কা ও বংশী নিনাদ করা হইত। কোন রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া বাদসাহ যখন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেন, সে সময়ের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করা বড়ই কঠিন। যাত্রাকালেই হউক আর প্রত্যাবর্ত্তন সময়েই হউক, অসংখ্য বাহিনীর সুশৃঙ্খল গতি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইত। উৎসবের দিনে বা পর্ব্বাহে যখন সাহান্-সা প্রাসাদের বাহির হইতেন—কিম্বা রাজ প্রাসাদ হইতে "এদ্গায়" যাইতেন—'চাবুকদার' ও "এসাওল্"গণ সর্ব্বাগ্রে জনতার ভিতর দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিত। সমগ্র নগরীর বিপণী, গৃহ দ্বার ও রাজপথ, নানাবিধ সজ্জায় শোভিত হইত। প্রত্যেক গৃহদ্বারে রেশমের রঙিন্ পরদা, পতাকা ও পুষ্পমাল্যে শোভিত হইত। রাস্তার পার্শ্বে ত্রিতল চতুস্তল প্রকাণ্ড সৌধ গুলির অলিন্দ, ছাদ প্রভৃতি জনপূর্ণ হইয়া পড়িত। নগর ও উপনগরের অগণ্য জনস্রোত রাজপথ ও গলি গুলি পূর্ণ করিত। বাদসাহ পর্ব্বোপলক্ষে যখন রাজপথ দিয়া এদ্গায় (ইদ্ পর্ব্বানুষ্ঠানের স্থান) যাইতেন, তখন কখনও হস্তিপৃষ্ঠে কখনও বা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন। সর্ব্বাগ্রে মণি-খচিত ছত্র লইয়া এক দল ছত্রবাহী যাইত; তাহাদের পশ্চাতে রত্ন-খচিত, সূচিত্রিত, ব্যজনী ও চামর লইয়া চামরধারীরা থাকিত। তৎপশ্চাতে বাদসাজাদারা স্বদলস্থ প্রধান প্রধান ওমরাহ-বেষ্টিত হইয়া, ধীর গতিতে অগ্রসর হইতেন। বাদসাহজাদাদের অগ্রে, সুসজ্জিত ইরাকি ও আরবী অশ্বের উপর অশ্বারোহীরা চলিয়া যাইত। তাহার পর হস্তিযূথ। হস্তিযূথের উপর রত্ন-ঝালরময় হাওদা ও একটীর উপর কেবল মাত্র সিংহাসন। ইহার পর সিংহচিহ্নিত রাজপতাকা ও অন্যান্য রাজচিহ্ন—রাজদণ্ড ও উন্মুক্ত অসিধারিগণ। ইহার পর খাস্-এ-সওয়ারীর দল। এই দলে, তখ্‌তে রওয়ান, পালকী, চতুর্দ্দোল, তাঞ্জাম ও গুজরাটের গাড়ী থাকিত। সীরতুজকগণ এই সকলের পরিচালকরূপে থাকিতেন। ইসাওয়ালেরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের দণ্ড ও আশাশোটা লইয়া তাহার পরে যাইত, তাহাদের পরে খিদমতিয়াগণ।

ইদ্গার স্থান পর্য্যন্ত রাজপথের দুইপার্শ্বেই রাজভৃত্যেরা ও অস্ত্রধারী সৈন্যগণ এবং বরকন্দাজেরা দাঁড়াইয়া থাকিত। ইহাদের সম্মুখেই পদাতিক ও বন্দুকধারিগণ। এই দলের মধ্যেই সম্রাট প্রসন্নমুখে দ্রুতগামী অশ্বারোহণে পথ অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার আদেশে রাজ পথের দর্শকদের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছড়াইয়া দেওয়া হইত। এ সকল দিনে নগরের সকল ভিক্ষুকের জীর্ণ ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হইয়া যাইত। এদগায় উপস্থিত হইয়া সেই সপ্তসমুদ্র সীমাবেষ্টিত হিন্দুস্থানের মহা গৌরবান্বিত বাদসা আপনার পদ-গৌরব ভুলিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে নমাজ করিতেন। এই সময় প্রবীণ, মহাজ্ঞানী প্রধান মোল্লাসাহেব প্রচারমঞ্চে দাঁড়াইয়া এই মহা প্রতাপান্বিত খলিফা ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের গৌরব কীর্ত্তন করিতেন। মোল্লাসাহেবেরা এই সময়ে প্রচুর অর্থ লাভ করিতেন।

বাদসাহের শিবির।

বাদসাহ যখন অগণ্য সৈন্য লইয়া, যুদ্ধার্থে বা মৃগয়ার জন্য রাজধানীর বাহির হইয়া দূরতর প্রদেশে যাইতেন, তখন সর্ব্বাগ্রে "খুস্‌মঞ্জিল" "দারোগা" ও "মনুরফ" প্রভৃতি কর্ম্মচারিরা সদলবলে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে একটী সুন্দর স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া তথায় "পেশখানা" বা সম্বর্দ্ধনা গৃহ প্রস্তুত করিতেন। তাম্বু-চিত্রকর, ভিস্তি, সূত্রধর, সুপকার প্রভৃতি কর্ম্মচারী ও ফরাস্ খানার লোকেরা সর্ব্বাগ্রে যাইত। যে স্থান নির্ব্বাচিত হইত সেইস্থানে বিচিত্র শিবির-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইত। এই শিবির শ্রেণীর মধ্যে বাদসাহের শয়ন ও বিশ্রাম কক্ষ, প্রকাশ্য ও গোপনীয় দরবার গৃহ, প্রভৃতি সবই থাকিত। সর্ব্বমধ্যে বেগমদিগের তাঁবু। এই তাম্বুর দরজা জানালা থাকিত, সেই সব জানালায় স্বর্ণখচিত নীলাভ পরদা দোদুল্যমান হইত। দৌলৎ-খানার চারিদিকে বা সম্মুখে বাজার স্থাপন করা হইত। এই বাজারে সকল প্রকার বিক্রেয় পদার্থ থাকিত। বাদসাহের শিবিরের পরে সাহজাদাদের শিবির, তৎপরে বড় বড় আমীর ওমরাহদিগের বস্ত্রাবাস। অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া এই শিবিরশ্রেণী সন্নিবেশিত হইত, এই জন্য প্রত্যেক বিভাগের চিহ্ন স্বরূপ প্রধান প্রধান শিবিরের শিরোদেশে বিভিন্ন বর্ণের পতাকা সমূহ বায়ুভরে ইতস্তত সঞ্চালিত হইত। পতাকা দেখিয়া কোন্‌টী কাহার শিবির তাহা নির্ণীত হইত। সম্রাট যখন দৌলৎ-

খানা হইতে বাহির হইতেন, তখন জয় ডঙ্কা ও বংশী নিনাদে, করতালের গম্ভীর শব্দে,সমস্ত প্রান্তর ও আকাশের পদপ্রান্তস্থ মেঘরাজির নিভৃত ক্রোড়দেশ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। বাদসাহের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার জন্য হস্তী, দ্রুতগামী অশ্ব, তক্তরওয়ান্, স্বর্ণ সিংহাসন, প্রভৃতি ইচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হইত। রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, রাজপুত্রগণ বখশীগণ, ওমরাহগণ, মনসবদারগণ ও বিজয়ী বীরবৃন্দ বাদসাহের অগ্রে পশ্চাতে থাকিতেন। সর্ব্বপশ্চাতে বেগমদিগের জন্য "চন্দাওল" "মহাফেজ" "পাল্কী" ও "ডুলী"। এই পাল্কীগুলি মণিমণ্ডিত রেশমের আবরণীতে বেষ্টিত. স্বর্ণ রৌপ্যের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে পরিশোভিত। খোজাদিগের প্রধানগণ, অস্ত্রাধারী খোজা ও তাতারীগণ, এত সতর্কতার সহিত, এত সুশৃঙ্খলার সহিত বাদসাহ ও মহিষীগণের চারিধার রক্ষা করিয়া চলিত, যে সেখানে মৃদু মলয়ের যাতায়াতের পথও যেন রুদ্ধ হইয়া পড়িত। লৌহ পর্ব্বতের (?) ন্যায় একদল সুনির্ব্বাচিত তেজোদৃপ্ত বিশ্বাসী রাজপুত সৈন্য, বেগম ও সাহজাদীদের রক্ষক রূপে চারিধার বেষ্টন করিয়া উন্মুক্ত তরবারী হস্তে অগ্রসর হইত। এত সুশৃঙ্খলার সহিত, এত তৎপরতার সহিত, এই বিপুল বাহিনী অগ্রসর হইত, যে তাহা দেখিবা মাত্রই বিস্ময় জন্মিত। কোন গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময় কেহ পথিপার্শ্বস্থ কোন বৃক্ষের ফল পাড়িতে পারিত না বা কোন শস্য ক্ষেত্রে গিয়া শস্য লইতে পারিত না। যে এইরূপ অপকর্ম্ম করিত—বাদসাহের আদেশে তাহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া জন্মের মত তাহার জঠরজ্বালার নিবৃত্তি করিয়া দিত। সৈন্যদের হস্ত হইতে প্রজার শস্যক্ষেত্রের শস্য রক্ষা করিবার জন্য,ওমরাহ ও মন্সবদার ও আহদিয়ানেরা সমস্ত দলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। কোন শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে সেনাদল উপস্থিত হইলে দারোগা ও আমিনেরা সর্ব্বাগ্রে তাহা জরীপ করিয়া তাহার একটা মূল্য ধার্য্য করিয়া লইতেন। যদি কোনরূপে এই শস্যের ক্ষতি হইত, তাহা হইলে রাজকোষ হইতে সেই ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত্রাধিকারীকে টাকা ধরিয়া দেওয়া হইত।

বরযাত্রী।

প্রচলিত পল্লী প্রবাদ অনুসারে পিতার কুপুত্রের উপরই বিবাহে বরযাত্রী হইবার ব্যবস্থা আছে। প্রিয় বন্ধু বসন্ত কুমারের বিবাহে সেই প্রবাদ সার্থক হইয়াছিল।

সে এক বৈশাখের কথা। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়াছি, বিজয় বাবু এক দিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বসন্তের বিবাহে তোমরা বরযাত্রী হইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।' 'যে আজ্ঞে' বলিয়া আমরা প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

বসন্ত আমার সমবয়স্ক, সহাধ্যায়ী এবং প্রতিবেশী। তাঁহার সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুতা হইয়াছিল। "রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" বিবাহার্থীর পক্ষে শ্বশুরালয় শ্মশান অপেক্ষা অল্প ভীতি উৎপাদক নহে, অধিক শ্যালক শ্যালিকা থাকিলে ত কথাই নাই। বসন্তের ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের উপর ষষ্ঠীদেবীর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।

আসল কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের জন্মস্থান রাজপুর। রাজপুর রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একখানি ক্ষুদ্র পল্লী,আমাদের গ্রাম হইতে কত ক্রোশ হইবে বলিতে পারি না, তবে অনেক দূর বটে। আমাদের গ্রাম হইতে রাজপুর গ্রামে উপস্থিত হইবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সকলগুলি যানেরই আবশ্যক হয়, অর্থাৎ গোশকট, বাষ্পীয় শকট, ষ্টীমার, নৌকা ইহার কোনটিই বাদ দিবার উপায় নাই।

বিজয় বাবু আমাদের গ্রামের প্রসিদ্ধ উকীল, তাঁহার জমীদারীও নিতান্ত অল্প নহে, তাহার উপর বসন্ত তাঁহার একমাত্র কৃতবিদ্য পুত্র, সুতরাং তাহার বিবাহের আয়োজনে গ্রামে মহা কলরব পড়িয়া গেল। মিঠাই মণ্ডা প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্টান্ন গ্রামের সর্ব্বসাধারণের কল্পনানেত্রের সম্মুখে অত্যন্ত পরিস্ফুট আকার ধারণ করিল। গ্রামস্থ লোকের মুখে কেবল এই বিবাহের কথা, চতুর্দ্দিকে সকালে সন্ধ্যায় এই সম্বন্ধেই নানাবিধ আলোচনা। কৌলিন্যে যাহারা সমাজের মস্তক, জীবনোপায় যাঁহাদের উঞ্ছবৃত্তি, তাঁহারা দলে দলে বিজয় বাবুর বৈঠকখানায় সমাগত হইয়া সুবাসিত তাম্রকূটধূম্র পান করিতে করিতে অসঙ্কোচে নানা প্রকার সদুপদেশ দান করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন,

"এই আপনার প্রথম কার্য্য, গায়ে হলুদের দিন প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাড়ী একখানি গামলা ও এক গামলা শর্ষপ তৈল দান করা বিধেয়।" কেহ প্রস্তাব করিলেন, এই উপলক্ষে প্রত্যেক সধবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে এক একটি সুবর্ণ নির্ম্মিত নথ দান করিলেই বিজয় বাবুর কীর্ত্তিস্তম্ভ দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবে। এই বিবাহ উপলক্ষে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য পেয়ের আয়োজন সম্বন্ধে অবশ্য কাহারও মতভেদ ছিল না।

২৪এ বৈশাখ রাত্রে বিবাহ। স্থির হইল, ২৩এ বৈশাখ অপরাহ্ণে আমরা গোশকটে কন্যাগৃহাভিমুখে ধাবিত হইব। বসন্ত তাঁহার ভাবী পত্নী তড়িৎকুমারীর আলোক চিত্র ইতি-পূর্ব্বেই দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। মেয়েটি তাঁহার পছন্দ হইয়াছিল। নব বৈশাখের শান্ত শীতল সুনির্ম্মল প্রভাতে অচিরে বিবাহ-সম্ভাবিত প্রেমিক যুবকের হৃদয়, বসন্তের পুষ্পগন্ধ সমাকুল সমীরণবৎ কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং প্রভাতে উঠিয়া বসন্ত যখন আমার শয়নকক্ষের প্রান্তবর্ত্তী কুসুমোদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে গাহিতেছিলেন,—

"আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলহার
প্রভাত-চরণে ঢালিব।"

তখন আমার মনে কিছুমাত্র বিস্ময়োদ্রেক হইল না। পূর্ব্বাকাশে তখন তরুণ অরুণোদয় হইতেছে মাত্র, বৃক্ষপত্র ও শ্যামল দুর্ব্বাদল শিশির-সিক্ত, সুখস্পর্শ শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে; প্রভাতালোকের কুহকময় সংস্পর্শে বসুন্ধরা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে! বসন্তের গান শুনিয়া আমি কোন প্রকার সাড়া শব্দ না দিয়া উঠিয়া বসিলাম, মাথার কাছে টেবিলের উপর হারমোনিয়ামটা ছিল, তাহাতে সুর দিয়া ধরিলাম—

"আমি নিতি নিতি কত করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে।"

বন্ধু গান ছাড়িয়া একেবারে বারান্দায় উঠিয়া দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে উভয়ে তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলাম।

বিজয় বাবুর বাড়ীর সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে বসিয়া রসুনচৌকীর দল সুস্বরে মঙ্গল গান গাহিতেছিল। পাড়ার কতকগুলি বালকবালিকা বেঞ্চির উপর বসিয়া গল্প করিতেছিল, পরস্পরকে চিমটি কাটিতেছিল, কেহ কাহারও হাত হইতে একটা রসগোল্লা বা আধখানা জিলিপি কাড়িয়া লইয়া নিজের মুখবিবরে নিক্ষেপ করিতেছিল। কেহ এক রাশ বকুল ফুল কোঁচড়ে পুরিয়া আনিয়া অনন্যমনে মালা গাঁথিতেছিল।

ধীরে ধীরে আমরা বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। সুসজ্জিত বৈঠকখানা ভারি সরগরম দেখা গেল। বিভিন্ন গ্রাম হইতে কুটুম্ব মহাশয়েরা আসিয়া ঘর পূর্ণ করিয়াছেন, ঘন ঘন তামাক চলিতেছে। বিজয় বাবুর চারি দিকে আট দশ জন হিতৈষী পরামর্শদাতা, সম্মুখে একটা হাঁড়ি, হাঁড়ির গায়ে লাল কালিতে লেখা—"শ্রীমান্ বসন্তকুমার বসু বাবাজীবনের শুভ বিবাহের জমা খরচ।" জমাখরচের যত কিছু কাগজ পত্র সেই হাঁড়ির মধ্যে রক্ষিত হইতেছে। বৈঠকখানার সম্মুখে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, পাল্কীর বেহারা, মৎস্যবিক্রেতা জেলে, দধি দুগ্ধ সরবরাহকারী গোয়ালা, মাটির গেলাস নির্ম্মাতা কুম্ভকার প্রভৃতি বহুলোক বসিয়া স্ব স্ব বরাত মিটাইতেছে। আজ মধ্যাহ্নে বরযাত্রী-ভোজন আছে। যাহারা বরযাত্রী হইয়া যাইবেন, তাঁহারা বিজয় বাবুর গৃহে আহার করিয়া গরুর গাড়ীতে উঠিবেন। বর ও পুরোহিতের জন্য পাল্কীর বন্দোবস্ত স্থির হইল

বিজয় বাবু আমাকে বলিলেন, "তোমরা young man, বেলা আটটা পর্য্যন্ত ঘুমাবে যদি তবে কি রকম করে কাজ চলবে? দেখচোত আমি একা মানুষ।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনি একাই একশ।"

"নাহে বাপু:—'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি', শুভকার্য্যের অনেক বাধা। তোমার সার্ট খোল, কোমর বেঁধে লেগে পড়, গাড়ীর বন্দোবস্ত করা আর বরযাত্রীদের গুছিয়ে ষ্টেসনে নিয়ে যাওয়ার ভার তোমার উপর। নেপাল দাদা ভাঁড়ার ঘরের ভার নিয়েছেন, তরিতরকারী, মাছ, দই সবই প্রায় এসে পড়েছে, সকালে সকালে সকলকে খাইয়ে বিদেয় কর্ত্তে পাল্লে হয়, পারাপারের পথ, অনেক দূরও যেতে হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি যাবেন ত?"

"না, আমার আর যাওয়া হবে না। এদিগের সমস্ত কাজ বাকি, তা আমি না গেলেও চলবে, তোমারা-আছ, গ্রামের সকল ভদ্র লোকই যাচ্ছেন, বিশেষতঃ বসন্তের বড় মামা জগবন্ধু বরকর্ত্তা হয়ে যাবেন, কোন অসুবিধা হবে হবে না।"

বড় মামা মহাশয় অহিফেন নামক মহাদ্রব্য কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই সেবন করিয়া থাকেন। সংপ্রতি তিনি কিঞ্চিৎ কাঁচা অহিফেন সেবন করিয়া বিজড়িত নেত্রে তামকূট ধূমের মধুরতা আস্বাদন করিতে করিতে এই নশ্বর জগতের শ্রেষ্ঠ সুখ অনুভব করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিজয় বাবুর বচন-সুধা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি তাঁহার সুপক্ক লোমবহুল ভ্রুর নিম্নভাগে মগ্নপ্রায় রুদ্ধ নেত্রদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "অহং আমি বরকর্ত্তা হয়ে যাচ্চি, দেখে নেবে কি রকম হুঁসিয়ারিসে সকল কাজ শেষ করে আসি। বোসজার সেখানে যাওয়ার দরকার কি?"

আমি বলিলাম, "মামা, শুনেছি সে গণ্ডগ্রাম, সঙ্গে আফিঙ্ নিতে ভুলবেন না, কৌটা যদি ফেলে যান, তবে আপনার প্রাণ নিয়েই আমাদের শশব্যস্ত হয়ে পড়্তে হবে।"

মাতুল মহাশয় একটা সম্বন্ধ বিরুদ্ধ রসিকতা দ্বারা আমার সদুপদেশ উড়াইয়া দিলেন।

ভাবিলাম, বাড়ীর ভিতর আয়োজনটা কি রকম চলিতেছে একবার দেখিয়া আসি।—ধীরে ধীরে সিঁড়ির দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ছাঁচের নীচে দাঁড়াইতেই ছাদের উপর হইতে আমার মস্তকে এক ঘটী চুণ হলুদ গোলা জল বর্ষিত হইল। বিস্ময় ব্যাকুল চক্ষে ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, দুইখানি বলয়ালঙ্কৃত সুগোল হস্ত ত্বরায় অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার পর চারিদিক হইতে খল খল হাস্য, নব বস্ত্রের খস খস শব্দ, এবং অলঙ্কারের রুণু ঝুণু ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। কুটুম্বিনীগণে গৃহ পরিপূর্ণ, কিশোরী ও যুবতীগণের ফুল্লারবিন্দ তুল্য মুখ, সরোবরে পদ্ম সমূহের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। আমার লাঞ্ছনাকারিণী দূর সম্পর্কীয়া একটি শ্যালিকা, অনেকদিন পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি এই ভাবে অভিনন্দন করিলেন।

সকালে বর যাত্রিগণের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; বেলা দুইটার সময় সকলের আহারাদি শেষ হইল। প্রায় ২০ খানি গো-শকট পথে সারি দিয়া দাঁড়াইল, গাড়োয়ানেরা জোঁয়ালে গরু বাঁধিয়া গাড়ীতে তৈল দিয়া লইল। তার পর গাড়ীতে তোষক ও বালিশ পাতা হইলে, বরযাত্রিগণ পান চিবাইতে চিবাইতে গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন; কোন গাড়ীতে দুজন, কোন গাড়ীতে তিনজন বরযাত্রী; বরকর্ত্তা মাতুল মহাশয় স্বয়ং এক গাড়ী অধিকার করিয়া শয়ন করিলেন; হারাধন খানসামা ও নরহরি প্রামাণিক এক গাড়ীতে উঠিল; বরের বাক্স তাহাদের জিম্বা রহিল। বেলা প্রায় তিনটার সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল, স্থির হইল বর ও পুরোহিত সন্ধ্যার পর পাল্কীতে রওনা হইবেন।

বিশখানা গাড়ী রাজপথের ধূলি উড়াইতে উড়াইতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। বরযাত্রিগণ গাড়ীর মধ্যে শয়ন করিয়া পঞ্জরে বেদনা সঞ্চয় করিতে করিতে রেলোয়ে ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। রামনগর ষ্টেসনে গিয়া আমাদের ট্রেণে চাপিতে হইবে, রামনগর আমাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ, মধ্যে দুইটি পার।

পথের দুইধারে মাঠ, অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে দূরে দুই একটা অশ্বত্থ বট বা শিমুল গাছ। ঝাঁ ঝাঁ করিয়া রৌদ্র পড়িতেছে, কোন একটা গাছের পত্রান্তরাল হইতে তৃষিত চাতক 'ফটিক জল' শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছে, উদ্দাম বায়ুপ্রবাহে ধূলি-রাশি উড়িয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছে। রাখালেরা মাঠে গরুর পাল ছাড়িয়া দিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছে, তাহাদের নিকটে তাল পাতার ছাতি পড়িয়া আছে। কেহ কেহ আম পাড়িয়া লবণ মাখিয়া খাইতেছে, পল্লীস্থ নারীগণ অদূরবর্ত্তী বিল হইতে মৃৎকলসীতে জল লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছে। ক্রমে সূর্য্যের তেজ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, ভগবান্ মরীচিমালী পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িলেন, বৃক্ষের ছায়া প্রান্তর বক্ষে দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অপরাহ্ণে তরুর অন্তরালে বিহঙ্গ কূজন আরম্ভ হইল। আমরা সেই গরুর গাড়ীতে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম।

রামনগরের হাটে যখন আমরা পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। গাড়ীগুলি ভাল ছিল, তাই আমরা সাত ঘণ্টার মধ্যে দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলাম। এই হাটে আমাদের আহারাদির জন্য 'ভাঁড়ার' খোলা হইয়াছিল, প্রায় ষাট জন লোকের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্যাদি পাক করা ছিল। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া আহার কার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছি, এমন সময় অদূরে পাল্কী বাহক বেহারাগণের 'হিঁয়ো' 'হিঁয়ো' 'জোয়ান হিঁয়ো' ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। অবিলম্বে বরবেশধারী শ্রীমান্ বসন্ত কুমার রঙ্গভূমে উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত

মহাশয় পাল্কী হইতে অবতরণ করিযাই 'সন্ধ্যার' জন্য অস্থির হইয়া প'ড়িলেন, রাত্রি দশটা বাজে এখনও তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক অসমাপ্ত রহিয়াছে। বস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি সন্ধ্যাহ্নিকে নিযুক্ত হইলেন, আমরা ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। শুনিলাম আর এক কোয়ার্টারের মধ্যে ট্রেণ প্লাট্‌ফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মাতুল মহাশয় বরকর্ত্তা সাজিযা আসিয়াছেন। তিনি অতি সতর্ক ব্যক্তি, প্লাট্‌ফর্ম্মে দাঁড়াইয়া বরযাত্রির সংখ্যা গণনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বরযাত্রিগণ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন! মাতুলের ক্রোধ ক্রমে অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল। ভূদেব! তাঁহার সেই ক্রোধের পরিণত অবস্থায় তাহার প্রিয় বন্ধু ফকিরচাঁদ দত্ত মহাশয় তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মিত্তিরজা, একবার কৌটাটা বের করত ভাই।"—মাতুল ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হোমাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া, বলিলেন, "তোমার আক্কেলটা কি রকম দত্তজা, কৌটাটাতে ভরি দুই আফিং আছে কি নেই, তারই উপর তোমার নজর পড়ে রয়েছে, দিন রাতে আট প্রহরই যদি তোমার কৌটার আবশ্যক হয় ত খানিক নিয়ে এলেই পার্ত্তে, কেউত বারণ করে নি।"—অন্য সময় হইলে মিত্তির জা মহাশয় বন্ধুর এই বাক্‌পটুতা হয়ত ক্ষমা করিতেন, কিন্তু এখন তিনি বরযাত্রী, বরকর্ত্তা হইয়া বরযাত্রীকে অপমান করে, এমন বরকর্ত্তা পৃথিবীতে নাই। দত্তজা ক্রোধে তিনগুণ হইয়া বলিলেন, "আমি ফকির চাঁদ দত্ত, জনমেজয় দত্তের পুত্তুর, জনার্দ্দন দত্তের নাতি, আমাকে আধ আনার আফিংএর জন্যে কিনা অপমান করে বিজয় ঘোষের শালা—এ বিয়েতে যে বরযাত্রী যায় সে ত্রিজাতক।"—দত্ত মহাশয় ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। আমরা পাঁচ সাত জনে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলাম, কিন্তু দেখিলাম তাঁহার গায়ে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় অযুত হস্তীর বল। তবে সুবিধার কথা এই যে সত্যই তাঁহার গৃহ প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় ছিল না, ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় অহিফেন গ্রহণ করিবার ফন্দী তেই তিনি এই প্রকার কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি পরে আমাদের নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন।

যাহাহউক বরকর্ত্তা মাতুল ওরফে মিত্তিরজা মহাশয় অধিকাংশ বরযাত্রি কর্ত্তৃক তাঁহার এই অবিবেচনার কার্য্যের জন্য তিরস্কৃত হইয়া একেবারে শীতলতা প্রাপ্ত হইলেন, এবং দত্তজাকে ক্রোধ শান্তির অমোঘ ঔষধ বাহির করিবার নিমিত্ত তাঁহার জামার জেবে হাত পুরিয়া দিলেন। সহসা তাঁহার মুখভাব ফাঁসির আসামীর মুখের আকার ধারণ করিল। হতাশ ভাবে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ, আমার কৌটা।" জামার জেব হইতে হযত কৌটা পড়িয়া গিয়াছে ভাবিয়া তিনি যে পরিমাণে ব্যাকুল হইলেন, অন্যান্য বরযাত্রিগণ ঠিক সেই পরিমাণে আনন্দানুভব করিলেন, এমন কি বৃদ্ধ দত্তজা পর্য্যন্ত বলিলেন, "বেশ হয়েছে, ভগবান্ জব্দ করেছেন,আমাকে বঞ্চিত করার চেষ্টা!"—সহসা অদূরে সাঁ সাঁ শব্দ হইল। আমরা বুঝিলাম, ট্রেণ আসিতে আর বিলম্ব নাই, তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলাম, ছোট ষ্টেসন, গাড়ী দুই তিন মিনিটের অধিক সেখানে অপেক্ষা করে না। ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল, আমরা গাড়ীতে উঠিয়া একটা কামরা দখল করিয়া বসিলাম। ট্রেণে আমাদের জন্য সে কামরটা রিজার্ভ করা ছিল। গাড়ীতে উঠিয়া মিত্তিরজা ব্যাকুল ভাবে তাঁহার পকেট, কাপড়ের বোচ্‌কা, ব্যাগ্ প্রভৃতি অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। মুখে কিছু না বলিলেও বুঝিতে পারা গেল, তিনি তাঁহার 'সাত রাজার ধন' সেই আফিংয়ের কৌটা খুঁজিতেছেন। বিস্তর চেষ্টাতেও যখন তাহা মিলিল না, তখন তিনি অবসন্ন ভাবে একখানা বেঞ্চির উপর বসিযা পড়িলেন, এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দ্বাদশীর চন্দ্রালোকে নৈশ প্রকৃতি হাসিতেছিল। প্রান্তরের ভিতর দিয়া ট্রেণ ঝটিকা-বেগে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। বরযাত্রিগণ কেহ গান ধরিলেন, কেহ সিগারেট ধূম পান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধেরা এক স্থানে বসিয়া কবে কোথায় কোন্ বিবাহের বরযাত্রী হইয়া কন্যাযাত্রিগণকে কিরূপ ভাবে 'জব্দ' করিয়াছিলেন তাহারই গল্পে স্ব স্ব বুদ্ধি বাহুল্যের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ছোট ছোট ছেলেরা বেঞ্চির উপর শয়ন করিল। সহসা মিত্তিরজা 'পেয়েছি পেয়েছি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দত্তজা তিন বেঞ্চি লাফাইয়া তাঁহার সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইলেন ও আগ্রহের সঙ্গে বলিলেন, 'কৈ কোথায় পেলে ?"—"এই ট্যাকে, কৌটা ট্যাকে বেগে কোথায় না খুঁজেছি হে! বড় হায়রাণ হওয়া গেছে।"—তাঁহার কথা শুনিয়া অনেকে হাসিল। মিস্তিরজা এতই খুসী হইলেন যে, বিনা আপত্তিতে পাটনাই মটরের মত এক বড়ি অহিফেন অম্লানবদনে দস্তজার হস্তে সমর্পণ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে উভয়ের বিবাদের আপোষ হইয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি অনেকেরই নিদ্রা হইল না। পোড়াদহ ষ্টেসনে উত্তর বঙ্গ লাইনের এক 'গাধা ট্রেণ' অপেক্ষা করিতে ছিল, আমাদের গাড়ী খানা তাহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইল। শুনিলাম গোয়ালন্দ ও কলিকাতার দিক হইতে গাড়ী না আসা পর্য্যন্ত আমাদের সেখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহাই হইল। ঘণ্টা দুই সেখানে বিশ্রাম করিয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল। অতি প্রত্যূষে দামুকদিয়া ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে বীচি-বিক্ষোভ-চঞ্চলা পদ্মা খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, প্রভাত সূর্য্য কিরণে সৈকত ভূমি চিক্ চিক্ করিতেছে, এবং নানাজাতীয় নৌকা পাল ভরে দিগ-দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে, দূরে দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী লইয়া জেলেরা ইলিশ মাছ ধরিতেছে। আমরা ট্রেণ পরিত্যাগ করিতে না করিতে আই, জি, এস, এন্, কোম্পানীর সুবৃহৎ দোতলা ষ্টীমার "থ্রাস" হইতে সুগভীর বংশীধ্বনি হইল, বোধ হয় বাঁশী বলিতেছিল, 'ভয় নাই, আমি প্রস্তুত আছি।'

রৌদ্র প্রবল হইয়া উঠিল, একে বালিচর, তাহার উপর গৃহাভাব, সেই রৌদ্রে চড়ার উপর বসিয়া আমরা ষ্টীমারের শীতল বক্ষে বিশ্রাম লাভের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ষ্টীমার বক্ষ হইতে তখন রাশি রাশি গোচর্ম্ম নামিয়া রেলের গাড়ীর কক্ষ পূর্ণ করিতেছিল। অনেকে এই অবসরে স্নান করিয়া লইলেন, কেহ কেহ নির্ব্বিকার চিত্তে তামাক টানিয়া সন্তাপ দূর করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্টের মেল ষ্টীমার সাঁড়া ঘাট হইতে দার্জ্জিলিং রেলের আরোহী লইয়া ঘাটে আসিয়া থামিল। জলদ-গম্ভীর স্বরে পুনঃ পুনঃ 'আলি-গেটারের' কণ্ঠনাদ হইতে লাগিল। শত শত আরোহী ব্যস্ত-ভাবে ষ্টীমার ছাড়িয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিতে লাগিলেন। কুলিরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোট ও ডাকের ব্যাগ ঘাড়ে লইয়া ডাক্ গাড়ী পূর্ণ করিয়া ফেলিল। চারিদিকে উৎসাহ, উদ্দীপনা, ডাক, হাক্, সোর গোল—যেন কোন মহোৎসব ব্যাপারের কোলাহলে নদীতীর প্রতিধ্বনিত। ময়রারা নানারকম জল খাবার বড় বড় রেকাবে সাজাইয়া ক্ষুধাতুর যাত্রিগণের ক্ষুধার পরিমাণ সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল।

বরযাত্রিগণের ক্ষুধা সময়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। মিস্তিরজাকে বলা গেল, "জলযোগের কিছু আয়োজন করুন, ষ্টীমারে চারি পাচ ঘণ্টা থাকিতে হইবে, তখন কোথায় কি খাইতে পাওয়া যাইবে?"—রাত্রির গুরুতর আহারের পর প্রভাতেই আবার ক্ষুধার আতিশয্যের কথা শুনিয়া মিস্তিরজা কিছু রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "তোমরা বাপু ব্রহ্মাণ্ড হজম করিয়া ফেলিতে পার। এখানে দুদশ টাকার বেশীত আর গোল্লা রসগোল্লা পাওয়া যাবে না। ক্ষুধাটা একটু চন্ চনে কর, ষ্টীমার হইতে নামিয়াই অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত পাইবে।" মাতুল মহাশয়ের কার্পণ্য দর্শনে বরযাত্রিগণের অনেকে বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিল, কেহ কেহ প্রস্তাব করিল ত্রেতার কাল নিমে ও দ্বাপরের শকুনি বর্ত্তমান কলি যুগে মাতুলের অংশ অভিনয় করিবার জন্য বিজয় বাবুর শ্যালক রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে, অতএব তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া পদ্মাগর্ভে নিক্ষেপ করা হউক, তাহাতে দেশের বহু মঙ্গল সাধিত হইবে। মাতুল দেখিলেন, তাঁহার শত্রুর সংখ্যা যেরূপ অধিক তাহাতে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে; তিনি নিঃশব্দে সরিয়া পড়িলেন। বসন্তকুমার অবিলম্বে দশ টাকা বাহির করিয়া দিলে মহাসমারোহে নদী তীরে জলযোগ সুসম্পন্ন হইল। আমরা ষ্টীমারে গিয়া উঠিলাম, তখন বেলা আটটা।

কয়েকবার বংশীধ্বনি করিয়া ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। জলরাশি বিদীর্ণ করিয়া উভয় পার্শ্বের চরপ্রান্তে ফেনরাশি পুঞ্জীভূত করিয়া ষ্টীমার স্রোতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইল। উচ্চ চরের বহু নিম্নে নদীবক্ষ, স্থানে স্থানে বালুকা-ময় চর। সেই সকল চর ঘুরিয়া ষ্টীমার অতি সাবধানে চলিতে লাগিল। যেখানে জল অল্প সেখানে বংশখণ্ড প্রোথিত, তাহার মস্তকে তৃণগুচ্ছ আবদ্ধ। খালাসীরা ওজন দড়ি ফেলিয়া ষ্টীমারের মাথায় দাঁড়াইয়া বিকৃতকণ্ঠে সুর করিয়া হাকিতেছে "এক বাঁও মিলে না—দু বাঁও-মি-লে —এ-এ-না।"—ষ্টীমারের দুই পাশ দিয়া বড় বড় নৌকা অনুকূল স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া লক্ষ্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

সুবৃহৎ মুক্ত বিহঙ্গ-পক্ষের ন্যায় শুভ্রপাল, একটির উপর আর একটি, বায়ুভরে তাহা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। পালের দড়ি ধরিয়া মেড়ুয়াবাদী নৌ-চালকগণ নৌকার ছৈয়ের উপর পালের ছায়ায় বসিয়া আছে। অপর পারের সন্নিকটে দলে দলে মহিষ জলে দেহ নিমজ্জিত করিয়া গ্রীষ্মের উত্তাপ প্রশমিত করিতেছে।

কত গ্রাম অতিক্রম করিয়া ষ্টীমার চলিতে লাগিল। কত বৃক্ষচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে গ্রামবাসিনী রমণীগণ ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে স্নান করিতেছে—কত বালক বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ তীরে বসিয়া আঠাল মাটি দিয়া মাথা ঘসিতেছে কেহ বালি দিয়া কলস বা হাতের খাড়ু মাজিতেছে, কেহ বা ক্ষারসিক্ত কাপড় কাচিতেছে। নদীমাতা সকলকে সমান আদরে ও আগ্রহভরে বক্ষে গ্রহণ করিতেছেন তাহাদের দেহের সন্তাপ দূর করিতেছেন। কত পল্লীযুবক উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া সেই প্রসন্নসলিলার সলিলগর্ভে সাঁতার কাটিতেছে, কখন ডুবিতেছে, কখন ভাসিতেছে। একটি ছোট মেয়ে মুক্ত আর্দ্র কেশে তীরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "ও দাদা তোমার পায়ে পড়ি ফিরে এসো, অতদূর যেয়ো না, আমার ভয় করবে।"—

একটা ষ্টেসনে ষ্টীমার লাগিল। গোপাঙ্গনাগণ দধি, দুগ্ধ, ছানা ক্ষীর লইয়া ষ্টীমারের কাছে ভিঁড় করিয়া দাঁড়াইল। একজন ভিখারী দূরে দাঁড়াইয়া তাহার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া করুণস্বরে আরোহিগণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিল। সে অন্ধ। তাহার বামহস্তখানি অবলম্বন করিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার সরলতামাখা কাতর মুখখানি দেখিয়া অতি নির্দ্দয়ের হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয়। বোধ হয় সেই দৃষ্টিহীন অনাথের অন্ধনেত্রের পরিবর্ত্তে ভগবান্ তাহাকে এই সুকুমারী বালিকাটিকে প্রদান করিয়াছেন। প্রিয়বন্ধু বসন্তকুমার অন্ধের সহিত সমবেদনা প্রকাশপূর্ব্বক তাহার হস্তে একটি টাকা প্রদান করিলেন। এমন দান বোধ করি, সে জীবনে কখন লাভ করে নাই। সে উভয় হস্ত মিলিত করিয়া বলিল, "রাজা বাবু, তুমি চিরজীবী হও।"—কৃতজ্ঞতাভরে তাহার অন্ধনেত্র হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

বেলা ২ টার সময় আমরা 'চারঘাট' ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে তিন মাইল দূরে আমাদের গম্যস্থান। বসন্তকুমারের ভাবী শ্বশুর মহাশয় ধনাঢ্য ব্যক্তি, সেই অঞ্চলের কোন নীলকরের নায়েব। দেখিলাম দুইটী হস্তী ও কয়েকখানি পাল্কী নদীর ধারে প্রতীক্ষা করিতেছে। বর, পুরোহিত ও কয়েকজন বরযাত্রী পাল্কীতে চড়িলেন, মিত্তিরজার পাল্কীর উপর লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সংখ্যাল্পতা বশতঃ তিনি স্বয়ং বরকর্ত্তা বলিয়া চক্ষুলজ্জার খাতিরে আর পাল্কী চড়িলেন না, একটী হাতীতে চড়িলেন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত দত্ত মশাইও সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। হস্তীতে আরোহণ করিয়া দত্তজার মনে বড় স্ফূর্ত্তির উদয় হইল, তিনি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। মিত্তিরজা বলিলেন, "দত্তজা তোমার ঐ বিলাতি তামাক একটু দাওত, বড় তামাকের পিপাসা হয়েছে।" দত্ত মহাশয় একটা সিগারেট ও দেশলাই বাক্স মিত্তিরজার হস্তে অর্পণ করিলেন, মিত্তিরজা মুখে সিগারেটটী গুঁজিয়া দুইহাতে দেশলাই ধরাইলেন, ইতিমধ্যে দত্তজার ইঙ্গিতে মাহুত হাতি উঠাইল, মিত্তিরজা গদীর উপর হইতে একেবারে "পপাত ধরণীতলে"—মিত্তিরজার আর্ত্তনাদে বরযাত্রিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পাঁচ সাতজনে মিলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল। মিত্তিরজা প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি হস্তী পৃষ্ঠে আর দ্বিতীয় বার আরোহণ করিবেন না। অগত্যা অনেক কষ্টে একখানি পাল্কী খালি করিয়া তাঁহাকে তাহার মধ্যে পুরিয়া চৌধুরী (কনের পিতা) মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রেরণ করা হইল। আমরা দশ বার জন পদব্রজে মাঠ ভাঙ্গিয়া, ছোট ছোট জলা ও বিল পার হইয়া লক্ষ্য স্থানে চলিলাম।

চৌধুরী মহাশয়ের গৃহ হইতে রসি দুই দূরে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমাদের স্নানাহার ও বিশ্রামের সকল আয়োজনই বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া মিত্তিরজা এমনই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, সকল বিষয়েই তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং এবং তাঁহার আত্মীয়গণ বিধিমতে বরকর্ত্তার ক্রোধোপশমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফল হইল না। অবশেষে দত্তজা গোপনে চৌধুরী মহাশয়কে বরকর্ত্তা মিত্তিরজার ক্রোধ দূরীকরণের ঔষধের কথা জ্ঞাত করিলেন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে প্রায়

পাঁচ ভরি অহিফেন মিত্তিরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিত্তিরজা সেই মুহূর্ত্ত হইতে চৌধুরী মহাশয়ের ক্রীতদাস হইয়া পড়িলেন। শেষে এমন হইল যে, তিনি বরযাত্রিগণের অসুবিধার প্রতি পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিতে রাজী হইলেন না।

সন্ধ্যার পর বাসাবাটী হইতে মহাসমারোহে বর কন্যাকর্ত্তার গৃহে নীত হইলেন, বরযাত্রিগণ পদব্রজে বরের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এক প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপের নীচে সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, শ্রীমান বসন্তকুমার পাল্কী হইতে নামিয়া টোপর মাথায় দিয়া হস্তে দর্পণ লইয়া এক মখমলের শয্যায় উপবেশন করিলেন। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ দুই পাশে ও সম্মুখে বসিলে রীতিমত পান তামাক চলিতে লাগিল, অভ্যাগত ব্যক্তিগণের মস্তকে গোলাপ জল বর্ষিত হইতে লাগিল। মেয়ের পিতা কুঠির দেওয়ান, সুতরাং কুঠির বহু সংখ্যক আমলা সভাস্থলের শোভা বর্দ্ধন করিয়া বসিলেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেরা আসিয়া আমাদের সঙ্গী ছেলেদের সঙ্গে বিদ্যা ঘটিত নানা তর্ক আরম্ভ করিল, নানা প্রকার মৌখিক অঙ্ক, হিঁয়ালী ও ফাঁকি সিদ্ধান্তের বিচার চলিতে লাগিল, শেষে হাতাহাতির উপক্রম হইল। এমন সময় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "লগ্ন উপস্থিত, সভাস্থ সকলের অনুমতি হইলে কন্যা পাত্রস্থ করি।"—কিন্তু সভাস্থ ব্যক্তিগণ অনুমতি দান করিলেন না। গ্রাম্য বারোইয়ারির পাণ্ডারা বারোইয়ারি পূজার জন্য পঞ্চাশ টাকা চাঁদার দাবি করিয়া বসিলেন। গ্রাম্য বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ লম্বা চাঁদার ফর্দ্দ বাহির করিলেন, হরি সভার দল আসিয়া চাঁদা প্রার্থনা করিলেন। মিত্তিরজা প্রথমে কিছুই 'দিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন, শেষে বাধ্য হইয়া কিছু কিছু চাঁদা দিয়া সকলকে শান্ত করিলেন। বর সভাস্থল হইতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইল, অন্দর মহলে স্ত্রী আচারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেখানে বরযাত্রিগণের প্রবেশ নিষেধ, পাছে সেখানে কোন বরযাত্রী প্রবেশ করে, এজন্য কয়েকজন কন্যাযাত্রী ও দ্বারবান যষ্টিহস্তে দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। আমরা বসিয়া ঘন ঘন হুলুধ্বনি শুনিতে লাগিলাম। অদূরে রসুনচৌকী বাজিয়া বিবাহ উৎসব জ্ঞাপন করিতে লাগিল, আকাশে বসিয়া শশধর এই মধুর মিলন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমাদের সঙ্গে কয়েকজন হিন্দুস্থানী প্রহরী গিয়াছিল, তাহাদের প্রতি কন্যাকর্ত্তা কিম্বা তাঁহার দলস্থ লোক কিছু মাত্র যত্ন প্রকাশ করেন নাই, তাহারা সন্ধ্যাকাল হইতে এক ঘটী পানীয় জল চাহিয়া পায় নাই, অধিকন্তু দুই একটা অপমানের কথা শুনিয়াছিল, তাহারা অপমানিত হইয়া কোন কোন বরযাত্রীর কাছে নালিশ রুজু করিয়া বলিল, দেওয়ানজীর বাড়ীতে আর তাহারা ক্ষণ মাত্রও থাকিবে না, রাগ করিয়া তাহারা বাসায় চলিয়া গেল। বরযাত্রিগণ তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিবাহ সভা পরিত্যাগ করিলেন। মিত্তিরজা তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বৃথা হইল। সকলেই বলিলেন "আপনি বরের মামা, বৈবাহিক গৃহে লুচি মণ্ডা, আফিং গুলি ভক্ষণ করুন, আমরা অপমান সহ্য করিয়া এখানে থাকিতে পারিব না, পেটের দায়ে ত আর আমরা আসি নাই।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া মাতুলমহাশয় বরকর্ত্তাকে সংবাদ দিলেন। বরকর্ত্তা চৌধুরী মহাশয় কন্যাদান করিতে বসিয়াছিলেন, তিনি পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সেই অবস্থাতেই বাহিরে আসিয়া দেখিলেন কেহই তাঁহার গৃহে নাই, সকলেই রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি মহাব্যস্ত ভাবে আমাদের বাসা বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁর পরিবারস্থ অনেকে আসিয়াই বরযাত্রিগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বরযাত্রিগণ তখন দুর্ব্বাসার ন্যায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কাহারও কথা তাঁহারা গ্রাহ্য করিলেন না। অগত্যা সকলকে বিফল মনোরথে চলিয়া যাইতে হইল। বরযাত্রিগণ অনাহারে শয়ন করিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নব জামাতা আমাদের প্রিয়বন্ধু বসন্তকুমারকে লইয়া পুনর্ব্বার বরযাত্রগণের সম্মুখীন হইলেন। বসন্ত সকলকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন, তাঁহার শ্বশুরকে ক্ষমা করিতে বলিলেন, কিন্তু তখন তিনি সদলচ্যুত, শ্বশুরের লোক, তাঁহার কথা গ্রাহ্য করে কে?—অবশেষে উপায়ন্তর না দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় বরযাত্রিগণের পদ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন বরযাত্রী মহোদয়গণের মনে কিঞ্চিৎ অনুকম্পার সঞ্চার হইল, তাহারা বলিলেন যদি দারোয়ানেরা

তাঁহাকে মার্জ্জনা করে তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহার গৃহে ভোজন করিবেন।—দারোয়ানেরা সহজেই তাহাদের ক্ষোভ পরিত্যাগ করিল, তখন সকলে গিয়া আহারে বসিলেন।

আহারান্তে আমরা আবার বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। কোন কোন বরযাত্রী গৃহে শয়নের স্থান না পাইয়া বারান্দায় আসিয়া শয়ন করিলেন, কেহ বা নিকটস্থ কুটম্ব গৃহে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাত্রি অধিক ছিল না, সুনিদ্রা হইবার পূর্ব্বেই রাত্রি শেষ হইয়া গেল। অতি প্রত্যুষে বরযাত্রীরা দেখিলেন তাঁহাদের জামা কাপড় চাদর সমস্ত হরিদ্রা রঙ্গে রঞ্জিত। শীঘ্রই সকলে ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন, রাত্রে কন্যাযাত্রী মহাশয়েরা যে অজস্র গোলাপ জল বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা হরিদ্রারঞ্জিত ছিল রাত্রে হরিদ্রার বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই, প্রভাতে যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে কন্যাযাত্রিগণ কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। কিন্তু তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ক্রোধ প্রকাশ নিষ্ফল, সুতরাং মনের আক্রোশে তাঁহারা বিছানা ছিঁড়িয়া, বালিসের তুলা বাহির করিয়া, হুকাগুলি ভাঙ্গিয়া, ঘর অপরিষ্কার করিয়া, দলে দলে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কন্যাপক্ষের একজন লোকও বলিল না—"মশায় এ বেলাটা থাকুন।" বরযাত্রিগণের আক্রোশে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইল না, কারণ তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রভাতে যখন শানাই নূতন করিয়া মধুর রাগিণীতে হৃদয়ের আনন্দ গাথা ব্যক্ত করিতে লাগিল, এবং গ্রামস্থ নরনারীগণ কৌতুকপূর্ণ অন্তরে বর দেখিতে চৌধুরী বাড়ীর দিকে ছুটিল, তখন আমরা গৃহহীন আশ্রয়হীন ভাবে ক্ষুব্ধ চিত্তে মেঠোপথ অতিক্রম পূর্ব্বক "পিতার কুপুত্র যে, বরযাত্রী হয় সে" এই গ্রাম্য প্রবচনটির সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে করিতে আমাদের গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছিলাম। আমাদের সমস্ত আক্রোশ মিত্তিরজার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু হায়, তিনিও তখন আমাদের মধ্যে ছিলেন না। বৈবাহিক গৃহে দান সামগ্রীর ফর্দ্দ মিলাইতেছিলেন। যাহা হউক, এই ঘটনার পর মিত্তিরজাকে গৃহে আসিয়া যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা জন্মিয়াছে, তিনি আর জীবনে কখন বরকর্ত্তার গুরুভার গ্রহণ করিবেন না, এমন কি দশ ভরি অহিফেন উৎকোচ পাইলেও না।

প্লেগাসুর।

নামাবলী, লীলাভূমি ও গতিবিধি।

যাহার উপদ্রবে শ্রীনিবাস বোম্বাই শ্মশানে পরিণত এবং রাজধানী কলিকাতা বিলাপ ধ্বনিতে পরিপূরিত, সমগ্র সভ্যজগৎ যাহার অঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পরাঙ্মুখ প্রায় হইয়া নৈরাশ্য সাগরে নিমজ্জিত, এবং আমাদের সভ্য প্রধান গবর্ণমেণ্ট যাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় মধ্যপথে অবস্থিত, পর্ণকুটীরবাসিনী কাঙ্গালিনী মৃত্যুমুখী একমাত্র পুত্রের জন্য আর্ত্তনাদ করিয়া যাহার চিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিতে অসমর্থ, এবং অট্টালিকাবাসী ধনাভিমানী অজস্র অর্থব্যয় করিয়াও প্রিয়পুত্রকে যাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারিয়া ধূলায় বিলুণ্ঠিত, তাহার নাম ও ধাম, গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপ জানিতে কাহার না আগ্রহ হয়? এই দৈত্যের,

ডাক নাম

প্লেগ্। বিলাতের প্লেগ্ এবং ভারতের জনপদোদ্ধংসন এই উভয়ের শব্দার্থ এক, কিন্তু ভাবার্থ এক কি না তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। প্লেগ্ বলিতে এখন বিউবনিক প্লেগ্ (১) বুঝায়। কিন্তু ইউরোপীয় চিকিৎসকেরাও বহুকাল পর্য্যন্ত প্লেগের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করেন নাই; বরং সকল সময়েই যে বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হয় তাহা নহে। এই জন্য জনপদোদ্ধংসন যে আধুনিক প্লেগ্ নয় এ কথা কেহ নিশ্চয় বলিতে পারেন না, বরং প্লেগ্ বলিয়াই অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে। (২) জনপদোদ্ধংসনের লক্ষণ ও ক্রিয়াদির এইরূপ আভাস পাওয়া যায়:—

"প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈর্মনুষ্যাণাং
যেঽন্যে ভাবাঃ সামান্যাস্তদ্বৈগুণ্যাৎ
সমানকালাঃ সমান লিঙ্গাশ্চ
ব্যাধয়োঽভিনির্বর্ত্তমানা জনপদ
মুদ্ধংসয়ন্তি।* তদ্যথা:—বায়ুরুদকং
দেশঃ কাল ইতি।" চরকসংহিতা,
বিমানস্থান, তৃতীয় অধ্যায়।

অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন মনুষ্যগণের যে সাধারণ ভাব, তাহার বৈগুণ্যহেতু এক সময়ে এক লক্ষণাক্রান্ত ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া জনপদ উৎসন্ন করে। সেই সকল সাধারণ ভাব এই; যথা, বায়ু, জল, দেশ ও কাল।

ভূমির বৈগুণ্য বশতঃ যে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গও রোগাক্রান্ত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়;—

"সরীসৃপ ব্যালমশক শলভ মক্ষিকা মূষকোলুক শ্মশানিক শকুনি জম্বুকাদিভি + ×"—চরকসংহিতা, বিমানস্থান ৩য় অধ্যায়।

অর্থাৎ, সরীসৃপ, সাপ, মশা, পতঙ্গ, মাছি, ইঁদুর, পেঁচা, শ্মশানবাসী শকুনি, শিয়াল প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হয়।—সেকালেও তবে ইঁদুরের উপর রোগের আক্রোশ ছিল।

(*) রোগটা এক প্রকার সাংঘাতিক জ্বর বলিয়াই বোধ হয়।

---

(১) Bubonic Plague.

(২) চরক, বিমানস্থান, ৩য় অধ্যায়।

জনপদোদ্ধংসন অধ্যায়ে অকালমৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া চরক রক্তাতিসার ভ্রম প্রলাপ যুক্ত জ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। চরক রোগ দেখেন নাই বলিয়া বোধ হয়; দেখিয়া থাকিলে তাঁহার মতন বিচক্ষণ লোক লক্ষণগুলির তন্ন তন্ন বিচার করিতেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ মারীর প্রকোপ হইয়াছিল; চরক প্রাকৃতিক লক্ষণ দেখিয়াই ভবিষ্যতে মারীর আশঙ্কা করিয়াছিলেন। বর্ণনা পড়িয়া সংক্রামক বলিয়া বোধ হয়। সুশ্রুত পাঁচ প্রকার সংক্রামক রোগের উল্লেখ করিয়াছেন:—

কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥
সুশ্রুত।

অর্থাৎ কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ ও ঔপসর্গিক রোগ (পাপজাত এবং ভূতোপসর্গজাত রোগ), এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়।

কুষ্ঠ, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ রোগ ও ঔপসর্গিক রোগ কখনও মারীর আকার ধারণ করে না। সুতরাং জনপদোদ্ধংসন সংক্রামক জ্বর বলিয়াই অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ। সুশ্রুতে মসূরিকা নাম দিয়া বসন্ত রোগের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে যে বহুলোকের প্রাণ নাশ হইত তাহা বোধ হয় না, কারণ বসন্ত ক্ষুদ্র রোগের মধ্যে গণ্য। এদিকে চরক বলিতেছেন সাপ, ইঁদুর, মশা, মাছি প্রভৃতি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, কিন্তু মানুষ, গরু ও ঘোড়া ছাড়া অন্য প্রাণীর বসন্ত হয় বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং জনপদোদ্ধংসন রোগ প্লেগ বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে।

(৩) রোগের লীলা-ভূমির বিষয় আলোচনা করিলেও জনপদোদ্ধংসন প্লেগ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। চরক বলেন পঞ্চাল দেশের রাজধানী কাম্পিল্য নগরে আত্রেয় গ্রীষ্মকালে গঙ্গাতীরে অগ্নিবেশকে জনপদোদ্ধংসনের কথা বলেন। রোহিলখণ্ড ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশকে পূরাকালে পঞ্চাল বলিত। আধুনিক কেদারনাথ উত্তর পঞ্চালের একটী নগর। কেদারনাথে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে মহামারী প্রবল ছিল তাহা প্লেগ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি, কেহ কেহ অনুমান করেন, এই মহামারী হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে এবং তিব্বত হইতে চীনদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে।(১)

চীনদেশে ইহার নাম ইয়াং যু পিং। (২) চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইহাকে ব্ল্যাক্ ডেথ বলিত। (৩) ষষ্ঠ শতাব্দীতে জস্টিনিয়ানের রাজত্বকালে ইউরোপে প্লেগের ভয়ানক উপদ্রব হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম জস্টিনিয়ান্ প্লেগ্। (৪) ইতালীয় গ্রন্থে ইহার নাম পেস্টিস্ ইঙ্গুইনেরিয়া (৫) বা কুঁচকিগত মারী। আফ্রিকা অঞ্চলের কৌম্পলি (৬) ও রবওঙ্গা (৭) লিভ্যাণ্ট্ উপকূলের লিভ্যাণ্টাইন প্লেগ্; (৮) এবং মাড়ওয়ার অঞ্চলের পালি প্লেগ্ (৯) একই পদার্থ। এতদ্ভিন্ন ইহার নাম ওরিএণ্টেল্ বা প্রাচ্য প্লেগ, (১০) এবং বিউবনিক টাইফাস্ (১১)। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। এখন দেখা যাউক, ইহার

ধাম

কোথায়। ইনি মর্ত্তালোকের প্রায় সর্ব্বত্রই বাস করেন। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহার নিবাস সিরিয়ায় ছিল। ইবেনেজার যুদ্ধে (১২) ফিলিস্তাইনগণ ইজ্রায়েল্‌বাসিদিগকে পরাজয় করিয়া প্লেগের হস্তে পতিত হইয়াছিল। প্লেগের ও ইঁদুরের অত্যাচারে যখন গ্রাম ও নগর উৎসন্ন হইতে লাগিল, ফিলিস্তাইনেরা ইঁদুরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবপ্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইজিপ্সাসের ডাক্তার কফাসের মতে খৃষ্টজন্মের তিন শতাব্দী কি তাহার পূর্ব্বে প্লেগ লিবিয়া মিশর ও সিরিয়ায় অধিকার স্থাপন করে। তখনও ইহার দৃষ্টি ইউরোপের উপর পতিত হয় নাই। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে জস্টিনিয়ান প্লেগ মিশর দেশ হইতে ইউরোপের দিকে ধীর পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া তুরস্ক ফ্রান্স ও ইতালী জনশূন্য করিল। তদবধি ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত ইউরোপই ইহার বিশেষ লীলা ভূমি। মধ্যে মধ্যে আফ্রিকা ও চীন পারস্য ও আরব ইহার দরুণ সশঙ্কিত হইয়াছিল। ১৮৯৪ সালে হংকং হইতেই ইহার বিক্রম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং অধিকার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল।

সাহেবদিগের এই ধারণা ছিল যে প্লেগ সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পারে আসিতে পারে নাই। জনপদোদ্ধংসন যদি প্লেগ হয়, তাহা হইলে অতি পুরাকালেও যে ভারতে ইহার প্রকোপ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজ অঞ্চলের দেবীপুরাণে নাকি প্লেগের কথা আছে এবং তাহাতে এই উপদেশ আছে, যে যখনই যেখানে ইঁদুরের মড়ক দেখিবে তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। কেহ কেহ অনুমান করেন এই গ্রন্থ ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। অনুমান সত্য হইলে একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে প্লেগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারতে প্লেগের বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। যে মহম্মদ টগলক চীন ও পারস্য জয় অভিলাষে বহু অর্থ নষ্ট করিয়া অর্থশূন্য রাজকোষ পূর্ণ করিবার জন্য প্রজা-রক্ত শোষণ করিয়াছিল এবং করভয়ে পলাতক প্রজাদিগকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় হত্যা করিয়াছিল, তাহারই রাজত্বকালে (১৩৩৪) এই ভীষণ শত্রু ভারতে প্রবেশ করে। আবার সেই ভয়ঙ্কর নরপিশাচ টাইমুর যে সময় দিল্লীর পথে পাঁচ দিন ধরিয়া নর শোণিতের নদী প্রবাহিত করিল এবং গলিত মৃতদেহের উপর মৃতদেহ পুঞ্জীকৃত করিতে লাগিল, সেই সময় (১৩৯৯) অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে প্লেগ প্রাদুর্ভূত হইয়া দেশ ছারখার করিয়াছিল। টাইমুর মধ্য আসিয়া হইতে আসিয়াছিল, তাই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, চীন দেশজাত ব্ল্যাক্ ডেথ এবং দিল্লীর প্লেগ একই পদার্থ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দিল্লীতে প্লেগ ছিল। এই শতাব্দীর শেষভাগে যখন সিরিয়া ও পারস্যে প্লেগের প্রাদুর্ভাব, সেই সময় সুরাট বন্দরে (১৬৮৪ সালে) ও বোম্বাই নগরে (১৬৮৯ সালে) ইহার লীলার প্রথম অভিনয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে যে সময় লিভ্যাণ্ট, আশিয়া মাইনার, আর্মেনিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় ইহার আধিপত্য, সেই সময় (১৮১২) কচ্ছ, কাটিবর, গুর্জ্জর এবং সিন্ধু দেশে তিন বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষের পর ইহার ভীষণ দৌরাত্ম্য। কমায়ুনের অন্তর্গত গাড়োয়াল প্রদেশে ১৮২৩ সাল হইতে অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার রাজত্ব। ১৮২৮—২৯ সালে দিল্লী ও রোহিলখণ্ড এবং ১৮৩৬ সালে মাড়োয়ারের অন্তর্গত পালি এবং রাজপুতানার অন্যান্য স্থানে ইহার ভীষণ পরাক্রম। এই সময়ে ইহার পূর্ব্বনিবাস লিভ্যাণ্ট অঞ্চলে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব।

১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত চীনদেশ প্লেগের আবাস ছিল। কিন্তু ১৮৯৪ সালে হংকং নগরে যখন ইহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, তদবধি সমস্ত পৃথিবী ইহার ভয়ে কম্পিত। তাহার দুই বৎসর পর হইতে ভারতবর্ষ অধিকার জন্য ইহার বিশেষ চেষ্টা। এখনও মনে আছে, ১৮৯৬ সালের অক্টোবর মাসের সেই গভীর রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া এক জন দূত আসিয়া ডাক্তার (এখন অধ্যাপক) সিমসনের আহ্বান পত্র দিয়া গেল। তদনুসারে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম প্লেগ কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছে, এবং আমাদিগকে অতি সন্তর্পণে নগর রক্ষা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট

১ Dr. Michoud. ২ Yang-tzu-ping. ৩ Black Death. ৪ Justinian Plague. ৫ Pestis Inguinaria. ৬ Kaumpuli. ৭ Rubwunga. ৮ Levantine Plague. ৯ Pali Plague. ১০ Oriental Plague. ১১ Bubonic Typhus. ১২ Battle of Ebenezer.

ও জনসাধারণ তখন ডাক্তার সিম্‌সনের কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন না; সংবাদ পত্রিকায় "সিম্‌সোনিয়ান্ প্লেগ" লইয়া উপহাস চলিতে লাগিল। কিন্তু রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের সেই "সিম্‌সোনিয়ান্ প্লেগ" অদ্য নিঃসন্দেহে প্রকৃত প্লেগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত এবং এ বিষয় লইয়া কোন আন্দোলনই হইত না। নূতন মিউনিসিপাল আইন সম্বন্ধায় প্রশ্নের উত্তরে লর্ড হ্যামিলটন বলিয়াছিলেন যে, ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিয়াছিল। রোগিদের দেহ হইতে বীজ লইয়া ডাক্তার সিমসন প্লেগ-বীজ আবিষ্কারক কিটাস্থাটোর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিটাস্থাটো ইহা প্লেগ বীজ বলিয়াই স্বীকার করেন। ডাক্তার সিমসনের মতে ৮৯৫ সালে কেল্লায় প্রথম মৃদু প্লেগ হয়। যাহা হউক, সেই সময় হইতেই যে কলিকাতা নগরী প্লেগের লীলাভূমি এবং "সিম-সোনিয়ান প্লেগই" যে অদ্যকার কলিকাতা প্লেগের সূচনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন বোম্বাই, সুরাট, পুনা, মান্দ্রাজ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতি নানা স্থানে ইহার প্রকোপ। সে দিকে হংকং এ ইহার রণভেরী আবার বাজিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত প্লেগতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক সিমসন প্লেগের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ইনি কখন কোন দেশের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং ইহার

গতিবিধি

নিরাকরণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। মিশরে ইঁহার, প্রথম আবির্ভাব খ্রীষ্ট জন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে। দ্বিতীয় বার ৮০০ বৎসর পর ষষ্ঠ শতাব্দীতে, তৃতীয় বার ৮০০ বৎসর পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, চতুর্থবার ২৫০ বৎসর পর সপ্তদশ শতাব্দীতে, পঞ্চমবার প্রায় ২০০ বৎসর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে, ষষ্ঠ বার ১২ বৎসর পর ১৮১২ সালে, সপ্তমবার ২ বৎসর পর, অষ্টমবার ১৪ বৎসর পর, নবমবার ৫ বৎসর পর। শেষ বার ১২ বৎসর রাজত্বের পর ১৮৪৫ সালে অন্তর্দ্ধান। লণ্ডনে প্রথম প্রাদুর্ভাব ১৩৪৮ সালের শেষে, তৎপরে দ্বিতীয় বার ১৫০ বৎসর পর। তৃতীয় বার ৩৭ বৎসর পর, ৮, ১৫, ১৬, ০, ৭, ৪, ২২, ১১, ১০, এবং ১৭ বৎসর অন্তর সর্ব্বশুদ্ধ ১৩ বার ইঁহার ভয়ে লণ্ডন কম্পিত। অনেকে মনে করেন অগ্নির ভয়ে ইনি লণ্ডন ছাড়িয়া পলায়ন করেন, কিন্তু তিনি তেমন পাত্রই নন; অগ্নি কাণ্ডের পরেও ১৩ বৎসর (১৬৭৯ পর্য্যন্ত) তথায় ছিলেন।

বোম্বাই সহরে প্রথম বার ইহার ভোগ ১৩ বৎসর ছিল; এবার ১৯৪ বৎসর পর ইঁহার পুনরাবির্ভাব; তিরোধান কবে তাহা কে বলিতে পারে? কমায়ুনে প্রথম প্রকোপ ১৮২৩ সালের দ্বিতীয় বার ১১ বৎসর পরে, তৃতীয় বার ১৩ বৎসর পরে, চতুর্থ বার ২ বৎসর পরে এবং পঞ্চম বার ২২ বৎসর পরে। ১৮৭৭ সালের ইঁহার পাঞ্চাললীলার শেষ অভিনয়।

গমনাগমন সম্বন্ধে যখন ইহার এই প্রকার খামখেয়ালি, তখন বহুকাল অব্যাহতি পাইয়াও কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না এবং কতকাল কোথায় বাস করিবেন তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কলিকাতায় ত অহেতুকী ভক্তিবাদী শ্রীচৈতন্যের শিষ্যবৃন্দ ভয়-ভক্তি-বিজড়িত স্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে কতবার নগর প্রদক্ষিণ করিলেন, তথাপি ইঁহার দয়ার উদ্রেক হইল না; এখন দেখা যাউক বিংশ শতাব্দীর মহিলাকুলের উলুধ্বনি মিশ্রিত শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যে ইহার ক্রোধের কতদূর শান্তি হয়।*

কালাকাল

সম্বন্ধেও কোন বিচার নাই। মিশরে প্রায়ই সেপ্টেম্বর মাসে আগমন এবং জুন মাসে গমন। শীতপ্রধান দেশে বসন্ত কালে আগমন, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকোপ এবং শীতকালে গমন। চীন দেশে মে মাসে আগমন, জুন মাসে প্রকোপ এবং সেপ্টেম্বরে অন্তর্দ্ধান। বোম্বাই সহরে ১৮৯৬ সালে অক্টোবর মাসে আগমন, শীতকালে প্রকোপ এবং এপ্রিলের শেষে অন্তর্দ্ধান। পর বৎসর নবেম্বরের শেষে আগমন, গ্রীষ্মারম্ভে প্রকোপ এবং জুনে অন্তর্দ্ধান; তৃতীয় বৎসরে ডিসেম্বরে আগমন, গ্রীষ্মাতিশয্যে প্রকোপ এবং জুলাই মাসে অন্তর্দ্ধান। কলিকাতায় প্রথম বার গ্রীষ্মারম্ভে প্রকোপ এবং জুনে অন্তর্দ্ধান। এবার বসন্ত কালে প্রকোপ এবং গ্রীষ্মাতিশয্যে অন্তর্দ্ধান। পুনায় বর্ষাকালে এবং দাক্ষিণাত্যে বর্ষাশেষে ও শীতারম্ভে ইঁহার প্রকোপ। সুতরাং ইনি শীতাতপ সহিষ্ণু মহাযোগী। ইঁহার স্থানাস্থান ভেদ নাই। নাইল, ইউফ্রেটিস্ ও ইয়াংসীর তীরস্থ নিম্ন জলাভূমিতেও ইনি আনন্দে বিচরণ করেন এবং সমুদ্র হইতে ৬০০০ ফুট উর্দ্ধে কমায়ুন এবং কুর্দ্দিস্থানেও অবলীলাক্রমে আরোহণ করেন।

পাত্রাপাত্রভেদ

আছে বলিয়া বোধ হয়। ময়লা পরিপূর্ণ পর্ণকুটীরের অর্দ্ধভুক্ত দরিদ্রের সঙ্গে ইঁহার বিশেষ সখ্য। ইংরাজ পণ্ডিতেরা বলেন, যেখানে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ সেখানেই ইঁহার আধিপত্য। তবে আর ভারতের আশা কি? লণ্ডনে দরিদ্রদিগকেই ইনি বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন, তবে রোগী সংসৃষ্ট ডাক্তার, পাদ্রী, এবং রাজকর্ম্মচারী অবস্থাপন্ন হইলেও সেই কৃপায় বঞ্চিত হন নাই। ইঁহার

বাহন

অনেক। কখনও সিদ্ধিদাতা গণেশের ন্যায় মূষিক বাহনে গৃহে গৃহে পল্লিতে পল্লিতে বিচরণ করেন, কখনও বা নরস্কন্ধে আরোহণ করিয়া কি রোগী স্পৃষ্ট বস্ত্রাদি অবলম্বন করিয়া দেশদেশান্তরে গমনাগমন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চীনদেশে যখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব, সেই সময় নাকি ইঁদুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত এবং রক্ত বমন করিতে করিতে পড়িয়া মরিয়া যাইত। চীন গ্রন্থকারেরা বলেন ইঁদুরের মৃতদেহ হইতে বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হইয়া নরদেহ আক্রমণ করিত। সেই সময়ে তথাকার প্রসিদ্ধ কবি টন-জুয়ান্ ইঁদুরের মৃত্যু উপলক্ষে একটী সুন্দর কবিতা রচনা করেন। তাহার নাম "ছুছুন্দরী কাব্য" রাখা হইয়াছিল কিনা তাহা জানিনা। তবে ঐ ইঁদুর মড়ক জনিত রোগেই যে তাঁহার মৃত্যু হয় চীন গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে। ডাক্তার সিম্‌সন্ যে সময় কলি-কাতায় প্লেগের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করেন, সেই সময় বড় বাজার অঞ্চলে চাউল গম ও ছোলার গুদামে অনেক রুগ্ন ইঁদুর দেখা যাইত। ইহাদের লোমহীন শরীর, অস্বাভাবিক ঘোলা ঘোলা চক্ষু এবং সলম্ফ গতি দেখিয়া দোকানিদের পোষ বিড়াল তাহাদের নিকট অগ্রসর হইত না। হংকং প্লেগের সময়ও ইঁদুরের মড়ক হইয়াছে। সুতরাং ইঁদুরই যে প্লেগাসুরের প্রধান বাহন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্লেগাক্রান্ত স্থানের লোক অন্য স্থানে যাইবামাত্র কিম্বা এক স্থানের প্লেগ রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্য অন্য স্থানে নীত হইবার পর যে সেই সব স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। এই সমস্ত প্রণালীতে যে রোগ সংক্রামিত হয়, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; এমন কি এ বিষয় লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে যে ভূমির বৈগুণ্য জন্মায় এবং তাহার দরুণ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ও মনুষ্য রোগাক্রান্ত হয়, অতি পুরাকালে চরক তাহা বলিয়া গিয়াছেন। ভূমি যে বিকৃত হয়, ভূগর্ভবাসী ইঁদুরের মড়ক তাহার প্রমাণ। চীন পণ্ডিতেরা

* আজকাল কলিকাতায় প্রতি রাত্রে ৯।০ টার সময় প্লেগ-শান্তির জন্য মহিলারা শঙ্খধ্বনি করিতেছেন।

বলেন যাহার মুখ ভূমির যত নিকটে সে তত শীঘ্র প্লেগাক্রান্ত হয়; যথা সর্ব্ব প্রথমে ইঁদুর এবং তৎপরে শূকর, বিড়াল, কুকুর, গরু এবং মানুষ, পরে পরে রোগাক্রান্ত হয়। প্লেগ যে সংক্রামক এই সংস্কার ইউরোপেও অতি পুরাতন। আমাদের দেশে যেমন, বিলাতেও তেমনি, নাপিত মহাশয়েরাই অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন। ১৫৪০ সালে অষ্টম হেনরীর রাজত্ব কালে চন্দ্রবৈদ্যকে অস্ত্রবৈদ্যের কার্য্য করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কারণ তাহারা ক্ষৌরী কার্য্য স্থলে প্লেগ রোগীকে আশ্রয় দিতেন।* ডাক্তার রসেল বলেন প্লেগের সংক্রামকতায় আবশ্যাদ এক প্রকার বাতুলতা এবং পালা জ্বরের মতন ছাড়িয়া ছাড়িয়া সময় বিশেষে প্রবল হয়। গবর্ণমেণ্ট যখনই জাহাজ আটক করিবার বিধি প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তখনই বণিক মহলে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে এবং সংক্রামকতার মত বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ১৮২৫ সালে বণিকদের উত্তেজনায় এই সংক্রামকতার মত অনুসন্ধান করিবার জন্য দুইটী কমিটি নিযুক্ত করেন। তাহাতে মাক্লীন নামক একজন বিকৃত মস্তিষ্ক কর্ত্তব্যহীন চিকিৎসক বণিকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন। জাহাজ সংক্রান্ত বিধি যায় যায় হইয়াছিল; এমন সময় কোয়াটার্লী রিভিউ পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গুচের লেখনী প্রসূত একটী চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখনীর যেমন শক্তি, পত্রিকারও তেমন সম্ভ্রম। রাজমন্ত্রিগণ সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবং জাহাজ সংক্রান্ত বিধি পরিবর্ত্তন করিবার সংকল্প তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্লেগের সংক্রামকতা সম্বন্ধে গুচ যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী উদাহরণের উল্লেখ করিব :—

১। মার্সেলিস্ মারী—

৭০ বৎসর পর মার্সেলিস্ বন্দরে প্লেগ অকস্মাৎ রণঘোষণা করিল, কিন্তু কেহই গ্রাহ্য করিল না। মাজিস্‌ট্রেটরা লোকের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকেরা প্লেগ নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন; তাহা লইয়া মাজিষ্ট্রেট্‌দের সঙ্গে তাঁহাদের বিবাদ চলিতে লাগিল এবং জনসাধারণের নিকট নানাপ্রকার গঞ্জনাভোগ করিতে হইল। কিন্তু যখন গাড়ী গাড়ী মৃতদেহ গোরস্থানে স্তূপীকৃত হইতে লাগিল, সৎকার অভাবে মৃতদেহ পথে ঘাটে পড়িয়া রহিল, সংক্রামক বিষ পোড়াইয়া ফেলিবার মানসে হাটে মাঠে দ্বারে দ্বারে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইল, দোকান পাট বন্ধ করিয়া সকলে নগর ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন এই আক্রমণের কারণ অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনুসন্ধানে জানা গেল প্লেগ দেখা দিবার তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে একখানা জাহাজ প্লেগাক্রান্ত সিরিয়া ও ত্রিপলি হইতে যাত্রী লইয়া মার্সেলিস্ বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিল। পথে এক জন তুরস্ক যাত্রীর প্লেগে মৃত্যু হয়। দুই জন নাবিক ঐ মৃতদেহ জলে ফেলিবার চেষ্টা করে কিন্তু কাপ্তানের আদেশে নিবৃত্ত হয়। কিছু দিন পর ঐ দুই নাবিক ক্রমশঃ আরও দুই জন নাবিক এবং জাহাজের ডাক্তার, ছয় জন জাহাজের কুলী, একটী বালক আর এক জন ডাক্তার ও তাঁহার পরিবার প্লেগ কবলে পতিত হইল। তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত জাহাজ তীরে আসিতে দেওয়া হয় নাই। পরে যাত্রীগণ পুরাতন বস্ত্রাদি লইয়া জাহাজ ছাড়িয়া তীরে উঠিল। পাঁচ মাস জাহাজে বন্দী থাকিয়া যাত্রিগণ যখন কোন বড় সহরে প্রবেশ করে, তাহাদের প্রথম কাজ রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ। ক্রয় বিক্রয়, আদান প্রদান, দেখা সাক্ষাৎ, গল্পগুজব প্রভৃতি কত প্রকার প্রয়োজনে তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং তাহাদের দ্বারা রোগ ছড়াইয়া পড়িবার অনেক সুযোগ থাকে। সহরে প্রথম যে ব্যক্তি প্লেগাক্রান্ত হয়, সে ঐ জাহাজের একজন যাত্রী। ঐ জাহাজের সঙ্গে যাহাদের কারবার ছিল এইরূপ কতিপয় লোকের পরিবারেও প্লেগ দেখা দিয়াছিল। এইরূপে মার্সেলিস্ ও নিকটবর্ত্তী স্থানে ৮০, ০০০ মৃত্যু হইয়াছিল।

একটী হোটেলে ৩০০।৪০০ লোক থাকিত। একটী স্ত্রীলোক তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলে তাহার সামান্য জ্বর হইয়াছে। দুইজন দাসী তাহাকে ধরিয়া বিছানায় রাখিয়া আসে। পরদিন সেই দুইজনের প্লেগ হইল। এইরূপে ডাক্তার, কর্ম্মচারী, চাকর প্রভৃতি সকলেই প্লেগাক্রান্ত হইল, এবং তন্মধ্যে কেবল মাত্র ৩০ জন আরোগ্য লাভ করে।

মার্সেলিসে মৃতদেহ সৎকার সম্বন্ধে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ভিখারীরা গাড়ী করিয়া মৃতদেহ লইয়া যাইত। ভিখারীরাও একে একে মরিল। তৎপর কয়েদীদিগকে কারামুক্তির প্রলোভন দেখাইয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল, কিন্তু এক পক্ষের মধ্যে ২৩৩ জন বন্দীর মধ্যে কেবল মাত্র ১১ জন জীবিত রহিল।

সমুদ্রে তিনখানি বন্দীজাহাজ ছিল। একখানিতে প্লেগরোগী, এবং একখানিতে অন্য রোগী এবং একখানিতে সন্দেহজনক রোগী থাকিত। এইরূপে খুব সতর্ক থাকাতে ১০, ০০০ লোকের মধ্যে কেবল মাত্র ১৩০০ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয় এবং অর্দ্ধেক লোক আরোগ্য লাভ করে।

মার্সেলিসের প্রথম সেরিফ বলেন, যাহারা বহির্জগতের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব রাখে নাই তাহারা প্লেগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল।

২। মস্কো প্লেগ।

ডাক্তার মার্টেন্স্ মস্কোর একজন চিকিৎসক। তিনি বলেন ১৫০ বৎসরের মধ্যে সেখানে প্লেগ দেখা যায় নাই। ১৭৬৯ সালে রুশে তুর্কে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরবৎসর রুশীয় ইয়াসি নগরে প্লেগ আবির্ভূত হইয়া বহু রুশের প্রাণনাশ করিল। দুইজন সৈন্য পথে প্লেগাক্রান্ত হইয়া মস্কোর সৈন্য-হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে। তৎপরে তথাকার একজন ডাক্তার (Demonstrator of Anatomy) এবং এগার জন পরিচারক ঐ রোগে আক্রান্ত হইল। অধ্যক্ষেরা হাসপাতাল সহরের বাহিরে লইয়া গেলেন, বাহিরের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিলেন দরজায় সিপাহীর পাহারা বসাইলেন, এবং রুগ্ন সৈন্য ও তাহাদের পরিবারবর্গকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া তাহাদের বস্ত্রাদি দগ্ধ করিলেন। প্লেগ তখনকার মতন অদৃশ্য হইল। একটী কারখানায় একজন স্ত্রীলোক প্লেগ লইয়া আসে। তাহার দরুণ ১১৭ ব্যক্তির প্লেগে মৃত্যু হয়। যাহাতে ভিতর হইতে বাহিরে লোক না যাইতে পারে তজ্জন্য পাহারা বসান হইল, কিন্তু রাত্রিযোগে জানালা দিয়া অনেকে পলায়ন করিল। রোগ সহরময় ছড়াইয়া পড়িল; প্রতিদিন ২০০ হইতে ৪০০, ৪০০ হইতে ৬০০, ক্রমে হাজার মৃত্যু হইতে লাগিল। একদিন বিকালে সমুদয় নগরবাসী দলবদ্ধ হইয়া দ্বার জানালা ভাঙ্গিয়া হাসপাতালে প্রবেশ করিল, মহা সমারোহে সাধুমূর্ত্তি (Saints) রোগীদিগের নিকট লইয়া গেল এবং

* "Because persons using surgery often take into their cures and houses such sick and diseased persons as have been affected with the pestitence &c. —do use or exercise barbery, as washing or shaving, or other feat, † thereto belonging, which is very perilous for infecting the king's liege people resorting to their shops or houses, there being washed or shaven." *Act of the Parliament of Henry VIII, 1540, quoted by Dr. Gooch in the Quarterly Review, 1825.*

সকলে একে একে সেই সব মূর্ত্তি চুম্বন করিল। দেশীয় প্রথানুসারে তাহারা মৃতদেহ আলিঙ্গন করিল এবং নগরের মধ্যস্থলে সমাহিত করিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে রোগ নিবারণের চেষ্টার দরুণ ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; তাই সকলে মিলিত হইয়া ডাক্তারদিগের গৃহ আক্রমণ করিল এবং তাহাদের গৃহ লণ্ড ভণ্ড করিল। প্লেগও ক্রমশঃ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রতিদিন ১২০০।১৩০০ প্রাণী গ্রাস করিতে লাগিল। বন্দীরা মৃতদেহ সৎকার করিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। দরিদ্রদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল, এবং একটী বড় জামা, দস্তানা এবং ওয়েল ক্লথের মুখোস দিয়া বলা হইল যেন হস্ত দ্বারা মৃত দহ স্পর্শ না করে। এই উপদেশ কেহই পালন করে নাই; তাহাতে বহুসংখ্যক দরিদ্রলোকের মৃত্যু হয়। যে সমুদয় ডাক্তার রোগীকে কেবল দেখিয়া যাইতেন কিন্তু স্পর্শ করিতেন না, তাঁহাদের কোন রোগ হয় নাই, কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসকেরা রোগী স্পর্শ করিতেন বলিয়া রোগাক্রান্ত হইতেন। সমুদয় নগরে প্লেগের ভীষণ প্রকোপ, কিন্তু অনাথ হাসপাতালে ১৪০০ লোকের মধ্যে একটীও প্লেগরোগী ছিল না। বাহিরের সঙ্গে ইহাদের কিছুমাত্র সংস্রব ছিল না। এক রাত্রে ছয়জন লোক হাসপাতাল হইতে গোপনে পলায়ন করে এবং রোগ লইয়া প্রত্যাগমন করে। তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হইল, তদবধি আর সেখানে প্লেগ দেখা দেয় নাই।

মণ্টাদ্বীপবাসী ৭১ বৎসর নিরুদ্বেগে বাস করিতেছিল। অকস্মাৎ একদিন প্লেগাক্রান্ত আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে সেণ্ট নিকলো নামক জাহাজ আসিয়া তথায় নঙ্গর করিল। পথে দুইজন নাবিকের প্লেগে মৃত্যু হয়। নঙ্গর করিবার পর জাহাজ হইতে তুলিয়া নাবিকদিগকে হাসপাতালে রাখা হইল। ক্রমে কাপ্তান ও তাহার ভৃত্যের ঐ রোগে মৃত্যু হয়। পরে জাহাজ আলেকজাণ্ড্রিয়া ফিরিয়া গেলে সকলে নিশ্চিন্ত হইল। কিছুদিন পর বর্গ নামক একজন চোরাই মাল বিক্রেতার একটী সন্তান প্লেগে মারা যায়। তাহার মাতা অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় এই রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে একটী সন্তান প্রসব করিয়া মারা গেল এবং একে একে তাহাদের সমস্ত পরিবার নির্ম্মূল হইল। বর্গের স্ত্রীকে যে ধাত্রী প্রসব করাইয়াছিল তাহাকে অনেক দিন দেখিতে না পাইয়া তাঁহার এক কুটুম্ব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। তাহার দ্বারে অনেকক্ষণ আঘাত করিয়া যখন কোন উত্তর পাইল না, তখন সে ব্যক্তি দ্বার ভগ্ন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল ধাত্রী জানু পাতিয়া অচল হইয়া রহিয়াছে অনেক ক্ষণ নাড়িয়া যখন বুঝিল যে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, তখন সেই স্থান হইতে আসিয়া স্বাস্থ্য কমিটীতে সংবাদ দিল। কমিটী তাহাকে একটী স্বতন্ত্র স্থানে আবদ্ধ করিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্লেগে মৃত্যু হইল। এইরূপ প্লেগের প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কেবল মঠ, জেল প্রভৃতি যে সব স্থানে বাহিরের সঙ্গে কোন সংস্রব ছিল না, সেই সব স্থানে প্লেগ দেখা দেয় নাই।

৪। মিশর যুদ্ধে স্যার জেম্‌স্ ম্যাগ্রিগর ভারতীয় সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন। তিনি বলেন, তের জন ডাক্তার প্লেগ হাসপাতালের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে রোগীর রক্ত মোক্ষণ করিতে হইত এবং কুঁচকিতে অস্ত্র করিতে এবং পটি বাঁধিতে হইত। এই কার্য্যের জন্য দেশীয় গ্রীক ডাক্তার নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বহু অর্থের প্রলোভনেও কেহ স্বীকৃত হয় নাই। অবশেষে ঐ তের জনের মধ্যে সাত জনের প্লেগ এবং ৪ জনের মৃত্যু হইল। যাহারা রোগীর সংস্পর্শে আসে নাই, অথচ তথায় বাস করিত তাহারা রোগাক্রান্ত হয় নাই।

৫। ফরাসীশ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার ছয় বৎসর পর ৮০ জন ডাক্তারের প্লেগে মৃত্যু হয়। এই জন্য ব্যবস্থা হইল তুরকী নাপিত প্লেগ রোগীর অস্ত্র চিকিৎসা করিবে। তাহার ফল এই দাঁড়াইল যে দুই বৎসরে কেবল ১২ জন ডাক্তারের প্লেগে মৃত্যু হইল। কিন্তু তুর্কী নাপিত মণ্ডলীর অর্দ্ধেক লোক প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

৬। ১৮০১ সালে মিশর যুদ্ধের সময় ফরাসীশ সৈন্যগণ ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ডাক্তার ডেস্‌গেনেটেস্ Desgenetes তাঁহাদের ভয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্যদের সমক্ষে নিজ দেহে বিষ সঞ্চার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একটী আরোগোন্মুখ রোগীর কুঁচকির পুঁজে ছুরি ডুবাইয়া, সেই ছুরী দ্বারা নিজের কুঁচকীও বগলে অল্প খোঁচা দিয়া, সাবান জলে ধুইয়া ফেলিয়া ছিলেন। তিন সপ্তাহ পরে তিনি সুস্থ শরীরে সৈন্যদের সমক্ষে স্নান করিলে সকলে আশ্বস্ত হইল। এই কথা শুনিয়া ইংরাজ ডাক্তার হোয়াইট মনে করিলেন তবে ত প্লেগ সংক্রামক নহে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি রীতিমত নিজ দেহে বিষ সঞ্চার করিলেন, কিন্তু ধূর্ত্ত ফরাসীশ ডাক্তারের সতর্কতার সহিত ছুরীর আঁচড় দেওয়া কি সাবান জলে ধুইয়া ফেলার কথা তিনি শুনেন নাই এবং তদ্রূপ সাবধানও হন নাই। ২রা জানুয়ারী তিনি একটী স্ত্রীলোকের কুঁচকী হইতে পুঁজ লইয়া উভয় উরুতে ঘর্ষণ করেন এবং পর দিন প্রাতে নিজ হস্তে ছুরিকাঘাত করিয়া আঘাত স্থানে একজন সিপাহীর কুঁচকীর পুঁজ মাখাইয়া দেন। চতুর্থ দিন বিকালে (৬ই) তাঁহার কম্প দিয়া জ্বর আসিল, খুব ঘর্ম্ম হইতে লাগিল, মস্তিষ্কের দোষ ঘটিল, হস্ত পদের কম্প হইল, জিহ্বা শুষ্ক ও কাল হইল, এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি একজন প্রধান সংক্রামক-মত বিরোধী। তাঁহার প্লেগ হইয়াছে বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিলেন না, এবং কাহাকেও বগল কুঁচকী পরীক্ষা করিতে দিলেন না। ষষ্ঠ দিবসে (৮ই) প্রলাপ আরম্ভ হইল এবং সপ্তম দিবসে (৯ই) মৃত্যু আসিয়া সমুদয় মতামত বিরোধ ঘুচাইয়া দিল।

৭। ১৮১১ সালের একখানা ডাক্তারি পত্রিকায় 'Journal de Medicine) উল্লিখিত আছে হ্বালি (Valli) নামক একজন ইতালীয় চিকিৎসক প্লেগের সময় কনষ্টাণ্টিনোপলে বাস করিতেন। তিনি বসন্তের পুঁজ, ব্যাঙের পাক রস, কিম্বা তৈলের সহিত প্লেগের পুঁজ মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার তৈল প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। কোন মুসলমান তাঁহার চক্ষু রোগের চিকিৎসা করাইতে আসিল, অমনি আদেশ হইল—"চক্ষুর পাতায় ঐ তৈল মালিশ কর।" কেহ বা পেটের বেদনায় অস্থির হইয়া তাঁহার নিকট আসিল, অমনি ঐ তৈল পেটে মালিশ করিবার ব্যবস্থা হইল। এই উপায়ে হ্বালি ৩০ ব্যক্তির দেহে প্লেগ সঞ্চার করিলেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসার মাত্রা এত অধিক হইয়া পড়িল যে, অবশেষে সুলতান হস্তক্ষেপ করিলেন, এবং যে ব্যক্তি হ্বালির ঐ তৈল প্রস্তুত করিত তাহাকে বন্দী করিয়া, তাহার সমুদয় তৈল দগ্ধ করিলেন এবং তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন।

কলিকাতায় যখন ডাক্তার সিম্‌সন প্লেগের আগমন ঘোষণা করেন, তাহার পূর্ব্বে কেল্লায় হংকং হইতে একদল ফৌজ আসে। ডাক্তার সিম্‌সন্ বলেন তাহাদের মৃদু প্লেগ হইয়াছিল। ১৮৯৮ সালের যে প্রথম রোগীর বিবরণ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়, সে একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। আরম্ভে মৃদু প্লেগ হইয়া থাকে, অনেকে তাহা লক্ষ্য করেন না। মেডিকেল কলেজে এই প্রকার কয়েকটী রোগী ভর্ত্তি হয় এবং একজনের মৃত দেহ ঐ ছাত্র ব্যবচ্ছেদ করে। অল্প দিন পরেই তাহার প্লেগে মৃত্যু হয়। এইরূপ প্লেগ রোগীর শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া দুই জন ডোম প্লেগাক্রান্ত হইয়াছিল এবং ডাক্তার গ্রীন্ ঐ রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে দেহ হইতে দেহান্তরে রোগ সংক্রামিত হইবার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বস্ত্র উপলক্ষে প্লেগ সঞ্চারের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। হাওয়ার্ড বলেন ১৬৬৫ সালে যখন লণ্ডন প্লেগে ছারখার হইতেছিল, সেই সময় একজন প্লেগ রোগীর বস্ত্র ডার্বিসিয়ারের অন্তর্গত ইয়াম গ্রামে প্রেরিত হয়। সেই সময় হইতে সেই গ্রামে প্লেগ প্রাদুর্ভূত হইল। পাদ্রী মম্পেসন্ তাঁহার যজমানদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকে

পলায়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, অবশেষে প্লেগের কবলে পতিত হইলেন। এইরূপে ২৬০ জন গ্রামবাসীর প্লেগে মৃত্যু হয়।

ফরাসীশ সৈন্যের ডাক্তার পগ্নেট্ (Pugnet) বলেন যে প্লেগে মৃত একজন ডাক্তারের গলাবন্ধ এবং রুমাল ১৪ জন লোককে বিতরণ করা হয়। তাহাদের সকলেরই প্লেগ হইয়াছিল এবং গলার বীচি ফুলিয়াছিল।

১৮৩৫ সালে মিশরে এই বিষয়ে পরীক্ষা হইয়াছিল। দুইজন প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীকে প্লেগরোগীর বস্ত্রে আবৃত করিয়া তাহারই বিছানায় শোয়ান হয়। ফল—উভয়েরই প্লেগ, তন্মধ্যে একজনের মৃত্যু।

এইরূপে ইঁদুরদেহ, নরদেহ এবং রোগীর বস্ত্রাদি অবলম্বন করিয়া যে প্লেগ দেশ দেশান্তরে গমনাগমন করে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিউমোনিয়াবিকারে প্লেগ বায়ু আশ্রয় করিয়াও দেহান্তরে প্রবেশ করিতে পারে। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার একজন প্লেগরোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই রোগীর কাসি ছিল; তাহার কফ ডাক্তারের নাকে ও মুখে প্রবেশ করে। এই ঘটনার পাঁচ দিনের মধ্যে তাঁহাকে হারাইয়া তাঁহার বহুসংখ্যক বন্ধু ও রোগী শোকে কাতর হইয়াছিলেন।

অনেক সময় অদৃশ্য যান আরোহণ করিয়া প্লেগ শত শত যোজন দূরে গিয়া ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ওলাবিবি পানীয় জলে বাস করেন, এ বিষয়ে এখন আর মতভেদ নাই; কিন্তু যখন কোথাও তাঁহার প্রাদুর্ভাব হয়, কোন শুভমুহূর্ত্তে কোথাকার পানীয় জল অবলম্বন করিয়া তিনি প্রথম রোগীর দেহে প্রবেশ করেন, তাহা সমুদয় স্থলে নির্ণয় করা যায় না। প্লেগ সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া প্লেগ প্রথম ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন তাহা অনেক সময়ে নিরাকরণ করা অসাধ্য।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস।

মেঘরাজ্যে।

চৈত্র বৈশাখের প্রখর রৌদ্র তাপে মস্তিষ্ক যখন উত্তপ্ত হইয়া উঠে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে একমাত্র তালবৃন্ত খানিকে সার করিয়া যখন দৈনিক সমস্ত কর্ত্তব্যগুলির প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়িতে হয়, তখন পৌষমাসের সেই আরামের দিন গুলিকে স্মৃতি পথে আনিলে, উপস্থিত যন্ত্রণাটা যেন কঠোরতর ও তীব্রতর হইয়া পড়ে। কিন্তু আজ কাল ইংরেজ-রাজের কৃপায়, সভ্যতার উন্নতিতে ও বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই কষ্ট কণ্টকিত স্মৃতিটা অনেকের পক্ষেই সুখকর হইয়া উঠিয়াছে। জীবনব্যাপী কঠোর কার্য্য পরম্পরা হইতে কিঞ্চিৎ অবসর লইয়া কষ্ট-সঞ্চিত রৌপ্যমুদ্রা গুলির মধ্যে কয়েকটির মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারিলেই নিদারুণ গ্রীষ্মের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারা যায়।

আমরাও এই অভিসন্ধিতে বৈশাখের খর-রবি-করোজ্জ্বল ও উত্তপ্ত, ধূলিধূসরিত কলিকাতা সহর খানিকে পশ্চাতে ফেলিয়া অপরাহ্ন ৪½টার সময় দার্জ্জিলিং মেল ট্রেণে একদম উত্তর মুখে ছুটিয়া চলিলাম। আমাদের দুঃখ অনুভব করিয়াই বুঝি দেরী হওয়ার ভয়ে ট্রেণ খানি যথাশক্তি দৌড়িয়া সন্ধ্যা অতীত হইতে না হইতেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে একেবারে পদ্মাপারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দামুকদিয়া পৌঁছিয়া তাপদগ্ধ দেহটাকে শ্রান্তি হারিণী পদ্মার সুশীতল বক্ষে ভাসাইয়া দিলাম।

সারাঘাটে উঠিয়া সর্ব্ব সন্তাপ হারিণী নিদ্রাদেবীর স্নেহময় ক্রোড়ে দেহ খানিকে ঢালিয়া দিলাম। শিশু রবির মৃদু কিরণস্পর্শে যখন চক্ষের পাতা খুলিয়া গেল, তখন আমরা হিমালয়ের পদ-প্রান্তে অনন্ত হিমানীর শান্ত ছায়ায় সমাহিত শিলিগুড়ী ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; এই ষ্টেশন হইতে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে আরম্ভ। এই রেলওয়েটীকে যেন আদরচ্ছলে রহস্য করিয়াই Toy Railway বলা হয়। ক্ষুদ্রাকার গাড়ীগুলি দেখিয়া হাসি পাইল। মনে হইল, ছোট বেলার খেলনার রেল গাড়ীর মত ইহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী স্প্রাং আঁটিয়া ছাড়িয়া দিলেই বুঝি খানিকটা ছুটিয়া চলিবে। কিন্তু যখন সেই ছোট্ট ট্রেণ খানি ঝকাঝক্ হস্ হস্ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ও দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিল, তখন হাসির পরিবর্ত্তে গভীর বিস্ময়ের উদয় হইল। ছোট্ট ইঞ্জিনখানির বিপুল শক্তি দেখিয়া অবাক হইলাম। শিলিগুড়ী পার হইয়া জীবনে প্রথম চা বাগানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। অনেক কালের উপভুক্ত জিনিসটাকে সশরীরে সম্মুখে পাইয়া চোখ ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই মেঘান্তরালে লুক্কায়িত, হিমালয়ের অস্পষ্ট অভগ্ন, বিশাল দেহ তৃষিত চক্ষের সম্মুখে একটু একটু করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

বর্ত্তমান সময়ে দার্জ্জিলিং যাওয়াটা যত সহজ ও অল্প ব্যয় সাধ্য হইয়াছে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। এখন যেমন ২৫ টাকা বেতনের একজন কেরাণীও ৩৬।০ টাকা ব্যয় করিয়া দুপাঁচ দিনের জন্য শৈল বিহার করিয়া আসিতে পারেন, তখন তাহা ছিল না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং যাত্রীকে হাওড়া ষ্টেসন হইতে ২২০ মাইল দূরবর্ত্তী সাহেব গঞ্জ ষ্টেসনে যাইতে হইত। সেখান হইতে ষ্টিমারে



দার্জ্জিলিং।

KUNTALINE PRESS

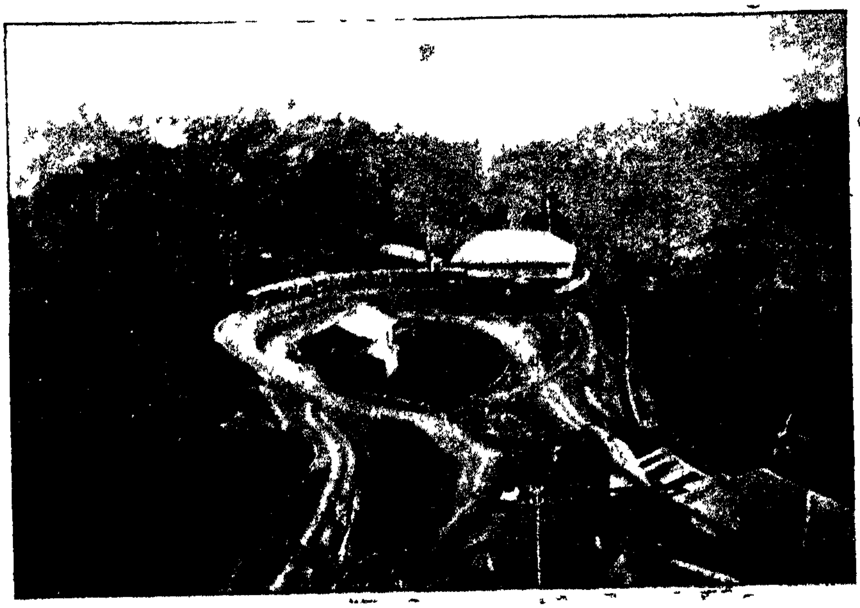
কারাগোলা, সেও প্রায় ৫।৬ ঘণ্টার রাস্তা হইবে। কারাগোলা হইতে পালকী, গরুর গাড়ী, ঘোড়া, নৌকা কিম্বা ডাক গাড়ীতে পূর্ণিয়া, কিষনগঞ্জ ও তেঁতুলিয়া হইয়া শিলিগুড়ী পৌঁছিতে হইত। শিলিগুড়ী হইতে প্রায় ৫০ মাইল রাস্তা টোঙ্গায় চড়িয়া অবশেষে দার্জ্জিলিং পৌঁছান যাইত। সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ জে, ডি হুকার সাহেব ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে উল্লিখিত পথে তাঁহার সুবিখ্যাত হিমালয়-যাত্রা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কারাগোলা হইতে শিলিগুড়ী পৌঁছাইতে তাঁহার ২৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৪০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কষ্টের সীমা ছিল না। সুতরাং স্বাস্থ্যলাভের জন্য দার্জ্জিলিং যাত্রাটা তখন পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের মত জীবনের শেষ যাত্রা বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আজ যেমন কাশী বা জগন্নাথ যাত্রা করিতে হইলে আর লোককে উইল করিয়া শোক সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে সজলনেত্রে শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে হয় না, তেমনি দার্জ্জিলিং যাত্রাটাও লোকের পক্ষে সহজ সাধ্য আরামের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে।

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান্ রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শক্তির একটি অতি বিস্ময়জনক প্রকাশ। পৃথিবীতে যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য জিনিষ আছে, এই রেলওয়ে তন্মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে। আমেরিকার এণ্ডিস্ পর্ব্বত মালার রেল রাস্তা ছাড়া ইহার সহিত তুলনা আর কোন রাস্তারই হয় না। এই লাইনের সর্ব্বোচ্চ ষ্টেসন ৭৪০৭ ফুট উচ্চ। কি সুকৌশলে এতটা উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত দ্রুতগামী রেলগাড়ী অনায়াস-গতিতে চলিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময় ও কৌতুহলে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট কার্য্য-কুশল সার এস্‌লি ইডেন সাহেবের যত্নে ও সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ফ্রাঙ্কলিন্ প্রেস্‌ষ্টেজ্ সাহেবের বুদ্ধি-কৌশলে এই রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। বহুকাল হইল গভর্ণমেণ্ট মাইল প্রতি প্রায় একলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া শিলিগুড়ী হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত একটি সুপ্রসস্ত পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই রাস্তাটিকে পাঙ্খাবাড়ি রোড্ বলিত। এখন উহার নাম কার্টরোড্। বর্ত্তমান রেলের রাস্তা কোথাও এই কার্টরোডের উপর দিয়া, কোথাও বা পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ১৮৭৯ সালে কার্য্যারম্ভ হইয়া ১৮৮১ সালে নির্ম্মাণ শেষ হয়। এই ১৮৮১ সালে ৪ঠা জুলাই বঙ্গেশ্বর সার্ এস্‌লি ইডেন্ এই রাস্তা উন্মুক্ত করেন। হিমালয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানি ইহার জন্য মাইল প্রতি প্রায় ৩৫০০ পাউণ্ড বা ৫২৫০০্ টাকা খরচ করিয়াছেন।

যাঁহারা কখনও দার্জ্জিলিং যান নাই, তাঁহারা হয়ত মনে করিতে পারেন যে, রেল রাস্তাটা বুঝি ক্রমোচ্চ ভাবে বরাবর সরল গতিতে শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং পৌঁছিয়াছে। তাহা নহে। রেলরাস্তা বরাবর পর্ব্বতের গাত্র-সংলগ্ন থাকিয়া উহার বক্রভাব অনুগামী হইয়াছে। এক এক স্থানে বক্রতা এত অধিক যে চলিতে ভয় হয়, এবং এত জন্যই Agony Point, Sensation Point প্রভৃতি নামকরণ হইয়াছে। কোথাও বা সহসা অনেক উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, অথচ সোজা উঠা একেবারেই অসম্ভব; এই জন্য স্থানে স্থানে Reverse নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল Reverse ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের চরমোৎকর্ষ। এক একটি Reverse দ্বারা রাস্তাটিকে অতিঅল্প সময়ে ও অনায়াসে প্রায় ১০০ ফুট উর্দ্ধে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

আবার কোথাও Loop প্রস্তুত করিয়া রাস্তার উপরদিয়া রাস্তা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। এই সকল স্থানে উপরে উঠিয়া নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অতিক্রান্ত রেল রাস্তাটি পরিস্কার দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। কাকলঙ্গ বেণ্ডের (Bend) নিকট দ্বিতীয় লুপ্‌টি ঠিক যেন একটি ৪ সংখ্যা অঙ্কিত করিয়াছে। চিন্‌বাটী লুপ্‌টি এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত এবং ইহার সমস্ত দৃশ্যটি এমনই মনোরঞ্জক ও বিস্ময়োৎপাদক যে, পাঠকদিগকে ইহার একটি সুন্দর চিত্র উপহার দিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

শিলিগুড়ী হইতে শুক্‌না পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু দেখিবার নাই। তারপরে যখন ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলাম, তখন যাহা দেখিলাম ও অনুভব করিলাম, তাহা লিখিয়া জানাইবার মত মানুষের ভাষা নাই। আমার প্রাণে যত ভাব ও চিন্তা আসিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবারও আমার শক্তি নাই। শুক্‌না ষ্টেশন হইতে ট্রেণখানি আঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, সর্পগতিতে দ্রুতবেগে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে উঠিতে লাগিল। অধিকাংশ পথেই রাস্তার একদিকে গভীর খাত, অন্যদিকে



চিনবাটী লুপ।

অভ্রভেদী শিখরমালা। ডান দিকে হাত বাড়াইলে পর্ব্বত গাত্র স্পর্শ করা যায়, আবার বাম দিকে ট্রেণখানি নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে কয়েক আঙ্গুল সরিয়া গেলেই একেবারে পাতাল পুরীতে নাগলোকে যাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। যতদূর দৃষ্টি যায় পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত বই আর কিছুই দেখা যায় না। পাহাড়ের গায়ে ছোট বড় কত রকমের কত গাছ, কত রকমের সুন্দর লতা পাতা, কত সুন্দর ফুল ফল। একাধারে এমন প্রাণবিমোহন কোমল সৌন্দর্য্য ও এমন হৃদকম্পকারী ভয়াবহ বিস্ময়োৎপাদক দৃশ্য আর কোথাও সম্ভবে না।

কখনও আমরা একটা পাহাড়ের গায়ে উপরে উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুই তিনবার উঠিয়া আবার আর একটা পর্ব্বতে আসিয়া পৌঁছিলাম। উর্দ্ধে উঠিয়া নীচের অতিক্রান্ত রেলপথ দেখিয়া বড়ই আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। কখনও বা ঘুরিয়া ফিরিয়া ঠিকপূর্ব্ববর্ত্তী স্থানেই আবার আসিয়া হাজির হইলাম। পূর্ব্ববর্ণিত চিনবাটি লুপ্ ঠিক রঙ্গটঙ্গ ষ্টেসনের উপরে, কিন্তু রঙ্গটঙ্গ হইতে ৪৫ মিনিটে আমরা প্রায় ৮০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া এই স্থানে পৌঁছিলাম। দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় কেহ ইচ্ছা করিলে এই স্থানে অবতরণ করিয়া সোজা রাস্তায়, ট্রেণখানি কাকলঙ্গ পাহাড় ঘুরিয়া রঙ্গটঙ্গ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, ষ্টেসনে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারেন। শুকনা ও রঙ্গটঙ্গের মধ্যবর্ত্তী স্থানে হাতী বাঘ, চিতা, বন্য কুকুর, শূকর, শশক, হরিণ প্রভৃতি বহু সংখ্যক আরণ্য জন্তু সর্ব্বদা বিচরণ করে। রঙ্গটঙ্গের বিপরীত পশ্চিমদিকে কাকলঙ্গ পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উত্তর পার্শ্বে টিণ্টারিয়া ষ্টেশন। টিণ্টারিয়া হইতে দুই মাইল অগ্রসর হইলেই প্রথম Reverse দেখিতে পাওয়া যায়। সম্মুখেই শিবাখোলা নদী। শিবাখোলা গয়াবাড়ির নিকট পাগলাঝোরা হইতে উৎপন্ন হইয়া মহানদীতে পতিত হইয়াছে। গয়াবাড়ী হইতে দুই মাইল অগ্রসর হইলেই পাগলা ঝোরা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে এই ঝরণায় এমন প্রবল বেগ হয় যে, রেলওয়ে কোম্পানীকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হয়। ১৮৯০ সালে ঝরণার জল প্রায় ৫০০ গজ রেলের রাস্তা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

ইহার পরেই মাহালদ্রাম রেঞ্জ। এই পর্ব্বতমালার সর্ব্বদক্ষিণে মহানদী ও খার্সিয়াং ষ্টেসন, সর্ব্বোত্তরে দার্জ্জিলিং। মহানদীর নাম হইতে মহানদী ষ্টেসনের নামকরণ হইয়াছে। ষ্টেসন হইতে কয়েক গজ অগ্রসর হইলেই মহানদীর জন্মস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। শিলিগুড়ীর পরেই এই মহানদীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেখানে নদীর উপরে সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। যত উপরে উঠিতে লাগিলাম ততই শীত বোধ হইতে লাগিল। তারপরে শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের গায়ে চা বাগানগুলির দৃশ্য বড়ই সুন্দর। কোনও কোনও স্থান

হইতে সমতল ক্ষেত্র দেখা যায়। সেখানকার বড় বড় গাছগুলি ঠিক যেন ছোট ছোট ঘাসের ঝোপ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নদীগুলি দেখিয়া মনে হইল, কে যেন শাদা কাপড় মাঠে বিছাইয়া রাখিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আমরা খার্সিয়াং ষ্টেসনে পৌছিলাম। এই স্থান সমুদ্রতীর হইতে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চ। ক্ষুদ্র সহরটী ষ্টেসন হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে মাহালদ্রাম রেঞ্জের একটী Spur এর উপর স্থাপিত। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থানকে Eagle's Crag বলে, এবং ইহা শিলিগুড়ীর পরবর্ত্তী শুক্না ষ্টেসন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ট্রেণ এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। ষ্টেসনের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে দাঁড়াইয়া আমরা টিবাইব সমতল ভূমি দেখিতে পাইলাম। খার্সিয়াং হইতে রওয়ানা হইলেই পশ্চিম দিকে সিঙ্গালিলা রেঞ্জের সীমান্ত প্রদেশ নয়ন পথে পতিত হয়। এই পর্ব্বত শ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগেই স্বাধীন নেপাল রাজ্য। মাহালদ্রাম ও সিঙ্গালিলার অন্তর্ভূত উপত্যকার নাম বালাসুন। ইহার শ্যামল বক্ষকে বিধৌত করিয়া বালাসুন নদী প্রবাহিতা। এই নদীর জন্মস্থান ঘুম পাহাড়ের নিকটে। আমরা বাম দিকে বরাবর এই নদী ও উপত্যকা এবং ডান দিকে মাহালদ্রামে বিবিধ তরুলতাসমাচ্ছন্ন তুঙ্গ শিখরমালা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ইতিপূর্ব্বে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখনও অল্প অল্প পড়িতেছিল। চতুর্দ্দিকে সদ্যস্নাত বৃক্ষ লতা মৃদু সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। মাহালদ্রাম রেঞ্জের আপাদমস্তক বৃক্ষলতাপূর্ণ গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে এই গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া নির্ঝরিণী শ্রুতি-মধুর কলনাদে উপত্যকার গভীর গহ্বরে নিপতিত হইতে-ছিল। সহসা নির্জ্জন বনভূমির অন্তরাল হইতে ফেনরাশি উদ্গিরণ করিতে করিতে ঝরণার-নির্ম্মল সলিল প্রবাহ শত হস্ত নিম্নে পতিত হইয়া গভীর আবর্ত্ত উৎপাদন করিতেছিল. আবার সেই অনাবিল আবর্ত্তকে উল্লম্ফনে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল।



ঘুম-ডাইনী।

পথিমধ্যে এই প্রকার বহু সংখ্যক ঝরণা দেখিতে দেখিতে আমরা সোনাদা আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আপ্ ও ডাউন মে'লের প্রায় এই স্থানেই সাক্ষাৎ হয়।

সমতল ক্ষেত্রে অবস্থান কালে সৌদামিনী সংবৃত যে জলদ মালাকে মস্তকোপরি কত উর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিতাম, আজ তাহা সহসা পথিমধ্যে আসিয়া আমাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন করিল। উপরে নীচে, আশে পাশে চতুর্দ্দিকেই মেঘ। কেহ কেহ ভদ্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া এক দম আমাদের গাড়ীর ভিতর দিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল। সোনাদা ও ঘুমের অন্তবর্ত্তী স্থান প্রায় সর্ব্বদাই কুয়াসাচ্ছন্ন থাকে। সে দৃশ্যটী বড়ই সুন্দর। শুভ্র, ঘনসন্নিবিষ্ট কুয়াসা ভেদ করিয়া যখন ট্রেণ খানি হুস্ হুস্ শব্দে চলিতে থাকে, তখন ডান দিকের উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী অস্পষ্ট রূপে দৃশ্যমান হইয়া প্রাণের ভিতর এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করে। আবার পশ্চিম দিকে দিগ্দিগন্ত-ব্যাপী কুয়াসা-সমুদ্র দেখিয়া মনে

হয় যেন আমরা সৃষ্টির প্রান্তসীমায় দণ্ডায়মান হইয়া অসীম শূন্য উপলব্ধি করিতেছি। সময় সময় বাত্যাহত উড্ডীয়মান তুলারাশির ন্যায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কুয়াসা জাল চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তখন অপরিস্ফুট রূপে প্রতিভাত সুন্দর বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রকে স্বপ্ন দৃষ্ট কাল্পনিক জগৎ বলিয়া ভ্রম জন্মে। আমরা এই শুভ্র বাষ্পসমুদ্র ভেদ করিয়া জোড়বাঙ্গলা নামক বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা ঘুমনামক ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। এই স্থান ৭৪০৭ ফুট উচ্চ। ঘুম হিমালয়ান্ রেলওয়ের সর্ব্বোচ্চ ষ্টেসন। এই স্থানের পশ্চিম দিকে ৪ মাইল গেলেই ঘুমরক নামক পাহাড়টী দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেসনে গাড়ী থামিলেই পলিতকেশ ও গলিতচর্ম্ম এক বুড়ী অদ্ভুত রকমের পোষাক পরিয়া 'বাবু একটা পয়সা বকসিস্" বলিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে উপস্থিত হয়। ইহাকে সকলে 'ঘুম ডাইনী' অথবা The Ghoom Witch বলিয়া থাকে। ইহার উপস্থিতি যাত্রীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং কৌতূহল বশতঃ দুই একটী পয়সা দিয়া ইহার দন্তহীন মুখের সরল হাসিটী দেখিতে অনেকেই কাতর হয় না।

পশ্চিমে দিকের বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক পর্ব্বতগুলির দৃশ্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। আমরা এই স্থান হইতে মোড় ফিরিয়া, বালাসুন উপত্যকা পরিত্যাগ করিয়া, ছোট রঙ্গিতের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই দার্জ্জিলিং সহরের রমণীয় দৃশ্য। পাহাড়, পর্ব্বত, বৃক্ষলতা, নদী, ঝরণা মেঘ ও বিদ্যুতের ভিতর দিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে হইতে সহসা হিমাদ্রি-শিখরস্থিত অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্যের মত দার্জ্জিলিং সহরের প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শৈলসুন্দরীর অঙ্কগত এই অপূর্ব্ব আনন্দ নিকেতন দর্শন করিয়া বিস্ময়ে শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় মন অপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।



নেপালী কুলি।

দূর হইতে দার্জ্জিলিঙের দৃশ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক। বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত দেবপুরীর মত শুভ্রছাত বিশিষ্ট সুন্দর সুন্দর গৃহ গুলি প্রাচীন পর্ব্বতমালার গাত্রে থরে থরে সাজান রহিয়াছে। দার্জ্জিলিং ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইলেই ডান দিকে লিম্বোঝোরা। বিগত ঝড়বন্যাতে এই ঝরণার চারিদিক হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড (ধস্) Slip পড়িয়া স্থানটিকে আতঙ্কপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বহুসংখ্যক পাহাড়ী-কুলী পাথর দিয়া এই স্থান বাঁধিতেছে। দৃঢ়কায় পাহাড়ীরা পিঠে পাথর লইয়া শত হস্ত নিম্ন হইতে সোজা উপরদিকে উঠিয়া যাইতেছে।

আশে পাশে পাহাড়ীদের ছোট ছোট কুটীর। তাহাদের বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু দেহ, লাল লাল গাল, ও গোল গাল ছেলে মেয়ে গুলি দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। বেলা প্রায় ৩টার সময় মেল ট্রেণ দার্জ্জিলিং ষ্টেসনে পৌঁছিল। ষ্টেসনটি ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে বড়ই সুন্দর। ভুটিয়া ও পাহাড়ী কুলীতে প্ল্যাটফরম্ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কতগুলি আমাদের বিছানা বাক্স লইয়া চলিল। এক এক জন কুলী



নেপালী মেয়ে।

তিন মণ বোঝা অনায়াসে বহিতে পারে। ছোট ছোট বালক বালিকারাও কুলীর কাজ করে। ইহারা মাথায় করিয়া মোট বহিতে পারে না। কপালের সঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া বাক্স, বিছানা, খাট, পালঙ্গ, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, সিন্দুক সমস্তই পিঠে করিয়া লইয়া যায়। পাহাড়ে দেশে মাথায় মোট লইয়া উঠা নামা করা অসম্ভব।

ষ্টেসন হইতে প্রায় ২০ মিনিট পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আমরা আমাদের প্রবাসগৃহ করলটন ভিলাতে পৌঁছিলাম। সহর দেখিবার জন্য এমন আগ্রহ উপস্থিত হইল যে, আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম।

মানবের অনধিগম্য যেস্থান একদিন অরণ্যচর হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ থাকিয়া সৃষ্টির প্রাচীন প্রকৃতির স্বাধীন লীলাক্ষেত্র রূপে যুগযুগান্তর ধরিয়া বিরাজ করিতেছিল, আজ সেইস্থান, এক সুসভ্য জাতির পদার্পণে পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইয়া, এক অভিনব সজীবতা ও প্রফুল্লতা লাভ করিয়াছে। যেস্থানে দুর্দ্দান্ত পর্ব্বতবাসিগণও নির্ভয়ে চলিতে সাহস করিত না, আজ সেখানকার সুশোভিত রাজপথে অবলাগণও নিঃশঙ্কচিত্তে মনের আনন্দে বিচরণ করিতেছে! ব্যবসা বাণিজ্যের কোলাহলে, শাসন ও শিক্ষার সুবন্দোবস্তে, নৃত্য-গীতের উন্মত্ততায়, হিমাদ্রিশিখরস্থিত সেই অরণ্যপুরী আজ স্বর্ণপুরীতে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতির উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতরে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রমক্লিষ্ট মানবের জন্য দার্জ্জিলিঙে যে সুশীতল বিশ্রাম গৃহ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার জন্য ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাঙ্গালী মাত্রেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও চির ঋণী।

আমরা অকল্যাণ্ড রোড্ দেখিয়া একেবারে Mall এ আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অকল্যাণ্ড রোডের - শেষভাগের চৌরাস্তাকে দার্জ্জিলিংএর চৌরঙ্গী ও ইডেন গার্ডেন বলা যাইতে পারে। এখানে হ্যারিংটন ও পার ফটোগ্রাফার, হোয়াইটএওয়েলেডল, মুর, ফ্রান্সিস্ হ্যারিসন হেথওয়ে পোষাক বিক্রেতা; নিউমেন স্মিথ ষ্টেনিষ্ট্রীট প্রভৃতি কলিকাতার বড় বড় দোকানদার সুরম্য দোকান সাজাইয়া বসিয়াছেন। চৌরাস্তার মোড়ে ড্রামড্রুইড ও কলিকাতার সুবিখ্যাত হোটেলওয়ালা, মিসেস্ মঙ্কের রকভিল হোটেল।

Mall স্থানটী অনেকটা ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ড বাজিবার স্থানের মত—চারিদিকে সারি সারি বসিবার বেঞ্চ স্থাপিত আছে। বেঞ্চগুলির পশ্চাতে গাছের ডালে নানা রকম সুন্দর সুন্দর অর্কিড ফুটিয়া রহিয়াছে। চারিদিক গোলাপ, দালিয়া প্রভৃতি নয়নরঞ্জক প্রস্ফুটিত ফুলে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজ বাঙ্গালী, স্ত্রী পুরুষ, ছেলে বুড়া সকলেই প্রত্যহ একবার এখানে বেড়াইতে আসিয়া থাকেন। এখানে পাহাড়ীরা নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর জিনিস লইয়া বিক্রয়ার্থ দণ্ডায়মান থাকে। তন্মধ্যে



চৌরাস্তা।

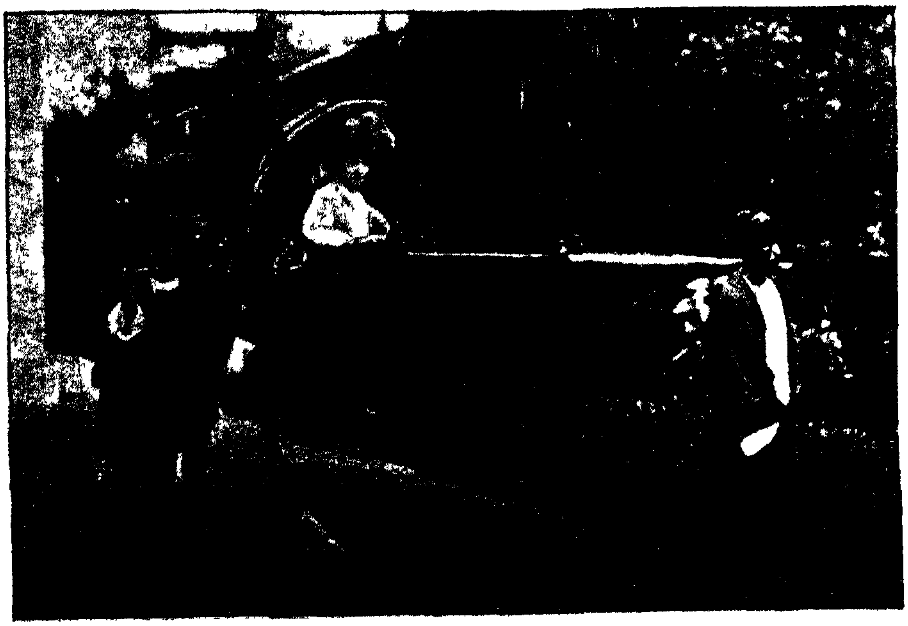
তদ্দেশীয় কাপড়, বৃক্ষলতা ও মৃত প্রজাপতি প্রভৃতিই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

দার্জ্জিলিঙে সাহেবে নেটিভে জেতা জিতের সম্পর্কটা কিছু শিথিল। বাঙ্গালী দেখিলেই সাহেবের পাদুকাগ্র কম্পিত কিম্বা হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয় না। Mallএ ইডেন গার্ডেনের মত সাহেব বাঙ্গালীর বসিবার স্থানের পার্থক্য নাই। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ইংরেজমহিলাও সাধারণ একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে একাসনে বসিতে ভ্রূকুঞ্চিত করেন না। মেমসাহেবেরা অনেকেই রিক্স্ গাড়ী কিম্বা ডাণ্ডি চড়িয়া Mallএ আসেন। রিক্স্ এক রকম ছোট গাড়ী, মানুষে টানে। ডাণ্ডীর একখানি ছবি দিলাম।



ফিরিওলা।

এই রমণীয় রাজ্য দেখিতে দেখিতে এক অপার সৌন্দর্য্য সাগরে প্রাণটা ডুবিয়া গেল। অনন্ত নীলিমার কোলে শ্যামল পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, শিখরের উপর শিখর মস্তক উত্তোলন করিয়া কত শত সহস্র বৎসর, কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আপনাদের সুবিস্তৃত দেহে মহান্ সৌন্দর্য্যরাশির অনন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া কতকাল ধরিয়া সৌন্দর্য্যপিপাসু প্রকৃতির উপাসক মানব প্রাণকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছ! বিশ্বনিয়ন্তার অপার মহিমার অসীম শক্তির অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া ধরণীবক্ষে বিরাজ করিতেছে! এই



ডাণ্ডি।

অপার সৌন্দর্য্য সাগরে আপনার পিপাসিত প্রাণটাকে ডুবাইয়া দিয়া আমাকে আজ ধন্য মনে করিলাম। রমণীয় প্রকৃতির অমৃতসেচনে অভিষিক্ত হইয়া আনন্দ ও শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে সে দিনকার মত গৃহে প্রত্যাগত হইলাম।

শ্রীঅনন্তনারায়ণ সেন।

কথা।*

কবিবর রবীন্দ্রনাথ প্রণীত কতকগুলি অভিনব কবিতা "কথা" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি সম্প্রতি রচিত হইলেও, কবিতা-নিবদ্ধ বিষয়গুলি অতি পুরাতন ইতিহাসের সম্পত্তি। বৌদ্ধগ্রন্থে, রাজস্থানের কিম্বদন্তীতে, শিখ সমাজের শৌর্য্যগাথায়, মহারাষ্ট্ররাজ্যের বিক্রমকাহিনীতে ও ভক্তমালের পুণ্য কথায় এতদিন যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহারই ছায়া লইয়া কবিতাগুলি গঠিত। যে সকল ঐতিহাসিক কীর্ত্তিকাহিনী এখনও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহা কিরূপে কাব্য-সৌন্দর্য্যের উপাদান হইতে পারে, কবি তাহার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পদলালিত্য গৌরবে, রস সমাবেশ-কৌশলে, চিত্তবিনোদনচাতুর্য্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত; তাঁহার প্রতিভা বিষয় নির্ব্বাচনের জন্য যে স্বদেশের পুরাতন পুণ্য-কথা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছে, ইহা দেশের ও দেশীয় সাহিত্যের পক্ষে আনন্দের সংবাদ।

ভারতবর্ষ বহু পুরাতন সভ্যজনপদ বলিয়া সকল দেশেই সুপরিচিত। তাহার পুরাকাহিনীর লুপ্তোদ্ধার করিবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া পাশ্চাত্য সাহিত্য-সেবকগণ অতুল অধ্যবসায়ে পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় বহু বিলুপ্তপ্রায় শিলালিপি বিশদীকৃত ও মরুমরীচিকা নিহিত স্মৃতিচিহ্ন উদ্ঘাটিত হইতেছে। কিন্তু সে সকল প্রত্নতত্ত্ব সাধারণে সুপরিচিত হইতে পারিতেছে না। তাহার সৌন্দর্য্যভোগ করিতে হইলে যেরূপ অধ্যবসায় ও অধ্যয়ন ক্লেশের প্রয়োজন, আমাদের দেশের পাঠক সাধারণের মধ্যে সেরূপ পাঠানুরাগ এখনও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে নাই। সুতরাং দুই দশজন স্বদেশের বা বিদেশের পুরাতত্ত্ববিৎ জীবনপাত করিয়া যে সকল তথ্যাবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইতেছেন, দেশের লোকের নিকট সহসা তাহার সমাদর হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের সযত্ন সংকলিত পুরাতত্ত্বের সারাংশ কবিতানিবদ্ধ হইলে, তৎপ্রতি সহজে লোক-চক্ষু পতিত হইতে পারে। সেকালের ইতিহাসে যে সকল চরিত্রের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি চিরকালই কাব্যসৌন্দর্য্যের উপাদান রূপে গণ্য হইতে পারিবে। কবি সেইরূপ আদর্শ লইয়া কয়েকটী

---

* শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কবিতা পুস্তক, মূল্য এক টাকা।

"কথা" রচনা করায়, বঙ্গসাহিত্যে কিয়ৎ পরিমাণে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইল। এক সময়ে স্বদেশের এবং বিদেশের পুরাতন পুস্তকের ভাবানুবাদ করা বঙ্গ সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর কল্পনার প্রাবল্যে সে লক্ষ্য ভাসিয়া গেলে, কিছুদিন বঙ্গসাহিত্য বহু পথে ধাবিত হইয়া অবশেষে কোকিল-কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন ও মানভঞ্জনের তরল তরঙ্গের রঙ্গ রসেই সর্ব্বদিক মগ্ন হইয়া উঠিতেছিল, তখন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অনুরোধে কল্পনার উচ্ছৃঙ্খল নখরাঘাতে বহু ঐতিহাসিক চরিত্র শতধা বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং স্বদেশের ইতিহাস হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে অক্ষত কলেবরে কবিতা নিবদ্ধ করিলেও যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির বাধা হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কবি বঙ্গ সাহিত্য-সেবকগণের সম্মুখে এক অভিনব চেষ্টার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।

ঐতিহাসিক চিত্রচয়নে কবিকল্পনা যে সর্ব্বথা নিরঙ্কুশ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে একবার কর্ত্তব্যানুরোধে তীব্রভাষা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ এই নূতন কবিতাপুস্তকের ভূমিকায় যেন তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়াই লিখিয়াছেন :—"মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে, আশা করি সেই পরিবর্ত্তনের জন্য সাহিত্য নীতিবিধানমতে দণ্ডণীয় গণ্য হইব না।" আমি কবিকুলকে ঐতিহাসিক হইবার জন্য তাড়না করি নাই ; কিন্তু ঐতিহাসিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকলকেই আগ্রহে অনুরোধ করিয়াছিলাম। যাহার যে চরিত্র তাহার মূল প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গল্পাংশ সরল সরস বা সহজে বোধগম্য করিবার জন্য অবান্তর বিষয়ের কিছু কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিলে ইতিহাসের ক্ষতি নাই—সাহিত্যের বিলক্ষণ লাভ। কবি বর্ত্তমান পুস্তকে ঐতিহাসিক চরিত্রের মূল প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই ; সুতরাং অবান্তর বিষয়ে যাহা কিছু ইতর বিশেষ করিয়াছেন, তজ্জন্য কেহ তাঁহাকে দণ্ডার্হ মনে করিতে পারিবেন না। ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার সময়ে বহু মৃতমহাত্মার চিতাভস্মের উপর দিয়া পদবিক্ষেপ করিতে হয় ; তাহার প্রত্যেক ভস্মকণা পবিত্র ও সম্মানার্হ—সেখানে যাঁহারা সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে কাতর বা অক্ষম, তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-বোধশক্তির মূলেই বিলক্ষণ দোষ প্রবেশ করিয়াছে ; রচন-রচন-কৌশল-বলে তাঁহারা কবি বলিয়া সমাদর পাইতে পারেন না। সৌন্দর্য্য রুচির সহিত এক-সূত্রে গ্রথিত। যে শ্মশানে দাঁড়াইয়া চিতাধূমাচ্ছন্ন গগন-মণ্ডলে নেত্র নিবদ্ধ করিয়া কুৎসিত সঙ্গীত গান করিতে পারে, সে প্রতিভাশালী পণ্ডিত হউক—কবি নহে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষে যে মহাশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা চিরপ্রচলিত প্রথা পদ্ধতির বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কেবল চরিত্র গৌরবে অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। ভগবান্ শাক্যসিংহ ও বৌদ্ধাচার্য্য উপগুপ্ত তজ্জন্য চির প্রসিদ্ধ। মগধাধিপতি বিম্বিসারের শাসন সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়—তিনি বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার রাজপুরী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ; লোকে প্রাণভয়ে পুরাতন ধর্ম্ম পুনঃগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইতিহাস বিখ্যাত প্রিয়দর্শন অশোক নরপতিও প্রথমে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মেই আস্থাবান্ ছিলেন ; অবশেষে মথুরা-প্রবাসী বৌদ্ধসন্ন্যাসী উপগুপ্তের মন্ত্র শিষ্য হইয়া অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে বৌদ্ধমত প্রচারিত করিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বৌদ্ধগণের মধ্যে কত দীন দরিদ্র ব্যক্তিও জনহিতব্রত সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এসকল এখন ইতিহাসের কথা, জীর্ণগ্রন্থে কীটাকুল হইয়া উঠিয়াছে ! সুতরাং সেকালে কি কৌশলে পথের কাঙ্গাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে পদানত শিষ্যরূপে বশীভূত করিয়া দেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা আর জীবন্ত ভাবে দর্শন করিবার উপায় নাই। কবি তাহার কয়েকটি চিত্র সঙ্কলিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ত্যাগ ও পরসেবা এবং উপগুপ্তের নির্লিপ্ত চরিত্র সুকৌশলে ভাষা নিবদ্ধ করিয়াছেন। পাটলি-পুত্রের নগরোপকণ্ঠে কুক্কুটারামে অবস্থিত হইবার পূর্ব্বে উপগুপ্ত মথুরায় অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহার তরুণ জীবন। কিন্তু তরুণ জীবনেই তিনি উচ্চলক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ব্রহ্মচার্য্য ও আত্মসংযম সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার চরণতলে ভারতবর্ষের নরনারী ও তাহাদের অদ্বিতীয় সম্রাট্ প্রিয়দর্শন অশোক লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন। মথুরায় অবস্থান করিবার সময় তিনি নগর প্রাচীরতলে সুপ্ত থাকিতে একদা কোন

অভিসারিকার চঞ্চল পদ তাঁহার গাত্রে পতিত হয়। তখন

নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণ গগনে,
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

সুতরাং কোথায়ও কেহ দেখিবার লোক ছিল না। রমণী এরূপ সময়ে এরূপ স্থানে সহসা নবদেহ স্পর্শে চমকিত হইয়া প্রদীপ ধরিয়া দেখিল—

নবীন গৌর কান্তি।
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণা কিরণে বিকচ নয়ান
শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান,
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

নয়নে "লজ্জা জড়িত" হইলেও, রমণী রূপ দেখিয়া আত্ম সম্বরণ করিতে পারিল না। মুখরার ন্যায় তাঁহাকে স্ব ভবনে আহ্বান করিয়া ফেলিল! উপগুপ্ত বলিলেন :—

অয়ি লাবণ্য পুঞ্জে।
এখনো আমার সময় হয় নি,
যেথায় চলেছ, যাও তুমি ধনী,
সময় যে দিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।

অল্পদিনের মধ্যেই সে সময় আসিল; উপগুপ্তও প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন। কিন্তু হায়! সেদিন রমণী বসন্তরোগগ্রস্তা গলিতদেহা;—

রোগমসি ঢালা কালি তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুর পরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।

উপগুপ্ত সেই দিনটিতে তাহার শিয়রে আসিয়া শ্মশান শয্যায় স্বহস্তে সর্ব্বাঙ্গে ঔষধ লেপন করিতে বসিলেন। এই সন্ন্যাসীর চরিত্রবলেই উত্তরকালে ভারতবর্ষের পুণ্য নাম দেশ দেশান্তে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে কেহ ইঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সঙ্গে এই চরিত্র সৌন্দর্য্য মিলাইয়া দেখ,—ইহার নিকট কত চন্দ্রকরোজ্জ্বল নির্ম্মল রজনী মলিন বলিয়া বোধ হইবে না কি?

আর এক সময়ে আমাদের দেশে অন্যবিধ আর একটি মহাশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল;—তাহার জন্মস্থান পঞ্চনদ, জন্মদাতা গুরু নানক ও শক্তি বিধাতা গুরুগোবিন্দ, ইতিহাসে সুপরিচিত। যাহারা এই মহাশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা শিখ্ নামে পরিচিত হইয়া বীরদর্পে অদ্যাপি সভ্যজগতে সম্মান লাভ করিতেছে। কিন্তু কবে কিরূপে এই শক্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল, কেহ তাহার সন্ধান রাখিত না। যখন ফুটিয়া উঠিল, তখন সকলেই চাহিয়া দেখিল;—

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ্—
নির্ম্মম নির্ভীক্।

তখন কাণ পাতিয়া সকলেই শুনিল;—

"অলখ নিরঞ্জন"—
মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয় ভঞ্জন-
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
অসি বাজে ঝঞ্জন।

দিল্লীর বাদশাহের সহিত অল্পদিনের মধ্যেই এই নবাগত মহাশক্তির সংঘর্ষ সমুপস্থিত হইয়াছিল। সে সংঘর্ষে শিখ্ বহুবার পরাজিত হইলেও কদাচ বশীভূত হয় নাই। দিল্লীশ্বরের বাহুবল ছিল, তাহার নিকট লক্ষ লক্ষ শিখ্ মাথা পাতিয়া জীবন দান করিয়াছে, কিন্তু একটি প্রাণীও কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরে জীবন ভিক্ষা করে নাই! গুরুদাসপুর গড়ে

মোগল শিখের রণে
মরণ আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুই জনা দুই জনে।

ইহার একটি কথাও কবিকল্পিত নহে; কিন্তু এত করিয়াও এই যুদ্ধে শিখ্দীর বন্দা বন্দী হইয়াছিলেন। মোগলেরা তাঁহাকেও তাঁহার পার্শ্বচরগণকে দিল্লীতে বাঁধিয়া আনিল। সেখানে যাহা হইল, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই!

পড়িগেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ　করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি
দিন গেলে প্রাতে　ঘাতকের হাতে
বন্দীরা সারি সারি
"জয় গুরুজীর　কহি শত বীর
শত শির দেয় ডারি।

জীবন রক্ষার জন্য পাড়া পাড়ি করাই জীবের প্রকৃতি;

জীবন বিসর্জ্জনের জন্য এমন কাড়া কাড়ি করিতে শিখ্ ভিন্ন আর কেহ শিখিয়াছিল কি না সন্দেহ। দিল্লী বীর-শোণিতে প্লাবিত হইয়া গেল; অবশেষে

বন্দার কোলে কাজি দিল তুলে
বন্দার এক ছেলে;
কহিল, ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।

* * * *

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোট ছেলেটিরে
লইল বক্ষে টানি।

* * * *

তার পরে ধীরে কটিবাস হতে
ছুরিকা খসায় আনি—
বালকের মুখ চাহি
"গুরুজীর জয় কাণে কাণে কয়
"রে পুত্র ভয় নাহি।"

পিতাপুত্র উভয়কেই জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইল। ঘাতক বন্দার দেহ সাঁড়াশি দগ্ধ করিয়া ছিঁড়িল; কিন্তু—

স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি
একটি কাতর শব্দ!

শিখ্ কিরূপ নির্ম্মল নির্ভীক্ তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতে গিয়া, সে কিজন্য নিম্মল নির্ভীক্ তাহাও সুকৌশলে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শিখের ইতিহাসে অকাতরে মুণ্ডদানের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তজ্জন্য গুরুগোবিন্দের মৃত্যু ও তরুসিংহের জীবনবিসর্জ্জনের গাথাও প্রদত্ত হইয়াছে।

পঞ্জাবের শিখের ন্যায় দাক্ষিণাত্যের মারাঠারাও এক দিন নববলে বলিয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিল। শিখ নির্ম্মল নির্ভীক্—মারাঠা কর্ম্মনিষ্ঠ ও সুচতুর। শিখ্ ক্ষুদ্ররাজ্য গঠন করিয়াছিল; মারাঠা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রধান্য লাভের উপক্রম করিয়াছিল। কি জন্য মারাঠা দিল্লীশ্বরকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে অক্ষম হইয়া আবার কালক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, কয়েকটি চিত্রে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মারাঠা শক্তির জীবন প্রভাতে—মারাঠা শক্তির জীবনদাতা ছত্রপতি শিবাজী গুরু রাম দাসের গৈরিক বসনের পতাকা উড়াইয়া পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন; যে যেখানে ছিল স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের উদ্ধার কামনায় পতাকা-তলে সমবেত হইয়াছিল। জীবন মধ্যাহ্নে পেশোয়ারবংশের ধন লিপ্সায় মারাঠাশক্তি স্বার্থ চিন্তায় পরার্থ বিস্মৃত হইয়াছিল; জীবন সন্ধ্যায় তাহারা দস্যু তস্কররূপে মানব সমাজে উপদ্রব করিয়া তৃণ জঙ্গলের ন্যায় একে একে ভস্ম হইয়া গেল!

রাজস্থানের রাজবংশধরগণ সামন্তসেনা সহায়ে ইতিহাসে যে সকল অদ্ভুত বীরকীর্ত্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্য দেশে দুর্লভ। রাজা ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়া সামন্তগণ তাঁহার আহ্বানে অকুতোভয়ে জীবন বিসর্জ্জন করিতে আসিত; রাজশক্তি প্রজা সাধারণের বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া রাজা বিচারকালে ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিস্মৃত হইতেন। একটি দৃষ্টান্ত দেখ;—

বিপ্র কহে "রমণী মোর
আছিল যেই ঘরে
নিশীথে সেথা পশিল চোর
ধর্ম্মনাশ তরে।
বেঁধেছি তারে, এখন কহ
চোরে কি দিব সাজা?"
"মৃত্যু" শুধু কহিলা তারে
রতন রাও রাজা।

ছুটিয়া আসি কহিল দূত—
"চোর সে যুবরাজ।
বিপ্র তাঁরে ধরেছে রাতে
কাটিল প্রাতে আজ!
ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে
কি তারে দিব সাজা?
"মুক্তি দাও" কহিলা শুধু
রতন রাও রাজা।

পড়িতে পড়িতে কবিকল্পিত কাহিনীর মত বোধ হয়, এমন ঘটনা কেবল রাজস্থানের ইতিহাসেই সম্ভবে! সে ইতিহাসে বীরের ন্যায় বীররমণীও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে পৃথিবীকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন। কবি তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া ছবিখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন! কোন এক বিশেষ যুদ্ধে রণোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করা সহজ, কেন না তাহা স্বাভাবিক। ধর্ম্মনাশ ভয়ে চিতায় প্রবেশ করা কঠিন হইলেও তেমন কঠিন নহে, কারণ দশের দৃষ্টান্তে উত্তেজনা আসিয়া দুর্ব্বলতাকেও বলদান করিয়া থাকে। কিন্তু প্রতি দিবসের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের ভিতরে স্বদেশের জন্য আত্মসুখ মুহূর্ত্তে তুচ্ছ করিয়া জীবনদানের জন্য অগ্রসর হওয়া তেমন সহজ নহে। সহজ না হইলেও রাজস্থানের পল্লীতে পল্লীতে নরনারীকে এইরূপে জীবন দান করিতে দেখিয়া ইতিহাসলেখক তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতির উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়া থাকেন। কবি এইরূপ একটি বিবাহসভার বর্ণনা করিয়াছেন। বরকন্যা "আঁচল বাঁধা আঁখি নত" মন্ত্র পড়িবার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান, এমন সময়ে মহারাণার দূত আসিয়া যুদ্ধের জন্য বরকে

আহ্বান করিল; তখন প্রহর খানেক রাত হয়েছে শুধু! শাঁখ বাজাইয়া মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ ব্যাপারটা শেষ করিয়া গেলেও না চলিত এমন নহে, কিন্তু রাজপুত সে শিক্ষালাভ করে নাই!

বাঁধা আঁচল খুলে ফেলে বর
মুখের পানে চাহে পরস্পর
কহে প্রিয়ে নিলেম অবসর
এসেছে ঐ মৃত্যু সভার ডাক।"

সত্য সত্যই বরের আর বিবাহ করা হইল না। কন্যা চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া বরের বাটীতে উপনীত হইলেন; কিন্তু তখন

নিশীথ রাতে বর সজ্জা পরা
মৈত্রিপতি চিতার পরে শুয়ে।

কন্যা ক্রন্দন করিলেন না, কপালে করঘাত করিলেন না, বসন ভূষণ খুলিয়া ফেলিলেন না; চিতায় বসিয়া পতিপদ ধারণ করিলেন। কবিও তাঁহার শোকে বসুধাকে দ্বিধা বিভক্ত হইবার জন্য অনুরোধ না করিয়া বলিয়া উঠিলেন:—

ধূধূ করে জ্বলে উঠল চিতা—
কন্যা বসে আছেন যোগাসনে।
জয় ধ্বনি উঠে শ্মশান মাঝে
হুলুধ্বনি করে পুরাঙ্গনা।

কিন্তু আপাদ মস্তক এরূপ রুধির রঞ্জিত ঐতিহাসিক চিত্র বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান পাঠক পাঠিকার চিত্ত রঞ্জন করিতে কতদূর সক্ষম হইবে, তাহাতে কিছু সন্দেহ বোধ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপেক্ষা গানই অধিকাংশ বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত, তাহা ক্রমশঃ নিম্ন স্তরেও গড়াইয়া পড়িতেছে। সুতরাং কবি বন ফুলের মালার গান গাহিয়া মন ভুলাইয়া এখন রক্ত তিলক পরা কৃপাণকরা ভৈরবী মূর্ত্তির বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন দেখিয়া, বাঙ্গালী ভয়ে চক্ষু মুদিয়া ঘন ঘন শ্রীদুর্গা স্মরণ করিতেছে না, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।

স্কটলণ্ডের সমর কবিতা, রাজ স্থানের অমর কবি চন্দ ভট্টের বীর গাথা, এ সকলই কিন্তু কথার আকারে ছড়ার সুরে সরল ভাবে গ্রথিত। জন সাধারণ শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিবে, বালক বালিকা ক্রীড়া কৌতুকের ন্যায় আবৃত্তি করিবে, শ্রমজীবী চিত্তবিনোদনের জন্য পরিশ্রমের সময়ে [illegible] ন্যায় গুণ্ গুণ্ করিয়া গান করিবে,—তাহাই এই শ্রেণীর কবিতার লক্ষ্য হইলে, ইহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, কবি বোধ হয় সেই জন্যই ইহাকে কাব্য, কবিতা বা তদ্রূপ কোন গুরুতর নামে পরিচিত না করিয়া বিনীতভাবে বলিয়াছেন—ইহার নাম "কথা"। আমাদের ভাষায় যে "কথা" নাই, তাহা ঠিক নহে। সুয়া রাণী দুয়া রাণীর কথা, ঘুম পাড়ানিয়া মাসি পিসির কথা, বেহুলা লখিন্দরের কথা, দাশুরায়ের নলিনী ভ্রমরের কথা এবং পৌরাণিক কীর্ত্তি-কাহিনী ও মেয়েলী ব্রতের কথায় বাঙ্গালা দেশ আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তথাপি এ দেশে উচ্চ লক্ষ্যের খাতিরে তুচ্ছ কর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া লক্ষ্য সাধন করিবার কথা নূতন করিয়া রচনা করিবার প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে। যিনি প্রথমে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাঁহার উদ্যম হয়ত কিছুদিন লোকের নিকট তেমন ভাল লাগিতে না পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর কথা একবার ভাষায় স্থান লাভ করিলে কালে যে তাহা বহুমূল্য অলঙ্কার বলিয়া স্বীকৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ হয় না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

হিমাচল বক্ষে।

(২)

জমীদার মহাশয়ও তাঁহার অনুচরকে ডাকবাঙ্গলায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া আমি একটু আশ্বস্ত হইলাম। জনমানবশূন্য নির্জ্জন স্থানে মনুষ্য-সমাগম যে কি প্রীতি-কর তাহা অন্তরে অনুভব করিলাম। বলা বাহুল্য যে, এই দিবা দ্বিপ্রহরে, কোন ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে, কিম্বা আরব্যোপন্যাসসুলভ আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ ঘর্ষণ করিয়া, এই মরুতুল্য অচল পৃষ্ঠে তিনি খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিবেন, এরূপ দুরাশায় আমরা আশ্বস্ত হই নাই। আমার মনে হইল আমি এ অঞ্চলের পথ ঘাট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অপরিচিত পথ ভ্রমণে নানা অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা, এ অবস্থায় তাঁহার ন্যায় একজন স্থানীয় ভদ্রলোকের নিকট অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিব, ইহা অল্প সুবিধার কথা নহে। আহারাভাব হইলেও বড় দুশ্চিন্তা ছিল না; এজীবনে ত কতদিন একাদশী করিয়াই অতিবাহিত করিয়াছি, ক্ষুধায় কাতর হইয়া গিরিবক্ষনিঃসৃত নির্ঝরের স্ফটিক বিমল জলধারা আকণ্ঠ পুরিয়া পান

করিয়াছি, কখন তাহাও পাই নাই, কিন্তু কোন দিন ত পড়িয়া থাকে নাই, আজিকার এ দীর্ঘদিনও না হয়, সেই ভাবে অতিবাহিত হইবে। উপবাসই এ পথের প্রধান সম্বল, তবে দৈবাৎ কিছু আহার্য্য মিলিলে তাহা নিতান্তই ভগবদানুগ্রহ মনে হইত। সুতরাং আহারের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্মিতমুখে জমীদার মহাশয়ের অভ্যর্থনা করা গেল।

ডাকবাঙ্গালায় সাধু সন্ন্যাসীর আবির্ভাব দেখিয়া জমীদারমহাশয় মহাসম্ভ্রমে আমাদের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিলেন। অন্য কাহারও মনে যাহাই হউক, ইহাতে আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম, আমি এখনও ভালরকম 'সাধু' হইতে পারি নাই, গঞ্জিকার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, ভস্মে দেহ ভূষিত করিতে শিখিনাই, সাধু সন্ন্যাসীর মত নির্লজ্জ-ভাবে যাহা জানি না তাহা লইয়া অজস্র কারা-স্রোত উদ্গিরণ করিতেও এপর্য্যন্ত অভ্যস্ত হই নাই, তথাপি জমীদার মহাশয় আমার ন্যায় ক্ষুদ্রের চরণে প্রণিপাত করিলেন, ইহাতে নিজের ক্ষুদ্রতা অনুভব করিলাম, বড় অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম, আমার মনে সহসা একটা তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইল। মনে হইল, আমার এ সন্ন্যাস বিড়ম্বনার মধ্যেও কোন সুখ, কিছুমাত্র পরিতৃপ্তি নাই, যাহাতে আমার অধিকার নাই, অম্লানবদনে তাহা আত্মসাৎ করিয়া কেন পাতকগ্রস্ত হইতেছি? কেন অন্যকে প্রতারিত করিতেছি? কিন্তু অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি আর ফিরিবার উপায় নাই; আমার হৃদয়ে যতই অসাধুভাব থাক, আমার চিত্তে যতই দুর্ব্বলতা থাক, আমার জ্ঞান নেত্র যতই অন্ধ হোক, সাধুর অভিনয় আমাকে করিতেই হইবে, নতুবা ঐ পর্ব্বতপ্রান্তে কোন্ গিরি গুহায়, কোন্ তৃণাচ্ছন্ন অদৃশ্য রসাতলগর্ভে আমার মত নিরাশ্রয় শ্রদ্ধাবিশ্বাসশূন্য লোকের দেহ নিপতিত হইবে, কে বলিতে পারে? ভণ্ডামিটাও আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সময়ে সময়ে এতই আবশ্যক হইয়া উঠে। এ দোষ কাহার তাহা বলিতে পারি না, সাধু সন্ন্যাসীর, না লোটা, কম্বল, গেরুয়া বসনের? যাহারই হোক, কিন্তু আমার সুদীর্ঘ পার্ব্বত্য অভিযানের অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে হিন্দুর দেশ এই ভারতবর্ষ সাধুসন্ন্যাসিগণের দ্বারাই শাসিত। যাহারা সংসারের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়াছে, কামিনী কাঞ্চনের মোহবন্ধনচ্ছিন্ন করিয়া অনাদি অনন্ত বিশ্বদেবতার চরণে সুপবিত্র জীবনকুসুমাঞ্জলি দান করিয়াছেন—তাঁহাদেরই মঙ্গলকিরণানুরঞ্জিত নৈতিক প্রভাবে যে দেশ শাসিত হয়, যে দেশের সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, সে দেশ চিরদিন আধ্যাত্মিক উন্নতির সমুচ্চ শিখরে আরূঢ় থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমাদের দেশের এ শোচনীয় অধঃপতন কেন? আমাদের ন্যায় এবং আমাদের অপেক্ষাও নরাধম সন্ন্যাসি-দলের আতিশয্যই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হইল। ভণ্ডামী সর্ব্বত্র এমন কি 'সন্ন্যাসগিরি'ও এখন একটা ব্যবসায়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যবসায়ে পরিশ্রম অল্প, দারিদ্র্যের ঝঞ্ঝাট নাই, অথচ লাভের সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় আছে, সেই ব্যবসায়ের দিকে বহুলোকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাহার ফলে মঠধারী মহান্ত হইতে ভেকধারী ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই শুকদেব গোস্বামীর অভিনব সংস্করণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারা আর কিছু না জানুক এটুকু জানে যে এই গৈরিকবসন ভারতজয়ী। ভারতের এমন স্থান নাই যেখানে ইহা সবল ও দুর্ব্বল সর্ব্বশ্রেণীর ভয় ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে না পারে। হয়ত আমাদের দেশের জনকত শিক্ষিত যুবক প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া ইহার প্রতি বীতরাগ, কিন্তু এ ত্রিশকোটী ভারতবাসীর মধ্যে তাঁহারা কয় জন? কয়জন তাঁহাদের মতের সারবত্তা স্বীকার করে? ত্রিশকোটীর মধ্যে তাঁহাদের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি, তাহাদের যুক্তি, বিশ্বাস সমস্ত ডুবিয়া যায়।

প্রলোভন ত অল্প নহে, এই রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ডের মহিমায় কত নরপিশাচ বিনা পরিশ্রমে উদর পুরিয়া আহার করিয়া থলি ভরিয়া অর্থ লাভ করিতেছে, দেশ ছাড়িয়া নাম বাহির করিতেছে। হিন্দুর গৃহদ্বার সাধুসন্ন্যাসীর জন্য উন্মুক্ত দেখিয়া, দলেদলে লোক যে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু শিক্ষিত লোক যতই নাসিকা কুঞ্চিত করুন, অশিক্ষিত জনসমাজে, অন্তঃপুরে এখনও গৈরিক বসন ও ভস্মাডম্বরের অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, এখনও তাহারা হিমাচলের পাষাণবক্ষ হইতে কন্যাকুমারিকার সুনীল সিন্ধুসলিল বিধৌত শ্যামল তটভূমি পর্য্যন্ত অটুট অধিকার বিস্তৃত রাখিয়াছে। সরলতার প্রতিমা, শ্রদ্ধাভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ভারতলক্ষ্মীগণ

সাধু দেখিলেই, সে যতই পাপিষ্ট হউক, ভক্তিভরে মস্তক অবনত করেন, তাহার পর যদি সেই সাধু নানা 'তীরথ' দর্শন করিয়া থাকেন, কিম্বা দর্শন না করিয়াও অসঙ্কোচে মিথ্যা বলিয়া সর্ব্বতীর্থ সন্দর্শনের অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, দুই চারিটা অশুদ্ধ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে গৃহলক্ষ্মীগণ ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়ে তাহাদের জন্য যে শুধু আটা ঘৃতের বন্দোবস্ত করেন তাহা নহে, অম্লান বদনে তাঁহারা তাঁহাদের সযত্ন সঞ্চিত স্বর্ণ ও রজতখণ্ডও সাধুচরণে উপহার দান করিয়া আত্মার পরিতৃপ্তি লাভ করেন। হিমালয়ের নিভৃতবক্ষেও এমন ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর অভাব নাই, ইহা তাঁহাদের জাতীয় প্রকৃতি। আমার পরিধানে যদিও গৈরিক বসন, অঙ্গে ভষ্ম ও মস্তকে জটাভার ছিল না, তথাপি আমার মলিন ছিন্ন বস্ত্র, আজানুবিলম্বিত কম্বল, সুদীর্ঘ পর্ব্বত ভ্রমণের জষ্টি এবং ধূলিময় বিশৃঙ্খল কেশরাশি আমার সাধুত্ব বিঘোষিত করিতেছিল। তাহার উপর সাধুর ভণ্ডামিও যে একেবারে না ছিল এমন নহে, স্থান কাল পাত্র বিবেচনায় নিজের সন্ন্যাস-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত দুই চারিটি সাধু বাক্যও প্রয়োগ করিতে হইত, কিন্তু তাহার একটি উপদেশও প্রতিপালন করা কি কঠিন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় কোন দিন হয় নাই। বাহিরের কম্বল ও ভিতরের আত্মম্ভরিতা ইহাই আমাদের সন্ন্যাসের প্রধান সম্বল। আমরা সাধু!

যাহাহউক, লোকের ভিতরের দিকটা সহসা অন্যের দৃষ্টিপথে পড়ে না, আর বাহ্যিক খোলস দেখিয়াই মনুষ্যের মর্য্যাদার বিচার হয়, তাই জমীদার মহাশয় আমাকে একটি মহাতেজস্কর সাক্ষাৎ বিশ্বামিত্র তুল্য পরাক্রান্ত তপস্বী স্থির করিয়া আমার অদূরে ধরাসনে সসম্ভ্রমে উপবেশন করিলেন। তাঁহার অনুচর পদাতিকদ্বয় কিছুদূরে বসিয়া শ্রমদূর করিতে লাগিল। আমরা তিহরী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি শুনিয়া জমীদার মহাশয় আত্মপরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই পরিচয় হইতে জানিতে পারিলাম, তিনি তিহরীর রাজার একজন অতি নিকট কুটুম্ব! এই কুটুম্বিতাসূত্রে তিনি তিহরীর রাজপরিবার হইতে একখণ্ড ক্ষুদ্র জমীদারী লাভ করিয়াছেন, এই জমীদারির আয় হইতেই তাঁহার সংসার প্রতিপালন ও সাধুসেবার কার্য্য নির্ব্বিরোধে সম্পন্ন হয়। একথাটা শুনিয়া আমাদের সেই শিক্ষা সভ্যতা সমাচ্ছন্ন নদীমেখলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশের স্বধর্ম্ম নিরত রাজপ্রসাদ লোলুপ জমীদার পুঙ্গবগণের কথা মনে পড়িল। তাঁহাদের মধ্যে কয় জন সাধুসেবাকে তাঁহাদের পারিবারিক কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন? সে রূপ জমীদার বাঙ্গালাদেশে শতকরা একজনও আছেন কি না সন্দেহ। এমন একদিন ছিল, যখন তাঁহাদিগের পুণ্য প্রয়াসী পিতৃপুরুষগণ পরোপকার সাধনে প্রচুর অর্থব্যয় জীবনের একটি আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তাঁহাদের গৃহে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত, সেই সকল পার্ব্বণোপলক্ষে যে প্রচুর ব্যয় বিধানের নিয়ম ছিল, দানদুঃখীকে অন্ন বস্ত্রদান, পরের দুঃখ মোচন ও প্রতিপালন, ও প্রজার নিকট হইতে লব্ধ অর্থের সদ্ব্যয় দ্বারা সেই নিয়ম প্রতিপালিত হইত, তাঁহাদের অতিথিশালায় বহুদূর দেশ হইতে সমাগত অতিথিগণ আশ্রয় লাভ করিত, তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত জলাশয় ও নিদাঘপীড়িত, তৃষার্ত্ত প্রজাপুঞ্জের জলকষ্ট নিবারণ করিত। পুণ্যময়ী গৃহলক্ষ্মীগণ পরসেবা-ব্রতকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করিতেন। কিন্তু আমাদের দেশের সে দিন আর নাই, আমাদের দেশে সুখ ও কর্ত্তব্যের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে এখন বিজ্ঞাপনের যুগ, যাহারা দেশ হিতকর কার্য্য করেন তাঁহারা অধিকাংশস্থলেই ঢক্কানিনাদ সহকারে স্ব স্ব মহিমা প্রচার না করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না, উপাধির আশায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা সৎকার্য্যে অর্থদান করেন, এবং গবর্ণমেণ্ট গেজেটে সেই দানের সংবাদ প্রচারিত হইলেই তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন। সৎকার্য্যের জন্য এরূপ দানেও দেশের উপকার হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি প্রতিনিয়ত এই প্রকার প্রলোভনই তাঁহাদিগের দানশক্তিকে পরিচালিত করিতে থাকে, তাহাহইলে কিছুদিন পরে দেশের নিঃস্ব অনাথগণ আর মুষ্টিভিক্ষা লাভেও সমর্থ হইবেন না, অতিথি অভ্যাগতের প্রতি সমাদর একেবারেই অনাবশ্যক প্রতীয়মান হইবে। বঙ্গ দেশে এমন একদিন ছিল যখন অতিথি সৎকার মহাপুণ্যের কার্য্য বলিয়া গৃহস্থগণের বিশ্বাস ছিল, এমনও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, যেদিন গৃহে কোন অতিথির আবির্ভাব না হইত, গৃহস্থ সেদিন নিতান্তই নিরর্থক গেল বলিয়া মনে

করিতেন। বাঙ্গলাদেশের লোকের হৃদয় হইতে এই প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে, এমন কি অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে গৃহে আশ্রয়দান করা একালে অনেকে মহা নির্ব্বোধের কার্য্য মনে করেন। এই সকল কারণে বঙ্গগৃহে আর তেমন অতিথির সমাগম হয় না। দেশভ্রমণের নানাবিধ সুবিধা হওয়াতে অতিথির সংখ্যারও অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে, নিতান্ত বিপদে না পড়িলে এখন আর কেহ কাহারও গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য প্রার্থনা করে না। কিন্তু পথ ঘাট বর্জ্জিত এই হিমাচল বক্ষস্থিত সস্তপ্ত দুর্গম পল্লী সমূহ সম্বন্ধে একথা খাটে না, এখানে অনেক প্রবাসী পান্থকেই বাধ্য হইয়া পরগৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইতে হয়। গৃহস্বামিগণও তাহাদিগকে আহার ও আশ্রয় দান একটি প্রধান কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহই রায় বাহাদুর বা রাজা খেতাব লাভের আশায় গবর্ণমেণ্টের হস্তে এক এক বাণ্ডিল কোম্পানীর কাগজ দান করেন না, মিউনিসিপালিটীর কমিশনর কিম্বা জেলা বোর্ডের মেম্বর হইবার আগ্রহ তাঁহাদের নাই, চাঁদার খাতায় তাঁহাদের সহিও দেখা যায় না, কিন্তু স্বয়ং অনাহারে থাকিয়াও গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আতিথ্য সৎকারে কোন দিন তাঁহাদের বিরাগ নাই। আর ইঁহা-দের সামর্থ্যই বা কতটুকু।—আমার সম্মুখে উপবিষ্ট ঐ যে জমীদারটি—পরিচয়ে বুঝিতে পারিলাম ইনি বেশ একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার, কিন্তু তাঁহার আকার প্রকার, কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গিতে তাহার পরিচয় পাইবার উপায় নাই, জমীদারীর আয় হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যায় না, কারণ ইঁহারা পার্ব্বত্য প্রদেশের জমীদার। আমাদের সমতল ভূমির জমীদারের ন্যায় কমলা দুই হস্তে ধন ধান্য বিতরণ করিয়া ইঁহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন না। হিমালয় অতুল সৌন্দর্য্যের আকর, হিমালয়ের নিভৃত পাষাণ বক্ষের ভিতর প্রসন্ন সলিলা প্রেম মন্দাকিনী অবিরল নির্ঝর ধারায় প্রবাহিতা, হিমালয়ের অপরিজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত অন্ধকার গহ্বরে কত মণিমুক্তা, কত কুবেরের ভাণ্ডার, লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য রাশি রাশি মণিমুক্তা সঞ্চিত আছে, কিন্তু হিমাচলের পাষাণ বক্ষে শস্যোৎপাদনের কোন সুবিধা নাই, চাষ করিবার উপযুক্ত জমি প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না, তথাপি উহারই মধ্যে বিশেষ চেষ্টা করিয়া অধিবাসিগণ গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য যৎসামান্য উৎপাদন করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করে, তদ্দ্বারা অতিথি সৎকারও করিয়া থাকে। প্রজার যেখানে এইরূপ অবস্থা সেখানে সেই সকল প্রজার ভূস্বামী জমীদারগণের অবস্থা যে কিছু মাত্র সচ্ছল নহে, তাহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

সুতরাং বলাবাহুল্য আমাদের এই জমীদার মহাশয়ের আয় অতি সামান্য, তবে তাঁহার একটা সুবিধা এই যে, তাঁহাকে রাজকর যোগাইতে হয় না। তাঁহার প্রজাগণ সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ এবং তিনি পুত্র নির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত আলাপে তাহাও বুঝিতে পারিলাম। আমরা এখন যেখানে বসিয়া আছি ইহাও তাঁহার জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত; এই স্থানটির নাম ডাক চওড়া। নামের ডাক খুব চওড়া হইলেও স্থানের জাঁক কিছু মাত্র পরিলক্ষিত হইল না, কিন্তু এজন্য স্থানটির প্রতি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করা যায় না। আমাদের বীরশূন্য বঙ্গদেশে আজকাল অনেক বীরেন্দ্র নাথ অনেক বিদ্যাশূন্য বিদ্যাবাগীশ এবং দৃষ্টিশক্তিশূন্য পদ্ম-লোচন দেখিতে পাওয়া যায়। যে দেশে ভূসম্পত্তিহীন ধনবান্ কেবল চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর মাত্র সম্বল করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট 'মহারাজা বাহাদুর' খেতাবে সম্মানিত হন, সে দেশে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য উপত্যকা যতই সংকীর্ণ হউক, তাহার নাম ডাক চওড়া হইলে সে নামের স্বার্থকতা সম্বন্ধে কাহারও কটাক্ষপাতের অধিকার নাই।

আমাদের আহারের কি বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য জমীদার মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার জমীদারীর মধ্যে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া সাধু সন্ন্যাসী যে আহারাভাবে কষ্ট পাইবে, ইহা তাঁহার অসহ্য, একথা তাঁহার কথার ভাবেই বুঝিতে পারিলাম। আমরা দেখিলাম, আহারের কোন আয়োজন করিয়া উঠিতে পারি নাই, তাঁহার নিকট এ কথা প্রকাশ করিলে তিনি বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন, অথচ সে ব্যস্ততায় কাহারও কোন লাভ নাই। আগ্রহ মাত্র সম্বল করিয়া মানুষ সকল সময় অভীষ্ট সাধন করিতে পারে না, বিশেষতঃ সম্বলশূন্য অবস্থায় এরূপ জন মানব বর্জ্জিত পাহাড়ের দুর্গম বক্ষে। তথাপি তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে

বলিতে হইল, সঙ্গে নিজের দেহ এবং যষ্টি ও কম্বল ভিন্ন অন্য কোন সামগ্রী নাই, এখানেও কিছু পাইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, সুতরাং আমরা আহারের সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া সুস্থির চিত্তে কাল যাপনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, আর ক্ষুধা তৃষ্ণাতে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত কাববার ব্রত গ্রহণ করিয়াইত এ ভীষণ পথে বাহির হইয়াছি, এ অবস্থায় অতিথি সৎকারের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা অনাবশ্যক।

কিন্তু মানুষ এ পৃথিবীতে আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক কাজও করিয়া থাকে, জমীদার মহাশয় অল্প কালের মধ্যেই তাহার নজীর প্রকাশ করিলেন; আমাদেব সঙ্গে কথা বার্ত্তা শেষ হইলে তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে ডাক বাঙ্গালোর বারান্দা হইতে নামিয়া গেলেন, কোথায় কি অভিপ্রায়ে যাইতেছেন তাহা প্রকাশ করিলেন না, আমরাও অবশ্য তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য জ্ঞান করিলাম। কৌতূহলের সহিত নীরবে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম তিনি দোকানদাবের রুদ্ধ দ্বারের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার তালাটা একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। তিনি যে পরের ঘবের তালা এভাবে পরীক্ষা করিবেন, এ সম্ভাবনা একবারও আমার কল্পনায় উদিত হয় নাই, এ অধিকার তাঁহার কতটুকু আছে তাহাও জানিতাম না। কিন্তু তিনি জমীদার মনুষ্য, পার্ব্বত্য প্রদেশের অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন ভূস্বামী—প্রজা পুঞ্জের জরু গরুর উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভুত্ব—তিনি ইচ্ছা করিলে একটা দোকানের তালার উপর তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিবেন, ইহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নহে। আমার নিকট এই দৃশ্য যতই বিস্ময় উৎপাদক হউক, তাঁহার পাইকগণ এ ব্যাপার দেখিয়া বিন্দুমাত্র ও বিস্ময় প্রকাশ করিল না। জমীদার মহাশয় বারকত তালাটা ধরিয়া টানাটানি করিয়া একটু দাঁড়াইয়া একবার কি চিন্তা করিলেন, বোধ হয় কিং কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার জমীদারীর মধ্যে তাঁহার সম্মুখে সাধু সন্ন্যাসী সারা বেলা অভুক্ত থাকিবেন, আর তিনি গৃহে ফিরিয়া পরম হৃষ্ট চিত্তে ও প্রসন্নমনে ডাল রুটির সদ্ব্যবহার করিবেন, আমাদের বঙ্গদেশের লক্ষ্যপতি গণের চক্ষে ইহা বিসদৃশ না ঠেকিলেও, হিমালয়-বক্ষ বিহারী সেই সরল হৃদয় সাধুভক্ত অশিক্ষিত জমীদারের নিতান্তই রুচি বিরুদ্ধ মনে হইতেছিল। কিন্তু পরের ঘরের তালা ভাঙিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহস্বামীর অজ্ঞাতসারে খাদ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না, তাই তিনি দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া কতক্ষণ চিন্তা করিলেন। অবশেষে আমার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া কৃতাঞ্জলী পুটে প্রকাশ করিলেন, যদি আমরা তাঁহার সঙ্গে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করি তাহা হইলে তাঁহার গৃহ পবিত্র ও তাঁহার জীবন ধন্য হয়। জমীদার মহাশয়ের গৃহ পবিত্র ও জীবন ধন্য করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, বিশেষতঃ ক্ষুধার আতিশয্য অনুসারে তাহা কর্ত্তব্য বলিয়াও মনে হইয়াছিল; কিন্তু তখন আমাব উপর মধ্যাহ্ন সূর্য্য সুতীব্র কিরণ জাল বর্ষণ করিতেছিলেন, পথের প্রস্তর খণ্ড অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, দেহেও ক্লান্তির অভাব ছিল না, সুতরাং অগত্যা ক্ষুধা নাশের সুখ অপেক্ষা বিশ্রামের শান্তিই তখন প্রার্থনীয় বোধ হইতেছিল; সুতবাং সেই মধ্যাহ্ন কালে এত কষ্ট সহ্য করিয়া তিন মাইল পথ আহারের প্রলোভনে নামিয়া যাওয়া কিছু মাত্র বাঞ্ছনীয় জ্ঞান হইল না। জমীদার মহাশয় শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। বোধ হয় কোন সাধু সন্ন্যাসীর মুখে তিনি আহারেব প্রতি এতখানি ঔদাসিন্যের কথা আর কখনও শ্রবণ করেন নাই, তাই পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি বলিতে লাগিলেন, সামান্য পথশ্রমের জন্য মহা প্রাণীকে এত কষ্ট দেওয়া কখন সঙ্গত নয়, তাঁহার গ্রামের পথ যেরূপ সিধা তাহাতে আমরা অতি সহজেই অল্প কালের মধ্যে লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব। কিন্তু আমি সর্ব্বত্যাগী সংযম-পরায়ণ সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার সকল প্রলোভন উপেক্ষা করিলাম, বলিতে কি শ্রীচরণদ্বয় তখন এই গুরুদেহ ভার বহনে অসম্মত হইয়া বসিয়াছিল, আর পথের সুগমতা সম্বন্ধে তিনি যতই ভরসা প্রদান করুন, এ অঞ্চলের পথ ঘাট সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না, এদেশের এক ক্রোশের পথও জানি, সোজা পথ যে কেমন সরল হইয়া থাকে, তাহাও আমার অজ্ঞাত নাই; তাই সবিনয়ে তাঁহাকে জানাইলাম যে এমন ছায়া শীতল আশ্রয় স্থান ও নিশ্চিত অনাহার পরিত্যাগ করিয়া আমি অনিশ্চিত আশ্রয় ও নিশ্চিত আহারের সন্ধানে আর ছুটিতে পারি না। বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে বিশ্রাম ভোগ করা যাইতেছে।

জমীদার মহাশয় বড় বিপদে পড়িলেন, এমন আহার-

সুখ-বিমুখ সাধু দেখিয়া তাঁহার ভক্তি নদীতে প্রবল জোয়ার বহিল। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া গোবধ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বিনামা প্রদানের যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার অনুচর পদাতিকদ্বয়কে সেই দোকানের তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্ম আদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা অবিলম্বে বিনা সঙ্কোচে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিল, দুই মিনিটের মধ্যে দোকানের দ্বার উন্মুক্ত হইল, জমীদার মহাশয় তাঁহার অনুচর দ্বয়ের সহিত দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমরা কৌতূহল বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহাদের অনুষ্ঠান দেখিতে লাগিলাম। জমীদার মহাশযের আদেশ ক্রমে পদাতিকদ্বয় সেই দোকানী শূন্য দোকান হইতে যথেচ্ছা পরিমাণে আটা, ডাইল, ঘৃত, লবণ ও লঙ্কা বাহির করিয়া আমাদের সম্মুখে সংস্থাপন করিল। আমার পাপ যে একেবারেই হয় নাই তাহা বলিতে পারি না, কারণ আমাদের ক্ষুধার পরিমাণ যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহাতে আমরা লুব্ধদৃষ্টিতে সেই সমস্ত দ্রব্যের প্রতি চাহিতে লাগিলাম, মনে হইল এই পাহাড়ের ভিতর এমন নির্ব্বান্ধব স্থানে বহুদিন আহারের এমন উপকরণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই; প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে কাহার বদন-কমল সন্দর্শন করিয়া ছিলাম তাহাও একবার চিন্তা করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞান একেবারেই বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই, তাই জমীদার মহাশয়কে জানাইলাম আমাদের মত মুসাফির লোকের এত অতিরিক্ত আটা, ডাইল, ঘৃতের কোন আবশ্যক নাই, সুতরাং দোকানদার বেচারীর এত জিনিষ নষ্ট করা যাইতে পারে না। কিন্তু জমীদার মহাশয় বলিলেন, আমাদের ন্যায় দুজন জোওয়ান সাধুর জঠরাগ্নিতে কতখানি দ্রব্য পরিপাক হইতে পারে তাহা তিনি জানেন, তাই তিনি দুবেলার উপযুক্ত রসদ বাহির করিয়া দিয়াছেন। অপরাহ্নে যদি আমরা এই বাঙ্গলায় থাকি তাহা হইলে ত আটা ঘৃত কাজে লাগিবেই, আর যদি নিতান্তই না থাকি, অর্থাৎ ছয় মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক অপর ডাক বাঙ্গলায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেও তাহার আবশ্যক হইবে, কারণ সেখানে একখানিও দোকান নাই। সাধুর ভবিষ্যৎ ক্ষুধার চিন্তায় জমীদার মহাশয়কে আকুল দেখিয়া বড় হাসি আসিল, কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, এই দুর্গম দুরারোহ পার্ব্বত্য পথে কেহ আমার কম্বলে দুই সের সোণা বাঁধিয়া দিলেও তাহা আমি বহিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত নহি, আটা, ডাইল, ঘি, লবণ ত দূরের কথা। শুনিয়া জমীদার মহাশয় বলিলেন পথে সোণা খাওয়া যায় না, কিন্তু দেহ ধারণের জন্য এ সকল দ্রব্য নিতান্ত আবশ্যক এবং এ বিষয়ে যখন আমাদের এত বিরাগ তখন আমরা কখনও ভাল সাধু হইতে পারি না, বিশেষতঃ তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সেবার জন্ম যে সকল দ্রব্য মাপিয়া বাহির করিয়াছেন, তাহা পুনঃগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের নিকট পতিত হইতে পারিবেন না, অতঃপর তাঁহাকে যেন আর অন্যায় অনুরোধ না করি! অবশেষে আমি সেই আটা, ঘি, ডাইল, লঙ্কা লবণের মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে বড় সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। আমার কথা শুনিয়া তিনি মুখ অন্ধকার করিয়া বলিলেন, আমরা বোধ হয় কোন কালেই গৃহী ছিলাম না, গৃহীর দ্বারে সন্ন্যাসী বা সাধু আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করার পর গৃহীর প্রদত্ত দ্রব্যাদির দাম জিজ্ঞাসা করা কেবল গৃহীর অপমান করা নয়, তাহাতে আতিথ্য ধর্ম্মও কলুষিত হয়, আমাদের আশীর্ব্বাদে সাধু সেবার এই সামান্য উপকরণের মূল্য প্রদানের সামর্থ্য তাঁহার আছে, আর সামর্থ্য না থাকিলেও তিনি ভিক্ষা করিয়া সেই মূল্য সংগ্রহ করিতেন। হায় জননী বঙ্গভূমি! তোমার সুফলা সুজলা শস্যশ্যামলা ক্রোড়ে বিলাসপটু অপব্যয়ী জমীদার পুঙ্গবগণের মধ্যে এমন সহৃদয় অতিথিবৎসল জমীদার কয়জন আছেন? আমারা সুশিক্ষিত, সুসভ্য, আলোক প্রাপ্ত. আর ইহারা অশিক্ষিত, ঘোর মূর্খ, অসভ্য !!! এতদিন পরেও শিক্ষা সভ্যতার প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিলাম না। সুতরাং নত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলাম, জমীদার মহাশয়ের শেষ কথাটায় আমাকে বড় অপ্রতিভ হইতে হইয়াছে। অবশেষে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম, ভদ্রলোক আমার কথায় মনে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন।

বেলা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া, আমরা জমীদার মহাশয়কে আর এখানে বিলম্ব করিতে নিষেধ করিলাম, বিশেষতঃ তাঁহাকে অনেকদূর যাইতে হইবে। তিনি তাঁহার সঙ্গী পেয়াদা দুজনের মধ্যে একজনকে আমাদের 'রসুই উসুই বানানেকো লিয়ে' রাখিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গন্তব্যপথে প্রস্থান করিলেন, যাইবার

সময়েও যাহাতে 'সাধু লোগোঁকো সেবা আচ্ছিতরে' হয় তাহার জন্য তাঁহার পেয়াদাকে সাবধান করিতে ভুলিলেন না। দোকানদার দোকানে না আসা পর্য্যন্ত দোকানের খবরদারি করিবার হুকুমও দান করিয়া গেলেন।

প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্য পদাতিকবর দুই জনের আহারোপযোগী আটা ভিজাইল। আমি বলিলাম, ও আর রাখিবার দরকার নাই, বিলকুল্ আটা ভিজাইতে হইবে। সে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার মনিব সাধুকে দেবতার মত ভক্তি করিয়া গেলেন, আর সে সামান্য ভৃত্য হইয়া সেই সাধু মহাত্মার কথার প্রতিবাদ করিবে, পাহাড়ী ভৃত্যের এত সাহস না থাকিলেও সে যাহা বুঝিল না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে ছাড়িল না। জিজ্ঞাসা করিল—"সমস্ত আটা পাঁচ জনের খোরাক, এত আটা কেন ভিজাইব?" আমি বলিলাম "আমাদের খোরাকও অল্প নহে।" অগত্যা সে বেচারা সমস্ত আটা ভিজাইয়া লইল, ভিজাইতে ভিজাইতে দুই একবার আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দেহের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল। যে উদরে এত আটা, ডাইল ঘৃত ও লবণের স্থান হইতে পারে, সে উদরের পরিধি সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা করাই বোধ হয় তাহার কটাক্ষপাতের উদ্দেশ্য।

আটা ভিজান শেষ হইলে, পেয়াদা সাহেব সাধু সেবার জন্য দোকান হইতে দোকানীর থালা বর্ত্তন বাহির করিয়া আনিল। অল্প ক্ষণের মধ্যেই অতি উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যের সৃষ্টি হইল—আটার খুব পুরু রুটি, আর খোসাওয়ালা কড়াইয়ের ডাল। ঘৃত, লঙ্কা ও লবণ সংযোগে তাহা অমৃতের ন্যায় উপাদেয় হইয়া উঠিল, আমরা মহানন্দে যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্তির সহিত ভোজনকার্য্য শেষ করিলাম, পেয়াদাও তাহার যথাযোগ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইল না। আহারের সময় একবার ভগবানের করুণার কথা মনে পড়িল, মনে হইল তাঁহার কৃপায় কি না হইতে পারে? তাঁহার ইচ্ছায় মরুভূমিতে বারিবর্ষণ হইতে পারে, শ্মশানে কুসুম ফুটিতে পারে, জন্মান্ধের নয়ন উন্মিলিত হয়, এমন কি, জনমানবশূন্য খাদ্যসামগ্রী লাভের সম্ভাবনা বিরহিত সমুন্নত গিরি-বক্ষে আটা, ঘি, ডাল, লবণ লঙ্কা দিয়া মহা সমারোহে সন্ন্যাসী-ভোজনও হইতে পারে—আজ ত তাহা প্রত্যক্ষই করিলাম। তথাপি তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারি না, তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না, বিপদের মেঘে চারিদিক সমাচ্ছন্ন দেখিলে কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া বলি, "হে ভগবন্! তোমার বিচার নাই, আমার ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তি টুকু নষ্ট না করিলে তোমার বিশ্ব নিয়ম কি ব্যর্থ হইয়া যাইত?"—হায় "তাঁহারই দেওয়া সুখ, তাঁহারই দেওয়া দুঃখ" সমান সহিষ্ণুতার সহিত উপভোগ করিতে পারি না কেন?

আহারাদির পর গৃহপ্রাচীরে ঠেস দিয়া বসিয়া মনে মনে এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম, আর পার্শ্বশায়িত সঙ্গীটির বিকট নাসাগর্জ্জন তাঁহার উদরের পরিতৃপ্তি ও সুখ-সুপ্তির অকাট্য যুক্তি বহন করিয়া আমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

শ্রীজলধর সেন।

তিন মিত্র।

১। আমরা অনেক সময়ে চিন্তা করি, কিরূপে আমাদের দুর্দ্দিন ঘুচিবে? এই অধঃপতিত জাতি কি প্রকারে আবার উন্নতির উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিবে? স্বজাতির প্রতি ভালবাসা মানবের অন্তরের এক স্বাভাবিক ভাব, এবং এ ভাব নিন্দনীয়ও নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন স্বীয় পরিবারের প্রতি বিশেষ ভালবাসা আছে, স্বজাতির প্রতিও সেইরূপ একটা বিশেষ প্রাণের টান আছে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, সে আবার কি? মানবজাতির প্রতি প্রেম থাকিলেই হইল, আবার একটা জাতীয়তার গণ্ডী দিবার প্রয়োজন কি? আমরা কিন্তু এরূপ বিশ্বজনীনতার পক্ষপাতী নহি। যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই পরিবার, সেই দেশের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্বন্ধ অবশ্যই আছে, এবং বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, বিশেষ ভালবাসাও আছে। ইহা সংকীর্ণত্ব নহে, বিশেষত্ব। কোন ব্যক্তি যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহা যদি সে বিশ্বপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া জগতের সকল লোককে বিলাইয়া দেয়, আর যাহাদের ভার বিশেষভাবে তাহার স্কন্ধে স্থাপিত হইয়াছে, সেই জনক জননী, স্ত্রী পুত্র অনাহারে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার অধর্ম্মই হয়, ধর্ম্ম কখনই

হয় না। ঈশ্বর যে বিধি আমাদের প্রকৃতিতে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করা কদাপি ধর্ম্ম নহে, পরন্তু সর্ব্বতোভাবে অমঙ্গলকর। এ জগতে সকলেই যদি সকলের জন্য ভাবে, কেহ যদি বিশেষভাবে কাহারও জন্য না ভাবে, তাহা হইলে আর সংসারে দায়িত্ববোধ বলিয়া একটা জিনিষ থাকে না, এবং অবশ্যম্ভাবিরূপে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি অসম্ভব হইয়া পড়ে; শিশুগণ নিঃসহায় হয়, বৃদ্ধ পিতা মাতা-কেও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, দেশের বাণিজ্য, ব্যবসায়, শিক্ষা সকলই নষ্ট হইয়া যায়, কারণ যাহা সকলের কাজ তাহা কাহারই কাজ নহে। জগতের ইতিহাস আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়? যে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি প্রেম যত প্রবল, সে জাতি তত উন্নত। কার্য্যে আমরা নিজ নিজ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, মুখে কেবল "ভারত" "ভারত" বলিয়া চীৎকার করি। যে প্রেম থাকিলে দেশের জন্য মহামতি ম্যাট্‌সিনির ন্যায় ফকির হইয়া দেশে দেশে বেড়াইতে হয়, সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখ সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হয়, প্রাণটাকে অনায়াসে অম্লানবদনে বিসর্জ্জন করিতে পারা যায়, সে প্রেম কোথায়? যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে এত বিলাস দেখিতাম না, এত বাক্যব্যয় দেখিতাম না, নীরবে সকলে বিন্দু বিন্দু শরীরের রক্ত দিয়া দেশের সেবা করিতাম। হায়! সে প্রেম কোথায় পাই, কিরূপেই বা জাগে?

২। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলেরই জন্য আছে। আমাদের হিমাচল, আমাদের সিন্ধুকাবেরী, য়ুরোপীয়-দিগকেও তৃপ্তি ও আনন্দ দান করে; পক্ষান্তরে য়ুরোপের আল্‌প্‌স্ ও আমেরিকার নায়েগ্রাও ভারতবাসী পর্য্যটকের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। এক পদার্থ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সকলেরই পক্ষে সব বস্তুকে মধুময় করিয়াছে। ভারতের প্রচুর-শস্যশালিনী ভূমি ইংলণ্ডের মুখে অন্ন দিতেছে, আবার ইংলণ্ডের শিল্প আসিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছে, এমন কি আমাদের ঘরে প্রদীপটি পর্য্যন্ত জ্বালিয়া দিতেছে। আমাদের ঋষি য়ুরোপে যাইয়া য়ুরোপীয়দিগকে অধ্যাত্মযোগ শিক্ষা দিতেছেন; য়ুরোপের উইলবারফোর্স ও ড্যামিয়ন আসিয়া আমাদিগকে নরসেবা শিক্ষা দিতেছেন। আমাদের কালিদাস য়ুরোপে পূজিত, য়ুরোপের সেক্সপিয়র আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। য়ুরোপের ম্যাট্‌সিনি, হ্যামডেন্ আমাদের অন্তরে স্বদেশ-প্রিয়তা জাগাইতেছেন, আমাদের সন্ন্যাসিগণ য়ুরোপীয়-দিগকে বিকৃত স্বার্থ-বিষাক্ত জাতীয়তার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া বিশ্ব-প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে শিক্ষা দিতেছেন। সুতরাং আমাদের দেশে যাহা আছে তাহাই ভাল ভাবিয়া জগতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে চলিবে না; পরন্তু যে দেশে যে উন্নতি হইয়াছে ও হইবে তাহাই আনিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধনে নিযোগ করিতে হইবে, নতুবা জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যে জাতি যাহা কিছু পায় তাহা জগৎপিতা ঈশ্বরের নিকট হইতেই পায়, সুতরাং তাহাতে সকলেরই অধিকার আছে। পাছে বিদেশীয় আলোক প্রবেশ করে, এই ভয়ে সর্ব্বদা হৃদয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে, দিন দিন ঘন অন্ধকার আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিবে, নিজের ক্ষীণালোক ক্রমে মন্দীভূত হইয়া অবশেষে একেবারে নিভিয়া যাইবে।

৩। অনেকের মনে জাতীয় বিদ্বেষ অতিশয় প্রবল। ইংরাজ ফরাসীর নাম শুনিতে পারে না, ফরাসী ইংরাজের উপর সর্ব্বদাই খড়্গহস্ত। প্রবল প্রতাপান্বিত য়ুরোপীয় জাতিগণ যেন পরস্পরকে বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, এবং অকারণে দুর্ব্বলজাতিদিগের সহিত কলহ বাধাইয়া তাহাদের দেশ ও স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদের জাতীয় জীবন নষ্ট করিয়া দিতেছে! ইহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়; ইঁহাদের সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও ইঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, যে সকল জাতিরই স্বার্থ এক, জগতের উন্নতিই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং এক জাতিকে বিনাশ করিয়া অপর জাতির উন্নতি হইবে না, সকলে হাত ধরা ধরি করিয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে উঠিতে হইবে। মানবের প্রতি প্রীতিহীন হইয়া, ঈশ্বরকে ভুলিয়া, নরশোণিত পান করা কদাপি সভ্যতা নহে; বস্তুতঃ ভক্তি, প্রীতি ও সভ্যতা একই পদার্থ, তাহার মধ্যে দমদম্ বুলেট্ ও ম্যাক্সিম্ গানের কোন স্থান নাই।

এখন প্রশ্ন এই,—কোন জাতিই যে জগতের অন্যান্য জাতিকে পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারেন না, এই মহৎ উজ্জ্বল সত্যটা তাঁহারা অনুভব করেন না কেন? ইতিহাস ত এই সত্যটাকে চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া

দেখাইয়া দিতেছে। জগতে যে জাতি এক সময়ে উন্নত ছিল, কালক্রমে তাহার অধঃপতন হইয়াছে, আবার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিও সময়ে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে। সাগর-তরঙ্গের ন্যায় জগতে এইরূপ উত্থান পতন চিরদিনই দেখা যাইতেছে। কোন জাতি যতই উন্নত হউক না কেন, অন্যান্য জাতির সহিত নানা সূত্রে তাহার যোগ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং হীনজাতিকে উন্নত করিতে না পারিলে উন্নত জাতিকেও ক্রমশঃ হীনতা প্রাপ্ত হইতে হয়, কারণ যোগে ভাবের বিনিময় অনিবার্য্য। এরূপ অধোগতি হইতে কি জাতি, কি ব্যক্তি, কি সমাজ, কেহই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। চীন দেশের উন্নত প্রশস্ত প্রাচীর তাহাকে অন্যান্য দেশ হইতে বিযুক্ত করিয়া বহিরালোককে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই; সুতরাং বিশাল চীনরাজ্য আজ বিদেশীয়দিগের কুক্ষিগত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতএব যোগেও রক্ষা নাই, বিয়োগেও রক্ষা নাই, রক্ষা কেবল পরস্পরের উন্নতি সাধনে।

সমগ্র জগৎ এক মহা বিধানের অন্তর্গত, এক মহাসত্য, মহাসংকল্প—সকল মানবকে, সকল জাতিকে একসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে,—এই সত্য দর্শন করিলে, জাতীয়, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি সমস্ত বিদ্বেষ দূর হয়, ভ্রাতৃভাব আইসে, এবং সব সত্যকেই সেই মহাসত্যের অন্তর্গত জানিয়া, তাহাদের মধ্যে যে স্বাভাবিক যোগ আছে তাহা অনুভব করিয়া, আমরা নিঃস্বার্থ, পবিত্র ও উৎসাহান্বিত হইয়া আত্মকল্যাণ-সাধনে ও জগতের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন সত্যকে গ্রথিত করিয়া এক করিতে হয় না, তাহা প্রিয়দর্শন সুস্নিগ্ধ গোলাপের পত্রের ন্যায় স্বভাবতঃ একত্র সমাবিষ্ট ও নিত্যযুক্ত হইয়াই আছে, কেবল সেই যোগ দেখিতে পাইলেই হইল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত

সমালোচনা।

পট।*

'পট' একখানি গল্প পুস্তক। লেখক শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় মাসিক সাহিত্যের পাঠকবৃন্দের নিকট অপরিচিত নহেন। গল্প রচনায় দীনেন্দ্র বাবুর প্রতিষ্ঠা আছে; তাঁহার চিত্রিত "পটে" সেই প্রতিষ্ঠার হানি হইবে না, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

'পট' ছয়টী ডিটেক্‌টিভ গল্পের সমষ্টি। পুস্তকের ভূমিকায় দীনেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "বাঙ্গলায় ভাল ডিটেক্‌টিভের গল্প নাই" এ কথা বোধ হয় আমাদের শিক্ষিত পাঠকগণ অস্বীকার করেন না। চেষ্টা কিরূপে ব্যর্থ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত পাঠকগণ এই পুস্তকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।" দীনেন্দ্রবাবু তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া যাহাই বলুন, 'পট' পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। সত্যই বঙ্গভাষায় ইতিপূর্ব্বে আমরা এরূপ সংযত ভাষায় লিখিত, বর্ণনা নৈপুণ্যে অলঙ্কৃত, সুরুচি সঙ্গত ডিটেক্‌টিভের গল্প পাঠ করি নাই। এ পুস্তকখানি যে বাঙ্গলা ডিটেক্‌টিভের গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রেষ্ঠ বলিতেছি কেন, তাহার একটু কারণ প্রদর্শন করা বাহুল্য নহে। আজকাল ডিটেক্‌টিভ গল্প বলিলেই ইংরেজী অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠক কুৎসিত প্রণয়-রহস্য, পাপের বীভৎস কাহিনী, প্রতারণা প্রবঞ্চনার লোমহর্ষণ চিত্র, ঘৃণিত হত্যাকাণ্ড, পাপের পৈশাচিক দৃশ্য প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতে পারেন না। এ জন্য তাঁহাদের অপরাধ নাই; তাঁহারা এইরূপ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠেই অভ্যস্ত। ডিটেক্‌টিভ কাহিনী পাপচিত্র যে না হইতেও পারে, কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে পারে, বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ করিতে পারে, তাহা "পট" পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 'পটের' প্রধান গুণ এই যে, ইহার রুচি মার্জ্জিত; কোন স্থানে এরূপ একটী শব্দ নাই, যাহা আপত্তিজনক, বা যেজন্য এই পুস্তক গৃহ-লক্ষ্মীগণের হস্তে অসঙ্কোচে দেওয়া যায় না। বঙ্গরমণীগণ অনায়াসে ইহা পাঠ করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, গ্রন্থকারের ইহাই প্রধান কৃতিত্ব।

ইহা ভিন্ন 'পট' রচনায় গ্রন্থকারের অন্য প্রকার কৃতিত্বও পরিলক্ষিত হয়। বর্ণন-কৌশলে দীনেন্দ্র বাবু যে সিদ্ধহস্ত, তাহা পাঠকগণের অগোচর নাই; এই বর্ণনার গুণেই 'পটের' গল্পগুলি ঠিক সত্যঘটনার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই জন্যই বোধ হয় গ্রন্থকার, পুস্তকের নাম "পট" রাখিয়াছেন।

"হত্যা রহস্য"—গল্পটী একটী বৃদ্ধা রমণীর আত্মজীবন কাহিনীর একাংশ। এই গল্পটী আমাদের সকল অপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে—ভাল লাগিবার প্রধান কারণ বর্ণনার মাধুর্য্য, দ্বিতীয় কারণ গল্প রচনার কৌশল। বাঙ্গলা ডিটেক্‌টিভ-উপন্যাস সমূহে ইংরাজীর আদর্শে উপন্যাসের নায়িকাগণকে চোর ডাকাত ধরিবার জন্য গোয়েন্দাগিরি করিতে দেখা যায়; কিন্তু তাহার ভিতর বৃদ্ধা রমণীর অবতারণা এমন অস্বাভাবিক হইয়া উঠে, যে তাহা কোন প্রকারে খাপ খায় না,—যেন বিলাতী মেয়ে ডিটেক্‌টিভ বাঙ্গালা দেশের উপন্যাসের মধ্যে সাড়ী পরিয়া ঘুরিতেছে। কিন্তু এই 'হত্যারহস্যে' গল্পের নায়িকা কুসুমকে দেখিয়া একবারও মনে হয় না, যে বঙ্গালীর কন্যা বঙ্গবধূ নহে। প্রিয়তমকে প্রথম বিদেশে বিদায় দিবার সময় কুসুমের মনের ভাব, তাহার অন্তর্বেদনা অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। গল্পের নায়িকা কুসুম বলিতেছেন—

"সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে নগেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন, আমি অশ্রুপূর্ণনেত্রে, কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, আমি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। বসন্তের মৃদু সান্ধ্য সমীরণ হিল্লোলে বৃক্ষ পত্র মর্ম্মরিত হইতেছে, আম্র বাগানে অন্ধকার ক্রমে নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছে, ঝিঁ ঝিঁ অবিরাম ঝঙ্কার ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিতেছে. এবং বৃক্ষতলে, ঝোপের আড়ালে, বাগানের মধ্যে শত শত জোনাকী মিট্ মিট্ ক

* শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য; মূল্য একটাকা চারিআনা।

জ্বলিয়া সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকারে সহস্র চক্ষুর স্পন্দন দীপ্যমান করিয়া তুলিতেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে একাকিনী কতক্ষণ আমি বিহ্বল-চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পরে মনটা একটু শান্ত হইলে, উজ্জ্বল নক্ষত্র পূর্ণ আকাশের দিকে চাহিয়া যুক্তকরে বলিলাম, 'ভগবন্ নগেন্দ্রকে কুশলে রাখিয়ো; আমি আর কিছু চাহিনা।' এ দৃশ্য পল্লীগ্রামের এবং এ চিত্রমাধুর্য্য-মণ্ডিত বঙ্গবধূর!

বাঙ্গলা দেশের পাঠক সাধারণের সম্মুখে সাধারণতঃ যে সকল বাঙ্গলা ডিটেক্টিভ গল্প সংগৃহীত দেখা যায়, তাহা যে শিক্ষিত পাঠকের আনন্দ-প্রদ হয় না, তাহার প্রধান কারণ তাহার ভিতরে 'আর্ট' নাই; হয়ত তাহার ভিতর ডিটেকটিভ গল্পের সমস্ত উপাদান ভাদ্রের কূলপ্লাবিনী তরঙ্গভঙ্গময়ী ভাগিরথী বক্ষে আলুলায়িতকুন্তলা রমণীর লম্ফ প্রদান, খড়্গাঘাতে নিদ্রিত দম্পতির শিরশ্ছেদন করিয়া কোন বিপন্না রমণীর পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতন, এই রকম অসংখ্য বিষয় আছে, যাহা সাধারণ পাঠক নিশ্বাস রোধ করিয়া পাঠ করেন, আহার নিদ্রা ভুলিয়া যান, কিন্তু গল্প রচনার যাহা 'আর্ট', তাহার অভাবে সে গল্পগুলি সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া থাকে। চুরী, ডাকাইতি, নারী নির্য্যাতন, প্রভৃতি ব্যতীত আরও অনেক ব্যাপার যে ডিটেক্টিভের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানের বিষয় হইতে পারে, দীনেন্দ্র বাবু তাঁহার 'পটে' তাহা দেখাইয়াছেন। তাহার 'চক্ষুদান' 'হত্যা-রহস্য' 'জাল ডিটেক্টিভ' প্রভৃতি গল্প পাঠ করিয়া যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিতে পারা যায়; তাঁহার গল্প লেখার বিড়ম্বনা পাঠ করিয়া অতি গম্ভীর প্রকৃতি পাঠকেরও হাস্যোদ্রেক হয়। পুস্তক খানির ভিতর ও বাহির উভয়ই সমান হইয়াছে।

কিন্তু তথাপি আমরা দীনেন্দ্র বাবুকে ক্ষমা করিব না। মাসিক সাহিত্যে যিনি পরিচিত চিত্র আঁকিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পাঠকগণকে মুগ্ধ করিয়া দেন, যাঁহার 'হামিদা'র' ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস বঙ্গ সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভের যোগ্য ও আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে, তিনি ডিটেক্টিভের গল্প দিয়া বাঙ্গালী পাঠককে ভুলাইয়া রাখিতে চাহেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। চেষ্টা করিলে যিনি বঙ্গ ভাষার বরাঙ্গ হীরক-খচিত স্বর্ণাভরণে সজ্জিত করিতে পারেন, তিনি আজ একখানি ডাকের গহনা হাতে করিয়া ছেলে ভুলাইতে আসিয়াছেন, ইহা অসহ্য,—দীনেন্দ্র বাবুর এই কৃপণতা ক্ষমার অযোগ্য।

জীবজন্তু:—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। মূল্য ১॥০ টাকা। ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট সিটিবুকসোসাইটি হইতে প্রকাশিত।

সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখান যেমন পিতামাতার একটি চিন্তার বিষয়, তেমনি তাহাদিগকে পাঠ্যপুস্তক যোগানও একটি চিন্তার বিষয়। উঁহাদের ক্ষুধা অগাধ; কৌতূহল ততোধিক। কৌতূহল মনের ক্ষুধা। শারীরিক ক্ষুধার নিবৃত্তি যেমন আবশ্যক, মানসিক ক্ষুধার নিবৃত্তি তেমনি আবশ্যক। প্রথমোক্তটিকে খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা সহজেই সন্তুষ্ট করা যায়, কিন্তু শেষোক্তটিকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। একটি সপ্রতিভ শিশুর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে যিনি একদিন মাত্রও চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই আমাদের এই মন্তব্যের সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। অবিশ্রান্ত আহার যোগাইয়াও এই মানসিক ক্ষুধা দূর করা যায় না; এদিকে আবার খাদ্যের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসতর্ক হইলেই উৎকট রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

এই জন্যই সন্তানেরা লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিবামাত্র এই চিন্তা উপস্থিত হয়, যে ইহারা কি পড়িবে? স্কুলে গিয়া তাহারা কি পড়িবে, সে চিন্তা ততটা করিতে হয় না। কিন্তু স্কুলের বাহিরে কি পড়িবে, ইহাই প্রধান ভাবিবার বিষয়। পিতামাতার এদিকে দৃষ্টি থাকিলে তাঁহারা উপযুক্ত গৃহপাঠ্য পুস্তকের জন্য ব্যস্ত হন। যদি এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি না থাকে, তবে যে ছেলেদের কেবল স্কুলের পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক পড়া বন্ধ হইয়া যায় তাহা নহে, তখন তাহারা যাহা পায় তাহাই পড়ে, এবং তজ্জন্য অনেক সময় তাহাদের গুরুতর অনিষ্ট হয়।

কয়েক বৎসর যাবৎ বালক বালিকাদিগের জন্য অনেকগুলি গৃহপাঠ্য পুস্তক বাহির হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। এই সকল পুস্তকের লেখকগণের নিকট বাঙ্গালার প্রত্যেক সন্তানবান্ ব্যক্তি ঋণী। এরূপ পুস্তকের প্রচার আরো অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

"এরূপ" শব্দটা অতিশয় সাধারণ ভাবেই এ স্থলে প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'শিশুদিগের পাঠোপযোগী' এই কথা বলাই আমার অভিপ্রায়। তদ্ভিন্ন, আজকালকার এই শ্রেণীর অধিকাংশ বাঙ্গালা পুস্তকই যেরূপ কেবলমাত্র খেলার পুস্তক হইয়া দাঁড়াইতেছে, সকল পুস্তকই সেইরূপ হওয়া আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না। এই সকল পুস্তক পাইয়া আপাততঃ বালকবালিকাগণ যতই সন্তুষ্ট হউক না কেন, ইহাদের স্থায়ী মূল্য বড় অধিক নহে। ইহাদের দ্বারা শিশুপাঠ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের কতদূর সৌষ্ঠব ও পুষ্টি হইবে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

এরূপ গ্রন্থ যাঁহারা লিখিতেছেন, তাঁহাদের কলম কাড়িয়া লওয়ার কথা হইতেছে না। উঁহারা স্বচ্ছন্দে এই সকল পুস্তক রচনা এবং প্রচার করিতে থাকুন, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে এতদপেক্ষা সারবান্ গ্রন্থসকল প্রচারিত হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমি নীতি এবং ধর্ম্ম বিষয়ক গম্ভীর বক্তৃতা পুস্তকের কথা বলিতেছি না। এরূপ পুস্তক অনেক সময় শিশুর জনকজননীর চিত্তকেই আকৃষ্ট করিতে পারে না, শিশুর নিজের কথা আর কি বলিব! কিন্তু ইহা জানি, যে অন্যান্য ভাষায় ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীবনচরিত, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ইত্যাদি বিষয়ক শিশুপাঠ্য অতি উপাদেয় পুস্তক সকল আছে। কোন কল্পিত গল্পের অথবা হাস্যকৌতুকের পুস্তক তদপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক নহে। এবং ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া আমোদের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের যে উপকার হয়, গম্ভীর বক্তৃতা দ্বারা তাহা হওয়া অসম্ভব। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এই শ্রেণীর একখানি পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে দু একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পুস্তক খানির নাম "জীব জন্তু", গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। বর্ণনীয় বিষয় নামেতেই ব্যক্ত হইতেছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমার আর কিছু বলা আবশ্যক বোধ হয় না। দেখিতেছি,এ পুস্তকে বিষয়টি শেষ হয় নাই, সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য আমরা গ্রন্থকারের নিকট এ বিষয়ে আরো কিছু আশা করিতে পারি।

বালকদিগের উপযোগী ভাষায় ধারাবাহিক প্রাণী বৃত্তান্ত বিষয়ক এমন মনোহর বাঙ্গলা গ্রন্থ আমি আর দেখি নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং শিশুদিগের রুচি, উভয়ের অনুরোধ রক্ষা করিয়া পুস্তক লেখা অতিশয় কঠিন কার্য্য। এই কার্য্য এরূপ সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে গ্রন্থকারকে নিশ্চয়ই অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বালকগণের হস্তে যদি সকল সময় তাহাদের পড়িবার পুস্তক ক্রয় করিবার ভার থাকিত, তবে তাহারা দ্বিজেন্দ্র বাবুর এ পরিশ্রম ব্যর্থ হইতে কখনই দিত না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

২৫।১নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, বি, এ (কেম্ব্রিজ)।

KUNTALINE PRESS.



চতুর্থ ভাগ। } আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩০৮। {১০ম ও ১১শ সংখ্যা।

শোকার্ত্তা পুরী।

মহারাজ দশরথ, অযোধ্যার পতি,
কৈকেয়ীর সত্যপাশে বদ্ধ হ'য়ে যবে
নির্ব্বাসিলা সীতাসহ প্রিয় পুত্র রামে,
সৌমিত্রি-সহায়-মাত্র, ভীষণ দণ্ডকে,
রাজ্য-অভিষেক-হর্ষ মহান্ বিষাদে
পরিণত হ'ল হায় ; দিবালোক যথা
পরিণত অন্ধকারে রবির অভাবে—
রবিকুলরবি রাম, বিহনে তাঁহার
শোকতমোমগ্না, হায়, অযোধ্যানগরী।

নিশ্চেষ্ট, নীরব, লীন নাগরীকচয়,
নিজ নিজ কক্ষে, যথা বিহঙ্গমকুল
নিরানন্দ, নীড়লীন, ত্যজিয়া কাকলী
নিশার সঞ্চারে। শূন্য পড়ি রাজপথ,
নিরন্তর বাহে লোকপ্রবাহ মহান্,
সরযূর স্রোতসম আতটপ্লাবিনী,
কলকল নাদে, হায়, বহিত উল্লাসে।
বদ্ধ বিপণির দ্বার, দ্রব্য বিনিময়
নাহি করে কেহ ; নাহি শব্দলেশ কোথা
নীরব বাদিত্র, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
প্রভাতে সায়াহ্নকালে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি
দেবনিকেতনে কেহ নাহি শুনে আর ;
সমীরণ নাহি বহে ধূপের সুবাস,
নাহি আনে দূর হ'তে শ্রবণ-মধুর-
নরনারী হাস্যধ্বনি নিস্তব্ধ নিশীথে।
ধায় না পথের মাঝে হয়, হস্তী, যান
বহিয়া বিলাসপ্রিয় যুবক যুবতী
প্রমোদ-কানন-মুখে সায়াহ্ন সময়ে।

চন্দন সুরভিজলে নহে সিক্ত আর
দীর্ঘ রাজপথ চয়, ধূলায় ধূসর,
পত্রাকীর্ণ, যেন হায় শোকের মূরতি—
শ্বসিত বিষাদভরে পবন তাড়নে।
অযোধ্যার যোদ্ধৃকুল সিংহপরাক্রম
কোদণ্ড টঙ্কারে আর করে না ধ্বনিত
আকাশমণ্ডল ; নহে মল্লযুদ্ধে রত ;
না ছাড়ে হুঙ্কার আর হইয়া বিজয়ী,
স্ফীতবক্ষ, শুনি নিজ জয়োল্লাস ধ্বনি
ধ্বনিত সহস্র কণ্ঠে। ব্রাহ্মণনিচয়
তপোধন, মহাভাগ, স্বাধ্যায়নিরত,
ব্রহ্মঘোষ নিনাদেতে করে না মুখর
কাননের বায়ুরাশি, পবিত্র নির্জ্জন।
গগন আচ্ছন্ন নহে হোমধূমে আর ;
সুপবিত্র হবির্গন্ধ বহি সমীরণ
করে না প্রসন্ন চিত মধুর প্রভাতে।
যায় না উদ্যানে ক্রীড়া করিবার তরে
কুমারীনিচয়, আহা, পবিত্র, সরল, !
বসন ভূষণ পরি। গৃহে কুলবালা
হাস্য পরিহাসে রত নহে সন্ধ্যাকালে,
সমাপিয়া গৃহকর্ম্ম ; গাহে না অথবা
মিলাইয়া কণ্ঠধ্বনি পবিত্র চরিত
মহীয়সী মহিলার নারী শিরোমণি !
প্রাণহীন মহাপুরী, নিস্তব্ধ, ভীষণ—
মৃত্যুরাজ্যসম, যেন জীবের সঞ্চার
নাহিক কোথাও, হায় ! স্পর্শিয়া গগন
দাঁড়াইয়া মধ্যস্থলে রাজার প্রাসাদ
মনোহর, সুবিশাল, বিচিত্র গঠন।
রুদ্ধ বহির্দ্বার তার, পিহিত কপাট ;
নিশ্চেষ্ট প্রহরী, ত্যজি বেত্র ধনুঃশর।
রাজসভা জনহীন , রাজসিংহাসন
শূন্য পড়ি সভামাঝে ; সভাসদচয়
কে কোথায় আছে, তাহা কেহ নাহি জানে।
শুধু কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মহর্ষি,
কাশ্যপাদি ঋষিগণে হ'য়ে পরিবৃত,
উপবিষ্ট এক পার্শ্বে শোকাকুল মনে।
জনশূন্য কক্ষ্যাচয়, কেবল প্রহরী
দাঁড়াইয়া দ্বারদেশে বিষাদিত চিতে,
কর্ত্তব্যবিরতমন ; ভাবে চক্ষু মুঁদি,
(বৃদ্ধ দ্বারী বলিতাঙ্গ, পলিত কুন্তল)
রামের সুচারু রূপ, অমিয় বচন,
করুণ হৃদয়, মরি, দয়ার আধার—
সৌমিত্রির তেজোগর্ব্ব প্রফুল্ল মূরতি
যবে দোঁহে অন্তঃপুরে করিত প্রবেশ
বন্দিতে জননীগণে। হায়, এবে তারা,
সুকুমার রাজপুত্র, জটাচীরধারী,
ভ্রমিছে অরণ্যমাঝে, কত কষ্ট সহি'।
চতুর্দ্দশ বর্ষ শেষে হবে প্রত্যাগত।
বাঁচিবে কি ততকাল, হায় রে, প্রহরী,
সার্থক করিতে নেত্র, হেরিয়া দোঁহারে
রাজলক্ষ্মী সীতাসহ ? ভাবিতে ভাবিতে
আকুল হৃদয় তার ; ঝরিল সবেগে
অশ্রুধারা, গণ্ডদেশ কুঞ্চিত প্লাবিয়া।
এইরূপ প্রতিদ্বারে শোকের উচ্ছ্বাস।

পঞ্চ কক্ষ্যা অতিক্রমি, ষষ্ঠ কক্ষ্যামাঝে
কৈকেয়ীর অন্তঃপুর সুরম্য বিশাল।
উচ্চচূড় অট্টালিকা, সুধাধবলিত।
স্ফটিকের স্তম্ভ তাহে শোভে সারি সারি,
মণিমুক্তা প্রবালাদি খচিত হইয়া।
রত্নময় সিংহাসন শোভে স্থানে স্থানে
রম্য লতা কুঞ্জ মাঝে ; বাপী সরোবর
কুমুদ কহ্লার কুবলয়ে সুশোভিত,
নিনাদিত নিরন্তর বিহঙ্গম রবে।
নিত্য পুষ্পফলপ্রসূ কত মহাতরু,
শান্ত সুশীতলচ্ছায়, শোভে দাঁড়াইয়া।
ময়ূর ময়ূরী, শুক, সারস, সারসী,
পিকবর, রাজহংস, হরিণ হরিণী,
নানাবিধ জীবজন্তু পালিত তথায়,
তুষিবারে নিরন্তর মহিষীর মন।
দিবাধাম সম, হায়, ছিল অন্তঃপুর,
মুরজ মুরলী বীণা হইত ধ্বনিত,—

ভ্রমিত চৌদিকে কত দাসী সুবেশিনী
চঞ্চল চরণে, মরি, ধ্বনিয়া নূপুর ;—
সুমধুর হাস্যরব উঠিত নিয়ত
আনন্দলহরী তুলি অন্তঃপুর মাঝে।
কিন্তু, হায়, আজি তাহা নিস্তব্ধ, নীরব।
না উঠে হাস্যের ধ্বনি, নাহি কোলাহল ;
নিরানন্দ পশু পাখী শঙ্কা বিজড়িত ;
কেহ নাহি দেয় ভক্ষ্য, কেহ না আদরে,
কনক পিঞ্জরে বসি ডাকে শুধু শুক,
বিকৃত কর্কশ কণ্ঠে, রহিয়া রহিয়া,
পাইতে আহার্য্য কিছু, কিন্তু, হায়, তার
করুণ প্রার্থনা কেহ করে না শ্রবণ।
ক্লান্ত মনে শেষে শুক নয়ন মুদিয়া,
নৈরাশ্যের মূর্ত্তিসম, বসে এক পাশে।

কৈকেয়ীর নিজ কক্ষ নিষ্প্রভ মলিন—
দুগ্ধফেননিভ শয্যা, আস্তরণ তার
মহামূল্য, ছিন্ন ভিন্ন র'য়েছে পড়িয়া—
কোথাও বসন প'ড়ি, কোথাও ভূষণ ;
পুষ্পাধারে ম্রিয়মাণ বিকচ নলিনী ;
বিশুষ্ক কুসুমমালা ভূতলে পড়িয়া।
হরিষ বিষাদে মগ্না মানিনী মহিষী ;—
ভরতের অভ্যুদয়ে প্রফুল্ল হৃদয়,
কিন্তু নৃপ নহে প্রীত, সে হেতু বিষাদ—
বিষাদ জড়িত তায় রোষ অভিমান।
নহে কি নৃপতিপ্রিয়া কৈকেয়ী মহিষী ?
নহে কি ভরত সৌম্য নৃপতিনন্দন ?
রাম রাজা হ'লে যথা হইত নৃপতি
হরষিত, নহে কেন তদ্রূপ এখন ?
ভেবেছিলা মুগ্ধা রাণী যৌবন-গরবে,
আনন্দিত হ'বে রাজা আনন্দে তাঁহার,
ফেলিবে না রামতরে বিন্দু দীর্ঘ শ্বাস,
কিম্বা অশ্রুকণা এক ; ভরতাভিষেক
মহানন্দে বিঘোষিবে, রামে নির্ব্বাসিয়া,
উঠিবে দুন্দুভিধ্বনি, হর্ষ কোলাহল,
অযোধ্যানগরী মাঝে, মাতিবে উৎসবে
নরনারী পরি চারু বসন ভূষণ।
কিন্তু সেই আশা, হায়, হ'ল না সফল ;—
যৌবনের কূটবন্ধ শ্লথ আচম্বিতে ;
রাণীর অঞ্চল হ'তে বিচ্ছিন্ন নৃপতি
সহসা ডুবিলা, হায়, শোকের সাগরে,
ছিন্নরজ্জু তরীসম, বাত্যা-অভিহত !
চমকি উঠিলা রাণী গর্ব্বিত হৃদয়
ভাঙিয়া পড়িল, আহা, ধূলির উপর—
বুঝিলা সুখের দিন অবসান তার,
যৌবনের বৃথা গর্ব্ব, বৃথা আর মান ;
ভূপতিতা তাই রাণী, ভুজঙ্গী সমান
দন্তাহতা, কাঁদে, মরি, গুমরি গুমরি।

ক্ষিপ্তপ্রায় দশরথ রামশোকে, হায় !
ম্রিয়মাণ রবি সম, রাহু ভীমরূপী
গরাসে যখন তাঁরে করাল বদনে।
অশ্রু কলঙ্কিতমুখ, নিষ্প্রভ, মলিন ;
আরক্তিম নেত্র দুটী ; স্ফীত নাসাপুট ;
অসংযত বেশভূষা ; মাথার মুকুট
খসিয়া পড়েছে কোথা ; কুণ্ডল বিহীন
কর্ণ দুটী। নাহি পায় বিশাল সংসারে
কোথাও শান্তির লেশ, জুড়াইতে প্রাণ—
দগ্ধ যাহা অহর্নিশ শোকের অনলে।
"হা রাম, হা রাম" সুধু মুখে সরে বাণী ;
কভু মূর্চ্ছা, কভু জ্ঞান, কভু মোহাবেশ ;
কভু কাঁদে, কভু গর্জ্জে, কভু রহে স্থির ;
কভু উঠে, কভু পড়ে, কভু ধায় বেগে
কৌশল্যার গৃহ হ'তে রাজপথ মুখে,
ক্ষিপ্ত চিত্ত প্রায় ; আহা, কৌশল্যামহিষী
পতিব্রতা, পুত্রশোকে কাতরহৃদয়া,
লুকাইয়া হৃদিমাঝে হৃদয়ের জ্বালা,
তোষে নৃপে প্রাণপণে সান্ত্বনা বচনে,
দুঃখিনী সুমিত্রা সহ। কিন্তু নরপতি
কিছুতেই নহে স্থির মুমূর্ষুর সম।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।



কৌমুদী।

এস গো অপ্সরোরূপা প্রকৃতি-শোভিনি,
সৌন্দর্য্যের জনয়িত্রী এ সৃষ্টি মণ্ডলে।
কবি চক্ষে তুমি বাণি। বিশ্ব-বিমোহিনী।
ভুবনে ভবেছ জ্যোতিঃ মধুব উজ্জ্বলে।
ভেদিয়া মেঘেব জাল দীপ্ত বাগভবে,
করে ধরি ওষধির কনক মঞ্জবী,
উদ্ভাসিযা দশ দিক্ নীলনভোপবে,
বাহিরিছ শশী হ'তে বিশ্ব আলো কবি।
অপূর্ব্ব মহিমাময়ি! হে সুব-সুন্দবি!
দিয়াছ ব্রহ্মাণ্ডবুকে সৌন্দর্য্যে জীবন;
নব সঞ্জীবনীবস, অমৃত লহরী,
ঢালে শিশুজীবরাজ্যে তব মাতৃস্তন!
উরিছ বিশাল দু'টি পক্ষ বিস্তারিয়া,
করুণ নয়নে ধরা কিবণে মথিয়া।

কি শুভ্র জ্যোৎস্না তুমি।—বজত বল্লবী—
আন বিশ্বে অলকাব দ্যুতি সমুজ্জ্বল,
বিকশিত শবতের শ্যাম অঙ্গ'পবি
মুকুতাব কম কান্তি কবে ঝলমল।
ললিত-কুরঙ্গ-আঁখি-মুকুব-প্রভায়
হিল্লোলে নাচাও সবে নীল-কুবলয;
বিলোল সমুদ্র স্ফীত তোমাবি লীলায়,
কুসুমিত ধবাবুক চিরমধুময়!
জীবচক্ষে ত্রিদিবেব দিয়ে ঘুমঘোব,
বসাও জগত মাঝে সুষুপ্তির মেলা;
বাঁধিয়া পরাণে কোন্ বিস্মৃতির ডোর,
ভুলাও এ স্বপ্নময় মিথ্যা ধূলিখেলা!
শুধু বঙ্গে, বর অঙ্গে ও শোভা মাখিয়া,
কি চিবযৌবনে বিশ্ব রয়েছে শোভিয়া!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

বেদ ও দেব।

ক্রমোন্নতির নিয়ম সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। জড়-জগৎ যেমন অতীন্দ্রিয় পরমাণুপুঞ্জ হইতে ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সুন্দর মনোহর আকার ধারণ করিয়াছে, অন্তর্জগতেও সেইরূপ ক্রম-বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান স্থূলকে ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে অনন্তের সাক্ষাৎ পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছে, মানবকে নীচ স্বার্থ-পরতা, ও ইন্দ্রিয়াশক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া স্বেচ্ছায় চিন্ময় ঈশ্বরের মধুময় প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখাইয়াছে। কোন জাতিই প্রথমে সচ্চিদানন্দরূপী অনন্ত ঈশ্বরকে ধরিতে পারে নাই। বৃক্ষ যেরূপ পরিণত হইয়া সুমিষ্ট ফল প্রসব করে, মানবের জ্ঞানবৃক্ষও সেইরূপ ক্রমশঃ পরিণত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃতময় ফল প্রসব করিয়াছে। গ্রীসীয় সভ্যতার প্রথমাবস্থায়ই আমরা প্লেটো ও আরিষ্টট্‌-লের সাক্ষাৎ পাই না; ইহুদীদিগের দেশেও প্রথমেই ঈশার আবির্ভাব হয় নাই। ইহুদীগণও প্রথমে যে ঈশ্বরের পূজা করিতেন, তিনি আমাদের ইন্দ্র অথবা গ্রীকদিগের জুপিটার অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। অপর কোন দেশে যাহা ঘটে নাই, কেবল ভারতবর্ষেই কি তাহা ঘটিয়াছে? কখনই নহে। ভারতেও অবশ্যম্ভাবিরূপে এই নিয়মই কার্য্য করিয়াছে। ঋগ্‌বেদের প্রথম মন্ত্র এই:—

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমং॥"

"অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্; অগ্নি দেবগণের আহ্বান-কারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী, আমি অগ্নির স্তুতি করি।"

রমেশচন্দ্র দত্ত।

"অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ যজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে। অসি হোতা ন ঈড্যঃ।"

"হে কাষ্ঠোৎপন্ন অগ্নি! এই ছিন্ন কুশযুক্ত যজ্ঞস্থলে দেবতাদিগকে আনয়ন কর; তুমি আমাদিগের স্তুতিভাজন ও দেবতাদিগের আহ্বান-কারী"।

ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল, ১২ সূক্ত তৃতীয় ঋক্।

ঋষি যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার স্তুতি করিতেছেন। কেন স্তুতি করিতেছেন, তাহাও প্রথম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হইতেছে, অগ্নি সেই দেবতাকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিতে সমর্থ, এই জন্যই অগ্নির স্তুতি। অগ্নি স্বয়ম্ভু নহেন, কিন্তু কাষ্ঠোৎপন্ন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঋষি প্রথমাবস্থায় জড় অগ্নিকেই দেবতা বলিয়াছেন, অগ্নির অতীত কোন-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার করিতেছেন না; অগ্নির কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু আত্মা ভিন্ন যে কাহারও কর্তৃত্ব নাই, তাঁহার জ্ঞানে এখনও তাহা প্রকাশ পায় নাই, অর্থাৎ তাঁহার আত্মজ্ঞানের উদয় হয় নাই, সুতরাং জড় ও আত্মার ভেদজ্ঞানও জন্মে নাই; কিন্তু তিনি নিজের কর্তৃত্ব দর্শনে বহির্জগতে যে পদার্থের কিছু কার্য্য দেখিতেছেন, তাহাতেই কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া ও তাহার অপ্রতিহতা মহতী শক্তি দেখিয়া তাহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সোপান। প্রত্যেক কার্য্যেরই যে একজন কর্তা আছে, এই জ্ঞান হইতেই মানবের ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি। শক্তিমত্ত ও ঈশ্বরত্ব অবশ্য এক নহে, কিন্তু প্রথমে শক্তিদর্শন হইতেই দেব ভাব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

অগ্নির সম্বন্ধে যাহা সত্য অন্যান্য দেবতার সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। অগ্নির পরেই ইন্দ্র প্রধান বৈদিক দেবতা। অগ্নির ন্যায় ইন্দ্রের উদ্দেশে রচিত বহু মন্ত্র ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে যে, জীবনধারণের পক্ষে ইঁহাদেরই অধিকতম প্রয়োজনীয়তা দেখিয়াই বৈদিক ঋষি ইঁহাদের বহু স্তুতি করিয়াছিলেন। অগ্নি ও ইন্দ্রের পর বরুণ ও বায়ু প্রধান বৈদিক দেবতা। অগ্নির দেবতা অগ্নি, জলের দেবতা ইন্দ্র, আকাশের দেবতা বরুণ, বায়ুর দেবতা বায়ু, বেদে এই রূপ তেত্রিশটি দেবতার উল্লেখ আছে। ইঁহাদের প্রত্যেকে প্রকৃতির কোন না কোন বিভাগের দেবতা, কিন্তু প্রত্যেকেই পৃথক্ কর্তৃত্ব-সম্পন্ন পুরুষ, সকলে এক নহেন।

"মক্ষিত্থা ধিয়া নরাঃ"

ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল ২ সূক্ত

৬ ঋক্।

"হে নরদ্বয় (বায়ু ও ইন্দ্র) এই কর্ম্ম ত্বরায় সম্পন্ন কর।"

"নরৌ পুরুষৌ পৌরুষেণ সামর্থ্যেন উপেতৌ।" সায়ণ।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, প্রথমে বেদের প্রত্যেক দেবতাই এক ভিন্ন পুরুষ, ও প্রকৃতির এক বিভাগের দেবতা; পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র। জ্ঞানের প্রথমাবস্থায় এরূপ ভ্রম হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। বৈদিক ঋষি ক্রমশঃ তাঁহার এই ভ্রম দেখিতে পাইয়াছিলেন। ক্রমে তিনি দেখিলেন যে, যে অগ্নি তাঁহার সম্মুখে জাজ্বল্যমান, তাহা সেই সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ নহে, কিন্তু জলে স্থলে শূন্যে বিবিধ আকারে বিদ্যমান

রহিয়াছেন; বিশ্বচক্ষু সূর্য্য তাঁহার একরূপ, ক্ষণস্থায়িনী চঞ্চলা চপলা তাঁহার আর এক রূপ :—

"গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং
গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চরথাং।
অদ্রৌ চিদস্মা অংতদূ্রোণে।
বিশাং ন বিশ্বো অমৃত স্বাধীঃ॥

"যে অগ্নি জলের মধ্যে ও বনের মধ্যে ও স্থাবর পদার্থের মধ্যে ও জঙ্গমের মধ্যে অবস্থান করেন, তাঁহাকে কি যজ্ঞগৃহে, কি পর্ব্বতের উপর সর্ব্বত্রই লোকে হব্য প্রদান করে। প্রজাবৎসল রাজা যেরূপ প্রজার হিতকর কার্য্য করেন, অমর অগ্নিও তদ্রূপ আমাদের হিতকর কার্য্য সম্পাদন করেন।"

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই দেখা যায় যে, ঋষি ইন্দ্র ও অগ্নিকে একত্র আহ্বান করিতেছেন।—

"যুবেথাং যজ্ঞমিষ্টয়ে সুতং সোমং সধস্তুতী।
ইন্দ্রাগ্নী আগতং নরাঃ॥

"হে একত্রে স্তুতিযোগ্য নেতা, ইন্দ্র ও অগ্নি! যজ্ঞ সেবা কর, যজ্ঞার্থে অভিষুত সোমের অভিমুখে আগমন কর।"

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঋষি অগ্নি ও ইন্দ্রের (তাপ ও মেঘের) মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়াছেন। অন্য একস্থলে ঋষি বলিতেছেন :—

"স নো বিশ্বেভির্দেবেভিরূর্জো নপাদ্ভদ্রশোচে।
রয়িং দেহি বিশ্ববারং॥" ৬।৮।৭১

"হে বলের পুত্র প্রশংসনীয় অগ্নি! তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত অবস্থিত হইয়া আমাদিগকে সকলের বরণীয় ধন প্রদান কর।"

এই মন্ত্রে বুঝা যাইতেছে যে, ঋষি দেবগণের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য যোগ দেখিতে পাইয়াছেন; তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে প্রকৃতির শক্তিনিচয় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু অবশ্যম্ভাবিরূপে পরস্পরের সহিত যুক্ত, এবং একশক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য শক্তি নিরপেক্ষ হইয়া কিছুই করিতে পারে না, অর্থাৎ প্রকৃতি এক আশ্চর্য্য, বিচিত্র যন্ত্র, বহুরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ এক।

"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব সংপ্রশ্নং ভুবনা যংত্যন্যা।"

ঋগ্বেদ—৮।৩।১০।৮২।৩

যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়।"

জ্ঞানোন্নতি সহকারে ঋষি এখন বুঝিতে পারিলেন, যে জগতে একই শক্তি নানা ভাবে ক্রিয়া করিতেছে, একই বিশ্বকর্ম্মা নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা পাতা বিধাতা, এবং তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন রাজ্যে যে বিভিন্ন দেবতা দেখিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞানতার ফল মাত্র, প্রকৃত দেবতা এক। বৈদিক ঋষি কখনও মনে করিতেন না যে, জগতের মূলস্থিত সেই দেবতা কেবল সত্ত্বা মাত্র, কিন্তু তিনি মনে মনে আলোচনা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্ম্মাণ করেন, সব অবলোকন করেন, ধারণ করেন, এবং তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জগতের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তিনিই মানবের একমাত্র পূজ্য—

"য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে
প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম॥"
"যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা
জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"
"যস্যেমে হিমবংতো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং
রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম॥

"যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করে, যাঁহার ছায়া অমৃত স্বরূপ, মৃত্যু যাঁহার বশতাপন্ন, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন্ দেবতাকে আমরা হব্য দ্বারা পূজা করিব?"

"যিনি নিজ মহিমা দ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয়সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীবদিগের অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছেন, যিনি এই সকল দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রভু, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন্ দেবতাকে আমরা হব্য দ্বারা পূজা করিব?"

"যাঁহার মহিমা দ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে, সসাগরা ধরা যাঁহারই সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হয়, এই সকল দিক্ বিদিক্ যাঁহার বাহু স্বরূপ, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন্ দেবতাকে আমরা হব্য দ্বারা পূজা করিব?"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতীয় জীবনরক্ষা।

ভাষা, ধর্ম্ম এবং আচার, জাতীয় জীবনের এই তিনটাই প্রধান উপাদান;—জাতীয় জীবনের এই তিনটাই প্রাণ। যে জাতির ভাষা, ধর্ম্ম এবং আচার বিলুপ্ত হয়, সে জাতির অস্তিত্বলোপ হয়। যে জনসমষ্টি লইয়া জাতি, ভাষাদি প্রাণত্রয়ের লোপ হইলে, সেই জনসমষ্টি থাকে, কিন্তু সে জনসমষ্টির সে জাতীয়ত্ব থাকে না; সেই দেহ থাকিলেও, সে প্রাণ থাকে না। হয় দেহ প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া

থাকে, না হয় তাহাতে অন্য প্রাণ আসিয়া অধিকারস্থাপন করে। তখন সেই জনসমষ্টিকে অন্যজাতিরূপে পরিচিত হইতে হয়।

দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পুরাতন অধুনাতন উভয়ন ইতিহাসেই দৃষ্টান্ত পাইবে; প্রাচীন নবীন উভয় সমাজে দৃষ্টান্ত পাইবে; অতীত বর্ত্তমান উভয় যুগেও দৃষ্টান্ত পাইবে। খৃষ্টধর্ম্মের আধিপত্য হইবার পূর্ব্বে, ইউরোপের যে ইউরোপত্ব ছিল, এখন সে ইউরোপত্ব নাই। সেই দেশ প্রদেশ পড়িয়া আছে, সেই নদ নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই গিরি পর্ব্বত এখনও মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু সে ইউরোপ আর নাই। সেই সকল গ্রাম নগরের অবস্থান ভূমি সেইরূপ আছে, কিন্তু সে সকল গ্রামের সে গ্রামত্ব আর নাই, সে সকল নগরের সে নগরত্ব আর নাই!

ইউরোপে সেইরূপ জনসমষ্টি এখনও রহিয়াছে; তখন যাঁহাদের বংশে ইউরোপ বিরাজিত ছিল, এখনও অনেক স্থলে তাঁহাদের বংশই বিরাজ করিতেছে। কিন্তু জাতীয়তার ব্যতিক্রমে জাতিরও ব্যতিক্রম হইয়াছে; ইউরোপের সকল ভূমিভাগই তখন নব নব জাতিজাতে পূর্ণ হইয়াছে।

সেই গ্রীস এখনও আছে, গ্রীসের সেই এথেন্স্ এখনও রাজধানীরূপে বিরাজ করিতেছে; সেই শৌর্য্যকেতন থার্ম্মপিলি ও মেরাথন এখনও পড়িয়া আছে; সেই সকল যুদ্ধক্ষেত্র এখনও রহিয়াছে; কিন্তু গ্রীসের সে গ্রীসত্ব আর নাই। গ্রীসের সে ভাষা নাই, সে ধর্ম্ম নাই, সে আচার নাই; সুতরাং সে গ্রীসের আর কিছুই নাই, গ্রীসের তিন প্রধান প্রাণই কবে উড়িয়া গিয়াছে!

তিন পুরাতন প্রাণের স্থানে তিন নূতন প্রাণ আসিয়া বসিয়া আছে। গ্রীক জাতির সে ভাষা নাই! যে ভাষায় গ্রীক-বাল্মীকি হোমর, গ্রীক-রামায়ণ ইলিয়দ অদিসির রচনা করিয়াছিলেন, যে ভাষায় সক্রেতীস প্লেতো দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে ভাষায় আরিস্ততল বিজ্ঞান লিখিয়াছিলেন, যে ভাষায় দিমস্থিনীশ বক্তৃতা করিয়া সুপ্ত নির্জ্জীব গ্রীসকে জাগরিত ও সজীব করিয়াছিলেন, যে ভাষায় পিতাগোরাস ভারতীয় আর্য্য শাস্ত্রের অনুকরণ করিয়াছিলেন, যে ভাষায় এরিষ্টোফেনীস এবং ইউরিপিদীশ নাটক লিখিয়াছিলেন, যে ভাষায় থুসিদিদীশ ও জেনোফন ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, যে ভাষায় এরিকিবাইদীশ ও পেরিক্লীশ রাজনীতির চর্চ্চা করিয়াছিলেন, গ্রীসের সে ভাষা এখন আর জীবিত নাই; সে ভাষা গ্রীকের মুখে আর শোনা যায় না; মৃত গ্রীক জাতির সে মৃত ভাষা এখন ইতিহাসকাব্যাদিময় প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে।

গ্রীকজাতি রোমকজাতির বশীভূত হইলে, গ্রীকরাজ্য রোমকরাজ্যের অঙ্গীভূত হইলে, গ্রীক ভাষায় ও রোমক ভাষায় যে সংমিশ্রণ হইতেছিল, পরে সেই সংমিশ্রণই গাঢতর ও ঘনীভূত হইয়া উঠে; সেই ঘনীভাবের পর গ্রীসরাজ্যে এক নূতনপ্রকার ভাষারই আবির্ভাব হইয়া পড়ে। সেই ভাষাই রোমের নামে "রোমায়িক" ভাষা বলিয়া পরিচিত। ভারতের উর্দ্দু যেমন সঙ্কর ভাষা—মিশ্রিত দোআঁসলা ভাষা, গ্রীসের ঐ রোমায়িকও সেইরূপ দোআঁসলা ভাষা। রোমায়িক গ্রীসের উর্দ্দু। কিন্তু গ্রীসের সে রোমায়িকও এখন আর নাই। প্রাচীন গ্রীকের অপভ্রংশ এবং পরিবর্ত্তনে এক নূতন গ্রীক উৎপন্ন হইয়াছে, সেই গ্রীকই এখন গ্রীসের ভাষা।

আবার, সেই রোমকেরও সেই দশা! যে দশা গ্রীসের, সেই দশা রোমের! প্রাচীন রোমের সে প্রাচীন লাটীন এখন, প্রাচীন গ্রীকের মত, প্রাচীন সাহিত্যেই বিরাজমান। সিপীয়ো, সীজার, কেটো, কাইকেরো, ভার্জিল, হরেস, তাসীতস, সেনেকা প্রভৃতির ভাষা এখন গ্রন্থগহ্বরে গুপ্ত। রোমকের মুখে এখন অন্য ভাষা, রোমকের কলমেও এখন অন্য ভাষা।

ইউরোপের অনেক রাজ্যেই দৃষ্টান্ত পাইবে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীস রোমে দৃষ্টান্ত যেরূপ ফুটন্ত, অন্যত্র ঠিক সেরূপ নহে। রুষ জর্ম্মণ ফরাসি ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা অপেক্ষাকৃত নূতন ভাষা; গ্রীক লাটীনের তুলনায় নবীন ভাষা। প্রাচীনে যত পরিবর্ত্তন, নবীনে তত নহে। তথাপি দেখিবে, খৃষ্টের পূর্ব্বে যে ভাষার যে প্রকৃতি ছিল, এখন সে ভাষার সে প্রকৃতি নাই।

কিন্তু কেবল ভাষার লোপেও জাতীয়তা-লোপ পূর্ণ মাত্রায় হইত না; তিন প্রাণের এক প্রাণ উড়িয়া গেলেও ইউরোপীয় জাতিগুলি আর দুই প্রাণ লইয়া জীবনধারণ করিতে পারিতেন। ধর্ম্ম এবং আচার যদি ঠিক থাকিত—এই দুই প্রাণও যদি বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলেও আমরা এখন ইউরোপে সেই প্রাচীন ইউরোপত্ব দেখিতে পাইতাম।

ধর্ম্মান্তরই একেবারে রূপান্তর করিয়া দিয়াছে। ইউরোপের যদি ধর্ম্মান্তর না হইত, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগের সে পুরাতন জাতীয়তা, কতক পরিমাণে, জীবিত থাকিত। ইউরোপে তখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ছিল, তাই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তা বিদ্যমান ছিল। এখন সমগ্র ইউরোপের এক জাতি; ইউরোপে এখন এক খৃষ্টান মহা জাতিরই বস বাস; প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলি এখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়েই পরিণত হইয়াছে। গ্রীক জাতি, ইতালীয় জাতি, জর্ম্মণ জাতি, ফরাসি জাতি, রুষ জাতি, ইংরেজ জাতি প্রভৃতি যত জাতিই এখন প্রকৃতপ্রস্তাবে খণ্ড খণ্ড উপজাতি; এক খৃষ্টান জাতির ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র। তাই বলিতেছি, এই সকল অংশ, এই সকল উপজাতি, *ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ব্যতীত আর কিছুই* নহে। ইউরোপের যত প্রাচীন জাতিরই তিরোভাব হইয়াছে। সে জাতি কুত্রাপি নাই; সে জনসমষ্টি মাত্র পড়িয়া আছে; সে দেহ আছে, সে দেহে সে ধর্ম্ম প্রাণ আর নাই। যে ধর্ম্ম-প্রাণ তিরোহিত হইয়াছে, নূতন এক ধর্ম্ম-প্রাণ তাহার আসনে বসিয়াছে।

ধর্ম্মের তিরোভাব হইলেই, আচারের তিরোভাব হইয়া থাকে। আচার ধর্ম্মেরই নিত্য সহচর। তাপ যেরূপ তেজের সহচর, গুরুত্ব যেরূপ দ্রব্যের সহচর, আচার সেইরূপ ধর্ম্মের সহচর। আচারহীন ধর্ম্ম নাই। অখৃষ্টান ইউরোপে যে আচার বিরাজ করিয়াছিল, এখনকার খৃষ্টান ইউরোপে সে আচার দেখিতে পাইবে না। এখন মহাখৃষ্টান জাতির আচারে প্রায়ই একতা দেখিতে পাইবে; স্থানভেদে—সম্প্রদায়ভেদে—যে তারতম্য, তাহা অতি সামান্য। অখৃষ্টান প্রাচীন ইউরোপীয় জাতিসমূহের ভিতর ধর্ম্মভেদজনিত যেরূপ আচারভেদ ছিল, সেরূপ আচারভেদ—তত অধিক আচারভেদ—এখন আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না।

আচারভেদ হইলেই অনুষ্ঠানভেদ হইয়া থাকে। আচারভেদে অনুষ্ঠানভেদ, আচারভেদে ব্যবহারভেদ, আচারভেদে আহারভেদ, আচারভেদে পরিচ্ছদভেদ; আচারভেদের তারতম্যেই আর সমস্ত ভেদেরও তারতম্য হইয়া থাকে। ইউরোপে এখন মূলধর্ম্ম এক, মূল আচারও এক। স্থলভেদে—*প্রদেশভেদে—মূলধর্ম্মে যেরূপ সামান্য তারতম্য হইয়াছে*, মূল আচারেও সেইরূপ নামমাত্র তারতম্য দাঁড়াইয়াছে। আহার বিহার, বিবাহ মিলন, পোষাক পরিচ্ছদ, সমস্তই আচারের অনুগত; সমস্তই আচারের অঙ্গীভূত। সকল লইয়াই আচার। সুতরাং আচারভেদ যেখানে যেরূপ, আহারব্যবহারাদিরও সেখানে তারতম্য সেইরূপ।

দেখিলে, ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে—ভিন্ন ভিন্ন ভূমিভাগে—যেরূপ ভাষা প্রচলিত ছিল, এখন সেরূপ ভাষা কুত্রাপি নাই। পূর্ব্বে যেরূপ ধর্ম্ম ছিল, সেরূপ ধর্ম্ম কুত্রাপি নাই। আর পূর্ব্বে যেরূপ আচার ছিল, এখন সেরূপ আচারও কুত্রাপি নাই।

আর দেখিলে, ভাষার যেরূপ ভিন্নতা আছে, ইউরোপে ধর্ম্মের ঠিক সেরূপ ভিন্নতা কুত্রাপি নাই; সুতরাং আচারেরও ততদূর ভিন্নতা কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। *আচারের সেরূপ ভিন্নতা নাই বলিয়াই, আহার ব্যবহার* পরিচ্ছদাদিরও সেরূপ ভিন্নতা নাই।

ধর্ম্মগত তারতম্য পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখন সেরূপ নাই। মূল খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপের এক; তাই মূল উপাসনাপদ্ধতিও সর্ব্বত্র এক। খৃষ্টধর্ম্ম মূলে এক থাকিয়াও, শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লবাদাবচ্ছেদে স্থলভেদে যেরূপ সামান্য ভেদগ্রস্ত করিয়াছে, উপাসনাপদ্ধতিরও সেইরূপ সামান্য ভেদগ্রস্ত হইয়াছে মাত্র। উপাসনায় যাহা ঘটিয়াছে, উপাসনার অঙ্গ—অনুষ্ঠানেও তাহাই ঘটিয়াছে।

ফলতঃ, ভাষার জন্য ইউরোপে জাতীয়তার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ধর্ম্মের জন্য ইউরোপে জাতীয়তার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আচার অনুষ্ঠানের জন্যও ইউরোপে জাতীয়তার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইউরোপীয় জাতিসমূহের জাতীয় দেহ সমানই আছে—একই আছে; জাতীয় দেহের সে জাতীয় প্রাণ কুত্রাপি নাই। জাতীয় প্রাণের—ভাষা ধর্ম্ম এবং আচারের—ঘোরব্যতিক্রম হইয়াছে। সে জাতি কুত্রাপি নাই, সে জনসমষ্টি সর্ব্বত্র আছে। জনসমষ্টির পুরাতন তিন প্রাণই তিরোহিত হইয়াছে; তিন প্রাণের স্থানে তিন নূতন প্রাণের আধিপত্য হইয়াছে। পুরাতন ভাষার পদে নূতন ভাষা বসিয়াছে, পুরাতন ধর্ম্মের আসনে নূতন ধর্ম্ম অধিষ্ঠান করিয়াছে, পুরাতন আচার অনুষ্ঠানের স্থানে নূতন আচার অনুষ্ঠান দখল সাব্যস্ত করিয়াছে।

তবেই দেখ, [illegible] ইউরোপের মৃত্যু হইয়াছে; এখন যাহা দেখিতেছ, তাহা নূতন ইউরোপ—এক স্বতন্ত্র ইউরোপ।

কলার ঝাড়ে পুরাতন এঁটে দিয়া নূতন তেউড় বাহির হইয়াছে; নূতন তেউড় নূতন গাছে পরিণত হইয়াছে। নূতন গাছের থোড় খোলা, পাতা পেটো, সবই নূতন; নূতন থোড়ে নূতন মোচা; নূতন মোচায় নূতন ফল।

প্রাচীনতার ধূয়া ধরিয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার ইউরোপের নাই;—ইউরোপের কোন দেশের কোন জাতির সে অধিকার নাই। প্রাচীন ভাষার গৌরবে গর্ব্ব করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, ক্ষমতা ইউরোপে কাহারও নাই; প্রাচীন ধর্ম্মের জন্য আত্মশ্লাঘা করিবার অধিকার কাহারও নাই; প্রাচীন আচার অনুষ্ঠানের কথা তুলিয়া অহঙ্কার করিবার এক্তারও ইউরোপে কাহারও নাই।

সে ইউরোপ নাই, সে ইউরোপের সে গ্রীস রোম নাই; সে সব কিছুই নাই, সে সব শব হইয়া গিয়াছে। ইউরোপের সেই শবে নূতন প্রাণ পশিয়াছে। এখনকার ইউরোপ ঠিক জীয়ন্ত ইউরোপ নহে, এ যে দানো-পাওয়া ইউরোপ। এই দানো-পাওয়া ইউরোপের জাতীয়তা, সভ্যতা, পাণ্ডিত্য, বীরতা, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য, প্রভুতা, দিগ্বিজয়, রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি সমস্তই সেই দানো-পাওয়া প্রাণের লক্ষণ। তেজ দেখিয়া বিস্মিত হইও না, দানো-পাওয়া শবের তেজ ভয়ঙ্কর। মানুষ জীয়ন্ত বেলায় যে দেহে—যে অঙ্গে—যে কাজ করিতে না পারে, দানো-পাওয়া দেহের—দানো পাওয়া অঙ্গে—সে কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন করিতে পারে। তখন অসাধ্যসাধনেও তাহার ভ্রূক্ষেপ হয় না, অসাধ্যও তখন তাহার পক্ষে সুসাধ্য হইয়া উঠে।

হিন্দুর ভারতে।

খৃষ্টানের ইউরোপ হইতে একবার হিন্দুর ভারতে আসিয়া উপস্থিত হও; দেখিবে, ভারতও ইউরোপের মত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের—ভিন্ন ভিন্ন ভূমিভাগের সমবায়। দেখিবে, ভারতের মহাহিন্দুজাতিও ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির সমবায়; এক মহাজনসমষ্টি, ভিন্ন ভিন্ন জনসমষ্টির সমবায়। দেখিবে, ভারতে বাঙ্গলা, উত্তরপশ্চিম, আসাম, পঞ্জাব, রাজপুতনা, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এইগুলি প্রদেশ। দেখিবে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আবার ভিন্ন ভিন্ন উপপ্রদেশ বিদ্যমান। বাঙ্গালা প্রদেশে দেখিবে, বঙ্গ, বিহার, উৎকল, ছোটনাগপুর; উত্তর-পশ্চিম, অযোধ্যা এবং পঞ্জাবে ঠিক এরূপ উপপ্রদেশ নাই,—ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ খণ্ড নাই; কিন্তু ঋতুভেদে—ভাষাভেদে—প্রকৃতিভেদে—ঐ সকল প্রদেশেও ভিন্ন ভিন্ন উপপ্রদেশের দর্শন পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম বা অযোধ্যার পূর্ব্ব ভাগে যে অবস্থা, পশ্চিম ভাগে সেরূপ নহে; পঞ্জাবের উত্তর ভাগে যে অবস্থা, দক্ষিণ ভাগে সেরূপ নহে; আবার সমতল পঞ্জাবে যে প্রকৃতি, বিষমতল পার্ব্বত্য পঞ্জাবে সে প্রকৃতি দেখিতে পাইবে না। বোম্বাই প্রদেশে সিন্ধু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি উপপ্রদেশের অস্তিত্ব বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। মধ্যপ্রদেশের নাগপুর অঞ্চলে যে ভাব, সম্বলপুর অঞ্চলে সে ভাব দেখিতে পাইবে না। মাদ্রাজের কর্ণাট উপপ্রদেশে আর মলবার উপপ্রদেশে বিলক্ষণ তারতম্য দেখিতে পাইবে। মধ্যভারত ও রাজপুতনায় যে, রাজ্যভেদে উপপ্রদেশভেদ, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। আসামেও উত্তর আসাম আর দক্ষিণ আসামে, সমতল আসাম আর পার্ব্বত্য আসামে, অনেক প্রভেদ দেখিতে পাইবে। তাই বলিতেছি, যেখানে দেশ সেই খানেই প্রদেশ, যেখানে প্রদেশ সেই খানেই উপপ্রদেশ। ভারতেও নবীন প্রাচীনের ভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পাইবে। তখনকার অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধে, আর এখনকার বঙ্গ বিহার নাগপুর উৎকলে কিরূপ প্রভেদ, তাহা বেদব্যাসের মহাভারত দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষে আর বর্ত্তমান কামরূপ-আসামে অনায়াসে তারতম্য করিতে পারিবে। তখনকার আর্য্যাবর্ত্তে আর এখনকার উত্তর পশ্চিমে ইতরবিশেষ করা কঠিন হইবে না। দেখিবে, তখনকার অযোধ্যায় আর এখনকার অযোধ্যায় কত বৈসাদৃশ্য; তখনকার ব্রহ্মাবর্ত্ত ও পঞ্চনদে এবং এখনকার পাঞ্জাবে কত বৈসাদৃশ্য; তখনকার গুর্জ্জরে আর এখনকার গুজরাটে কত বৈসাদৃশ্য। তখনকার মহারাষ্ট্রে আর এখনকার মহারাষ্ট্রেও তারতম্য দেখিতে পাইবে। কর্ণাট কানাড়ায় সেইরূপ তারতম্য; মালয় মলবারেও তারতম্যের অভাব নাই। প্রদেশে প্রভেদ হইয়াছে, উপপ্রদেশে ইতরবিশেষ হইয়াছে—নগরে গ্রামেও ভিন্নভাব ঘটিয়াছে।

এখনকার পাটনা তখনকার পাটলীপুত্র নহে। এখনকার এলাহাবাদে আর তখনকার প্রয়াগে অনেক প্রভেদ। তখনকার হস্তিনাপুর কোথায় গিয়াছে; নব হস্তিনা-

পুরে আর দিল্লীসহরেও কত প্রভেদ! সে অবস্থা আর এ উজ্জয়িনীর তুলনায় আলোচনা কর, বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইবে। রাজসাহী-বিভাগে বিরাট রাজ্যের অন্বেষণ করিতে গেলে, বিরাটবিভ্রাটে পতিত হইবে। যেখানে যাইবে, যে দিকে চাহিবে, সেইখানেই সেই নবীন প্রাচীনের তারতম্য দেখিতে পাইবে।

তখনকার কর্ণাটী, মহারাষ্ট্রী, গুর্জ্জরী, মাগধী প্রভৃতি রীতির ভেদে ভাষায় যেরূপ ভেদ দেখিতে পাইতে, এখনকার একবিধা ভাষায় সেরূপ রীতিভেদে সেরূপ ভিন্নতা পাইবে না। তখন রীতিভেদে কিছু কিছু ভাষা-ভেদ ছিল; এখন ভাষারই সম্পূর্ণ ভেদ হইয়াছে। এখন কানাড়ী, মারাঠি, গুজরাটী, হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভাষারই সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে।

সেই সংস্কৃত প্রাকৃত মূলে এবং পালিরূপ অপভ্রংশে, এখন যে হিন্দী বাঙ্গলা মারাঠি প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে, এ গুলির এখন স্বাতন্ত্র্যই হইয়া গিয়াছে। এখন প্রদেশভেদে ভাষাভেদ, উপপ্রদেশভেদেও ভাষার অবান্তরভেদ। তখন এক ভাষায় রীতিভেদ ছিল, এখন ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকৃতিভেদ হইয়াছে। এখনকার বাঙ্গলা, উৎকল, আসামী, এক হইয়াও ভিন্ন। এক হিন্দী বিহারে যেরূপ, পশ্চিমে সেরূপ নহে। আবার মুসলমানদিগের আবির্ভাবে একটা নূতন অতিরিক্ত ভাষারই সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। প্রথমে পল্টনের জন্য প্রস্তুত হইয়া, এই উর্দ্দু ক্রমে হিন্দুস্থানের রাজকীয় ভাষায় পরিণত হইয়া পড়ে। হিন্দী আরবী পারসীর মিলনে উৎপন্ন উর্দ্দু, মুসলমান বাদশাহ নবাবের ভাষা হইয়া, ভারতের সর্ব্বত্র আধিপত্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মুসলমান রাজার সে আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে রাজকীয় আরজভাষার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ভাবেই রহিয়াছে। উর্দ্দু এখনও ভারতের ভাষাসমাজে রাজত্ব করিতেছে।

সংস্কৃত, প্রাকৃত, আরবী এবং পারসী এখন মৃতভাষা; পালি আরও মৃত। পালিও কিন্তু বৌদ্ধ-আধিপত্যের সময়ে সমগ্র ভারতে একাধিপত্য করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাষা বলিয়া, পালি ভারতের বাহিরেও রাজত্ব করিয়াছিল। যেখানে বৌদ্ধ, সেইখানেই পালি। বৌদ্ধ রাজাদের সময়ে, অশোকের মত বৌদ্ধ সম্রাটের সময়ে, পালিও ভারতে উর্দ্দুর মত আধিপত্য করিয়াছিল। রাজভাষার সর্ব্বত্র সকল যুগে একাধিপত্য হইয়া থাকে। বৌদ্ধযুগে পালির যাহা হইয়াছিল, মুসলমান যুগে উর্দ্দুর যাহা হইয়াছিল, এখন ইংরেজ যুগে ইংরেজিরও তাহাই হইতেছে। এখন ভারতের সর্ব্বত্র ইংরেজের জয়, সর্ব্বত্রই ইংরেজির জয়। কিন্তু ইংরেজি এখনও উর্দ্দু হইতে পারে নাই; উর্দ্দু সদরে অন্দরে আধিপত্য করিয়াছিল, হাটে বাজারে বিরাজ করিয়াছিল। আমীর ফকীর, জমিদার রাইয়ত, ভিখারী কুবের, মূর্খ পণ্ডিত সকলের মুখেই উর্দ্দুর অধিকার হইয়াছিল। ইংরেজির এখনও সেরূপ মাহেন্দ্রযোগ হয় নাই। ইংরেজি বিদ্বানের ভাষা; ইংরেজি ভৃত্যের ভাষা; ইংরেজের সহিত সংস্রব রাখিতে হইলেই, ইংরেজি ভাষার আশ্রয় লইতে হয়।

কিন্তু উর্দ্দু ইংরেজির সহিত এ প্রবন্ধের তাদৃশ সম্বন্ধ নয়। আমাদের এখন সম্বন্ধ যত ভারতীয় ভাষার সহিত। ভারতের যত প্রদেশীয় বর্ত্তমান ভাষার সহিতই আমাদের এ প্রস্তাবে সম্বন্ধ। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পূর্ব্বে যেরূপ প্রদেশীয় ভাষার আধিপত্য ছিল, এখন সেরূপ প্রদেশীয় ভাষার আধিপত্য নাই। সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ রঘু যখন ভারতে দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তিনি যে সকল ভাষা দেখিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধর রামচন্দ্রের অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া যখন রামানুজেরা, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, চারিদিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঠিক সে সকল ভাষা দেখিতে পান নাই। আবার চন্দ্রবংশাবতংস পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়কালেও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষা আরও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল।

এখন ত কথাই নাই! তখন ভাষায় কিছু কিছু রূপান্তর হইত, এখন একেবারেই রূপান্তর! সত্য ত্রেতা দ্বাপরের ভাষার আর কলির ভাষায় সম্পূর্ণ প্রভেদ। আবার কলিরও যত সময় যাইতেছে, কলির ভাষারও তত পরিবর্ত্তন হইতেছে। কেবল ভাষায় যদি জাতীয়তার জীবন নির্ভর করিত, তাহা হইলে ভারতে হিন্দু জাতির জাতীয়তা একেবারেই বিলুপ্ত হইত।

কিন্তু ধর্ম্মের লোপ না হইলে, জাতীয় জীবনের লোপ হয় না। ধর্ম্মের লোপ না হইলে, জাতীয় আচারেরও লোপ হয় না। ভাষা, ধর্ম্ম এবং আচার, জাতীয় জীবনের এই

তিনটীই প্রধান প্রাণ। ভারতে একটী প্রাণের, ভাষারূপ প্রাণের, তিরোভাব হইয়াছে, আর দুইটী প্রাণের—ধর্ম্মপ্রাণ ও আচারপ্রাণের তিরোভাব হয় নাই; তাই ভারতে এখনও জাতীয় জীবন বিদ্যমান আছে। জীবনের এক প্রাণ গিয়াছে, এক পাদও গিয়াছে; কিন্তু হিন্দুর জাতীয় জীবন এখনও দুই প্রাণে দুই পাদে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই দুই প্রাণ যত দিন থাকিবে, হিন্দুর জাতীয় জীবন তত দিন থাকিবে। হিন্দুর ধর্ম্ম থাকিলেই আচার থাকিবে, ধর্ম্ম বাঁচিয়া থাকিলেই হিন্দুর দুই প্রাণ বাঁচিয়া থাকিবে। দুই প্রাণেই হিন্দুর জাতীয় জীবনও রক্ষা পাইবে। জাতীয় জীবন যতদিন থাকিবে, হিন্দু জাতিও ততদিন থাকিবে।

ধর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে অনেক, লাগিয়াছে অনেকবার, কিন্তু ভারতের হিন্দুধর্ম্ম প্রাণে মরেন নাই। বৌদ্ধের বিষম বহ্নিবাণ দিগ্দেশ জ্বালাইতে জ্বালাইতে হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছিল; আর্য্যভূমি সেই বৌদ্ধ বহ্নিবাণে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আর্য্যধর্ম্মকেও সে বাণের বিষম জ্বালা সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের অপঘাত হয় নাই। হিন্দুর রাজ্য বৌদ্ধরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, হিন্দুর মন্দির দেবালয় বৌদ্ধ বিহার মঠে পরিণত হইয়াছিল, হিন্দু দেবতার পূজক পুরোহিতেরা বৌদ্ধ প্রচারক হইয়াছিলেন, হিন্দু সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের মৃত্যু হয় নাই; অমরের মৃত্যু হয় না।

হিন্দুর ধর্ম্ম অমর, সুতরাং হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানও অমর। তাই শঙ্কর আবার আর্য্যভূমে আর্য্যধর্ম্মের পুনরাধিপত্য-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। তাই হিন্দুধর্ম্মের নিত্য-অনুচর আচার অনুষ্ঠানও আবার সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল; তাই হিন্দুর ভারত আবার হিন্দু হইয়াছিল; তাই বৌদ্ধরূপ ভ্রষ্ট হিন্দুরা আবার হিন্দু হইয়াছিল; বৌদ্ধ ভিক্ষু আবার সন্ন্যাসী অবধূত হইয়াছিলেন।

মুসলমানের ভয়ঙ্কর প্রবাহ আসিয়া হিন্দুর ভারতকে আবার ডুবাইয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। মুসলমানের তরবারিপ্রচারিত ধর্ম্ম আসিয়া ভীরু চকিত অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল। মুসলমানও, ভারতে একাধিপত্য করিয়া, ভয়মৈত্রে—আতঙ্ক প্রলোভনে—অসংখ্য হিন্দুকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। হিন্দুর ভারত, মুসলমান ধর্ম্মের জন্য, মুসলমান ধর্ম্মের অনুরক্ত মুসলমানের, আচার অনুষ্ঠানের জন্য, —বিব্রত বিপন্ন হইয়াছিল; হিন্দুর ভারত মুসলমানের হাতে পড়িয়া যায় যায় হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রলয়প্রবাহেও হিন্দুধর্ম্ম আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, মগ্ন ধর্ম্ম আবার তীরে উঠিয়াছিলেন ভগ্নহিন্দুসমাজ আবার সংযুক্ত হইয়াছিল, জীর্ণ হিন্দুজাতি আবার সবল হইয়াছিল। মুসলমানধর্ম্মের জন্য হিন্দুধর্ম্মকে প্রথমে অবসন্ন হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে অবসাদ স্থায়ী হয় নাই। অমর হিন্দুধর্ম্ম মুসলমানধর্ম্মের কালগ্রাস হইতেও আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

বৌদ্ধ এবং মুসলমান ধর্ম্মও যে হিন্দুধর্ম্মকে মারিতে পারে নাই, ইংরেজের খৃষ্টধর্ম্ম সে হিন্দুধর্ম্মকে মারিতে পারিবে না। আর রাজভেদে প্রকৃতিভেদ। বৌদ্ধ রাজারা ভারতের সমস্ত হিন্দুকে বৌদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, মুসলমান বাদশাহ নবাবেরাও ভারতের সমস্ত হিন্দুকে মুসলমান করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। আমাদের রাজাধিরাজ ইংরেজের প্রকৃতি অন্যরূপ; মতিবুদ্ধি অন্যরূপ। নিজে খৃষ্টান হইয়াও রাজা ইংরেজ কাহারও ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হন না; কাহারও ধর্ম্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপও করেন না। নিজে করেন না, পরকেও করিতে দেন না। বৌদ্ধ ও মুসলমান ভারতপতিরা ভারতের হিন্দুকে যেরূপ ধর্ম্মত্যাগে বাধ্য করিতেন, ভারতের ইংরেজ নরপতি সেরূপ বাধ্য ত করেনই না; পরন্তু যে সেরূপ বাধ্য করিতে চাহে, তাহাকেও রাজা ইংরেজ প্রশ্রয় দেন না; বরং নিষেধ করেন—নিবারণ করেন। ভারতের কাহারও ধর্ম্মত্যাগে সমদর্শী ইংরেজ রাজ উৎসাহ প্রশ্রয় দেন না।

ধর্ম্মরক্ষায় হিন্দুর পথ সহজ হইয়াছে। ভাষায়, বৌদ্ধ মুসলমান আঘাত করিয়াছিলেন, ইংরেজরাজ ভাষায় আঘাত না করিয়া উৎসাহ দিতেছেন। প্রকৃত আচার অনুষ্ঠানেও রাজা ইংরেজ বাধা দেন না; বৌদ্ধ মুসলমান খুবই বাধা দিতেন। তাই বলিতেছি, পূর্ব্বে আমাদের ভাষারক্ষার—ধর্ম্মরক্ষার—আচারপালনের পথ যেরূপ দুর্গম—যেরূপ বিপৎসঙ্কুল ছিল, এখন আর সেরূপ নহে। এখন যে, আমরা ধর্ম্মে চ্যুত হই—ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হই, তাহা আমাদের নিজের দোষে; এখন যে, আমরা আচারপালনে এবং অনুষ্ঠান আচরণে উদাসীন বা বিরত হই, তাহা আমাদের নিজের দোষে। এখনকার হিন্দু যে, অহিন্দু হয়, তাহা সেই হিন্দুর নিজের অপরাধে। এখনকার ভাষা রাজার দোষে

বিকৃত হয় না, বরং রাজার উৎসাহে, সাহায্যে, এখনকার ভাষা উন্নতিলাভ করিতেছে। এখনকার ধর্ম্ম রাজার দোষে বিকৃত হয় না, এখনকার আচারও রাজার দোষে কলুষিত হয় না। এখন সে দিকে যে দোষ, তাহা আমাদের নিজের দোষে। আর এখন যদি ভারতীয় হিন্দুর জাতীয়তা নষ্ট হয়, তাহা হইলে ভারতীয় হিন্দুর দোষে; এখন যদি হিন্দুর জাতীয় জীবন নষ্ট হয়, তাহা হইলে, হিন্দুর স্বকৃত পাপে। ভাষা, ধর্ম্ম এবং আচার, জাতীয় জীবনের এই তিন মহাপ্রাণই এখন আমাদের নিজের হস্তে। আমরা যদি না রাখি, তবে কেহই রাখিতে পারিবে না।

বাঙ্গালার বঙ্গে।

হিন্দুভারতে হিন্দুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, হিন্দুভারতে হিন্দুর প্রগাঢ় ভক্তি; কিন্তু বঙ্গেই বাঙ্গালি হিন্দুর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ, হিন্দুবঙ্গেই বাঙ্গালিহিন্দুর প্রগাঢ়তর ভক্তি। বঙ্গ বাঙ্গালি হিন্দুর জন্মভূমি; বঙ্গভূমির বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গালিহিন্দুর মাতৃভাষা। দেবভাষা—সংস্কৃত ভাষা—হিন্দুর চিরপূজ্য, বাঙ্গালিহিন্দুরও চিরপূজ্য। এই দেবভাষাই বাঙ্গলাভাষার জননী। তাই দেবভাষার প্রতি বাঙ্গালিহিন্দুর অচলা ভক্তি। বাঙ্গলা ভাষা আমাদের মাতা, সংস্কৃত ভাষা আমাদের মাতামহী; মাতামহী আমাদের মাতারও পূজ্যা। কিন্তু—আমাদের কাছে সাক্ষাৎ মাতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজ্যা। তাই বাঙ্গলা ভাষা আমাদের অধিকতর পূজ্যা।

আর, এই বাঙ্গলা ভাষার জন্যই বাঙ্গালি হিন্দুর স্বতন্ত্রতা। হিন্দু বলিয়া আমারাও শ্লাঘা করিয়া থাকি, কিন্তু বাঙ্গালি হিন্দু বলিয়াই আমরা অধিক গৌরব করি। আমাদের শ্লাঘা অন্যের কাছে আত্মশ্লাঘা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, এ গৌরব অন্যের বিবেচনায় গর্ব্ব বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে; আমাদের কাছে—আমাদের মত যত বাঙ্গালি হিন্দুর কাছে—কিন্তু এই শ্লাঘাই পরম পবিত্র শ্লাঘা, এই গৌরবই শ্রেষ্ঠ গৌরব অগ্রে মাতা, পরে মাতামহী। যে হিন্দুসন্তান মাতৃপূজা না করিয়া মাতামহীর পূজা করিতে তৎপর, সে হিন্দুসন্তানের আমরা প্রশংসা করি না। যাঁহার মানে মাতামহীর মান, যাঁহার আদরে মাতামহীর আদর, সেই মাতার যে সন্তান পূজা না করে, তাহাকে আমরা নরাধম বলিয়া মনে করি

সত্যই বলিতেছি, বঙ্গভূমি আমাদের কাছে যত প্রিয়, ভারতভূমি তত নহে; বঙ্গের বাঙ্গলা ভাষা আমাদের কাছে যত প্রিয়, ভারতের সংস্কৃত ভাষা তত নহে।

ধর্ম্মেও আমরা কিঞ্চিৎ তারতম্য করিয়া থাকি; ধর্ম্মের তারতম্য করিয়া আমরা আচারেরও তারতম্য করিয়া থাকি। হিন্দুধর্ম্ম মূলে সর্ব্বত্র এক হইলেও, প্রদেশভেদে তাহার প্রকৃতিভেদ আছে। আচার-ভেদেই হিন্দুধর্ম্মের এই ভেদ। যে হিন্দুধর্ম্ম এখন বঙ্গে বিরাজ করিতেছে, ঠিক সে হিন্দুধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র বিরাজিত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুষ্ঠানহীন ধর্ম্ম নাই, অনুষ্ঠানভেদেই এক ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই আচার; আচার আর অনুষ্ঠানে নিত্য সম্বন্ধ।

বঙ্গের বাঙ্গলা ভাষা আমাদের অধিক প্রিয়, বঙ্গের বঙ্গীয় হিন্দুধর্ম্মই আমাদের অধিক প্রিয়, বঙ্গের আচার অনুষ্ঠানও আমাদিগের অধিক প্রিয়। আহার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই আচারের অধীন ও অঙ্গীভূত। এই জন্যই বঙ্গের আহার ব্যবহারে আমাদিগের অধিক অনুরাগ, বঙ্গের পোষাক পরিচ্ছদেই আমাদিগের অধিক আসক্তি।

বঙ্গের যাহা নিত্য, যাহা চিরন্তন, তাহাই আমাদিগকে রাখিতে হইবে; তাহাতেই আমাদিগকে অনুরাগ বাড়াইতে হইবে; তাহাতেই আমাদিগকে অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে।

ধর্ম্ম ও আচারের কথা অনেক কহিলাম। এখন ভাষার কথাই ভাল করিয়া কহিব। জাতীয় জীবনে জাতীয় ভাষার কিরূপ উপযোগিতা, তাহা সংক্ষেপে দেখাইয়াছি। বঙ্গীয় হিন্দুর জাতীয় জীবনে বাঙ্গলা ভাষার কিরূপ উপযোগিতা, তাহাও পাঠককে ইঙ্গিতে আভাসে দেখাইতে ত্রুটি করি নাই। বঙ্গে বাঙ্গলা ভাষা যত দিন থাকিবে, বাঙ্গালি হিন্দুরও জাতীয় জীবন তত দিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কেবল ধর্ম্ম ও আচার অক্ষুণ্ণ রাখিলে, আমরা হিন্দু থাকিতে পারিব; কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাকে অক্ষুণ্ণ না রাখিলে, আমরা বাঙ্গালি নামের অধিকারী হইতে পারিব না। ভাষা আমাদের জাতীয়জীবনের প্রাণস্বরূপ, বাঙ্গালির বাঙ্গালিত্বরক্ষার পক্ষে আর দুই প্রাণ অপেক্ষা এই প্রাণেরই অধিক উপযোগিতা।

যখন বাঙ্গলা ভাষা না থাকিলে আমাদের বাঙ্গালিত্ব থাকিবে না, বাঙ্গলা ভাষার তিরোভাবে যখন আমাদিগের

বাঙ্গালিত্বরূপে মৃত্যু হইবে; তখন এই বাঙ্গলা ভাষার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা, ভক্তি, আদর, যত্ন তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ করা উচিত নহে; বাঙ্গলা ভাষারই পুষ্টি উন্নতির দিকে আমাদিগের অধিক দৃষ্টি রাখা উচিত।

যাঁহারা বঙ্গের বাঙ্গালি হইয়াও অন্য ভাষাকে বাঙ্গলা ভাষার অপেক্ষা উচ্চ আসনে বসাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা বঙ্গভূমির সুসন্তান বলিয়া মনে করি না, মাতৃরূপা বাঙ্গলা ভাষার তাঁহারা পুত্র হইবারই যোগ্য নহেন। সংস্কৃত ভাষা মাতামহী; ভারতের হিন্দী মহারাষ্ট্রী দ্রাবিড়ী প্রভৃতির ন্যায় যত ভাষাই আমাদের মাতৃরূপা বাঙ্গলা ভাষার সহোদরা। মাসীমাদিগকে, ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাক, কিন্তু মাসীকে কখনই মার অপেক্ষা উচ্চ আসন দিই না। মাতার সহোদরা বলিয়াই ত মাতৃস্বসা আমাদিগের পূজনীয়া। আর যখন খোদ মাতামহীকেই মাতার অপেক্ষা অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা দিতে পারি না; তখন মাতৃস্বসাদিগকেই বা মাতার অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি দিতে পারিব কেন? যে ভক্তি সংস্কৃত ভাষাকেও দিতে প্রস্তুত নহি, সে ভক্তি হিন্দী গুর্জ্জরী প্রভৃতিকে দিতে পারিব কেন? মাতার উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা মাতারই প্রাপ্য, বাঙ্গলা ভাষার উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা বাঙ্গালির কাছে বাঙ্গলা ভাষাই চিরদিন পাইবেন।

বাঙ্গলার পূজা।

মাতৃভাষা মাতার ন্যায় পূজনীয়া। মাতৃভাষার পূজা কিরূপে করিতে হয়, আয়র্লণ্ডের স্বদেশহিতৈষীরা তাহা আমাদিগকে শিখাইয়া দিতেছেন। আয়র্লণ্ড ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্গত,—অঙ্গীভূত। বিলাতের পার্লেমেন্টেও আয়র্লণ্ডের লোকে সভ্য হইয়া থাকেন। আয়র্লণ্ডের লর্ডেরা লর্ড হাউসে বসেন, আয়র্লণ্ডের ১০৩ জন সভ্য 'কমন' সভায় বসেন। আয়র্লণ্ডের সুইফ্‌ট্‌, গোল্ড্‌স্মিথ, মুর প্রভৃতি ইংরেজি ভাষায় সুন্দর সুন্দর কাব্য লিখিয়াছেন। ইঁহাদের কাব্য ইংরেজ কবির কাব্য অপেক্ষা আদরে সম্মানে হীন নহে। আয়র্লণ্ডের লেকি ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে যে সকল ইংরেজি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার আদর ইংলণ্ডেও অসীম। আয়র্লণ্ডের জষ্টিন ম্যাকার্থির মত ইংরেজি লেখক ইংলণ্ডেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বর্ক ও শেরিডান আয়র্লণ্ডের কুলতিলক। আইরিষ ওকনেল গ্রাটান প্রভৃতির ইংরেজি বক্তৃতা এখনও সকলের আদর্শ। ভারতের বড় লাট লর্ড মেয়ো আয়র্লণ্ডে জন্মিয়া আয়র্লণ্ডে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস আয়র্লণ্ডের সুসন্তান। আয়র্লণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষা হীন নহে। আয়র্লণ্ডে যাঁহারা ব্যারিষ্টার হন, তাঁহাদিগের অধিকার ইংরেজ ব্যারিষ্টারদিগের সমান। আয়র্লণ্ডের লোকে সর্ব্বাংশেই ইংরেজের সমতুল্য। ইংরেজি ভাষা আয়র্লণ্ডের একপ্রকার জাতীয় ভাষাই হইয়া গিয়াছে। ইংরেজি ভাষায় ইংরেজ, স্কচ্‌, ওয়েল্‌শ এবং আইরিষের কোনরূপ তারতম্য নাই।

তথাপি আয়র্লণ্ডের আইরিষ, আইরিষ ভাষার—আপনার মাতৃসমা গেলিক ভাষার—প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন, মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনে যেরূপ যত্ন করিয়া থাকেন, বঙ্গের বাঙ্গালি সেরূপ করেন না। ছয়শত বৎসরের আধিপত্যে ইংরেজিভাষা আয়র্লণ্ডের একপ্রকার জাতীয় ভাষাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি আইরিষ স্বীয় মাতৃভাষার মঙ্গলার্থ নিজের ধন প্রাণাদি সমস্তই ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত, অকাতরে ছাড়িয়া দিতেও তিনি সমর্থ।

ভারতের পরম সৌভাগ্য! রাজা ইংরেজ আইরিষদিগকে মাতৃভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বীতরাগ করিবার জন্য ছয় শত বৎসর ধরিয়া যত্ন চেষ্টা বিধিব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ভারতের ভারত-সন্তানকে মাতৃভাষায় সেরূপ বীতশ্রদ্ধ ও বীতরাগ না করিয়া তিনি বরং জাতশ্রদ্ধ এবং জাতরাগই করিবার তরে নিরন্তর যত্ন চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

আয়র্লণ্ডের ভাষাগত অবস্থার পরিচয়টা পাঠক একজন আইরিষের মুখেই শ্রবণ করুন। বৃটিশ পার্লেমেন্টের আইরিষ সভ্য টমাস ওডনেলের প্রবন্ধেই আইরিষ ভাষার রহস্য গ্রহণ করুন। ওডনেল বলিতেছেন;—

১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ এক আইন করিয়া আয়র্লণ্ডে আইরিষ ভাষার ব্যবহার রহিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। সেই আইনে বিধান হয়,—"যে ব্যক্তি আইরিষ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবে বা পত্রাদি লিখিবে, সেই দণ্ডনীয় হইবে। সে যদি স্বীয় ভবিষ্যৎ সদাচরণের জন্য—আর কখনও মাতৃভাষা মুখে আনিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞার

প্রতিপালন করিবে বলিয়া—উপযুক্ত রাজভক্ত লোককে জামিন দিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই সরকারে বাজে-আপ্ত হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি আইরিষ কৃষককে আইরিষ ভাষায় শিক্ষা দিবে, তাহারই কারাদণ্ড না হয় অর্থদণ্ড হইবে!"

তথাপি আইরিষ নিজের মাতৃভাষাকে একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। ওডনেল সাহেব বলিতেছেন "তথাপি আয়র্লণ্ডের অন্ততঃ ১০লক্ষ লোক এখনও আইরিষ ভাষার ব্যবহার করে; মাতৃভাষায় কথাবার্ত্তা করিতে পারে।"

কেন পারে? আইরিষ ভাষার সজীবতা কিসে রক্ষা পাইয়াছে—কিরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে?

ওডনেল সাহেবের মুখেই উত্তর লউন। তিনি বলিতেছেন, "আমরা মাতৃভাষার—আমাদের প্রিয় গেলিক ভাষার—মঙ্গলের জন্য যে সভা করিয়াছি, এখন তাহার ২০৮ শাখা চারি দিকে বিরাজ করিতেছে। এই সকল শাখার লক্ষ লক্ষ উদ্যোগী সভ্য দেশের চারিদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতেছেন; মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন ও উন্নতিবিধান করিতেছেন। যেখানে আইরিষ, সেইখানেই সভার শাখা। আমেরিকা আইরিষে পূর্ণ হইয়াছে, আমাদের ভাষারক্ষণী সভার শাখাও আমেরিকায় অনেক বসিয়াছে। ইংলণ্ডে আইরিষ আছে; নিজ ইংলণ্ডেও সভা হইয়াছে। লণ্ডনে সভা আছে, লিবারপুলে সভা আছে, মেঞ্চেষ্টারে সভা আছে। আমি নিজে অনেকস্থলে মাতৃভাষায়—আমার গেলিক ভাষায়—বক্তৃতা করিয়াছি। আমার মুখে মাতৃভাষায় বক্তৃতা শুনিয়া যত আইরিষ আনন্দিত হইয়াছে; সকলেই উৎসাহ অনুরাগের পরিচয় দিয়াছে।"

আয়র্লণ্ডের রাজনীতিক ওডনেল যাহা বলিয়াছেন, পাঠক তাহা শুনিলেন; আবার ধর্ম্মপ্রচারক পাদরি ওডনেল যাহা বলিয়াছেন, তাহারও একটু শ্রবণ করুন। পাদরি বলিতেছেন—

"মাতৃভাষার গৌরব প্রতিপত্তি যতদিন না বাড়িবে, ততদিন দেশের কোনরূপে উন্নতি হইবে না। মাতৃভাষার আদর যেরূপ বাড়িবে, দেশের মঙ্গল সেইরূপ হইবে। মাতৃভাষার যাঁহার অটল অচল অনুরাগ নাই, তিনি প্রকৃত দেশভক্ত বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত নহেন। যে মাতৃভাষার বিরাগী, সেত জন্মভূমির সুসন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকারী নহে।"

পাদরি ওডনেল বলিতেছেন, "আয়র্লণ্ডের যেখানে দেখিবে মাতৃভাষার আদর আছে, যেখানে দেখিবে সম্প্রদায়ের সকল লোকেই মাতৃভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে, সেইখানেই যত লোকের মুখে, নর নারী বালক বালিকার মুখে, মনুষ্যত্বের আভাস পাইবে। দেখিবে, মনের মহত্ত্ব মুখে ফুটিতেছে।"

পার্লেমেণ্টে ৮৫ জন স্বদেশহিতৈষী আইরিষ সভ্যের যে একটী দল আছে, সে দলের প্রতিপত্তি নিতান্ত কম নহে। সেই দলের প্রধান পরিচালক রেডমণ্ড সাহেব কি বলিতেছেন, একবার শ্রবণ করুন। রেডমণ্ড বলিতেছেন;—

"আমাদের মাতৃভাষা—গেলিক ভাষাই—আমাদিগের জাতীয়তারক্ষায় সমর্থ হইবে। আইরিষ হৃদয়ের আইরিষ ভাব, আইরিষ সংস্কার, আইরিষ চিন্তা, এই আইরিষ ভাষাই সর্ব্বত্র উত্তেজিত করিয়া রাখিবে। অন্যথা আমাদের জাতীয়তা বিলুপ্ত হইয়াই থাকিবে। আইরিষ ভাষার গৌরব থাকিলেই, আইরিষ জাতির গৌরব থাকিবে; আইরিষ জীবনের গৌরব থাকিবে।"

আইরিষ রাজনীতিক ওডনেলই বলিতেছেন,—

"আইরিষ ভাষাই আইরিষের স্বাতন্ত্র্য—আইরিষের আইরিষত্ব বজায় রাখিতেছে। আইরিষ ভাষার কল্যাণেই, আইরিষ জগতের সর্ব্বত্র, সুদূর জগৎপ্রান্তেও, আইরিষ বলিয়া, পরিচয় দিতে পারিতেছে।"

আয়র্লণ্ডের এক মহাকবি বলিয়াছেন,—

"মাতৃভাষা—শৈশবের ভাষা—যে জাতির সজীব না থাকে, সে জাতি কখনই সজীব থাকিতে পারে না; দোলনার ভাষা কবরে গেলে, জাতিকেও কবরে যাইতে হয়।"

পূর্ব্বে যাহাই হইয়া থাকুক, এখন কিন্তু আয়র্লণ্ডে আইরিষ ভাষা আবার সজীব হইতেছে। মরা গোড়ায় আবার তেউড় গজাইতেছে। যেখানে আইরিষ ভাষার আদর, সেইখানেই সুফল। আয়র্লণ্ডে জাতীয় শিক্ষার যে কমিশন বা সভা আছে, মহামতি সার প্যাটরিক কীনান তাহার অধ্যক্ষ। দেশের যত বিদ্যালয়ই এই কমিশনকে দেখিতে হয়। সুতরাং সার প্যাটরিক কীনানের অভিজ্ঞতা সর্ব্ববাদিসম্মত তিনি বলিতেছেন;—

"যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সকল আইরিষ সন্তানেরই আইরিষ ও ইংরেজি, দুই ভাষায় শিক্ষালাভ করা উচিত।

যেখানে দেখিয়াছি, আইরিষ বালক বালিকারা আইরিষ ছাড়িয়া—মাতৃভাষা ভুলিয়া—কেবল ইংরেজি শিখিতেছে, সেইখানেই ফল দেখিয়া, হতাশ ও বিস্মিত হইয়াছি; সেইখানেই যত বালক বালিকার মুখে যেন নির্ব্বুদ্ধিতাই ফুটিয়া বাহির হইতেছে; মুখে চোখে যেন জড়তাই বিরাজ করিতেছে। সকলের উচিত, প্রথমে আইরিষ ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়া, পরে আইরিষ ভাষার সাহায্যে ইংরেজিবিদ্যায় জ্ঞানলাভ করা।"

সার প্যাটরিক কীনান নিজের রিপোর্টে আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে যে কথা কহিয়াছেন, আমাদের শিক্ষাবিভাগের যে কোন কীনানই স্বকীয় রিপোর্টে সেই কথা কহিতে অধিকারী; সত্যই এই কথা কহিতে বাধ্য। সার প্যাটরিক বলিতেছেন:—

"গত বৎসর আমাকে পরিদর্শনব্যপদেশে অনেক স্থানের অনেক বিদ্যালয়ে অনেকবার যাইতে হইয়াছে। অনেক বালক বালিকার পরীক্ষাও আমাকে লইতে হইয়াছে। বালক বালিকাদিগকে ইংরেজি ভাষায় প্রশ্ন করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে, ইতস্ততঃ করিতেছে। কিন্তু যাই আইরিষ ভাষায় প্রশ্ন করিয়াছি, অমনই দেখিয়াছি, সকলের মুখে একটা জ্যোতি বাহির হইতেছে, উৎসাহ যেন ফুটিয়া পড়িতেছে; আর আইরিষ প্রশ্নে আইরিষ ভাষায় উত্তর দিবার সময়ে সকলেই বিচিত্র দক্ষতারই পরিচয় দিতেছে।"

অনেক বিদ্যালয়ের পরিদর্শন করা—এক স্থানে শত শত বালক বালিকার পরীক্ষা করা—এক সময়ে আমাদের ভাগ্যেও ঘটিয়াছে। আমাদের সামান্য সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাও কিন্তু সার প্যাটরিকের অসামান্য অসংকীর্ণ অভিজ্ঞতারই পথে যাইতেছে। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি—জন্মভাষা ও জন্মভূমি—স্বভাবতঃ সকলের কাছে জননীসমা। নানা কারণে যে ব্যতিক্রম হয়, তাহাই অস্বাভাবিক। স্বার্থ, অভিমান, অবুদ্ধিই লোককে মাতৃভাষার বিরাগী করিয়া, অন্য ভাষার অনুরাগী করে। কিন্তু যেখানে বহুদর্শিতা, সেইখানেই এক মত। সেইখানেই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, "অর্থ বা অন্যরূপ স্বার্থের জন্য অন্য ভাষা শিখিতে পার, কিন্তু মাতৃভাষায় কদাচ বিরাগী হইও না। ভিন্ন জাতীয় রাজার রাজ্যে রাজভাষা জ্ঞান করিয়া না শিখিলে চলে না, কিন্তু নিজের ভাষাও যেন সদা সর্ব্বদা [illegible] রাজভাষায় স্বার্থসম্পাদন কর, রাজভাষায় জ্ঞানসম্পাদন কর, রাজভাষায় বিদ্যাবর্দ্ধন কর; আপত্তি নাই। কিন্তু সকল স্বার্থ যেন মাতৃভাষার অর্থে নিযুক্ত হয়; সকল বিদ্যা, সকল জ্ঞানই যেন মাতৃভাষায় সংযুক্ত হয়।" আয়র্লণ্ডের জাতীয় শিক্ষাসমিতির অধ্যক্ষ সার প্যাটরিক কীনানের বাক্য বেদবাক্য! আয়র্লণ্ডের যত আইরিষকে—যত শিক্ষক ও পরিদর্শককে—তিনি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

আমাদের পথ আইরিষের মত দুর্গম বন্ধুর নহে। রাজা আমাদের জাতীয় ভাষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। আমাদের আদালতে জাতীয় ভাষার গৌরব আছে। আমাদের আইনেরও রাজাদেশে জাতীয় ভাষায় অনুবাদ এবং প্রচার হয়। আমরা জাতীয় ভাষায় রাজদ্বারে অভাব, আকাঙ্ক্ষা জানাইতে পারি। আমাদের সকল বিদ্যালয়েই জাতীয় ভাষার আদর আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও জাতীয় ভাষা এখন একেবারে অনাদৃত নহে। এরূপ অবস্থায় যদি আমরা আমাদের জাতীয় ভাষায়—বাঙ্গালী আমাদের বাঙ্গলা ভাষায়—বীতরাগ হইয়া থাকি, তাহা হইলে, এ মহাপাপ আমাদের; এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগকেই করিতে হইবে। জননী মাতা, জন্মভূমি মাতা, আর ভাষা মাতা; এই তিন মাতাই আমাদের পূজ্যা। এক মাতায় অভক্তি হইলেই আমাদিগকে মাতৃদ্বেষী হইতে হইবে।

আমাদের কাজ কর্ম্মে, আমাদের সমিতি সভায়, আমাদের চিঠী পত্রে, আমাদের পুস্তক পুস্তিকায়, আমাদের সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রে—যদি আমরা আমাদের বাঙ্গলাকেই একাধিপত্য করিতে না দিই, তাহা হইলে আমরা মাতৃদ্বেষী, আমরা মহাপাপী নরাধম। ইংরেজি ভাষা—রাজভাষা। আমাদের মাতৃভাষা নহে, বাঙ্গলাই আমাদের মাতৃভাষা, কোন্ ভাষায় আমাদিগের অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত, কোন্ ভাষায় আমাদের অধিক যত্ন অনুরাগ রাখা উচিত, তাহা বুঝা সহজ। যে ভাষায় আমরা শৈশবে "মা" বলিয়াছি, যে ভাষায় এখনও আমরা "মাকে" ডাকিতেছি, যে ভাষায় আমাদের পুত্র কন্যা এখন "মা" বলিতেছে—আমাদিগকে "বাবা" বলিয়া ডাকিতেছে, যে ভাষায় আমরা সুখ সমৃদ্ধি উৎসবের সময়ে আনন্দে করিতেছি, যে ভাষায় দুঃখের সময়ে কাতরতা-প্রকাশ করিতেছি, যে ভাষায় আমরা হাসিতেছি, যে ভাষায় কাঁদিতেছি, যে

ভাষায় বিপৎকালে ভগবান্‌কে ডাকিতেছি, যে ভাষায় মরণকালে হরিনাম করিতেছি, সেই ভাষা—আমাদের সেই মাতৃভাষা—বাঙ্গলীর সেই বাঙ্গলা ভাষা—কিরূপ পূজনীয়া—কিরূপ মাননীয়া—কিরূপ বরণীয়া—কিরূপ স্মরণীয়া—কিরূপ ভরণীয়া—তাহা যদি আমরা না বুঝি, তাহা হইলে আমাদের মত নরাধম—আমাদিগের মত পশুর অধম—জগতে আর নাই। নরকের শয়তানসন্তানেরাও মাতৃভাষা ভুলিতে পারে না!

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।



মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র

যে মহাপুরুষগণের নরজীবন অতি সুমধুর ও সুপবিত্র সৌরভে সুরভিত, যাঁহাদের মহাশিক্ষাময় চরিত্র-কাহিনী আলোচনা করিলে, মনের সঙ্কীর্ণতা ও মলিনতা বিদূরিত হয়, স্বর্গগত কালীকৃষ্ণ মিত্র সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাজনগণের অন্যতম। আজ দশবর্ষ হইল কালীকৃষ্ণবাবুর মর্ত্ত্যবাসের অবসান হইয়াছে। কালীকৃষ্ণ বাবুর নামোল্লেখ করিলেই আর দুইটী পুণ্যশ্লোক বঙ্গসন্তানের কথা মনে পড়ে—স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার। এই দুই মহাত্মা কালীকৃষ্ণ বাবুর সহিত চিরজীবন প্রাণে প্রাণে বাঁধা ছিলেন। যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই তিন মহাত্মার জীবনবৃত্ত আলোচনা করিবেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, এই তিনটী জীবনস্রোত মুখ্যতঃ একই খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহজ্জীবনের কথা সর্ব্বজনবিদিত, প্যারীচরণ বাবুর অপেক্ষাকৃত অপরিজ্ঞাত জীবনী যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন সে চরিত্র কত সুদুর্লভ ও উচ্চাদর্শে গঠিত। আর কালীকৃষ্ণ বাবুর মর্ত্ত্যবাস-কাহিনী এত মধুর, এত পবিত্র ও এত মহান্ যে, সে কথা আলোচনা করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, পাছে ক্ষুদ্র হৃদয় ও অক্ষম লেখনী সে ইতিহাসের মহত্ত্ব খর্ব্ব করিয়া ফেলে, সে চরিত্রের শুভ্র সৌন্দর্য্য মলিনতাস্পৃষ্ট করে। কালীকৃষ্ণবাবু সুধী ও গুণগ্রাহী সমাজে "A Modern Rishi" "মহর্ষি" "The Sage of Baraset" "Philosopher" "জ্ঞানাগার" প্রভৃতি অভিধায় সম্ভাষিত হইয়াছিলেন, দীন দরিদ্রগণ তাঁহাকে মানবাকারে দেবতা বলিয়া অর্চ্চনা করিত।

কালীকৃষ্ণ বাবু খৃষ্টীয় ১৮২২ অব্দে কলিকাতা সিমুলিয়ায় পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবনারায়ণ মিত্র। শিবনারায়ণ বাবু দর্জ্জিপাড়ার বনিয়াদি মিত্র বংশীয় এবং তিনি সুপ্রসিদ্ধ "ছাতুবাবু"র নিকট আত্মীয় ছিলেন। শিবনারায়ণ বাবুর চারি পুত্র, কালীকৃষ্ণ বাবু

তৃতীয়। পিতার সাংসারিক অবস্থার অসচ্ছলতা নিবন্ধন কালীকৃষ্ণ বাবু ও তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরদ্বয়কে পাঠ্যাবস্থায় দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। কালীকৃষ্ণ বাবু বাল্যকালে হেয়ার সাহেবের স্কুলে, সেই চিরপূজনীয় শিক্ষাগুরুর পাদমূলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দু-কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। এবং ঐ কলেজে বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার স্বীয় বৃত্তিলব্ধ অর্থ হইতে, প্রকৃতপক্ষে নিজেই নির্ব্বাহ করেন; এবং সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কালীকৃষ্ণ বাবু পিতৃহীন হয়েন।

কালীকৃষ্ণ বাবুর অগ্রজদ্বয়ের কথা স্মরণ করিলে মনে হয়, বিদ্যানুশীলনে অনন্যসাধারণ সাফল্যলাভ তাঁহাদের বংশগত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺কৃষ্ণধন মিত্র হিন্দু-কলেজে অধ্যয়নকালে অসামান্য বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভার জন্য এরূপ খ্যাতি লাভ করেন, যে তিনি Encyclopædia Britannica নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি শব্দকোষ গ্রন্থ এদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মহাপণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন সাহেব, ঐ দুরূহ কর্ম্মভার এদেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া, কৃষ্ণধন বাবুকে প্রশংসা জ্ঞাপন করেন ও উৎসাহ দান করেন। নির্ম্মম মৃত্যু কৃষ্ণধন বাবুকে সেই কীর্ত্তি রাখিয়া দিবার অবসর দেন নাই, তিনি যৌবনকালেই অনুমান বিংশতিবর্ষ বয়সে এ জগৎ হইতে অপসৃত হয়েন। কৃষ্ণধন বাবু ৺রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহাধ্যায়ী ছিলেন, এবং ডি এল্ রিচার্ডসন্ সাহেবের সম্পাদিত Oriental Pearl নামক পত্রে "K. D. M." শীর্ষক কৃষ্ণধনবাবুর বিয়োগজনিত শোকজ্ঞাপক প্রবন্ধ পাঠ করিলে তদীয় প্রতিভালোকদীপ্ত জীবনের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। কালীকৃষ্ণ বাবুর মধ্যমাগ্রজ ৺নবীনকৃষ্ণ মিত্র, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়েন—নবীনবাবুই মেডিক্যাল কলেজের প্রথম স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছাত্র। উত্তরকালে নবীন বাবু চিকিৎসা বিদ্যায় অদ্বিতীয় পারদর্শিতা লাভ করেন; লোকে তাঁহাকে ধন্বন্তরী বলিত। নবীন বাবুর গবেষণা কেবল ভৈষজ্যশাস্ত্রেই নিবদ্ধ ছিল না, তিনি ইংরাজি সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা পুরুষও সচরাচর দেখা যায় না। নবীন বাবু কাশিমবাজারের ৺রাজা কৃষ্ণনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং সেই সূত্রে উভয়ে অকৃত্রিম প্রীতিডোরে আবদ্ধ হয়েন। একবার রাজা কৃষ্ণনাথ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ নবীন বাবুকে একলক্ষ মুদ্রা অর্পণ করিয়াছিলেন; নবীন বাবু বন্ধুর দান গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তার সহিত সেই উপহার প্রত্যাখ্যান করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাত সময়ে নবীনবাবু, এদেশীয় ছাত্রগণকে ইংরাজি ফরাশী জর্ম্মান্ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন করিবার উদ্দেশে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগী হয়েন এবং উহার গঠন-প্রণালী নিজেরই বিদ্যা ও প্রতিভাবলে লিপিবদ্ধ করেন। রাজা কৃষ্ণনাথ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, স্বীয় উইলে, নবীনকৃষ্ণ বাবুকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থে বহুলক্ষ টাকা অর্পণ করিয়া যান। দৈবদুর্ব্বিপাকে নবীনবাবুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কামনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। রাজা কৃষ্ণনাথের শোচনীয় মৃত্যুকালে নবীনকৃষ্ণবাবু পীড়িত অবস্থায় সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি যখন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন ৺মহারাণী স্বর্ণময়ীর আপত্তিতে তাঁহার স্বামীর উক্ত উইল ধর্ম্মাধিকরণে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। সে ইতিহাস এখানে উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন। কালীকৃষ্ণবাবু উক্ত প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদ্বয়ের উপযুক্ত ভ্রাতা, কালীকৃষ্ণবাবুর মনস্বিতা দেশের গৌরবস্থানীয়।

পঠদ্দশায় কালীকৃষ্ণবাবু হিন্দু কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। কলেজে বিদ্যাশিক্ষা কালীকৃষ্ণবাবুর জ্ঞানার্জ্জনের প্রথম সোপান মাত্র, তিনি জীবনব্যাপী অবিরাম গবেষণায় ও নৈসর্গিক ক্ষমতাবলে এরূপ প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন, যে এ দেশে তাঁহার সমকক্ষ বিদ্বান্ ব্যক্তি অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা অতি প্রবল ছিল, তিনি ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থবারিধি মন্থন করিয়া সেই অদম্য তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। বৃদ্ধাবস্থাতেও স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগণ তাঁহার জন্য কলিকাতা ও অপরাপর স্থানের শ্রেষ্ঠ পুস্তকালয়সমূহ হইতে অবিরত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সেই অধ্যয়ন-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম হইতেন না। তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে গভীর চিন্তাশীল ও দুরূহ গ্রন্থ সমূহ আয়ত্ত করিতেন,

যে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়, এবং যে পুস্তক একবার কালীকৃষ্ণবাবুর অধীত হইত, তাহার গূঢ়তম রহস্য চিরদিনের জন্য তাঁহার নিজস্ব হইয়া যাইত। কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি আধ্যাত্ম সকল শাস্ত্রই তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল। পরন্তু একাধিক শাস্ত্রে তাঁহার গবেষণা ও জ্ঞান অতি গভীর ছিল। ইণ্ডিয়ান মিরার লিখিয়াছেন "He was at his death we believe one of the most up to date scholars of our country, keeping abreast of the latest contributions to human knowledge by an enthusiastic and unwearied application to books in more than one language"*—'আমাদের বিশ্বাস তিনি মৃত্যুকালে, জ্ঞানের আধুনিক বিকাশে সুপরিজ্ঞাত, একজন এদেশীয় মহামনীষী ব্যক্তি ছিলেন। সাগ্রহ ও অক্লান্ত অভিনিবেশের সহিত একাধিক ভাষার গ্রন্থসমূহে অধ্যয়নরত থাকিয়া, মানবসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের অভিনব সম্পদ আহরণ করিয়া তিনি উন্নতির পথে কালের সহগামী ছিলেন।'

কালীকৃষ্ণবাবুর অনুসন্ধিৎসা সর্ব্বতোমুখী ছিল; কিন্তু উদ্ভিজ্জ ও কৃষিবিদ্যা (Botany and Agriculture), নিদানশাস্ত্র, ভৌতিক বা অতিপ্রকৃত বিদ্যা (Spiritualism), যোগশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ ছিল। উদ্ভিজ্জ ও কৃষিবিদ্যায় তিনি সমকালীন ব্যক্তিগণের মধ্যে অদ্বিতীয় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ঐ বিদ্যাদ্বয়ের অনুশীলন তাঁহার পুঁথিগত ছিল না, তিনি উহার কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষ প্রতিপাদন করিতেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন, তিনি জীবনের একটী মুখ্যব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ব্রত সমাধানের আশায় তিনি অশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতিকর পাশ্চাত্য দেশে আবিষ্কৃত নব নব যন্ত্র সমূহ আনাইয়া তিনি পরীক্ষা করিতেন এবং কৃষিজীবিগণকে ঐসকল বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষাক্ষেত্র হইয়াছিল বারাসতে নবীনকৃষ্ণবাবুর সুবিশাল ও সুবিখ্যাত উদ্যানে। ঐ উদ্যানে কালীকৃষ্ণবাবু একটী আদর্শ কৃষিভাণ্ডার (Model Farm) উন্মুক্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ উদ্যান-প্রসূত শস্যাবলীর উৎকর্ষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রশংসা উদ্রিক্ত করিত। ঐ উদ্যানে কালীকৃষ্ণবাবু বায়ুমান, তাপমান বারিসম্পাতমান প্রভৃতি আবহবিদ্যা (Meteorology) সংক্রান্ত যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া উহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতেন, এবং উন্নতপ্রণালীতে বিদেশীয় হল-চালনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্তিকার উপাদান সমূহের কেবল গুণজ্ঞাপক বিশ্লেষণ (qualitative analysis) করিয়া নিরস্ত ছিলেন না, উহাদের পরিমাণজ্ঞাপক বিশ্লেষণ (quantatative analysis) করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কৃষিরসায়ণ শাস্ত্রেও (agricultural chemistry) তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রও কালীকৃষ্ণবাবু বিশেষ অভিনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; অগ্রজ নবীনকৃষ্ণবাবুর উক্ত বিদ্যানুশীলনের আগ্রহই বোধ হয় প্রথমাবস্থায় অনুজের জ্ঞানপিপাসু হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। পরে কালীকৃষ্ণবাবুর স্বাভাবিক পরহিতকামনা ঐ বিদ্যার প্রতি অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত করে। শেষাবস্থায় হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা শাস্ত্রেরই তিনি আলোচনা করিতেন। হোমিওপ্যাথী বিষয়ক কোন পুস্তকই তাঁহার অনধীত ছিল না এবং ঐ বিষয়ে, তিনি এত পুস্তক রচনা ও বিনা নামে কেবল মাত্র দরিদ্র গৃহে বিতরণের জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে সেগুলি হিন্দু পেট্রিয়টপত্রের কথায়, "তাহাদের রচয়িতার বিদ্যা ও পরিশ্রমের এক মহাকীর্ত্তি" ("a monument of their author's learning and industry")।* যোগশাস্ত্র, ভৌতিক বা অশরীরী আত্মা সম্বন্ধীয় যাবতীয় অলৌকিক বিদ্যালোচনায় তাহার নিরতিশয় আস্থা ছিল। তিনি ঐ বিদ্যানুশীলনের জন্য বারাসতে সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠ্যসমিতি (Truth Seekers' Reading club) নামক একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, অতিপ্রকৃতে নিষ্ঠাবান্ বহুতর বিদেশীয় ও দেশীয় প্রথিতনামা ব্যক্তির সহিত তাঁহার পত্র বিনিময় হইত, এবং উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার জন্য তিনি অভিনন্দিত হইতেন। "থিয়জফিষ্ট" পত্র বলেন যে, কালীকৃষ্ণবাবু পরলোক-প্রয়াণের সময় অলৌকিক সাহিত্য সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট এবং সুসম্পূর্ণ পুস্তকাগার রাখিয়া যান ("left one of the best and most

* Indian Mirror 18th August, 1891.

* Hindu Patriot 3rd August, 1891.

complete libraries of occult literature"* হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট বা মহম্মদীয় কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রই কালীকৃষ্ণবাবুর অপরিজ্ঞাত ছিল না। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ পাঠ ও আয়ত্ত করিতেন। কিন্তু কোনও এক শাস্ত্র বিশেষের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা সর্ব্বশাস্ত্রালোচনা জনিত প্রগাঢ় মনীষিতার জন্যই কালীকৃষ্ণবাবু বিদ্বজ্জন সমাজে বরেণ্য হইয়াছিলেন।

অনেকে আক্ষেপ করেন, কালীকৃষ্ণবাবু তদীয় অপরিমেয় পাণ্ডিত্যের কোন স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, সে বিষয়ে কোনও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াও বোধ হয় না। ইহার একটী কারণ আছে এবং সেই কারণটীই বোধ হয় তাঁহার অসাধারণ জীবনের বিশেষত্ব। তিনি যেরূপ জ্ঞানতৃষাতুর ছিলেন, তাহাতে কোনও সারবান গ্রন্থ রচনা করিতে পারিলে, তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু কালীকৃষ্ণবাবু পরদুঃখ নিবারণই জীবনমার্গের ধ্রুবনক্ষত্র স্থির করিয়া সেই মুখেই প্রধাবিত হইয়াছিলেন, গ্রন্থকাররূপে বরিত হইবার কামনা বা অবসর তাঁহার ছিল না। তিনি জানিতেন, জগতের জ্ঞান সম্পদ পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য দেশ দেশান্তরের শত শত সুধীজন নিয়োজিত আছেন, সেই জ্ঞান সাগরে তাঁহার বিন্দুবারি দান না করিলে জগতের বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু তিনি যদি স্বদেশীয় নিম্নশ্রেণীস্থ, অসহায় ও নিরক্ষর ব্যক্তিগণের ও অজ্ঞান তিমিরমগ্ন বঙ্গরমণীগণের হৃদয়ে জ্ঞানালোকের কণা মাত্রও প্রবেশ করাইতে পারেন, তিনি যদি দেশীয় শ্রমজীবি ও কৃষিজীবিগণের শোচনীয় অবস্থার কিঞ্চিন্মাত্রও উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার মানব-জীবনের উদ্দেশ্য মহত্তররূপে সফল হইবে! তাই কালীকৃষ্ণ-বাবু কৃষকগণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করিয়া গ্রাম্য বালিকাগণের অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া, পীড়িতের চিকিৎসা, নিরন্নকে অন্ন দান, আর্ত্তকে সান্ত্বনা করিয়া আপনার অমূল্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দুঃখ দেখিলেই যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, উহা নিবারণ করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় অশান্ত হইয়া উঠিত, অর্থনীতির তুলাদণ্ডে উচিত অনুচিত বিচার করিবার সামর্থ্য থাকিত না, তিনি কি নিকট-চিন্তা ঠেলিয়া দূরের চিন্তা করিতে পারেন? তিনি কি প্রত্যক্ষ শত হাহাকারের মধ্যে বাস করিয়া জগতের পরোক্ষ বা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত হইবার অবসর পাইতে পারেন? তাই কালীকৃষ্ণবাবু গ্রন্থরচনায় তাঁহার যোগ্য কোন কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তিনি আপনার জীবনটীকে কায়োমনোবাক্যে একটী পরার্থ-পরতার ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন!

পরন্তু যে প্রবল কামনার প্রেরণায় লেখকগণ সাধারণতঃ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, সেই কামনার অস্তিত্ব কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনে একেবারে ছিল না। যশোলিপ্সা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না, অহংজ্ঞান তিনি হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন, প্রশংসায় আত্ম-প্রসাদ লাভ করা দূরে থাকুক, ভক্তের অযাচিত প্রশংসাবাদে তিনি যেন কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেন, তাঁহাকে বড় বলিলে তিনি যেন মনে ব্যথা পাইতেন। এমন কি স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগণ তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি লইয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করেন, এ প্রস্তাবও তাঁহার প্রীতিকর হইত না, তিনি জীবিতাবস্থায় তাঁহার "ফটো" গ্রহণ করিবার অনুমতি দেন নাই; এ স্থলে যে ছবিখানি প্রদত্ত হইল উহা কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনান্তের পর গৃহীত হইয়াছিল। উহা তাঁহার অন্তিম শয্যাশায়ী প্রাণহীন নশ্বর দেহের প্রতিকৃতি

কোন অমর গ্রন্থ রচনা না করিলেও কালীকৃষ্ণ বাবুর লেখনী অলস ছিল না। তিনি লিখিতেন, প্রচুর পরিমাণে লিখিতেন, কিন্তু তাঁহার লেখনী ধারণের উদ্দেশ্যও তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যের একটী সহযোগী উপায় মাত্র,—পরহিতসাধন। তিনি যখনই কোন প্রবন্ধ রচনা করিতেন, বা পুস্তক প্রকাশ করিতেন, তাহা জনসাধারণের পাঠের জন্য, সমাজের মঙ্গল ও শিক্ষার জন্য, দরিদ্রের উপকারের জন্য। কালীকৃষ্ণ বাবুর ইংরাজি ও বঙ্গভাষায় উক্তরূপ রচনার বিরাম ছিল না, এবং পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সেগুলি বিনা নামে প্রকাশিত হইত।

হিন্দুকলেজে পাঠ সাঙ্গ করিয়া অনুমান বিংশতি বর্ষ বয়সের সময় কালীকৃষ্ণ বাবু ও তদীয় অগ্রজ নবীনকৃষ্ণ বাবু সপরিবারে বারাসতে যাইয়া বাস করেন, এবং বারাসতেই কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনের অবশিষ্ট, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল অতিবাহিত হয়। বারাসতে তাঁহাদের মাতুলাশ্রম ছিল

* Theosophist, October, 1891.

এবং পরে ঐ স্থানে তাঁহারা উদ্যান ও বসত বাটী নির্ম্মাণ করেন। কালীকৃষ্ণ বাবু আজন্ম ক্ষীণকায় ও অসুস্থ ছিলেন এবং সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহাকে অন্ন সংস্থানের জন্য পরের দাসত্ব গ্রহণ করিতে হয় নাই। অগ্রজ নবীনকৃষ্ণবাবু তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতে দেন নাই, এবং সর্ব্বপ্রযত্নে কালীকৃষ্ণ বাবুকে সে চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। নবীনকৃষ্ণ বাবু নিজে চিকিৎসা ব্যবসাতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, এবং সেই অর্থ প্রাণাধিক কালীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন; তিনি জানিতেন কালীকৃষ্ণের হস্তে অর্থের যেরূপ সদ্ব্যবহার হইবে জগতে আর কাহারও দ্বারা সেরূপ হইবে না। উদারতা ও করুণায় ভ্রাতৃদ্বয় আজীবন এক প্রাণ ছিলেন।

কালীকৃষ্ণ বাবুর বারাসতে বসবাস স্থাপনের অল্পদিন পরেই, ইংরাজি ১৮৪৬ অব্দে স্বর্গগত বাবু প্যারীচরণ সরকার স্থানীয় নবস্থাপিত গবর্মেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বারাসতে গমন করেন। সেই সময়ে নবীনকৃষ্ণ বাবু ও কালীকৃষ্ণ বাবুর সহিত প্যারীবাবুর যে ঘনিষ্ঠ প্রীতি বর্দ্ধনের সূত্রপাত হয়, তাহা বন্ধুত্রয়ের জীবনান্ত পর্য্যন্ত সমভাবে বেগবান ছিল। উত্তরকালে কালীকৃষ্ণ বাবু ও প্যারীচরণ বাবুর সৌহার্দ্দ দৃষ্টান্ত স্থানীয় হইয়াছিল। কালীকৃষ্ণ বাবু এবং প্যারীচরণ বাবু উভয়েই তখন যৌবনাবস্থায়। উভয়েই সমাজের হিতকল্পে যৌবনদৃপ্ত উদ্যমে সর্ব্বান্তকরণে অগ্রসর। উভয় বন্ধুর সমবেত চেষ্টায়, নবীনকৃষ্ণ বাবুর সমপ্রাণতাময় সহায়তায় এবং তৎকালীন বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) মহামান্য চার্লস বেনি ট্রেবর (C B. Trevor) সাহেবের সহৃদয় উৎসাহে বারাসতের সেই সময়ে যেরূপ শ্রীশোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেরূপ আর কখনও হয় নাই। সেই সময়েই বারাসত স্কুল বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয়সমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করে, সেই সময়েই বারাসতে বঙ্গদেশের প্রথম কৃষিবিদ্যালয় (Agricultural School), শ্রমজীবিগণের বিদ্যালয় (Industrial school) বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস (Hostel for Students), প্রতিষ্ঠিত হয়। এ গুলি সমস্তই প্যারীচরণ বাবুর কীর্ত্তি; তিনি বারাসতে কর্ম্মবীররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ বাবু এই সমস্ত অনুষ্ঠানেই প্যারীচরণ বাবুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, তিনি বারাসত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিতেন, শ্রমজীবিগণকে শিক্ষা দিতেন, স্থানীয় জনগণকে ঐ সকল সদনুষ্ঠানের স্থায়িত্ব সাধনের জন্য, উহাদের সাফল্য লাভ কার্য্যে সহায়তার্থ সর্ব্বপ্রযত্নে উদ্বোধিত করিতেন, এবং বন্ধুবর প্যারীচরণ বাবুকে কায়মনোবাক্যে উৎসাহ দিতেন। তৎকালীন শিক্ষা সভার (Council of Education) ১৮৪৭ খৃঃ অব্দের ও পরবর্ত্তী কালের বার্ষিক বিবরণগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় কালীকৃষ্ণবাবু বারাসতের এই নবীন অনুষ্ঠানগুলির উন্নতি সাধনে কত তৎপর ছিলেন এবং কত পরিশ্রম করিতেন। তিনি স্থানীয় শিক্ষা সমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

ঐ সময়ে বারাসতে আর একটী সদনুষ্ঠান হয়, যাহার জন্য বঙ্গদেশীয় স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে কালীকৃষ্ণ বাবু ও প্যারীচরণ বাবুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত, তাঁহারাই বঙ্গদেশের সর্ব্ব প্রথম গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তখনও স্মরণীয় বীঠন্ বালিকা বিদ্যালয় (Bethune Girl School) প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এই গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রায় তিন বর্ষ পরে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ঐ বীঠন্ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার উষাঘোরে এই বন্ধুযুগলকে ও তাঁহাদের পরম সহায় নবীনকৃষ্ণ বাবুকে উক্ত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সমাজের নিকট বহুতর নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, এমন কি, হিন্দুসমাজও ধর্ম্ম বিরোধী সিদ্ধান্ত করিয়া স্থানীয় কোন জমিদার পুঙ্গব তাঁহাদের প্রাণ হননের পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত বীরের ন্যায় অটল থাকিয়া সেই সমাজসমরে জয়লাভ করিয়াছিলেন। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রেবর ও জ্যাকসন্ সাহেব তাঁহাদের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং এই বিদ্যালয় কয়েক বর্ষ স্থায়িত্বলাভ করিলে তৎকালীন শিক্ষাসভা গবর্মেণ্ট তাঁহাদের বঙ্গের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপয়িতা বলিয়া অতি প্রশংসমান বাক্যে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, উৎসাহ দিয়াছিলেন, এবং বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানের সহৃদয় ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন।* মহামতি বীঠন্ (Drink

* General Report on Public Instruction, Bengal, for 1849-50, pages 4-5.

water Bethune), সার্ জেমস্ কল্‌ভিল (Sir James Colvil) প্রমুখ উচ্চ পদস্থ ইংরাজগণ এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে বারাসতে গমন করিতেন, স্থাপয়িতাগণকে বিবিধ প্রকারে উৎসাহ দিতেন, বালিকাগণকে পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। নবীনকৃষ্ণ বাবুদের বাটীতেই এই বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত, এবং বিদ্যালয়ের স্বপক্ষ কয়েক জন সহৃদয় ব্যক্তির পরিবারস্থ বালিকাবর্গকে লইয়াই প্রথমে এই বিদ্যালয় উন্মুক্ত হয়। নবীন বাবুর কন্যা—৺কুন্তীবালা (ইনি সুলেখিকা বলিয়া তৎকালীন বঙ্গসাহিত্য সংসারে পরিচিতা হইয়াছিলেন) এই স্মরণীয় বিদ্যালয়ের প্রথমা ও শ্রেষ্ঠা ছাত্রী। কিয়দ্দিন পরে যখন বারাসতবাসিগণ অবগত হইলেন যে, কালীকৃষ্ণ বাবু নিজে ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবেন, তখন তাঁহাদের অনেকেরই নিজ নিজ কন্যাগণকে ঐ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে আপত্তি রহিল না। কালীকৃষ্ণ বাবুর সুপবিত্র চরিত্রের উপর তাঁহাদের আন্তরিক এত ভক্তি ছিল! সেই কঠিন সমস্যার সময় কালীকৃষ্ণ বাবুর চরিত্র গৌরবই ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের সাফল্য লাভের একটী প্রধান কারণ স্বরূপ হইয়াছিল।

বারাসতে আট বর্ষ অবস্থানের পর প্যারীচরণ বাবু কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের (হেয়ার স্কুলের) হেড মাষ্টার পদে উন্নীত হইয়া ১৮৫৪ সালে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়েন। সেই সময় হইতে প্যারী বাবুর অনুষ্ঠিত সুকীর্ত্তিগুলি যাহাতে বিলুপ্ত না হয় তজ্জন্য কালীকৃষ্ণ বাবুকে সচেষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। শ্রমজীবি ও কৃষি বিদ্যালয়টী বিস্তৃত আকারে তিনি নিজ উদ্যানে সংস্থাপন করিয়া পরিচালন করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে কালীকৃষ্ণ বাবু সপরিবারে ঐ উদ্যানস্থ ভবনেই বাস করিতেন।

বারাসাতের এই দেড়শত বিঘা ভূমি বিস্তৃত উদ্যান নির্ম্মাণে নবীন কৃষ্ণ বাবুর লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এবং কালীকৃষ্ণবাবুর জীবনব্যাপী যত্ন পরিশ্রমে উহা নন্দন শ্রী ধারণ করিয়াছিল। অত দুষ্প্রাপ্য দেশীয় ও বিদেশীয় নানা জাতীয় ফল পুষ্পাদির তরুলতায় সুশোভন উদ্যান তৎকালে এ অঞ্চলে আর ছিল না। সার্ আসলি ইডেন প্রমুখ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ এই উদ্যানের মুক্ত কণ্ঠে গুণগান করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্যান যেমন একদিকে বিদেশীয় ও কলানুরাগিগণের নিকট শ্রী সম্পদের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তেমনি আবার আদর্শ কৃষি ভাণ্ডার ও কৃষি জীবিগণের শিক্ষা-ক্ষেত্র বলিয়া স্বদেশ হিতৈষিগণের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। কিন্তু জনসাধারণের নিকট এই উদ্যান উচ্চতর সম্মান লাভ করিয়াছিল—মহর্ষি কালীকৃষ্ণের আশ্রম বলিয়া। এই পরম রমণীয় প্রকৃতির নিভৃত নিলয়ে কালীকৃষ্ণ বাবু শান্তিময় ধর্ম্ম জীবন যাপন করিতেন। সেই শান্তি উপভোগ করিবার জন্য এবং প্রিয়তম বন্ধুর সাহচর্য্য লাভ করিবার জন্য প্যারী চরণ বাবু অবসর পাইলেই সেই উদ্যানে গমন করিতেন। কোন কোন দিন কালীকৃষ্ণ বাবুর অপর সুহৃদ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্যারীবাবুর সহযাত্রী হইতেন। নবীনকৃষ্ণ বাবু কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার সময় ঝামাপুকুরে বাস করিতেন, সেই বাসা বাটীতে নবীনকৃষ্ণ বাবু ও কালী বাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হয় এবং সেই ঘনিষ্ঠতা জীবনান্ত স্থায়ী অকৃত্রিম সৌহার্দ্দে পরিণত হয়। প্যারীবাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ ও লোকহিতকর যাবতীয় মহদনুষ্ঠানে কালীকৃষ্ণ বাবু সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ সংস্কারের এবং প্যারীচরণ বাবুর মাদক নিবারিণী সভার কালীকৃষ্ণ বাবু এক জন ঐকান্তিক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সামাজিক ব্যবহারে ও ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে অতি উদার মতাবলম্বী ছিলেন এবং সমাজের হিতকর দেশের উন্নতিকর যাবতীয় সংস্কার চেষ্টায় অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রাণপণে সহায়তা করিতেন সমাজস্থ দলপতিগণের সঙ্কীর্ণ মতামতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারী বাবু এই বারাসতবাসী বন্ধুর নিকট অনেক সদনুষ্ঠানের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্যারী বাবুর সম্পাদিত "Well Wisher" "হিতসাধক" ও "এডুকেশন গেজেট" পত্রগুলির কালীকৃষ্ণ বাবু একজন প্রধান লেখক ছিলেন। কালীকৃষ্ণ বাবুর লেখনী প্রসূত "বিধবাবিবাহ" "কৃষিবিদ্যা" স্ত্রীশিক্ষা' "মাদক নিবারণ" প্রভৃতি বহুবিধ উৎকৃষ্ট, চিন্তাশীল ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ এই পত্রগুলিকে অলঙ্কৃত করে। ক্রমশঃ—

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

অমর জীব।

জীবমাত্রই মরণশীল। মৃত্যুর গ্রাস হইতে নিস্তার পাইতে পারে এমন জীব দেখা যায় না। মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষলতা সকলেরই জন্ম আছে, সকলেরই মৃত্যু আছে। জীবগণ জন্মগ্রহণের পর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া শৈশব ও বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপনীত হয়। এই সময়ে তাহারা বংশরক্ষার নিমিত্ত সন্তান উৎপাদন করে। যৌবনের পর আর তাহাদের শরীরের বৃদ্ধি হয় না, বরং ক্ষয় হইতে থাকে এবং বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইয়া তাহারা জীবন-লীলা সাঙ্গ করে। যে খাদ্য ভোজন করিয়া, যে অবস্থার মধ্যে বাস করিয়া, বাল্যে ও যৌবনে তাহাদের শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইতেছিল, যৌবনের পরে সেই খাদ্য ভোজন করিয়া ও সেই অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও আর তাহাদের শরীরের পুষ্টি হয় না। শারীরিক যন্ত্র সকলের কার্য্যক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে,—বার্দ্ধক্য ও স্থবিরতার বাহ্যলক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়,—অবশেষে দেহ যন্ত্রের ক্রিয়া একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। ইহাকেই প্রাণ-বিয়োগ, জীবনান্ত বা মৃত্যু বলে।

দেখিতেছি জীবন থাকিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু বলিতে স্বাভাবিক মৃত্যুর কথাই বুঝিতে হইবে। অপঘাত বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা বলিতেছি না। আঘাতে ছিন্ন হইয়া, চাপে নিষ্পেষিত হইয়া, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, বা রসাভাবে শুষ্ক হইয়া দেহ যন্ত্রের ক্রিয়ার রোধ বশতঃ যে মৃত্যু, সে মৃত্যু শৈশব বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই ঘটিতে পারে। সে মৃত্যু স্বাভাবিক নহে, সে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে অনেকেই পারে। কিন্তু দেহ-যন্ত্রের যে ধীর ক্ষয়, ক্রমিক শিথিলতা,—পূর্ব্বে যে অবস্থার মধ্যে থাকিয়া দেহ-যন্ত্রের কার্য্য সম্পূর্ণ ভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছিল, পরে সেই অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও আর সেরূপ চলে না—তৈলক্ষয়ে দীপ শিখার ন্যায় ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া অবশেষে যে নির্ব্বাণ, তাহাই স্বাভাবিক মৃত্যু। ইহা বার্দ্ধক্যে বা জীবনের শেষ দশাতেই ঘটে। এ মৃত্যুর হাত এড়াইতে কাহাকেও দেখা যায় না।

তাহাতেই কথা উঠিয়াছে জীবমাত্রেই মরণশীল। এ কথাটা খুব সত্য, তবে খাঁটি সত্য নহে। অমর জীবেরও আবিষ্কার হইয়াছে।

নিষ্প্রবাহ জলাশয়ের তলে জল ও পঙ্ক মধ্যে এক প্রকার আণুবীক্ষণিক প্রাণী বাস করে, তাহাদের দেহাবয়বের কিছু মাত্র জটিলতা নাই। দেহ একটি মাত্র কোষে গঠিত, তাহার কোনই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই। কোষ কি? একবিন্দু গাঢ় তরল পদার্থ থলির মধ্যে আবদ্ধ। অনেক সময়ে এই থলি বা কোষের সূক্ষ্ম আবরণও থাকে না—কেবল মাত্র আবরণশূন্য একবিন্দু তরল পদার্থ দৃষ্ট হয়। এই পদার্থ স্বচ্ছ ও বর্ণহীন, না-তরল, না-কঠিন, অর্থাৎ গাঢ় তরল,—নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন প্রভৃতির জটিল রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন ডিম্ব শ্বেতবৎ পদার্থ। এই পদার্থ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি জীবনী শক্তির বিকাশ দৃষ্ট হয় না। ইহাই জীবনের আদি ও একমাত্র লীলাক্ষেত্র। সেই জন্য ইহার নাম প্রোটোপ্লাজম্, আদি ধাতু বা জীবন-ধাতু। প্রোটোপ্লাজমেই জীবনের বিকাশ। প্রোটোপ্লাজম তৈয়ার করিতে পারিলেই জীবনের সৃষ্টি করিতে পারা যাইবে। ইতঃপূর্ব্বে এক সম্প্রদায় বৈজ্ঞানিকের হৃদয়ে এরূপ প্রবল আশা জাগ্রত হইয়াছিল যে, তাঁহারা জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন দশ রকম জটিল রাসায়নিক পদার্থের সংগঠন করিতে পারিতেছেন, সেইরূপ একদিন রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যথাবশ্যক উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রোটোপ্লাজমের সৃজন করিয়া জড়ে জীবন সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু হায়! যতই জ্ঞানের উন্নতি ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, প্রোটোপ্লাজম্ নির্ম্মাণ করিয়া জীবনোৎপাদন করিবার আশা বৈজ্ঞানিকের হৃদয় হইতে মরু-মরীচিকার ন্যায় ততই দূরে পলায়ন করিতেছে।

এই প্রোটোপ্লাজম পদার্থকে তাঁহারা অন্যান্য রাসায়নিক যৌগিক-পদার্থের ন্যায় যতটা সরল মনে করিতেন, এখন আর ততটা সরল সুতরাং সহজ রচনীয় বলিয়া মনে করেন না। ইহার রাসায়নিক সংযোগ এত জটিল যে, অদ্যাবধি কেহই ইহার বিশ্লেষণ করিয়া কোন্ পরিমাণে কি কি উপাদানে ইহা গঠিত, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। পূর্ব্বে যে পদার্থকে নিরবচ্ছিন্ন সমভাবাপন্ন বোধ হইত, অধুনা অধিকতর শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে ফেনিল ও জটিল রচনা-প্রণালী সম্বলিত দৃষ্ট হয়।

জীবন-ধাতুময় কোষকে জীবন-কোষ বলে। অনু-বীক্ষণের তলে জীবন-কোষস্থিত জীবন-ধাতুর মধ্যে তৈল বিন্দু, শ্বেতসার বিন্দু প্রভৃতি জীবনী শক্তির ক্রিয়া সমুদ্ভূত বহুবিধ জটিল রাসায়নিক পদার্থের কণা সকল দৃষ্ট হয়। জীবন কোষের মধ্যে একস্থানে সূক্ষ্মাবরণবেষ্টিত আর একটি ক্ষুদ্র কোষ দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে অন্তঃকোষ বা কেন্দ্রানু (nucleus) বলা হয়। অন্তঃকোষের পদার্থ জীবন-ধাতু হইতে গাঢ়তর ও ভিন্ন। অন্তঃকোষের ধাতুতে যে যে রাসায়নিক উপাদানের সমাবেশ ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ দৃষ্ট হয়, জীবন-কোষের ধাতুতে তাহা হয় না। এই অন্তঃকোষ বা কেন্দ্রানুর মধ্যে অনেকগুলি সূত্রবৎ বা জালবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়।

অন্তঃকোষ-সম্বলিত জীবন-ধাতুময় এক একটি কোষ এক একটি জীবন-কোষ। জীবন-কোষ জড়পদার্থের ন্যায় নির্জ্জীব নহে। ইহা জীবিত-চেষ্টা বিশিষ্ট।

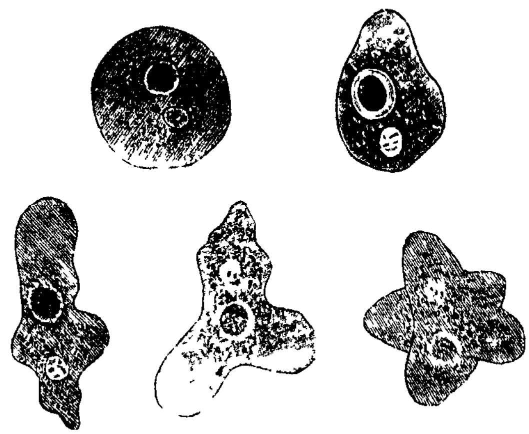
অনুবীক্ষণের সাহায্যে পঙ্কমধ্যে এইরূপ জীবিতচেষ্টা-বিশিষ্ট এক-কোষী জীব অনেক প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সরলদেহী—আমিবা।

আমিবা প্রাণিজগতের আদিম বা নিকৃষ্টতম প্রজা। আমিবা চমৎকার প্রাণী। আমিবা বিশিষ্ট-আকার শূন্য, অবয়ব রহিত। আমিবা গোল, আমিবা লম্বা। আমিবার হস্ত পদ নাই, আমিবার বহু হস্ত পদ। আমিবার মুখ নাই, আমিবা মুখময়। আমিবার উদর নাই, আমিবা উদরময়। আমিবার নাসিকা নাই, অথচ সর্ব্বাংশই নাসিকার কার্য্য করে।

যে একটিমাত্র জীবন-ধাতুময় কোষে আমিবার দেহ গঠিত তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতি নাই। দেহ-পদার্থ জীবন-ধাতুময় বর্ণহীন গাঢ় তরল।

অনুবীক্ষণের তলে কাচ-ফলকের উপর আমিবাকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়। আমিবার পা নাই, পাখা নাই, ডানা নাই, এককথায় চলিবার কোন অঙ্গ নাই, তথাপি আমিবা চলে। দেহাকৃতির আকুঞ্চন প্রসারণ ও পরিবর্ত্তনেই আমিবার গমন কার্য্য সাধিত হয়।

আমিবা সদা গতিশীল। দেহ সঙ্কুচিত করিয়া ক্ষণে বর্ত্তুলাকৃতি, ক্ষণে চক্রাকৃতি, ক্ষণে লম্বাকৃতি, ক্ষণে তারকা-কৃতি ধারণ করে। তাহার কোমল দেহ প্রতি নিমিষে

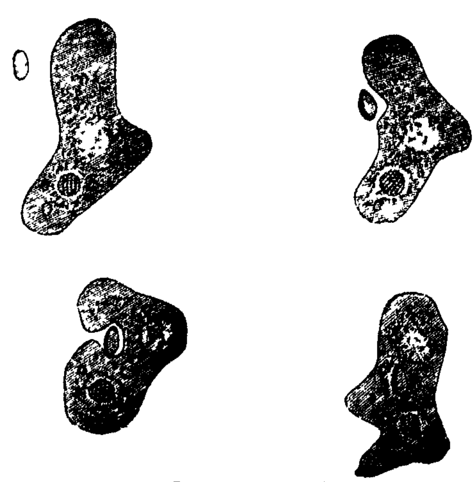


আমিবার বিভিন্নরূপ ধারণ।

নানা ভিন্নরূপ ধারণ করে। দেহ হইতে অঙ্গুলি সদৃশ অনেকগুলি ক্ষেপনী বা স্পর্শনী বাহির করে, আবার সেগুলি গুটাইয়া দেহমধ্যে বিলীন করে।

আমিবার শ্বাস প্রশ্বাসের কোন নির্দ্দিষ্ট যন্ত্র নাই, অথচ তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য নিয়ত চলিতেছে। জলে যে বায়ু সংমিশ্রিত থাকে, তাহা হইতেই শরীরের সর্ব্বাংশ দ্বারা অক্সিজেন বায়ু গ্রহণ করিয়া পরে শরীর হইতে অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করিয়া তাহার জীবন যন্ত্র চালাইতে থাকে।

বিভিন্ন আকারে নিরন্তর ভ্রমণ উপলক্ষে তাহার দেহ-বিলম্বিত অঙ্গুলি সদৃশ কোন স্পর্শনী, বা দেহের অপর কোন অংশ, যদি ক্ষুদ্রতর কোন উদ্ভিজ্জ বা প্রাণিজ পদার্থের সংস্পর্শে উপস্থিত হয়, তবে আমিবা আপন তরল সুকোমল দেহটি সেই পদার্থের দিকে ঠেলিয়া বা ঢালিয়া দেয়।



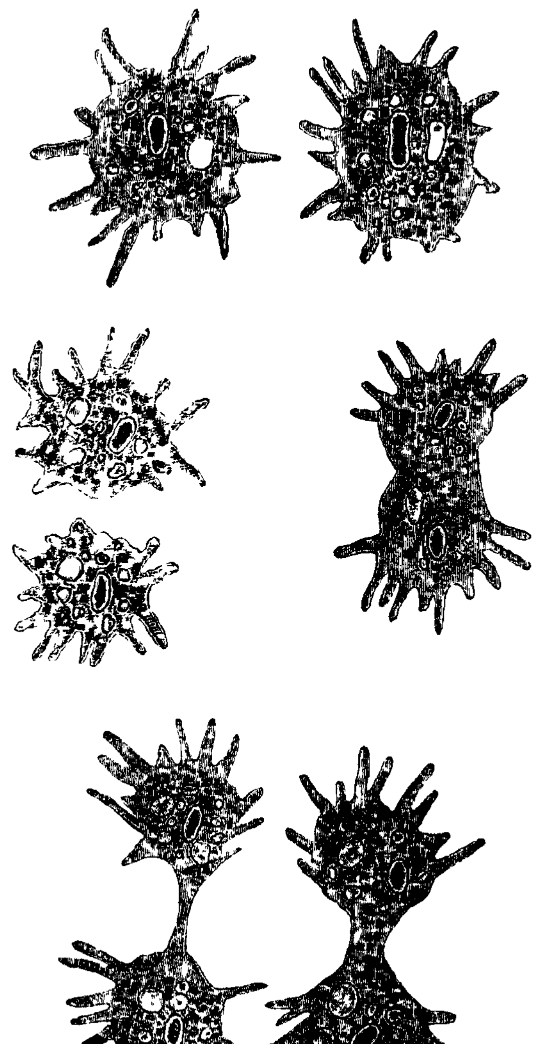
আমিবার ভোজন-প্রণালী।

তাহাতে অচিরে সেই পদার্থ আমিবার দেহধাতু দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত ও আবৃত হইয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। আমিবা এইরূপে খাদ্য উদরসাৎ করে। গ্রস্ত বা ভুক্ত পদার্থটি শীঘ্রই আমিবা দেহের সহিত সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে বিলীন হইয়া যায়। যে অংশ দেহের সহিত একেবারে মিলিয়া মিশিয়া না যায় তাহা দেহাভ্যন্তর হইতে বহিষ্কৃত ও নিক্ষিপ্ত হয়। আহার্য্য গ্রহণ করিবার কোন বিশেষ অঙ্গ না থাকিলেও দেহের যে কোন অংশ আহার্য্য-সংস্পৃষ্ট হয় সেই অংশ দিয়াই আহার্য্য দেহমধ্যে প্রবেশ করে। আমিবা মুখ-বিবর-হীন হইয়াও খাদ্য উদরসাৎ করে, উদর-হীন হইয়াও খাদ্যের পরিপাক করে।

আমিবার বিলক্ষণ অনুভূতি আছে। অভিপ্রেত অনভিপ্রেত বিচার করিবার, খাদ্যাখাদ্য বাছিয়া লইবার শক্তি আছে। চলিতে চলিতে বালুকণা বা অপর কোন অখাদ্য বস্তুর সহিত তাহার স্পর্শনী সংস্পৃষ্ট হইলে, ধীরে ধীরে স্পর্শনীটি সংকুচিত করিয়া পিছাইয়া আইসে ও সেই অসার পদার্থকে এক পার্শ্বে রাখিয়া পুনরায় অগ্রসর হয়। উত্তাপের কিম্বা চাপের হ্রাস বৃদ্ধি করিলে, উত্তেজক বা অবসাদক রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগ করিলে, আমিবা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে, তাহার দেহের গতির বৃদ্ধি বা নিবৃত্তি করে। দৈহিক উত্তেজনার বাহ্য প্রকাশ অনুভূতির লক্ষণ।

প্রচুর খাদ্য পাইলে আমিবা-দেহের দ্রুত বৃদ্ধি হয়। নিত্য নূতন পদার্থ দেহে শোষিত হইতে থাকিলে দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। কোন আমিবাই খুব বড় হইতে পায় না, কিয়ৎকাল বর্দ্ধনের পর দেহমধ্যে একটি চমৎকার ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাতেই তাহার দেহের আর বৃদ্ধি হয় না। বৃদ্ধির চরম সীমায় উপস্থিত হইলে আমিবা মন্থরগতি প্রাপ্ত হয়, স্পর্শনী সকল সঙ্কুচিত হয়। তাহার দেহ কোষ-মধ্যস্থিত অন্তঃকোষটি স্বতঃ দ্বিধা ভিন্ন হইয়া দেহকোষের দুই প্রান্তে অবস্থিতি করে, এবং দেহকোষের মধ্যস্থল সঙ্কুচিত হয়। এই সঙ্কোচন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেহ-কোষটিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দেয় এবং দুইটি ভিন্ন জীব কোষের উৎপত্তি হয়। এই এক একটি জীব-কোষ এক একটি আমিবা।

একটি আমিবা বিভক্ত হইয়া দুটি স্বতন্ত্র আমিবার উৎপত্তি হইল, উৎপন্ন আমিবাদ্বয়ের প্রত্যেকটি প্রথমটির অর্দ্ধাংশ। ইহারা প্রত্যেকে প্রথমটির ন্যায় জীবনবৃত্তির পরিচালনা করিতে থাকিবে এবং যথাকালে দ্বিখণ্ড হইয়া



আমিবার বংশবৃদ্ধির প্রণালী।

চারিটি আমিবার সৃষ্টি করিবে। সেই চারিটি আবার যথাকালে বিভক্ত হইয়া আটটি আমিবার সৃষ্টি করিবে। অবস্থা অনুকূল থাকিলে এইরূপেই আমিবা বংশের বিস্তার হইতে থাকিবে। আমিবার স্ত্রী পুরুষ নাই। সন্তান উৎপাদনে স্ত্রী-পুরুষের অপেক্ষা রাখে না; একটি আমিবা যখন দু'টি

আমিবায় পরিণত হইল, তখন প্রথমটি কোথায় গেল? তাহার কি মৃত্যু ঘটিল? তাহা ত নহে। তাহার দেহযন্ত্র ত বিকল হইয়া পড়িয়া নাই। পূর্ব্বে ছিল একটি যন্ত্র, এখন হইল দু'টি যন্ত্র, দু'ই কার্য্যক্ষম, দু'ই জীবন্ত।

যে আমিবা বৃদ্ধির চরম সীমায় উপস্থিত হইল সে বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভে আসিল। দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যে দুটি আমিবার সৃষ্টি হইল তাহারা নূতন, তাহাদের যৌবন দশা। পুরাতন আমিবা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া জরা বার্দ্ধক্য পরিহার করিয়া নবযৌবন লাভ করিল। পুনরায় বৃদ্ধ হইলে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নবযৌবন লাভ করিবে।

আমিবার জীবনপর্য্যায় যদি এই ভাবেই চলিতে থাকে তবে আমিবার মৃত্যু কোথায়? যেটি অপর প্রাণী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে বা জীবন ধারণের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থায় পড়িবে তাহারই অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে। অন্য কোন প্রকার মৃত্যু ঘটিবে না।

অনুবীক্ষণের তলে অদ্য যে আমিবাকে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে দেখিতেছি, সে ভূতলে মানবের আবির্ভাবের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কোন তড়াগ বা পল্বলে প্রথম আবির্ভূত আদিম আমিবা। আমিবা অজর অমর।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

কুকিজাতির বিবরণ।*

(১)

পার্ব্বত্য অসভ্য জাতিমধ্যে কুকিগণ সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর ও নিরক্ষর। ইহাদের ন্যায় হিংস্র স্বভাবাপন্ন জাতিও আর দেখা যায় না। কুকিদিগের আহার বিহার এবং আচার ব্যবহারাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, তাহাদিগকে রাক্ষস নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

কুকিগণ কিরাত বংশোদ্ভব। ইহারা অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত। রাজমালার সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় ইহাদের তেইশটি শ্রেণীর নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাদের অনুসন্ধানে তদতিরিক্ত তিনটি সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও সম্প্রদায় থাকা সম্ভবপর, কিন্তু তাহা বিশুদ্ধরূপে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। যে ছাব্বিশটি সম্প্রদায়ের নাম সংগৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) পাইতু, (২) চোটলাং, (৩) থরেং, (৪) বাইকেই, (৫) আমডই, (৬) চমলেন, (৭) বল্‌তে, (৮) বিযেতে, (৯) বাল্‌তে, (১০) বাংচন্, (১১) বাংচিযে, (১২) ছাইলই, (১৩) জংতেই, (১৪) পাটলেই, (১৫) বেতলু, (১৬) পাইতে, (১৭) ফুন, (১৮) ফুনতেই, (১৯) লেন্‌তেই, (২০) হ্রালতেই, (২১) সওয়ালই, (২২) পওয়াকুতু (২৩) ধুন, (২৪) বুবদইয়া, (২৫) চলজেন, (২৬) রাংতে।

এতদ্ব্যতীত আর একটি সম্প্রদায়ের কুকি আছে, তাহারা "হালাম" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন হালামগণ কুকি ও ত্রিপুরার মধ্যবর্ত্তী সঙ্করজাতি। মূলতঃ তদ্রূপ হওয়া অসম্ভব না হইলেও হালামগণ কুকিজাতির মধ্যেই পরিগণিত। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা এবং ত্রিপুরার রাজ সরকারি কাগজপত্র আলোচনায় যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তদ্দ্বারা হালামগণ কুকিজাতির একটি সম্প্রদায় বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে। হালাম সম্প্রদায়ও অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত। তাহার এক একটি শাখাকে "দফা" বলে। কৈলাস বাবু ইহাদের ত্রয়োদশটি দফার নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাদের অনুসন্ধানে সতরটি দফার নাম সংগ্রহ হইয়াছে, যথা:—

(১) মুতিলাংল, (২) কর্ব্বং, (৩) বংশের, (৪) লঙ্গাই, (৫) লচবাং, (৬) চড়ই, (৭) মরছম, (৮) রূপণী, (৯) খুলং, (১০) কলই, (১১) দাপ, (১২) বাংখল, (১৩) কাইপেং, (১৪) থাঙ্গাছেপ্, (১৫) শাখাচেপ্, (১৬) থগলং, (১৭) মুর্চ্ছাদাং।

নোয়াতিয়া ও জমাতিয়া দফাকেও কেহ কেহ কুকিসংসৃষ্ট সঙ্করজাতি বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা কুকিসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে।

পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম, উত্তরে কাছাড় ও মণিপুর, এবং দক্ষিণে আরাকাণ, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী দশ সহস্র বর্গমাইল পরিমিত পার্ব্বত্য ভূমিতে কুকিগণ বসবাস করিয়া আসিতেছে।

---

* এই প্রবন্ধের অতি অল্প অংশ 'নির্ম্মলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষ ঘটনাবশতঃ উক্ত পত্রিকার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায়, তৎকালে অবশিষ্টাংশ প্রকাশের সুবিধা হয় নাই। পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া, অপ্রকাশিত অংশের সহিত পুনঃ প্রকাশ করা যাইতেছে।

কোন কোন কুকিসম্প্রদায়কে বাসস্থানের নামানুসারে পরিচিত হইতে দেখা যায়। লুসাই পর্ব্বতবাসী কুকিগণ সাধারণতঃ "খচাক্" নামে অভিহিত। কিন্তু কাছাড়বাসিগণ ইহাদিগকে "লুছাই" বলিত। এই লুছাই শব্দ হইতেই ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট "লুসাই" শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, লুসাই উপত্যকাবাসী হালামগণই "লুসাই" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কুকিগণ মধ্যে মধ্যে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা কোথা হইতে আসিয়া বর্ত্তমান বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়াছে, এবং ইহাদের প্রকৃত জনসংখ্যা কত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।* আমরা কয়েকটি প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের বংশাবলী ও কোন কোন সম্প্রদায়ের স্থান পরিবর্ত্তনাদির বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশ করিব।

কুকিগণের সকল শ্রেণীর ভাষাই মূলতঃ এক। তবে উচ্চারণের তারতম্যের দরুণ সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের ভাষার সহিত মণিপুরী ভাষার কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্য আছে। এ বিষয়ে স্বাধীন ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় ধনঞ্জয় ঠাকুর মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"মণিপুরী ভাষার সহিত কুকি ভাষার ও শব্দের বিস্তর পার্থক্য থাকিলেও মণিপুরী ভাষার স্বর ও গঠনের কথঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। কুকিদিগের উচ্চারিত ভাষাও কণ্ঠ, তালু, দন্তোষ্ঠ ও মূর্দ্ধাভিঘাতজনিত সমস্ত বর্ণের উচ্চারণ আবশ্যক হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মূর্দ্ধণ্য বর্ণ উচ্চারণের ন্যায় উচ্চারণ হইয়া থাকে।"

"সাময়িক সমালোচনার সমালোচন ও মীমাংসা" নামক পুস্তকে কুকিগণের ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"—এই সকল শ্রেণীর ভাষা মূলতঃ পরস্পর বিভিন্ন নহে। তবে এই মাত্র প্রভেদ যে, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদিগের ভাষার সহিত পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগের ভাষার উচ্চারণ ও ধ্বনিগত যেরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, ইহাদিগের শ্রেণী সমূহের ভাষাতেও পরস্পর সেইরূপ পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে।" দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—৩০ পৃঃ।

হালাম সম্প্রদায়ের এক দফার সহিত অন্য দফার ভাষার উচ্চারণগত এত পার্থক্য দেখা যায় যে, তাহাদের প্রত্যেক দফার ভাষা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে

কুকি ভাষায় আমাদের অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কোনও কথা বলিবার পক্ষে আমরা অধিকারী নহি। অদ্যাপি কুকি ভাষার অক্ষর প্রচলন হয় নাই। ইহা ত্রিপুরা ভাষার ন্যায় সংকীর্ণ নহে। এই ভাষা দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের মনোগত ভাব অনায়াসে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। এবং ইহা শ্রুতিমধুরও বটে। কিন্তু ত্রিপুরা ভাষা সংকীর্ণ হইলেও কাপ্তান লে উইন্ সাহেব বাঙ্গালার পূর্ব্বসীমান্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে সেই ভাষারই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।*

কুকিগণের চেহারায় অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি অপেক্ষা অনেক পার্থক্য দেখা যায়। ইহাদের বর্ণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা কিছু কাল, নাসিকা অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং ওষ্ঠ পাতল। ইহাদের মধ্যে অনেকের নিবিড় শ্মশ্রুগুম্ফবিশিষ্ট সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, বাঙ্গালীর সংস্পর্শে ইহাদের আকৃতিগত এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে কাপ্তান লে উইন্ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আরাকাণ ও ব্রহ্মদেশবাসিগণের চেহারা হইতে কুকিগণের চেহারা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। তাতার বা মঙ্গোলিয়ানদিগের সহিত ইহাদের মুখের সাদৃশ্য নাই। ইহাদের বর্ণ কাল, গণ্ডস্থল সাধারণতঃ পালিশ, (মুখ চাপা নহে)। অনেকের ঘন দাড়ি গোঁপ আছে। বাঙ্গালির রক্ত সংমিশ্রণে তাহাদের চেহারার এবম্বিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস কুকিগণ অনেক বাঙ্গালী পুরুষ ও রমণীকে কয়েদ করিয়া নিয়াছিল, বাঙ্গালীর রক্ত তাহাদের মধ্যে মিশিবার ইহাই কারণ।"

তিনি আবার উপসংহারে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"ত্রিশ, চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীকে বন্দী করিয়া নেওয়া হইয়াছে, এমন কথা জানি না। অথচ কুকিগণের মধ্যে পাকা শ্মশ্রুবিশিষ্ট বৃদ্ধও দেখা গিয়াছে।"

শেষোক্ত বাক্য আলোচনা করিলে বুঝা যায়, কাপ্তান লে উইন্ তাঁহার প্রথমোক্ত বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিজেই সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু কৈলাসবাবু সেই সন্দেহ দূর করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

"আমরা গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছি যে, ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কুকিজাতির অত্যাচারের সূত্রপাত হয়। তদবধি বাঙ্গালী রমণী সংযোগে কুকিবংশ বৃদ্ধি হইতেছে।" রাজমালা,—৩য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

এই বাক্য আলোচনায় প্রকাশ পাইতেছে, বহুকাল হইতেই কুকির সহিত বাঙ্গালীর সংমিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং লে উইন্ সাহেবের ভ্রমণ কালে কুকিগণের মধ্যে ঘন দাড়ি গোঁপ বিশিষ্ট প্রাচীন লোক দেখা বিচিত্র নহে।

* বিগত সেন্সাস অনুসারে স্বাধীন ত্রিপুরাবাসী কুকিগণের জনসংখ্যা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, যথাস্থানে তাহা সন্নিবেশিত হইবে।

* Lewin's Hill Tracts of Chittagong, P. 99.

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, বাঙ্গালীর সংস্রবেই কুকিগণের আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিযাছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্যতীত অন্য কোন কারণে এই রকমের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না। লে উইন্ সাহেব কিছু দূরবর্ত্তী স্থানের লোকের চেহারার সহিত ইহাদের চেহারার তুলনা করিযাছেন। আমরা দেখিয়াছি, ইহাদের সহিত যাহারা এক পর্ব্বতে বাস করিতেছে (ত্রিপুরা, রিযাং প্রভৃতি), তাহাদের সহিতও ইহাদের আকৃতিগত বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয। কয়েকটি কুকির প্রতিকৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহা দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির সহিত ইহাদের আকৃতিগত পার্থক্য অনেক বেশী।

পর্ব্বতজাত বাঁশ দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে, বাঁশের পাতাদ্বারা ছাউনি দেয এবং বাঁশের বেত দ্বারাই বাঁধিয়া থাকে। মধ্যস্থলে বৃত্তাকারে আঙ্গিনা রাখিযা তাহার চতুর্দ্দিকে গৃহ নির্ম্মাণ করে। কুকিগণ মৃত্তিকা দ্বারা গৃহভিত্তি প্রস্তুত করে না। বাঁশের দ্বারা উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করিযা তদুপরি বাস করে। এই মঞ্চের নীচে পালিত পশু—শূকর, ছাগ ইত্যাদি রাখা হয়। মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবার নিমিত্ত মাচার উপরই একটি স্থান নির্ব্বাচন করিযা লয। মল ইত্যাদি নীচে পড়া মাত্র শূকরে ভক্ষণ করে। ইহারা খুব বড় বড় ঘর প্রস্তুত করিযা থাকে। এবং বাঁশের উপর নানাবিধ কারুকার্য্য করিযা ও রং ফলাইযা গৃহগুলি সুসজ্জিত করে। এক এক গৃহে ৩০ ৪০ জন পর্য্যন্ত লোক



সাধারণ কুকী।

সাধারণতঃ বহুসংখ্যক কুকি একত্রিত হইয়া, নিবিড় অরণ্য মধ্যে কতক স্থান আবাদ করিয়া তথায় বাস করে। ইহাদের এক একটি বাড়ী পাড়া নামে অভিহিত। ইহারা

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে বাস করিতে দেখা যায়। কোন কোন গৃহে আগন্তুকগণের অবস্থানের জন্য একটি প্রকোষ্ঠ রক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই জীর্ণ গৃহ পুনঃ

সংস্কার করে না। এক গৃহ ব্যবহারের অনুপযোগী হইলে, তৎপরিবর্ত্তে আবার নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। বিনা ব্যয়ে গৃহ প্রস্তুতের উপাদান পাওয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় তাহাদের এই অভ্যাস জন্মিয়াছে। ঘন ঘন স্থানপরিবর্ত্তনও ইহার একটি কারণ বটে।

কুকিগণের একতা ও সমাজবন্ধন অতীব প্রশংসনীয়। ইহারা এক পল্লীতে বহুলোক একত্র বাস করিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক গৃহেও বহুসংখ্যক লোক বাস করে। কিন্তু ইহাতেও বিবাদ বিসম্বাদ বা মনোমালিন্য ঘটিতে বড় একটা দেখা যায় না। কুকিগণের রাজা অথবা পাড়ার সর্দারই তাহাদের সমাজের নেতা। কিন্তু কোন ব্যক্তির দোষের দণ্ড অথবা সমাজের উপর কোনও নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, সমাজের প্রধান ব্যক্তিগণের মত গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং সমাজপতির স্বেচ্ছাচারী হইবার সুবিধা নাই। কোন ব্যক্তি সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহাকে সামাজিক কঠোর শাসন সহ্য করিতে হয়, এজন্য সমাজে উচ্ছৃঙ্খল লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

কুকি জাতির মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীরই প্রাধান্য বেশী। পুরুষকে এক রকম রমণীর অধীন হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু সুখের কথা এই যে, সভ্যসমাজে অনেকস্থলে স্ত্রী-স্বাধীনতার যে সকল বিষময় ফল ফলিতে দেখা গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে তদ্রূপ ঘটনা বড় একটা ঘটিতে দেখা যায় না। ইহাদের সমাজে ব্যভিচার-দোষ অতি বিরল। সামাজিক কঠোর শাসনই বোধ হয় ইহার প্রধান কারণ। বিবাহিত পুরুষ বা বিবাহিতা স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ ব্যভিচারের কথা প্রকাশ পাইলে তাহাদিগকে সামাজিক কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। এজন্য বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে প্রায়ই ব্যভিচার দোষ দেখা যায় না। অবিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রীর ব্যভিচার তত দোষাবহ নহে। এরূপ ঘটনাস্থলে তাহারা প্রায়ই বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যায়। কোনও অনিবার্য্য কারণে তাহাদের মধ্যে উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন পক্ষে বাধা ঘটিলেও ইহারা কোনরূপ কলঙ্কিত বা সমাজে ঘৃণনীয় হয় না। ইহা আধুনিক সভ্যসমাজের 'কোর্টসিপ্'এর ন্যায় মার্জ্জনীয় হয়।

কুকি-সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই পরিণত বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদের বিবাহ অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীপুরুষের প্রণয়মূলেই সম্পাদিত হয়। কোন কোন বিবাহ বর ও কন্যার অভিভাবকগণের দ্বারাও সাব্যস্ত হইয়া থাকে। সকলে মিলিয়া অপরিমিত মদ্য ও মাংস উদরসাৎ করা এবং নৃত্যাদি * আমোদ ব্যতীত ইহাদের বিবাহে অন্য কোনরূপ কার্য্যানুষ্ঠান হয় না। ইহাদের মধ্যেও কন্যা-পণের বিষময় প্রথা প্রবেশ করিয়াছে। এই পণের পরিমাণ স্থলবিশেষে ১০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য হইতে দেখা যায়।

কুকিগণের মধ্যে "পরিত্যাগ" (Divorce) প্রথা প্রচলিত থাকিলেও তাহা সহজে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে না। বিশেষ কারণ বশতঃ একে অন্যকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, অথবা কেহ নিজে পরিত্যক্ত হইতে চাহিলে, তদ্বিষয়ে সমাজের নিকট আবেদন করিতে হয়। সমাজে আলোচিত হইয়া প্রার্থনার কারণ গুরুতর বলিয়া বুঝা গেলে আবেদন মঞ্জুর করা হয়। আর যদি পরিত্যাগ করিবার বা পরিত্যক্ত হইবার কারণ সামান্য বলিয়া উপলব্ধি হয়, তবে সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় না। সমাজের এবম্বিধ বিচারের পরেও যদি কোন ব্যক্তি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে প্রতিপক্ষের ক্ষতিপূরণ এবং সামাজিকগণের ভোজের ব্যয় বহন করিতে হয়। তদ্রূপ করিলেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইল। তখন ইচ্ছানুসারে অন্য ব্যক্তির সহিত পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ কঠিন নিয়ম প্রবর্ত্তিত থাকার দরুণ কুকিগণের মধ্যে সচরাচর বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে দেখা যায় না। ইহাদের সমাজে বিধবাবিবাহও প্রচলিত আছে।

কি সভ্য সমাজ, কি অসভ্য সমাজ সর্ব্বত্রই রমণীজাতির স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্য ও কোমলতা দেখিতে পাওয়া যায়। কুকিগণ যেরূপ দুর্দ্দান্ত ও হিংস্র স্বভাবাপন্ন, তাহা দেখিলে স্বতঃই মনে হয়, ইহাদের রমণীগণও ইহাদেরই ন্যায় উগ্র স্বভাবাপন্ন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমরা দেখিয়াছি, আমাদের গৃহের অনেক মহিষাসুরমর্দ্দিনী উগ্রচণ্ডা

* কুকিগণের নৃত্য অতি ভয়াবহ দৃশ্য। ইহারা রণসাজে সজ্জিত হইয়া অস্ত্রাদি চালনা সহকারে নৃত্য করিয়া থাকে।

মূর্ত্তি অপেক্ষা ইহারা শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতিবিশিষ্টা, চরিত্র মাধুর্য্যও যথেষ্ট আছে।

সুন্দরী কুকিরমণীগণের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। ইহারা সাজগোজ বড়ই ভাল বাসে, কিন্তু মণিরত্ন বা স্বর্ণ প্রভৃতি বহুমূল্য গহণার নিমিত্ত ইহারা লালায়িতা নহে নানাবর্ণের পুঁতি, হস্তী-দন্ত ও মহিষের শৃঙ্গ বিনির্ম্মিত চুড়ী এবং নানাবিধ প্রস্তরের মালায় ইহাদের অলঙ্কারের কার্য্য সম্পাদিত হয়। খুব মোটা মোটা পিতলের শিকল ইহারা কটিতে পরিধান করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহারা কর্ণের লতিকা বিদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে এমন বৃহদাকারের হস্তী দন্ত নির্ম্মিত চুড়ী অথবা বাঁশের চুঙ্গি প্রবিষ্ট করাইয়া দেয় যে, সেই চুড়ীর ভিতর দিয়া অনায়াসে হস্ত প্রবেশ করান যাইতে পারে। কর্ণলতিকার চর্ম্মদ্বারা সেই চুরীর বা চুঙ্গির চতুর্দ্দিক আবরিত থাকে। কর্ণের এবম্বিধ বিস্তৃত ছিদ্র আমাদের চক্ষে বড়ই কুৎসিত দেখায়, কিন্তু ইয়ুরোপীয় রমণীমহলে সরু কটি এবং চীন দেশীয় রমণীগণের ছোট পা যেমন সৌন্দর্য্যের প্রধান অঙ্গ, তদ্রূপ কুকিরমণীগণও এবম্বিধ বিস্তৃত কর্ণরন্ধ্র বড়ই পছন্দ করে। শিশুকালে ইহাদের কর্ণলতিকা বিদ্ধ করা হয়। পরে ক্রমে ক্রমে সেই ছিদ্র বাড়াইতে থাকে। ইহারা অতি পরিপাটি রকমে কেশবিন্যাস করিয়া থাকে। পুরুষগণও রমণীদিগের ন্যায় লম্বা চুল রাখিয়া কবরীবন্ধন করে এবং কর্ণে রূপার এক প্রকার চুঙ্গি পরিয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটি কুকি রমণীর প্রতিকৃত পাঠকগণকে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তদ্দর্শনে ইহাদের আকৃতি এবং গহণা ও পরিচ্ছদাদির বিষয় কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হইবে।



কুকীরমণীগণ।

যে সকল প্রাণীর মাংস বা উদ্ভিজ্জাদি বিষাক্ত নহে, তাহার প্রায় সমস্তই কুকিগণের আহার্য্য। ইহারা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অথবা জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা মাংসাদি অর্দ্ধপক্ক মাত্র হয়। ইহাদের খাদ্য প্রস্তুত করিতে লবণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের মসলা বা তৈল ঘৃতের প্রয়োজন হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা

মাংসই ইহাদের উপাদেয় ও প্রিয় খাদ্য। তন্মধ্যে আবার হরিণ, খরগোস, হস্তী, অশ্ব, বিড়াল, বানর, অজগর সর্প, গোসাপ এবং ভেক ইত্যাদিই শ্রেষ্ঠ। নানা কারণে এখন মনুষ্যটা খাদ্যশ্রেণী হইতে বাদ পড়িয়াছে। বর্ষার সময় শিকার করা কষ্টসাধ্য বলিয়া, ইহারা শীত ঋতুতে হস্তী ইত্যাদি নানাবিধ জন্তুর মাংস শুষ্ক করিয়া মজুদ রাখে।

ইহারা কুকুরকে তণ্ডুল ভক্ষণ করাইয়া তখনই তাহাকে বধ করে। অথবা মৃত কুকুরের উদরে চাউল পূরিয়া শেলাই করে। তৎপর সেই কুকুরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, তাহার অভ্যন্তরস্থ সিদ্ধ তণ্ডুল পরম উপাদেয়জ্ঞানে সেই অৰ্দ্ধসিদ্ধ কুকুরের মাংস সংযোগে ভক্ষণ করিয়া থাকে। কুকিসমাজে এই খাদ্য আমাদের পোলাওয়ের স্থান অধিকার করিয়াছে। কুকিগণ ইহাকে কি বলে জানিনা, বাঙ্গালীগণ এই খাদ্যকে "কুকুর-পিঠা" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। দুগ্ধ ইহাদের সমাজে নিতান্ত অখাদ্য বস্তু।

কুকিগণ অপরিমিত মদ্যপায়ী। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেই সুরাপান করিয়া থাকে। তাহাদের পানীয় মদিরা আপনারাই চুয়াইয়া লয়। কিন্তু তাহা বিক্রয় করিতে পারে না। বিক্রয় করিলে, ত্রিপুর রাজ্যের প্রচলিত আইনানুসারে "ঝিঝাড়ার" অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়।



কুকিরমণীর সাধারণ বেশ।

ইহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, সকলে মিলিয়া তাহার দেহ প্রোথিত করিয়া থাকে। এবং মৃতব্যক্তির স্বর্গকামনায় সামাজিকদিগকে প্রচুর পরিমাণে মাংস ও মদিরা দ্বারা ভোজ দেওয়া হয়। কোনও রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার দেহ তৎক্ষণাৎ না পুঁতিয়া অগ্নি উত্তাপে শুষ্ক করিয়া যতকাল পারা যায়, সযত্নে রক্ষা করে। যখন রক্ষার অযোগ্য হইয়া পড়ে, তখন সকলে মিলিত হইয়া, মহাসমারোহে সেই দেহ সমাহিত করিয়া থাকে * এবং প্রধান প্রধান পর্ব্বোপলক্ষে মৃতরাজার উদ্দেশ্যে মাংস ও মদিরা উৎসর্গ করিয়া, তাহা ভোজন করে। মৃত্যুর পরে কয়েকদিবস শোক-বাদ্য বাদন ভিন্ন ইহারা কোন প্রকারের শোক-চিহ্ন ধারণ করে না।

কুকিরমণীগণ অপ্রশস্ত ও ছোট এক এক খণ্ড বস্ত্র কটিতে জড়াইয়া পরিধান করে। এবং দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া থাকে। এই বক্ষ আবরক বস্ত্রখণ্ডের সর্ব্বদা প্রয়োজন হয় না। গৃহকার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাকা কালে, অনাবৃত বক্ষে থাকিতেই দেখা যায়। ইহাতে তাহারা কোনরূপ লজ্জা বোধ করে না। কুকিরমণীগণ

* কৈলাশবাবুর লেখা দেখিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কুকিগণের মৃতদেহ দাহ করা হয়। এখন দেখিতেছি, আমাদিগের সেই বিশ্বাস প্রকৃত নহে।

সর্ব্বদা যে অবস্থায় থাকে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত কতিপয় রমণীর চিত্র পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

পুরুষগণ আবশ্যক হইলে বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে মাত্র। অনেক সময় আবার বস্ত্র পরিধান না করিয়া, একখানা "পাছুড়ি" দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া চলে। আজ কাল যাহারা একটু সভ্য হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বদাই বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রী, পুরুষ সকলেই উলঙ্গ হইয়া স্নান করে।

কুকিগণের শস্যোৎপাদন প্রণালী ত্রিপুরাজাতির প্রণালীর অনুরূপ। ইহারা গভীর অরণ্য কাটিয়া, তাহা শুষ্ক হইলে অগ্নি দ্বারা জ্বালাইয়া দেয়। এই উপায়ে জঙ্গল পরিষ্কার হয়, অথচ দগ্ধ হওয়ার দরুণ মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি পায়। এই উপায়ে জঙ্গল আবাদের পর ধান, কার্পাস, তিল, কাঁকুড়, তরমুজ, ভুট্টা প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও শস্যের বীজ মিলাইয়া, দায়ের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া, তন্মধ্যে রোপণ করে। এই সকল বীজ হইতে উপযুক্ত সময়ে গাছ ও ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে ফুটি কাকুড় ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ধান বাহির হয়, তাহা আশ্বিন মাসে কর্ত্তন করে। কার্ত্তিক মাসে তিল ও কার্পাস সংগৃহীত হয়। এই প্রণালীতে প্রস্তুত ক্ষেত্রকে "জুম" ক্ষেত্র বলে। এবম্বিধ উপায়ে একস্থানে ২।৩ বৎসরের অতিরিক্তকাল ভাল ফসল জন্মায় না। এবং এতদ্দ্বারা প্রজাগণ শ্রমোপযোগী ফসল পাইতে পারে না। হল-কর্ষণ দ্বারা শস্যোৎপাদন করিলে ইহারা অধিকতর লাভবান হইতে পারে এবং পার্ব্বত্য প্রদেশ আবাদেরও সুবিধা হয়। এই দুইটি কারণে ত্রিপুররাজ্যের পার্ব্বত্য প্রজাদিগকে হল চালনা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ত্রিপুর জাতির মধ্যে অনেকেই এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। কুকিগণ অদ্যাপিও চাষের কার্য্য আরম্ভ করে নাই। তাহাদিগের এ বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, রাজ-সরকার হইতে সমস্ত কুকিরাজগণকে অল্প জমায় কায়েমি-স্বত্বে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে। এবং দরিদ্র প্রজাদিগকে গো মহিষাদি সংগ্রহের নিমিত্ত রাজসরকার হইতে সাহায্য প্রদানের জন্য কৃষিব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। এই সুযোগে অনেক পার্ব্বত্য প্রজা হল কর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদনের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইবে সন্দেহ নাই।

কুকিগণের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমভাবে খাটিয়া থাকে। শস্যক্ষেত্রে রমণীগণ পুরুষের সমান পরিশ্রম করে। ভার বহন পক্ষেও তাহারা পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। ইহারা স্কন্ধে অথবা মস্তকে কোন প্রকারের ভার বহন করিতে পারে না। দাড়ি অথবা বৃক্ষের ছাল দ্বারা বোঝা বাঁধিয়া সেই দড়ি মাথায় (কপালের দিকে) লাগাইয়া লয় এবং সেই দাড়িতে বাঁধা বস্তু পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া ঈষৎ সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া চলিতে থাকে। এই উপায়ে তাহারা সচরাচর দেড়মণ, দুইমণ পর্য্যন্ত ভার বহন করে। সন্তানগণকেও ইহারা ক্রোড়ে না লইয়া, কাপড়ের বুচ্‌কীতে ভরিয়া, কাঁধের সহিত বন্ধন করিয়া পৃষ্ঠে বা পার্শ্বে ঝুলাইয়া লয়। শিশুগণ সেই অবস্থায়ই চুপ্ করিয়া থাকে। (২য় চিত্র দ্রষ্টব্য।)

কুকিগণ শিল্প কার্য্যে অতি নিপুণ, বাঁশ, বেত ও কাষ্ঠ দ্বারা নানাবিধ সুন্দর সুন্দর প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে। রমণীগণ আপন আপন পরিবারস্থ সকলের পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করে। তদ্ভিন্ন বিছানায় পাতিবার একপ্রকার অতি সুন্দর কাপড় প্রস্তুত করে, তাহাকে "পরি" বলে। চেষ্টা করিলে এবং আবশ্যকীয় অর্থ যোগাইলে, ইহাদের দ্বারা শিল্পের বিস্তর উন্নতি করা যাইতে পারে। আজকাল মেথলী (মণিপুরী) গণের নির্ম্মিত "খাইমপী" নামক শীতবস্ত্র নানা দেশে রপ্তানী হইতেছে এবং ভদ্রসমাজে এই কাপড়ের আদর বাড়িয়াছে। কুকিগণের নির্ম্মিত কাপড় রপ্তানী হইলে তাহাও সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারা অতি অল্প পরিমাণ বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। আপনাদের প্রয়োজন সাধন করিয়া বড় বেশী বিক্রয় করিবার সুবিধা হয় না।—

কুকি রমণীগণ অতি ধীর ভাবে, বিশেষ নিপুণতার সহিত বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। ইহারা যে প্রণালীতে বস্ত্র বয়ন করে, পর পৃষ্ঠায় তাহার একখানা ছবি দেওয়া গেল।

আপনাদের নির্ম্মিত মোটা কাপড় ব্যবহার করিয়াই কুকিগণ পরিতৃপ্ত হয়। বিলিতি কাপড় এতকাল ইহাদের সমাজে ঠাঁই পাইত না; এখন বৃটিশ গবর্মেণ্ট ও ত্রিপুরার



বস্ত্রবয়ন-প্রণালী।

মহারাজ বাহাদুরের প্রদত্ত উপহারচ্ছলে তাহাদের মধ্যেও মাঞ্চেষ্টার প্রবেশ লাভ করিয়াছে!

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

বৈদ্যনাথ।

হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ বৈদ্যনাথ কলিকাতা হইতে কিঞ্চদধিক ২০০ শত মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে সাঁওতাল পরগণায় অবস্থিত। ইহা "দেওঘর" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। "দেও"শব্দ দেবশব্দের অপভ্রংশ এবং ঘরশব্দ গৃহশব্দের প্রাকৃত। সম্ভবতঃ বৈদ্যনাথ দেবের অধিষ্ঠানই দেওঘর নাম হইবার কারণ। দেওঘর নাম প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন হইলেও উভয় নাম সমসাময়িক নহে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তৎপরিবর্ত্তে হার্দ্দপীঠ, হরিদ্রাপীঠ, রাবণ কনক, কেতকীবন, হরিতকী বন এবং বৈদ্যনাথ নাম দৃষ্ট হয়। মোসলমান রাজত্বের শেষভাগে বৈদ্যনাথ বীরভূম জিলার অন্তর্গত ছিল। অধুনা ইহাকে সাঁওতাল পরগণায় সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে শিবগঙ্গা নামে ৯০০ ফুট দীর্ঘ ও ৬০০ ফুট প্রস্ত একটী দীর্ঘিকা। ইহা অতিশয় গভীর এবং অবতরণোপযোগী প্রস্তরময় সোপানাবলী শোভিত। লঙ্কাধিপতি রাবণ পদাঘাতে ইহার সৃষ্টি করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। পূর্ব্বে শিবগঙ্গা একটী অগভীর জলাভূমির সহিত সংযুক্ত ছিল। সম্রাট্ আকবর সাহের প্রধান সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ উড়িশ্যা গমন কালে বৈদ্যনাথে আসিয়া এতদুভয়ের মধ্যে একটী বাঁধ নির্ম্মাণ করান; এবং স্বীয় নামানুসারে উক্ত জলাভূমির"মান সরোবর" আখ্যা প্রদান করেন (১)। বৈদ্যনাথের চতুর্দ্দিকে বৃক্ষসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তর। উৎদঘাতিনী ভূমি এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রস্তর দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এই স্থানে একটী ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। *প্রায় এক মাইল পশ্চিমে "দারোয়া"* নামে স্বল্পসলিলা এক নদী। বর্ষা ঋতু ভিন্ন অন্য সময়ে "দারোয়া" অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় আকার ধারণ করে। কিন্তু ইহার জল অতিশয় পরিপাক-শক্তি-সম্পন্ন। প্রায় পাঁচ মাইল পূর্ব্বে "তপোবন" নামক একটী পাহাড়। তপোবন প্রকৃতই শান্তিরসাস্পদ তপোবনের ন্যায় গাম্ভীর্য্য এবং পবিত্রতাব্যঞ্জক।

তীর্থস্থান ব্যতিরেকে বৈদ্যনাথের প্রসিদ্ধির আরও একটী কারণ আছে। বঙ্গদেশের মধ্যে ইহা একটী স্বাস্থ্যকর স্থান। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় প্রাচীন কালেও উক্ত কারণে এই স্থান বিখ্যাত ছিল। ভৈরবের

---

(১) The lake Forms a part of a large tract of low land or ravine, the western portion of which has been cut off by a heavy embankment, on the top of which runs the road aforesaid. This embankment must have been put up by Maharja Man Sinha, the great general of Akber, who came to this place on his way to Orissa, as I find, his name is associated with the western portion, which is called "Man sarovara."

(On the Temples of Deoghur)

Dr. Rajendra Lal Mitra. L L D. C I E.

বৈদ্যনাথ" নাম এবং অধিষ্ঠাত্রী শক্তির "আরোগ্য" নামই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে (১)। পুরাতন জ্বর, প্লীহা এবং যকৃত রোগীর পক্ষেই বৈদ্যনাথ বিশেষ উপযোগী। পরিবর্ত্তনের জন্য শীত ঋতুই প্রশস্ত। রোগীর জন্য সহর অপেক্ষা উন্মুক্ত স্থান অধিকতর স্বাস্থ্যজনক। পশ্চিমের মৃদু পবন রোগমুক্তির অনেক সাহায্য করে: কিন্তু উত্তর ও পূর্ব্বের বাতাস অনিষ্টকর বলিয়া খ্যাত।

বৈদ্যনাথ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত বলিয়া বৈদ্যনাথবাসীদিগকে সাঁওতাল বলিয়া অনেকের ধারণা জন্মিতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রীহট্ট জিলা আসামের মধ্যে হইলেও শ্রীহট্টবাসী যেরূপ আসামী নহেন. ঠিক তদ্রূপ বৈদ্যনাথ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত হইলেও এই স্থানের লোক সাঁওতাল নহেন। লোক সংখ্যা প্রায় ৮২০০। তন্মধ্যে প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ২০০ শত। প্রচলিত ভাষা "কায়েতি।" ইহা হিন্দি ও বাঙ্গালার সংমিশ্রণ মাত্র। প্রায় ৫০০।৬০০ ঘর পাণ্ডা এখানে বাস করিতেছেন। ইহারা বহু পূর্ব্বে মিথিলা, কানাকুব্জ এবং বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত। বৈদ্যনাথ দেবের পূজা এবং যাত্রীদের পৌরহিত্য অর্থাৎ পাণ্ডাগিরি ব্যতীত ইহাদের অন্য কোন বৃত্তি নাই। জীবন যাত্রার জন্য যাত্রীদের ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং দানশীলতাই ইহাদের একমাত্র ভরসা। সম্প্রতি শ্রীমান শৈলজানন্দ ওঝা, বৈদ্যনাথদেবের প্রধান-পূজক। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ যাধন ওঝা সর্ব্বপ্রথমে মিথিলা হইতে আসিয়া বৈদ্যনাথদেবের পূজক হন। "ওঝা" শব্দ উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। শৈলজানন্দ যোধনের বিংশতিতম পরবর্ত্তী। তাঁহার পুত্র রঘুনাথ ওঝা গিধোড়াধিপতি পূরণমল্ল সিংহকে বৈদ্যনাথ মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রার্থনা করেন।

সহরের প্রায় এক মাইল দূরে একটী কুষ্ঠাশ্রম। বৈদ্যনাথের ন্যায় স্বাস্থ্যকর স্থানই কুষ্ঠরোগীর উপযুক্ত। স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ মহাশয়ের অবিচলিত যত্নে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এই পবিত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় ইহা নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার একাকী বহন করিয়া নিরাশ্রয় কুষ্ঠীদের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নামানুসারে এই আশ্রম "রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণের দয়া এবং দানশীলতা দ্বারাই ইহা পরিচালিত হয়। আশ্রমে ৩০ জন রোগীর বাসোপযোগী স্থান আছে। কুষ্ঠীদিগের শয্যা, শীতবস্ত্র, আহার্য্য এবং ঔষধ প্রভৃতি আশ্রম হইতে প্রদত্ত হয়। যোগীন্দ্র বাবু ইহার অবৈতনিক সম্পাদক। তাঁহার যত্নে হতভাগ্যদিগের কোন প্রকার অসুবিধা না হইলেও আশ্রমের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। স্কুলের দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য ব্যতীত তাঁহাকে ইহাদের জন্য অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে তিনি বিব্রত হন না। কথা প্রসঙ্গে এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন "My body may be tired but never my spirit". অনেক স্থলে এই বাক্যের সত্যতা কার্য্যতঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আশ্রমের দেওয়াল সংলগ্ন কাষ্ঠফলকে একটী কাতর প্রার্থনা লিখিত আছে;—"Please contribute something for those unfortunate sons of God" পড়িলে কাহার প্রাণে না করুণার সঞ্চার হয়? হায়! বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য কতদিকে কত অর্থ ব্যয় হইতেছে, কিন্তু সদনুষ্ঠানে অর্থাভাব কি কম পরিতাপের কথা?

বৈদ্যনাথ মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সদর রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে ছয় ফুট উচ্চ এক মেটফরমের উপরে তিনটী সমচতুষ্কোণ প্রস্তর দৃষ্ট হয়। ইহাদের দুইটী মেটফরমের উপর সোজাভাবে প্রোথিত এবং তৃতীয়টী তদুপরি তোরণাকারে স্থাপিত। প্রোথিত প্রস্তরগুলি প্রত্যেকে ১২ ফুট এবং উপরিস্থিত প্রস্তরটী ১৫ ফুট দীর্ঘ; ইহার উভয় প্রান্তে মকর মৎস্যের মুখ অঙ্কিত। এই প্রস্তরত্রয় সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে: কাপ্তান সার উইল সাহেব, এই প্রস্তরগুলি কি, কোন উদ্দেশ্যে কর্ত্তিত এবং এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে তাহাই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তিনি এইমাত্র বলেন, উপরিস্থিত প্রস্তরের উভয়প্রান্তে হস্তী কিম্বা কুম্ভীরের মুখ অঙ্কিত (১)। হাণ্টার সাহেব বড়ই অদ্ভুত রকমের একটী কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, আদিম সাঁওতালগণ এই প্রস্তরগুলিকে পূজা করিত (২)। সম্ভবতঃ প্রস্তরের অস্তিত্বের কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিতে পারিয়া তিনি অসভ্য সাঁওতালদের শরণ লইয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার মতটী অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সাঁওতালগণ ইতাকার প্রস্তর পূজা করিত বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। প্রস্তর-অর্চ্চনা তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ হইলে সাঁওতাল ভূমির অন্যান্য স্থানেও দুই একটা উপাস্য প্রস্তর লক্ষিত হইত। তদ্ভিন্ন এত প্রকাণ্ড প্রস্তর কর্ত্তনোপযোগী কোন যন্ত্র সাঁওতালদিগের নাই। বেগলার সাহেব উক্ত প্রস্তরগুলিকে কোন প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। এইরূপ "ভিন্ন মুনির ভিন্ন মতের" মধ্যে বাবু ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের উক্তিই আমরা যথার্থ বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি বলেন, দোল পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণকে দোলাইবার জন্য এই প্রস্তরগুলি তোরণাকারে স্থাপিত হইয়াছে। অন্য কোন কারণ থাকিলে মকর মুখের প্রয়োজন ছিল না। অদ্যাপি ঐ স্থানে দোল যাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণকে দোলান হইয়া থাকে। (৪)

বৈদ্যনাথ তীর্থের উৎপত্তি শিবপুরাণ এবং পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা এ স্থলে তাহা উল্লেখ করিলাম না। কেবলমাত্র সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রচলিত একটী কৌতূহলজনক কিম্বদন্তী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা পুরাণোক্ত বিবরণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। পুরাকালে এক দল ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান বৈদ্যনাথের সমীপ-

---

(১) আরোগ্যা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী। ৭১ শ্রীমদ্দেবীভাগবৎ সপ্তম স্কন্দ, ত্রিংশোধ্যায়।

(১) There is a faint attempt at sculpture at each end of the vertical faces of the horizontal beam representing either elephants' or crocodiles' heads.

(Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. XIV P. 325).

(২) The three great stones which their (Santhals) Fathers worshipped and which are to be seen at the western entrance of the holy city to this day.

(Annals of Rural Bengal p. 192).

(৩) There is however one object that must be expected: that is a great gateway consisting of two pillars spanned by an architrave; this is clearly the remains of some great ancient temple which has been entirely disappeared leaving its outer gateway alone standing.

Archœological Survey of India. Reports Vol VIII. p. 128.

(৪) Three great stones......are at once made out by Hindu eyes to be no more than a Hindu *Dolkat Frame* in stone with *makara* faces at the extremities of the horizontal beam which is used for swinging Krishna in the Holy Festival,

(Mukherjee's Magazine. Vol II.)

বর্ত্তী এক মনোহর হ্রদের তীরে বাস করিতেন। তাহাদের চতুর্দ্দিকে নিবিড় অরণ্য ব্যতিরেকে অন্য কিছুই ছিল না। তাহাতে কৃষ্ণকায় পার্ব্বত্য জাতি বাস করিত। ব্রাহ্মণেরা সেই হ্রদের তীরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চনা করিতেন। কৃষিকার্য্য দ্বারা তাহারা জীবন রক্ষা করিতেন। প্রতিবাসী অসভ্যেরা বন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়া দিনপাত করিত। উর্ব্বরা ভূমি এবং তাহাতে অক্লেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় দেখিয়া কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ অলস ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইতে লাগিল। শিবলিঙ্গের আরাধনা তাহারা সম্যকরূপে পরিত্যাগ করিল। পার্ব্বত্য-জাতি ইহাতে অতিশয় রুষ্ট হইল। অবশেষে তাহাদের মধ্যে ক্ষমতাপন্ন এবং বলিষ্টকায় "বৈজু" নামে এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের যথেচ্ছচারিতা দমন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহাদের উপাস্য দেবতাকে প্রতিদিন যষ্টি প্রহার না করিয়া সে অন্ন জল গ্রহণ করিবে না।

"বৈজু" যথা নিয়মে তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল। একদা সে সমস্ত দিন পরিশ্রমে কাতর হইয়া সন্ধ্যার সময় অবসন্ন দেহে ভোজনে বসিয়াছে, এমন সময় সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হইল। তৎক্ষণাৎ ভোজন পরিত্যাগ করিয়া যথাশক্তি শিবলিঙ্গের প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। অকস্মাৎ হ্রদ হইতে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আবির্ভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন :—"বৎস বৈজু নিরস্ত হও; আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ; তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" বৈজু উত্তর করিল :—"আমার ধন সম্পদের অভাব নাই ; যদি প্রসন্ন হইয়া থাক তবে এই বর দেও—তোমার নামের সহিত যেন আমার নাম সংযুক্ত থাকে। তোমার নাম "নাথ" ; এক্ষণে ইহা "বৈজুনাথ" হউক"। তথাস্তু বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। তদনুসারে অদ্যাপি সাঁওতাল ও হিন্দুস্থানীরা বৈদ্যনাথের পরিবর্ত্তে "বৈজুনাথ" বলে।

এখন বৈদ্যনাথ মন্দিরের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। প্রাচীর পরিবেষ্টিত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে ইহা স্থাপিত। উচ্চতা প্রায় ৭২ ফুট। চতুর্দ্দিকে লক্ষ্মী নারায়ণ, অন্নপূর্ণা, পার্ব্বতী, কালী, সূর্য্য এবং আনন্দভৈরব প্রভৃতি দেবতার অনেকগুলি মন্দির আছে। কিন্তু তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন। ইহার অভ্যন্তর অন্ধকারময়। দিবসেও ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে। লিঙ্গ প্রায় চারি ইঞ্চি উচ্চ। উপরিভাগ ভগ্ন ও পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বন্ধুর ছিল। কিন্তু অসংখ্য যাত্রীর হস্তঘর্ষণ এবং অনবরত দুগ্ধ ও বারিধারায় অধুনা তাহা মসৃণ হইয়া গিয়াছে। হিন্দুমতে রাবণের মুষ্ট্যাঘাত এবং সাঁওতাল মতে বৈজুর যষ্টি প্রহার লিঙ্গ ভঙ্গের কারণ। অঙ্গনে প্রবিষ্ট হইবার তিনটী দ্বার আছে। উত্তর দ্বার দিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই সম্মুখে সুগভীর "চন্দ্রকূপ"। রক্ষোরাজ রাবণ লিঙ্গের অভিষেক ও অর্চ্চনার জলের জন্য এই কূপ খনন করেন। বৈদ্যনাথ-মন্দিরের সম্মুখেই পার্ব্বতীর মন্দির। এই মন্দিরটী মনোহর ; মধ্যস্থলে চতুর্ভুজা গৌরীমূর্ত্তি এবং অষ্টভুজা পার্ব্বতী মূর্ত্তি। দুর্গোৎসবের সময় তাঁহাদের প্রীত্যর্থে বহুসংখ্যক ছাগ ও মহিষ বলি দেওয়া হয়। পশুবলি বৈদ্যনাথের অপ্রিয় ; তজ্জন্য বলি প্রদানের সময় তাঁহার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করা হয়। হরপার্ব্বতীর চিরসম্মিলন সূচনার জন্য উভয়ের মন্দিরের চূড়া বস্ত্রদ্বারা সংযোজিত করা হইয়াছে। তারকেশ্বরের ন্যায় বৈদ্যনাথেও 'হত্যা' দেওয়ার প্রথা আছে।

শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান ভিন্ন অন্য একটী কারণেও বৈদ্যনাথ প্রাচীনতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতী তনুত্যাগ করিলে ভার্য্যাশোকে উন্মত্তপ্রায় মহাদেব তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে স্থাপন করিয়া যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে বিষ্ণুচক্র দ্বারা সেই শব ৫২ ভাগে কর্ত্তিত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে পতিত হয়। এই স্থানে সতীর উৎকৃষ্টাঙ্গ হৃদয় পতিত হইয়াছিল। সুতরাং বৈদ্যনাথ একটী "মহাপীঠ" স্থান। অদ্যাপি এখানে হৃদয়পতনস্থান সূচক একটী পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। ইহাকে "হার্দ্দিকুণ্ড" বা হৃদয়কুণ্ড" বলে। পূর্ব্বে এই কুণ্ড একটী অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধময় ডোবা মাত্র ছিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুযাত্রী ব্যতীত অন্য কেহ ইহার জল স্পর্শ করিতেও ইচ্ছা করিত না। তিন বৎসর অতীত হইল রোহিণীর ঘাটওয়ালিনী শ্রীযুক্তা কস্তুরা কুমারী ইহার পঙ্কোদ্ধার করাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে জল ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ মন্দির ও তৎপার্শ্বস্থ অন্যান্য মন্দিরে কয়েকটী প্রস্তরলিপি লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে দুই একটী প্রাচীনত্ব নিবন্ধন অতিশয় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৈদ্যনাথ মন্দিরের ভিতরের পূর্ব্ব দ্বারের উপরে দেবনাগর অক্ষরে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী লিখিত আছে।

অচল শশিশায়কোল্লাসিত ভূমি শাকাব্দকে
বলতি রঘুনাথকে হলব পূজাকে শ্রদ্ধয়াত্র
বিমলগুণ চেতসা নৃপতি-পূরণে নাচিরং
ত্রিপুরহরমন্দিরং ব্যরাচি সর্ব্বকামপ্রদং ॥
নরপতি কৃত পদামিদং।

এই শ্লোকে "বলতি" এবং "হলব" এই দুইটী শব্দ অশুদ্ধ। সম্ভবতঃ তাহা ভাস্করের অসতর্কতা হেতু ঘটিয়া থাকিবেক। তাহা না হইলেও রাজরচনা সমালোচ্য নহে। পণ্ডিতের হইলে স্বতন্ত্র কথা ছিল। যাহা হউক ইহা পাঠ করিয়া বৈদ্যনাথ মন্দিরের নির্ম্মাণকাল এবং নির্ম্মাতা নির্ণয় করা যাইতে পারে। অচল = ৮, শশী = ১, শায়ক = ৫ এবং ভূমি = ১ ; সুতরাং ১৫১৮ শকাব্দ অথবা ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, রঘুনাথের প্রার্থনায় পূরণমল্লসিংহ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। রঘুনাথ বৈদ্যনাথের তৎকালীন প্রধান পূজক ছিলেন। বীর বিক্রমসিংহ ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে গিধোড় রাজধানী সংস্থাপন করেন। পূরণমল্ল তাঁহার বংশধর। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্বর্গগত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় আমাদের কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বৈদ্যনাথ মন্দির ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের আরও অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক। তজ্জন্য তাঁহার মতের সত্যতা প্রমাণ করিতে যাইয়া কয়েকটী যুক্তিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ পূরণমল্ল ও রঘুনাথের সময়ের পূর্ব্বে কোন মন্দির না থাকিলে রঘুনাথের পিতা যোধন কি পূজা করিতেন? দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অনেক বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থে বৈদ্যনাথের প্রসিদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে সহস্রাধিক লিঙ্গের মধ্যে মাত্র দ্বাদশটী অতি প্রাচীন বলিয়া খ্যাত (১)। তন্মধ্যে বৈদ্যনাথের শিবলিঙ্গ একটী। এই লিঙ্গ উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের সমসাময়িক। ভুবনেশ্বর ১২০০ বৎসরের প্রাচীন। সুতরাং ইহার সমকালের হইয়া বৈদ্যনাথ লিঙ্গ এত দীর্ঘ সময় (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত) মন্দির শূন্য অনাবৃত স্থানে থাকিতে পারে না। কোন না কোনহিন্দু তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া থাকিবেক। তৃতীয়তঃ পূর্ব্ব মন্দির ভগ্ন করাইয়া পূরণমল্ল সিংহ নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এরূপও সম্ভব হয় না। কারণ দেবমন্দির ভগ্ন করা স্মৃতিতে নিষেধ আছে। স্মৃতির অনুশাসন অলঙ্ঘনীয়। সুতরাং পূরণ মল্ল স্বধর্ম্মনিরত হিন্দুরাজা হইয়া অনার্য্যোচিত কার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হন নাই। এই সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া

(১) সৌরাষ্ট্রে সোমনাথং চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্
উজ্জৈয়্যাং চ মহাকালং ওঁকারমমরেশ্বরে
কেদারং হিমবৎ পৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করং
বারাণস্যাং চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমী তটে
বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দ্বারকাবনে
সেতুবন্ধে তু রামেশং ঘুশ্মেশং শিবালয়ে ॥
(বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য)

তিনি বলেন, পূরণ মল্ল বৈদ্যনাথ মন্দিরের নির্ম্মাতা নহেন (১)। তিনি মন্দিরসংলগ্ন অলিন্দ মাত্র প্রস্তুত করাইয়া মন্দির নির্ম্মাণের প্রশংসা ও যশোলাভ কামনায় উক্ত অসত্য প্রস্তর-লিপি স্বহস্তে লিখিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার যুক্তিগুলি অকাট্য এবং উক্তিটি অভ্রান্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। প্রথম যুক্তির প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। রঘুনাথের পিতা শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন বলিলেই প্রচুর হয়। দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই—বৈদ্যনাথ-লিঙ্গ অতিশয় প্রাচীন, এই কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু তৎসঙ্গে বৈদ্যনাথের মন্দিরও ঠিক সেইরূপ প্রাচীন, এই বাক্যের পোষকতা করিতে পারি না। দেবতা প্রাচীন হইলেই তাঁহার মন্দিরও তদ্রূপ পুরাতন হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। তদ্ভিন্ন শিবলিঙ্গের পক্ষে অনাবৃত স্থানে থাকাও অসম্ভব নহে। হিন্দুদের অনেক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে যাহাতে মন্দির নাই। পুরাণোক্ত ৫২টী "মহাপীঠ" স্থান যে প্রাচীন ও বিখ্যাত তীর্থ তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু সেই সকল প্রত্যেক তীর্থেই কি ভৈরব ও ভৈরবীর মন্দির আছে? গঙ্গার "সাগর সঙ্গম" একটী অতিশয় পুরাতন ও সর্ব্বজন বিদিত তীর্থস্থান। ইহার প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। বোধ হয় ইহা বৈদ্যনাথ তীর্থ হইতেও অধিক পুরাতন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন দেব দেবীর জন্য কি এই সাগর সঙ্গমে কোন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল? মাত্র পাঁচ বৎসর অতীত হইল এই তীর্থে কপিলের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুতীর্থে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থে যদি মাত্র ৫ বৎসর পূর্ব্বে মন্দির নির্ম্মিত হইল, তবে ৩০৪ বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যনাথ তীর্থে কোন মন্দির ছিল না, অথবা এত বৃহৎ মন্দির ছিল না এই কথা স্বীকার করিতে হানি কি? মিত্র মহাশয়ের তৃতীয় যুক্তিও অপ্রতিবাদযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। দেব মন্দির ভগ্ন না করিয়া কি নূতন মন্দির প্রস্তুত করান যাইতে পারে না? হয়ত বৈদ্যনাথের পূর্ব্ব মন্দির প্রাচীন হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মে ভগ্ন হইয়াছে; অথবা ভূকম্পনেও ভূমিসাৎ হইতে পারে; এবং তৎপরে পূরণমল্ল সিংহ কর্ত্তৃক নূতন মন্দির ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে পুনর্নির্মিত হইয়াছে। তাহা হইলে তাঁহাকেও স্মৃতির নিষেধ বাক্যের অবজ্ঞা-জনিত পাপে নিমগ্ন হইতে হয় না।

বৈদ্যনাথ মন্দিরের ন্যায় একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে কোন রাজা অথবা ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক। আধুনিক চাঁদা তুলিবার প্রথাও সেই সময় প্রবল ছিলনা। ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন হইত। অন্যান্য হিন্দুরাজা অপেক্ষা গিধোড় রাজাই বৈদ্যনাথের সন্নিকটে। এরূপ অবস্থায় এই রাজ্যের একজন রাজা উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করাইবেন তাহা কিছু অসম্ভব নহে। পূরণমল্ল সিংহের স্বহস্ত-লিখিত প্রস্তর-লিপিই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তবে কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একজন রাজাকে মিথ্যাভাষী স্থির করিবার প্রয়োজন কি? রাজ্যশাসন কিম্বা সমাজশাসনে পূরণমল্ল অসত্যশীল এবং প্রবঞ্চনা-পরায়ণ হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু হিন্দু হইয়া তিনি দেবমন্দিরে মিথ্যালিপি খোদিত করাইয়াছেন ইহা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিনা।

আমি বৈদ্যনাথের লোকসংখ্যা ৮২০০ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান মেলাসে ইহার ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা।

শ্রীসীতানাথ দেব।

(১) It is obvious to me therefore, that the tradition which holds the temple to be old and ascribes to Purana Malla only the lobby, is correct and that having defrayed the cost of the lobby which became a part and an integral part of the temple, he by a Figure of "synecdoche" claimed credit for the whole. (On the Temples of Deoghrh; Dr. Rajendra Lall Mitra.)

মৃণালিনীর দৌত্য।

সূত্রপাত।

রমেশচন্দ্র রায় এম, এ, কলিকাতা—কালেজের একজন বিখ্যাত নবীন অধ্যাপক। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ তাঁহার গৃহে এক অতিথি উপস্থিত। অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রমেশচন্দ্রের মাসতুত ভাই, বয়সে তিন বৎসরের ছোট। অতুলও শিক্ষিত, বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নাগপুরে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন। দুই ভ্রাতায় পরম সৌহার্দ্দ। আদালত বন্ধ উপলক্ষে অতুল কলিকাতায় রমেশচন্দ্রের বাড়ী আসিয়াছেন। কলিকাতায় আসিলে রমেশচন্দ্রের বাড়ীই তাঁহার স্থান। দূরে দূরে থাকা সময়ও প্রায় প্রতি সপ্তাহে পরস্পরে নিকট চিঠি পত্র চলে। মূলকথা, দুইজনের মধ্যে গাঢ় প্রণয়।

রবিবার দিন বিকাল বেলায় দুই বন্ধু রমেশচন্দ্রের দ্বিতল শয়নগৃহে বিস্তৃত খাটের উপর বসিয়া পান খাইতেছিলেন এবং আলাপ করিতেছিলেন। রমেশচন্দ্রের স্ত্রী নলিনী-সুন্দরী গৃহের এক কোণে জানালার পাশে বসিয়া আরও পান সাজিতেছিলেন। বিকালে পুরা এক ডিবা পান না হইলে রমেশচন্দ্রের তৃপ্তি হয় না। শয়নগৃহে বসিয়া সংসার-সঙ্গিনীর স্বহস্ত সজ্জিত, দুই একটী পানে ও বয়সে কাহারই বা তৃপ্তি হইয়া থাকে? গৃহে বয়োজ্যেষ্ঠ দেবর, সুতরাং নলিনীসুন্দরী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিলেন। দুই বৎসরের খোকা শয্যার একপাশে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল।

শয্যাপার্শ্বে দেয়ালের গায় সুন্দর ফ্রেম বাঁধা কয়েকখানি ফটোগ্রাফ ছিল। সেগুলির প্রতি দৃষ্টি করিয়া, অতুলচন্দ্র বলিলেন;—"দাদা, ছবি তুলিলে কবে?—এখানি তো তোমার ছবি; মধ্যের এখানি তো খোকা! খোকার ছবি-

খানি বেশ উঠিয়াছে ;—মাথাভরা চুল, মুখভরা হাসি!—খোকার হাতে এটা কি ?”

রমেশ। ওটা তোমার বধূ ঠাকুরাণীর সোণার কাণ।

অতুল। সোণার কাণ! কেন? অভাব পূরণার্থে নাকি? সেইজন্যই কি অত খানি ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছেন?

নলিনীসুন্দরী আসীমন্ত অবগুণ্ঠন আরও টানিয়া নামাইলেন।

রমেশ। না হে, তা বলিতে পারিবে না! অমন সুন্দর কাণ যাব তার নাই। মা আদর করিয়া মতি বসান সুন্দর সোণার কাণ বানাইয়া দিয়াছেন। ফটো তুলিবার সময় সাজ সজ্জার জন্য গহনার বাক্স খোলা হইয়াছিল। খোকা ছাড়িল না, তাই তাহার হাতে একটা কাণ ছিল, সেই বেশেই তাহার ফটো তোলা হয়।

অতুল। তা খোকার ছবি বেশ উঠিয়াছে।—পাশে এ কার ছবি?

রমেশ। কালেজে ভবভূতির উত্তরচরিত পড়িয়াছিলে না?

অতুল। পড়িয়াছি বৈকি।

রমেশ। প্রথম অঙ্কে চিত্র-পরিদর্শন সময় সীতা একটী স্ত্রীচিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—‘বাছা, এটি কে?’—লক্ষ্মণ কিন্তু সে কথার কোন উত্তর দেন নাই।

অতুল। আমি সীতা নই; কালেজে শিক্ষিত আজি কালির লক্ষ্মণ, কিন্তু প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই উত্তর দিতে প্রস্তুত!—এ উর্ম্মিলা ঠাকুরাণীর দিবা কাণ!

নলিনীসুন্দরীর অবগুণ্ঠন আরও কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত হইল।

অতুল। এ ছবি ঠিক হইয়াছে কিনা তা তুমি বলিতে পার।

রমেশ। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে বলিব যে, ফটোগ্রাফার আদর্শের ভারি অপমান করিয়াছে।

অতুল। তা হবে।

রমেশ। তোমার বিশ্বাস না হয়, আদর্শতো এখানেই উপস্থিত; তুলনা করিয়া দেখ।

নলিনীসুন্দরীর অবগুণ্ঠন এঁবার অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত বৃদ্ধি পাইল।

অতুল। তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস নাই। দাদা, সোণার গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধা এটা কি এ?

রমেশচন্দ্র, খোকা ও নলিনী সুন্দরীর ছবির একটুকু উপরে দেয়ালে খাটান অতি সুন্দর বিলাতি ফ্রেমে বাঁধা একত্রে যোড়া দেওয়া দুই খানি মলিন কাগজ, তাহাতে দুই হাতের লেখা কতকগুলি অঙ্কপাত মাত্র। আমরা পাঠকবর্গের কৌতুহল তৃপ্তির জন্য নিম্নে অঙ্কগুলি মুদ্রিত করিলাম:—

১৮।১২।১০— ১৮ ১৩।১ —২৪৪।১১।৬— ৩০।১২।১
১৫২।১১'৮ —১০৪।১৪।৬ —১৯৬। ১।২—১৫১। ৭।৫
২৪৯।১৬।৪ —১২২।১০।১১—১৬৩। ৫।৩— ৭৮! ৫।৫॥

———

২৪৪।১১।৬—২৪৪।১১।৭—১০৪।১৪।৬— ৩৫।১৩।৪
৮৬।১৬ ৬— ৯৪ ১২।১— ৮৬। ৪।২—২৪৫।২০।৭
৩৫।১৭।৭— ৩৫।১১।৭—১৫৫। ১।১—২১৩।১৬।৯
৪১।১৮।৪—১১০।১৫।৩—১৫২। ২।৩—১৮৭।১৪।৪
৭।১৬।৬— ৮।১২।৫—১৩৩। ৩।৪।

———

অতি সুন্দর গিল্টি করা ফ্রেমে সাজান প্রাচীন দৈবজ্ঞ লিখিতবং আর অর্থযোগ শূন্য শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাত সমন্বিত এই মলিন কাগজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অতুল বলিলেন;—“ইহার অর্থ কি?”

বন্ধুদ্বয়ের দৃষ্টি যখন সেই অঙ্ক শ্রেণীর দিকে প্রযুক্ত ছিল, সে সময় নলিনীসুন্দরীর চকিত দৃষ্টিও একবার সেই দিকে নিপতিত হইয়াছিল; কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্ত মাত্রের জন্য। রমেশচন্দ্র যদি সে সময় অবগুণ্ঠনবতীর দিকে চাহিতেন, তাহা হইলে জানালার অনতিদূরে উপবিষ্টা নলিনী সুন্দরীর সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া ও তাঁহার স্মিত বিভাসিত আকর্ণ আরক্ত মুখশ্রী দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র সেদিকে না চাহিয়াই উত্তর করিলেন;—“উর্ম্মিলা ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা কর।’

অতুল। আমি তোমার মত নির্ম্মম নিষ্ঠুর নই, অঙ্কশাস্ত্রে এম, এ, তুমি কাছে থাকিতে এই দুর্ব্বোধ অঙ্কপাতের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া আমি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিপন্ন করিব না।

নলিনীসুন্দরী মনে মনে দেবরের শত প্রশংসা করিলেন।

রমেশ। অর্থ না বুঝিয়া কি আর ইনি কাকচরিত্রের এক পৃষ্ঠাবৎ এই অঙ্কপাত গুলি নিজের শয্যাপার্শ্বে এত যত্ন করিয়া রাখিয়াছেন?

অতুল। তা হউক, তুমি বল।

বুদ্ধিমান নাবিক যেমন ধন ধান্যে ভরা নৌকা গঙ্গা-স্রোতে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে দড়ি কাছি, দাঁড় বৈঠা পাল প্রভৃতি সরঞ্জম সাজাইয়া গুছাইয়া যথা স্থানে রাখিয়া প্রস্তুত হয়, পলায়নোন্মুখী নলিনীসুন্দরী তেমনি আপনার সাজ সজ্জা, সেমিজ সাড়ী অবগুণ্ঠন আঁটিয়া টানিয়া ঠিক ঠাক করিতে লাগিলেন।

রমেশ। আমাকেই বলিতে হইবে?—কিন্তু ইহার যে অংশ আমার লেখা, তাহার অর্থ আমি বলিব, আর যে গুলি অন্যের লেখা তাহার অর্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

নলিনীসুন্দরী সজ্জিত পান গুলি ডিবার মধ্যে রাখিয়া ডিবা বন্ধ করিলেন, বন্ধ করিবার সময় হাতের সোণার চুড়িগুলি ঝণৎকার করিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র চারু কর্ণাবলম্বী স্বর্ণ ইয়ারিং বিকম্পিত হইয়া আরক্ত গণ্ড আরও উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। তখন স্মিত চক্ষে নলিনীসুন্দরীর দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া রমেশচন্দ্র আরম্ভ করিলেন,—

"সে আজ প্রায় চারি বৎসরের কথা। গঙ্গাতট পরিশোভী সুন্দর মুঙ্গের সহর। চৈত্র মাসের শেষে একদিন সন্ধ্যার পর গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম। চন্দ্রোদয়ে চারি দিক জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া ছিল। মৃদু শীতল বাতাস—"

অতুল। তুমি যে দস্তুর মত নবেল আরম্ভ করিলে!

রমেশ। আগে শুন। মৃদু শীতল বাতাস ঝুরু ঝুরু করিয়া বহিতেছিল, গাছের ডালে কোকিল ডাকিতেছিল। আমি বেড়াইতে বেড়াইতে "বসন্ত কুটীরের" দিকে—"

নলিনীসুন্দরী পান ভরা ডিবাটী শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অলক্তরাগরঞ্জিত পদসংসক্ত মল চতুষ্টয়ের রুণু ঝুণু শব্দে সেই গৃহ মৃদুমুখরিত হইয়া উঠিল।

রমেশ। ওগো, পানে চুণ কম হইয়াছে, ওগো—

আর চুণ! নলিনীসুন্দরী সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পাশের ঘরে যাইয়া দরজা আঁটিয়া দিলেন।

পূর্ব্ব কথা।

রমেশচন্দ্র সেই অঙ্কপাতের কাহিনী অতুলচন্দ্রের নিকট বলিলেন। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা তাহা বিবৃত করিতেছি।

নলিনীসুন্দরীর পিতা হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বভাব কুলীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার অবস্থা মন্দ ছিল না। পুত্র অক্ষয়চন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া কলিকাতার এক বড় হৌসে কাজ পাইয়াছেন। হারাণচন্দ্র মেলবন্ধ সমান ঘর হইতে প্রথমা পুত্রবধূ আনিয়াছিলেন, কিন্তু এক বৎসর না যাইতেই সে বধূর অভাব হয়। তাহার পর সিদ্ধ শ্রোত্রিয় মধুসূদন রায়ের কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনীর সহিত অক্ষয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন।

হারাণচন্দ্রের দ্বিতীয় সন্তান কন্যা নলিনীসুন্দরী। ঘরে শিক্ষিত বড় ভাই, তাহার সঙ্গে আবার উপযুক্ত ভ্রাতৃবধূ কুমুদিনীর মিলন হয়। বাল্যকাল হইতে ভ্রাতা, পরে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর যত্ন চেষ্টায় নলিনী সুশিক্ষিতা হইয়াছিল। নলিনীর বয়স পঞ্চদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। স্বভাব কুলীনের কন্যা, মেলের ঘরে ভাল ছেলে নাই, সুতরাং এতক তাহার বিবাহ হয় নাই। সদ্যপ্রফুল্ল মধুগর্ভ অনাঘ্রাত কুসুম-কলিকার ন্যায় নলিনী পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে রমেশচন্দ্র ভগিনী কুমুদিনীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সে বাড়ীতে যাইতে লাগিলেন। তখন রমেশচন্দ্র বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। মধুর বয়ঃসন্ধিকালে প্রথম দিন রমেশকে দেখিয়া নলিনী স্তম্ভিত হইল। বালিকা নিজের মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিল না। কোন কোন দিন রমেশের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিত। কোন কোন দিন অজ্ঞাত প্রকৃতি লজ্জা, শঙ্কায় সঙ্কুচিত হইয়া পালাইয়া যাইত। কখনও বা শ্রদ্ধা, ভক্তি, কখনও বা লজ্জা, মৃদুভীতি। উন্মেষোন্মুখী যুবতী পরে বুঝিতে পারিল—এ ভাব ভক্তি নহে, শ্রদ্ধা নহে, অভক্তি অশ্রদ্ধা ত একেবারেই নহে। লজ্জা নহে; ভীতি নহে, আরও যেন কিছু, প্রগাঢ় চিত্তাকর্ষক আরও যেন কিছু!—কি? যাহা কোন দিন দেখে নাই, যাহা কোন দিন আপন মনে অনুভব করে নাই—হৃদয়ে সেই অননুভূতপূর্ব্ব তীব্রমধুর উদ্দীপক উন্মাদকারী নবীন উচ্ছ্বাস! নলিনী শেষে বুঝিল; বুঝিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিল;—

"প্রভু, দাসীকে রক্ষা কর। অকূল সমুদ্রে ভাসাইও

না। অনিবার অগ্নিতে দগ্ধ করিও না; আত্মসংবরণ শিক্ষা দাও।—আমি গরীব, রাজ বৈভবে যেন আমার লোভ না হয়!”

বাসনা ও তৃপ্তির মধ্যে কত যে গিরিনদী ব্যবধান, নলিনী তাহা জানিত। পিতা সংসার লইয়া ব্যস্ত, মাতা যেন দেখিয়াও দেখেন না, আত্মসুখে উন্মাদচিত্ত ভ্রাতার চক্ষু তখনও বুঝি ফুটে নাই। কেবল একজন বুঝিল; বুঝিল সমবয়স্কা কুমুদিনী।

উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে, হাসিতে খেলিতে যে দিবা রাত্রি কাছে কাছে, সেই ভ্রাতৃবধূ বুঝিল। শূন্য-নয়নে চন্দ্রালোকফুল্ল আকাশের দিকে তাহার চাহনি দেখিয়া বুঝিল; অতর্কিত আহ্বানে তাহার চকিত দৃষ্টি দেখিয়া বুঝিল; আহারে অনিচ্ছা, ভ্রমণে অনুদ্যম, অধ্যয়নে অমনো-যোগ, হাসিতে বিষণ্ণতা, লাবণ্যে কালিমার ছায়া দেখিয়া বুঝিল। বুঝিয়া মস্তক অবনত করিয়া প্রার্থনা করিল, “প্রভু, এ কি করিলে? দুইটী প্রাণীকে জীবন্তে দগ্ধ হইতে দেখিবে?—পর্ব্বত তো দুরারোহ। নদী তো দুস্তর! তবে কেন এ বিড়ম্বনা?”

একদিন কুমুদিনী নিভৃতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—

“ঠাকুরঝির বিবাহের কি করিলে?”

অক্ষয়। কিছুই হয় নাই।

কুমু। কবে হইবে?

অক্ষয়। বলা সহজ নহে। মেলের ঘরে দশ বৎসরের এক বালক আছে; আর আছে দুইটী বৃদ্ধ!

কুমুদিনী নিষ্পন্দনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে বলিল;—“এই ঘরেই করিতে হইবে?”

অক্ষয়। মেল ভাঙ্গিয়া কাজ করা সহজ নহে।

কুমু। কেন?

অক্ষয়। কুল থাকিবে না।

কুমু। কুল দিয়া কি করিবে?

অক্ষয়। কি করিব জানি না। তোমাকে এতদিন বড় কিছু বলি নাই; তাই বলিয়া তুমি মনে করিও না যে আমি নিশ্চিন্ত আছি। নলিনীর কথা মনে করিতে বুকে পাষাণের চাপ পড়ে। কাল মার সঙ্গে বিশেষ করিয়া আলাপ করিব।

কুমু। করিও, আর বিলম্ব করা চলে না।

অক্ষয়। কাল রমেশের এখানে আসার কথা আছে না?

কুমু। কথা ছিল; কিন্তু দাদা লিখিয়াছেন, আসিতে পারিবেন না।

অক্ষয়। কেন? রমেশ কি রাগ করিয়াছে?—গত রবিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম. আসে নাই; কালও আসিবে না! কেন?

কুমুদিনী তৎক্ষণাৎ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। নিকটে টেবিলের উপর বাটীতে দুধ ঢাকা ছিল; খোবার খাওয়ার সময় হইয়াছে। অগ্নিপাত্রে দুধ গরম করিতে দিয়া আসিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কুমুদিনী বলিলেন;—

“দাদা এখন আর এ বাড়ীতে বড় আসেন না। না আসাই ভাল।”

অক্ষয়। সে কি!—রমেশের আসা ভাল না?

কুমু। তুমি অন্ধ! দূরদৃষ্টির জন্য চস্‌মা পরিয়াছ, কিন্তু তোমার দূরদৃষ্টি নিকটদৃষ্টি কিছুই নাই!

অক্ষয়। রমেশ কি—

কুমু। শুধু তাহা হইলে দোষ ছিল না,—

অক্ষয়। আর কি?

কুমু। এ দিকে ঘরের কুসুমেও কীট ধরিয়াছে!

অক্ষয়। কুমু, আমি প্রকৃতই অন্ধ!

তাহার পর দিন বিকালে কুমুদিনী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। নলিনী বারান্দায় খোকার হাত ধরিয়া “হাঁটি হাঁটি” করিতেছিল। হাঁটিতে হাঁটিতে খোকা পড়িয়া যায়, আর উভয়ের মুখে হাসির উৎস ছুটে! আছাড় পড়িয়া খোকার হাসি, আর তাহাকে পড়িতে দেখিয়া হাতে তালি দিয়া নলিনীর হাসি!

অক্ষয়চন্দ্র আফিস হইতে আসিয়া মাতার ঘরে জলখাবার খাইতে খাইতে বলিলেন;—

“মা, নলিনীর সম্বন্ধের কি হইল?”

মাতা। হবে আর কি? ঈশ্বর যা করেন, তাই হইবে।

অক্ষয়। মেলের ঘরে তো ছেলে নাই; অন্যত্র দেখিলে হয় না?

মাতা। আর কোথায় দেখিবি?

অক্ষয়। আচ্ছা, মা, রমেশের সঙ্গে হয় না?

মাতা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন ;—

"অমন ছেলে! কাত্তিকের মত রূপ, লেখা পড়ায় তোরাই তো বলিস্ কত কি পাশ করিয়াছে, ধনে জনে পূর্ণ ঘর। মানুষ তপস্যা করিয়া অমন ছেলে পায় না। কিন্তু——"

অক্ষয়। কি, মা?

মাতা। জানিস্ই তো, রমেশ কুলীন নয়। কুল ছাড়িয়া কেমন করিয়া কাজ হইবে?

অক্ষয়। মা, তোমরা তো দিন কাটাইয়া আসিলে, আমার জন্যই তো কুল?—তা আমি তোমাকে জানাইতেছি, ভঙ্গ হইলে আমার কোন কষ্ট হইবে না। গত বৎসর বাবা বলিয়াছিলেন যে, বর্দ্ধমানে গ্রামে আমাদের এক পাল্‌টী ঘর আছে; সে ঘরে এক বর আছে। শুনিয়াছি, তাহার অবস্থা ভাল নয়, বয়সও বেশী হইয়াছে, ঘরে দুই স্ত্রী। বাবা বোধ হয় সেই চেষ্টায় আছেন?

মাতা। এক দিন আমার কাছেও তাহা বলিয়াছেন।—অভাগিনী কুলীনের ঘরে জন্মিয়াছে, ভাল কপাল কোথা হইতে আসিবে?

অক্ষয়। শুন, মা সেখানে নলির বিবাহ হইতে পারিবে না। কুল যায়, যাইবে; নলি সুখে থাকিবে। রমেশের সঙ্গে কার্য্য করিতে হইবে। অমন সুন্দর ঘর, সুন্দর বর ফেলিয়া দিয়া কেন আমরা কোন্ বন জঙ্গলে ঝগড়া কন্দলের ঘরে অপমূর্খের হাতে তাহাকে অর্পণ করিব?

মাতা পুত্রে আরও অনেক কথা হইল। তাহার পর অক্ষয়চন্দ্র মাতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া নিজের শয়ন ঘরের দিকে গেলেন। বারান্দায় নলিনী ডাকিয়া বলিল—

"দাদা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। দেখ খোকা কেমন সুন্দর হাঁটিতে পারে। হাঁটতো খোকামণি! 'হাঁটি হাঁটি পায় পায়'——"

দু চার পা চলিতেই শ্রীমান্ খোকা "পপাত ধরণীতলে।" অক্ষয়চন্দ্র বলিলেন —

"হাঁ, নলি, খোকা বেশ হাঁটিতে পারে।"

অক্ষয়চন্দ্র দাঁড়াইলেন না। অন্যান্য দিন হাঁটিবার চেষ্টা করিয়া ধূলি বালু সমেত বাবার কোলে উঠিয়া খোকা মুখ চোখ ভরা কত পুরস্কার পায়, আজ আর তাহা পাইল না। নলিনী দেখিল দাদার মুখ যেন কেমন মলিন।

নলিনী তাহার পর খোকাকে লইয়া মাতার ঘরে গেল। মাতা বিষণ্ণ মুখে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। নলিনী কাছে গেলে তাহার অবেণীবদ্ধ কেশরাশি দেখিয়া বলিলেন;—

"নলি, এখনো চুল বাঁধ নাই কেন?"

নলিনী। বৌর অবসর ছিল না, এখন বাঁধিয়া দিবে।

মাতা। বেলা গেল, যাও, মা, চুল বাঁধ গিয়া, খোকা আমার কাছে থাকুক্।

মাতার কণ্ঠস্বর যেন কেমন কাতর; দৃষ্টি যেন কেমন করুণ। নলিনী সে ঘর হইতে বাহির হইয়া কুমুদিনীর ঘরের দিকে চলিল। দরজার কাছে যাইতেই শুনিল, কুমুদিনী বলিতেছেন,—

" —মেল ভঙ্গ সহজ নহে।"

উত্তরে অক্ষয়চন্দ্র বলিলেন,—

"মা স্বীকার হইয়াছেন, এখন রমেশ— —"

শুনিয়া নলিনীর হৃদয়কক্ষে হঠাৎ যেন অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, তাহার বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আর অগ্রসর হইল না। ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর চলিয়া গেল। সূর্য্য অস্ত যাইবার অধিক বিলম্ব নাই। পশ্চিমাকাশে রবিরাগরঞ্জিত মেঘ-মালা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে; কাক, কপোত, চিল—কত পাখী আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে; ঝাঁকে ঝাঁকে কত পাখী কুলায় অন্বেষণে নানা দিকে ছুটিতেছে। নলিনী ছাদের আলিশা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ নেত্রে আকাশের সেই মনোহর শোভার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নব যৌবনোদ্ভিন্ন গৌর মুখমণ্ডল সান্ধ্য রবিকরে স্ফুরদারক্তলাবণ্যময় হইয়া উঠিল।—চাহিয়া রহিল মাত্র, কিন্তু সে শোভা তাহার দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে ছিল না। হৃদয়ে তাহার বিষম তরঙ্গাভিঘাত হইতেছিল। হা ঈশ্বর!

এমন সময় আয়না চিরুণী ফিতা লইয়া কুমুদিনী সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কি ভাবিতেছিস্, ঠাকুরঝি?" অতর্কিত প্রশ্নে নলিনীর মুখ ফুল্লারবিন্দবৎ আকর্ণ রক্তাভ হইয়া উঠিল। কুমুদিনী বলিল;—

"বেলা গেল চুল বাঁধ্‌বি না?"

কুমুদিনী তখন ক্ষিপ্রহস্তে শারদাকাশে সঞ্চরমান নবীন জলদজালবৎ নলিনীর নিবিড় নীল বিপুল কেশরাশি বেণীবদ্ধ করিয়া সুন্দর কবরী রচনা করিয়া দিল। কেশ রচনা শেষ করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে তাহার মুখ পরিমার্জ্জিত করিয়া দিবার জন্য কুমুদিনী ননদকে ফিরাইয়া বসাইয়া দেখিলেন যে, তাহার সুন্দর আয়ত চক্ষু জলভরা পরিনম হইয়াছে। নলিনী চক্ষু মুদ্রিত করিল, কিন্তু দুই বিন্দু অশ্রু তাহার দীর্ঘ সুনীল পক্ষ্মশ্রেণী সংসক্ত হইয়া রহিল।

কুমু। তুই কাঁদিতেছিস্ ভাই!

নলিনী কোন উত্তর করিল না।

কুমু। আমার কাছে গোপন করিতে পারিস্ নাই, আমি সকলই বুঝিয়াছি।—কেন এ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলি? কুলীনের কন্যা তুই, রায়বংশ যে শ্রোত্রিয়!

দরবিগলিত অশ্রুধারা নলিনীর গণ্ড বক্ষ পদপ্রান্ত বিধৌত করিতে লাগিল। অতি ধীরে, অতি আদরে মৃদুহস্তে কুমুদিনী ননদের চক্ষু মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—"ঝাঁপ দিয়াছিস্, বোন্, দেখি আমরা কূল কিনারায় আনিতে পারি কি না।"

সন্ধ্যা বহিয়া যাইবার উপক্রম হইল। আকাশে চাঁদ উঠিল, কত গ্রহ নক্ষত্র উঠিল, শীতল সন্ধ্যাবায়ু ঝুর্ ঝুর করিয়া বহিতে লাগিল। নলিনী কোন কথা বলিল না।

তখন মাতা ডাকিলেন। হাত ধরাধরি করিয়া ননদ আর ভ্রাতৃবধূ ছাদ হইতে নীচে নামিয়া গেলেন।

আশার দাস।

রমেশচন্দ্রের অবস্থা সম্পন্ন। কিন্তু বিধবা মাতা আর পারিয়া উঠেন না, শুধু ধন ধান্য, বিত্তসম্পত্তি থাকিলেই সংসার হয় না; ঘরে দেখিবার, ভোগ করিবার কেহ নাই। কুমুদিনীর বিবাহ দিবার পর হইতে মাতা একাকিনী সংসার চালাইতেছেন; তিনি এখন বৃদ্ধা হইয়াছেন। পুত্র রমেশের বিবাহোচিত বয়স অনেক দিন হইয়াছে। কালেজের পাঠ শেষ না হইলে বিবাহ করিবেন না বলিয়া রমেশ এত দিন মাতাকে বুঝাইয়া রাখিয়াছেন। এখন সে আপত্তির কারণও আর নাই। এখন বিবাহে আর কি আপত্তি হইতে পারে? কিন্তু রমেশ আজ কাল করিয়া বড় বিলম্ব করিতেছেন। আজ মাতা রমেশকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন।

মাতা। আমাকে আর কত দিন আবদ্ধ রাখিবি? পড়া শুনাতো শেষ হইয়াছে, এখন বিবাহ কর্, খালি ঘরে আর তিষ্ঠিতে পারি না।

রমেশ। করিব বৈ কি, এ বৎসরটা থাক্।

মাতা। আজ কয় বৎসর তুই ঐ এক কথা বলিয়া আসিতেছিস্। আমার কি আর কোন সাধ নাই? বৌ আসিবে, ছেলেপিলের কোলাহলে আমার শূন্যগৃহ পূর্ণ হইবে—আমি বাঁচিয়া থাকিতে কি কিছুই হইবে না?

রমেশ। এই তো এই কয়েকটা মাস বৈত নয়?—যাই, একবার একটুকু বাহিরে যাইতে হইবে।

মাতা। ঘটকী ঠাকুরুণকে আবার ভবানীপুর পাঠাইব?

রমেশ। না, মা। তোমাকে সেদিন বলিয়াছি, শীঘ্রই আমি একবার মুঙ্গের যাইব। আমি ফিরিয়া আসিলে যা হয় করিও।

বিবাহের প্রস্তাব উঠিলেই রমেশ কথা কাটাইয়া চলিয়া যায়, মাতা তাহা জানিতেন।

বৈঠকখানায় আসিয়া একটা কাউচের উপর শুইয়া পড়িয়া রমেশচন্দ্র কত কি ভাবিতে লাগিলেন। মানুষ জানে যে, যে জিনিশের জন্য যত আগ্রহ, যত আকাঙ্খা—সে জিনিষ ততই দুর্লভ। তথাপি মানুষ চিরকাল আশার দাস! আকাঙ্খার সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই তো উপভোগ এত মধুর, অতি তৃষ্ণাতেই তো জল এত সুরস! আকাঙ্খা বিড়ম্বনা মাত্র হইতে পারে, কিন্তু এ মর্ত্তভূমিতে আকাঙ্খা দিয়াই তো মানুষের জীবন গঠিত, চিত্রিত, পরিচালিত। নলিনী নভঃসঞ্চারিণী সৌদামিনীবৎ দুষ্প্রাপ্য, দুস্পর্শ হইতে পারে; কিন্তু রমেশচন্দ্র যখন সেই দুষ্প্রাপ্যের আশায় একবার মন বাঁধিয়াছেন তখন শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া সে কথা আর শিথিল করিতে পারিতেছেন না।

এমন সময় হড়করা একখানা চিঠি দিয়া গেল। বৌবাজার হইতে আসিয়াছে, ভগিনী কুমুদিনীর লেখা;—

"দাদা, আজ প্রায় পোনের দিন হইল তুমি আমাদিগকে দেখিতে এস নাই। আজ দশ বার দিন হইল খোকার অসুখ করিয়াছে, কিছুতেই সারিতেছে না। আমি ভারি চিন্তায় পড়িয়াছি। শ্রীযুক্ত শ্বশ্রু ঠাকুরাণী আজ পাঁচ দিন হইল শয্যাগত, তাঁহারও জ্বর। এ দিকে আফিসের

কামাই নাই ; কাজ বড় বেশী পড়িয়াছে। আমি বড় কষ্টে আছি।

ঠাকুর বাড়ীতে নাই, বৰ্দ্ধমান গিয়াছেন। সেখানে নাকি মেলের ঘরে একটী বর আছে। ঠাকুরঝির জন্ম তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন। এদিকে বাড়াতে আর সকলের আর এক মত হইয়াছে'। আজ দশবার দিন হইল আফিস হইতে আসিয়া অনেকক্ষণ মার সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলেন, মেল ছাড়িয়া ভাল বরের সঙ্গে বিবাহ দিতে বলেন। অনেক কথা হয়! ঠাকুরাণীর মত ফিরিয়াছে। এখন ঠাকুর বৰ্দ্ধমানে পাকা কথা না বলিয়া আসিলে হয়। ইঁহারা তোমাকেই বোধ হয় ভাল বর মনে করিয়াছেন। মা আজ কয় বৎসর যাবৎ তোমার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন ; এটা না, ওটা না, এখন না ইত্যাদি বলিয়া তুমি ফাঁকি দিতেছ। যদি এখানে হইবার কথা হয়, তবে তো স্বীকার আছ ? কাল বিকালে অবশ্য আসিও। খোকার চিকিৎসার একটা ভাল ব্যবস্থা করিতে হইবে, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না হইলে কিছু ঠিক করা যাইবে না। শুনিলাম, তুমি নাকি পশ্চিমে মুঙ্গের যাইবে, কেন ?—সেবিকা—কুমুদিনী।”

চিঠি পড়িয়া রমেশচন্দ্র উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া আবার পড়িলেন ; কাউচ পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রকাণ্ড হলের এ পাশ ও পাশ বেড়াইতে বেড়াইতে আবার পড়িলেন। খোকার অসুখ করিয়াছে, বিশেষ চিন্তার বিষয়। কুমুর শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অসুখ করিয়াছে, সেও বড় বিপদ। কিন্তু তা ছাড়া চিঠিতে আরও কথা আছে। ক্ষীণ, অতিক্ষীণ আশার কথা ;—মেল ভঙ্গ! তাহাই যদি হয় তবে কি না হইতে পারে ? বাস্তবিক রূপগুণ বিদ্যা বুদ্ধি বিত্ত সম্পত্তিতে রমেশচন্দ্র যে প্রার্থনীয় বর তাহা তিনি নিজে জানিতেন! কেবল কুলাংশে ন্যুন বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করাইতে সাহস করেন নাই। নতুবা তাঁহার কামনা পূরণ পক্ষে আর কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু সেই এক প্রতিবন্ধকই যে বিষম প্রতিবন্ধক, —কুলপনের দুর্লঙ্ঘ্য। কুলীন কন্যায় শ্রোত্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা!

পরদিন বিকাল বেলায় রমেশচন্দ্র ভগিনীর বাড়ীতে গেলেন। ভাগিনেয়ের জ্বর তেমন প্রবল নহে, সামান্য জ্বর, কিন্তু তাহা ভাল করিয়া ছাড়ে না। তাহার শরীর বড় কৃশ হইয়া পড়িয়াছিল। সে "হাটি হাটি" নাই, সে মধুর হাসির উৎস যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভগিনীপতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহার চিকিৎসার নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। কুমুর শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পুরাতন পীড়া। তিনি বয়সে নিতান্ত প্রাচীনা না হইলেও রোগ শোক চিন্তা দুঃখে তাঁহার শরীর অকালপক্ক, রুগ্ন হইয়াছে। দেশীয় ভাল কবিরাজ দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার কথা হইল। ভগিনীপতির সহিত আরও অনেক কথা হইল।

অক্ষয়। আমি একা পড়িয়াছি, বাবা বাড়ীতে নাই ; আফিসেও ছুটি নাই।

রমেশ। তিনি —

অক্ষয়। বৰ্দ্ধমান গিয়াছেন। নলিনীর বিবাহ এখন না দিলেই নয়। আমরা কুলীন বলিয়া এতদিন সহিয়াছে, কিন্তু আর গৌণ করা উচিত নয়।—কেমন তুমি কি মনে কর ?

রমেশ। এখন তো হওয়াই উচিত।

অক্ষয়। আমাদের নানা বিপদ। মেল বাঁধা ঘর, ভাল বর পাওয়া বড় কঠিন। এক ঘরে দশ বৎসরের এক ছেলে আছে, আর আছে দুইটী বৃদ্ধ!

রমেশ কোন উত্তর করিলেন না, চাহিয়া রহিলেন।

অক্ষয়। বৰ্দ্ধমানে নাকি আর একটী বর আছে ; বয়স চল্লিশ হইবে ; তাঁহার দুই বিবাহ, দুই স্ত্রীই বৰ্ত্তমান। আমাদের পাল্টী আর ঘর নাই। বাবা এই বরের অনুসন্ধানে গিয়াছেন।

রমেশ। কবে ফিরিবেন ?

অক্ষয়। এ বরের সঙ্গে কার্য্য করিবার ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই ; মাও সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মেল ছাড়িয়া দিয়া সুপাত্রে নলিনীর সম্বন্ধ করিবার চেষ্টা করিব।

রমেশ। তোমার পিতা ঠাকুর সম্মত হইবেন ?

অক্ষয়। সম্মত করাইতে হইবে। সহজে যে সম্মত হইবেন, সে ভরসা কম। তবে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব, শ্রোত্রিয়ের মধ্যে সৎপাত্র পাওয়া যাইতে পারে।

রমেশ। মেল ছাড়িয়া ভগিনীর বিবাহ দিলে অনেক ভাল বর পাওয়া যাইবে।

অক্ষয়। শোন——থাক্। তুমি শীঘ্রই মুঙ্গের যাইবে ?

রমেশ। আগামী শনিবার যাইব মনে করিয়াছি।

অক্ষয়। এখন কেন যাইবে ? তোমার সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ আবশ্যক হইতে পারে।

রমেশ। আবশ্যক হয় আমাকে চিঠি লিখিও, আসিব।

অক্ষয়চন্দ্র আর অগ্রসর হইলেন না। বাড়ীর কর্ত্তা তিনি নহেন, ভবিষ্যতের স্থিরতা নাই, আত্মীয়ের সঙ্গে কথা, অধিক কিছু বলা শ্রেয় জ্ঞান করিলেন না। কিন্তু উভয়ে উভয়ের মনোগত ভাব বুঝিলেন।

বাড়ীর ভিতর কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মুঙ্গের কি নিশ্চয় যাইবে দাদা ? কেন যাইতেছ ?"

রমেশ। মনটা ভাল না, কয়েকটা দিন বেড়াইয়া আসিব ?

কুমু। কোন কথা বার্ত্তা হইল ?

রমেশ। তোমার শ্বশুর ঠাকুর ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আমার কলিকাতায় থাকা যেন অক্ষয়ের ইচ্ছা।

কুমুদিনী দাদার মুখের দিকে কিছু কাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তবে যাইতেছ কেন ? থাকিয়া যাওনা কেন ?"

রমেশ। না, যাইব। খোকা কেমন থাকে আমার কাছে লিখিস্। সর্ব্বদা চিঠি লিখিস্।

তারপর শনিবার দিন রমেশচন্দ্র মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। সময় কাটাইবার জন্য সঙ্গে কতকগুলি ইংরেজি পুস্তক আর বঙ্কিম বাবুর অনেকগুলি উপন্যাস সঙ্গে লইলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি ৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

২য় প্রবন্ধ।

(২০১ পৃষ্ঠার পর)

মহারাজা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বৈঠকখানার দ্বার রুদ্ধ করত স্বহস্তে দর্পণ সমক্ষে বিরল শ্মশ্রুর ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিতেন। পরে গায়ে জামা ও মাথায় টুপি দিয়া উড়ানী স্কন্ধে ফেলিয়া একটী শুভ্রাস্তরন সুকোমল সুখচিত শয্যার উপরে উপাধানপার্শ্বে উপবেশন করিতেন। তিনি চেয়ারে বসিতে ভাল বাসিতেন না,—তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে একটীও চেয়ার ছিল না। এই সময়ে ডাক্তার বাবু আসিয়া স্বহস্তে ঔষধ খাওয়াইয়া যাইতেন। যেদিন মহারাজের বিশেষ কোন অসুখ না থাকিত, সে দিনও ডাক্তার বাবুকে সালসা বা তদ্রূপ কোন পোষ্টাই ঔষধ খাওয়াইতে হইত। ফলতঃ ঔষধ খাওয়াটা দৈনিক আহারের অন্তর্গত ছিল। অতঃপর মহারাজ অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন। সেখান হইতে সদরে ফিরিয়া আসিলে পেস্কার প্রভৃতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারী (Personal Staff) তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। যে সকল কর্ম্মচারী জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁহারা অঞ্জলিপুটে যজ্ঞোপবীত লইয়া প্রত্যহ এই প্রথম রাজদর্শনের সময়ে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। তিনিও প্রত্যেককে যোড়করে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেন। ব্রাহ্মণেতর কর্ম্মচারীরা মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেন। আশীর্ব্বাদ বা প্রণাম করিয়া রাজসন্নিধান হইতে চলিয়া আসিবার সময়ে সকলকেই পশ্চাৎ পদে হাঁটিয়া আসিতে হইত। এই সময়ে পেস্কার জরুরী কাগজ পত্রে মহারাজের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া বিদায় হইতেন। মহারাজ তখন হয় কোন নূতন ফটো তুলিবার জন্য ষ্টুডিও গৃহে প্রবেশ করিতেন বা কোন অয়েল পেইণ্টিং লইয়া বসিতেন। কোন বিবসনা রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিলে, দুচারিটি বিশিষ্ট লোক ভিন্ন অন্য লোকের গৃহ প্রবেশ নিষিদ্ধ হইত, দরবারের ভাষায় বলা হইত—"সাক্ষাৎ মানার ছবিতে আছেন" অর্থাৎ নিষিদ্ধ ছবি লইয়া আছেন।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে মহারাজের সম্মুখীন হইয়া কোন কথা তাঁহাকে বলিতে হইলে, মহারাজ বা ধর্ম্মাবতার শব্দ ব্যবহার করিয়া ব্যাকরণের প্রথম পুরুষ দ্বারা কাজ সারিতে হইত, যথা—"হুকুম দিতে মহারাজের মরজি হৌক" (Be it the pleasure of your Highness to pass an order in this matter ;) 'আপনি' বা 'মহাশয়' শব্দের ব্যবহার রীতিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু পরোক্ষে মহারাজ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে 'সাক্ষাৎ' শব্দই প্রায় ব্যবহৃত হইত, কদাচিৎ 'মহারাজ' শব্দও প্রযুক্ত হইত, যথা মহারাজ আহার করিতে বসিলে বলা হইত "সাক্ষাৎ গাতিতে আছেন' বা "সাক্ষাতের গাতি লাগিয়াছে"। ("আহার" বা 'খাওয়া' শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'গাতি' শব্দটিই এস্থলে প্রযুক্ত হইত।) উক্ত সাক্ষাৎ শব্দটী ইংরাজী His Highness শব্দের সমর্থক। প্রসিদ্ধ ইংরাজী ভাষাবিৎ মৃত ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যিনি কয়েক বৎসর মহারাজের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন) স্বীয় পুস্তকে এই শব্দটীকে 'His Presence' দ্বারা অনুবাদ করিয়াছেন।

বেলা বারটা একটার সময়ে মহারাজ, স্নানাহারের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন। আহারান্তে নিদ্রার পরে ৪টা ৪।০ টার সময়ে উঠিয়া সদরে আসিতেন। এই সময়ে ডাক্তার বাবুকে হাজির থাকিয়া প্রাতঃকালের ন্যায় মহারাজের শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিতে ও ঔষধ সেবন করাইতে হইত।

অতঃপর প্রদীপালোকের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত রাজ-দরবার আরম্ভ হইত। পেষকার বা হেড্ ক্লার্ক সমস্ত দিনের চিঠি ও দরখাস্তগুলি পড়িয়া শুনাইতেন, বৈষয়িক কাগজপত্র দেখাইতেন, এবং আবশ্যক মত কোন কোন কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা বা অনুমতি প্রার্থনা করিয়া লইতেন। ইহা বড় দুঃখের বিষয় যে মহারাজ ডাকের চিঠিগুলিও নিজে পড়িতেন না। যদি তিনি রাজ্য শাসন সংক্রান্ত অন্য যাবতীয় বিষয়ে উদাসীন থাকিয়াও কেবল দৈনিক চিঠি ও অভিযোগ-পত্রগুলি স্বয়ং আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন, তবে বোধ হয় রাজ্যের অর্দ্ধেক গলদ, প্রজার বার আনা অশান্তি এবং নিজের ষোল আনা দুর্নাম অপসারিত হইত।

ভারতের অনেক রাজা মহারাজা এইরূপ ক্ষণিক 'আয়েস্' সম্ভোগের লোভে প্রাইভেট্ সেক্রেটারির মুখে ভক্ষ্য আস্বাদন করিতে যাইয়া আপনাদের জীবন বিস্বাদ ও পরিণাম তিক্ত করিয়া থাকেন। মহারাজের হৃদয় দয়ার নবনীত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল ; তাঁহার অমনা সুলভ তীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধি ছিল ; অসাধারণ লোকচরিত্র-পরিজ্ঞান-শক্তি ছিল ; একটী অপরিচিত লোকের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার-সময়েই এমন ভাবে তাঁহার আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিতেন যে, বোধ হইত যেন রঞ্জেনের আলো অপেক্ষাও তাঁহার দৃষ্টি অধিকতর গূঢ়দর্শী ও মর্ম্মস্পর্শী ; তাঁহার ক্রোধ উদ্বেলিত হইলে

কর্ম্মচারিগণের হৃদয়ে খণ্ডপ্রলয়ের আতঙ্ক উপস্থিত হইত, পানাসক্ত বা দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি রাজৈশ্বর্য্য-সুলভ অনেক ব্যসন হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন, সর্ব্বোপরি তিনি অনলস, অধ্যবসায়ী ও চতুরস্র শিরস্ক ছিলেন,—এত গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে রাজ্যশাসন ও মন্ত্রি পরিবর্ত্তন ঘটিত অনেক অখ্যাতির ভাগি হইতে হইয়াছিল; তাহার প্রধান কারণ—কর্ম্মচারিদের উপরে অতিরিক্ত বিশ্বাস-স্থাপন ও লোকের 'মন্ত্রি'র ভয়ে অতিরিক্ত চক্ষুলজ্জা পোষণ।

তারপরে ফটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি (যথা প্লেট বা ফটো ডিভেলাপ্ করা ইত্যাদি) হইত; বিলাত ও এমেরিকা হইতে আগত ফটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় পত্রিকাগুলির প্রয়োজনীয় প্রবন্ধের মর্ম্মগুলি তাঁহাকে শুনাইতে হইত। এইরূপে রাত্রি প্রায় ১২।১টা বাজিলে তিনি অন্দরে প্রবেশ করিয়া আহারান্তে শয়ন করিতেন। পর দিন প্রাতে ৮।৯ টার সময়ে শয্যা পরিত্যাগ করিতেন।

তিনি খুব পরিহাস রসিক ছিলেন, এবং রহস্য পটু লোকের সমুচিত আদর করিতে জানিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অট্টহাস্য বিগলিত আত্ম সম্মান রমণাক্ষম লঘুপ্রকৃতি বাচাল ছিলেন না। যে যদু ভট্টাচার্য্যের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, বাগ্‌বৈদগ্ধি তাহার অন্যতর গুণ ছিল। এক সময়ে নদীয়ার রাজসভা যেমন গোপাল ভাঁড়ের শ্লেষোক্তি দ্বারা নিয়ত হাস্যধ্বনিমুখরিত ছিল, সেইরূপ এক সময়ে আগরতলার রাজসভা যদুর কৌতুকগন্ধ বচন-বিন্যাস দ্বারা কল হাস্য প্রতিধ্বনিত ছিল। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান সময়ের ইংরেজী শিক্ষা-প্রাপ্ত রাজাদিগের প্রাসাদে যত গম্ভীর-বদন প্রাচীন পেচক আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের কথাবার্ত্তা শ্মশান ঘাটের বংশচ্ছিদ্র-সমুত্থিত ধ্বনির ন্যায় একান্ত চিত্তাবসাদজনক ও ভয়ঙ্কর।

একবার একটী গৃহ মহারাজের কয়েকটী কুমারের লেখা পড়ার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার কয়েকটী নূতন আনীত কুকুরের উপযুক্ত বাসস্থান খুঁজিয়া না পাইয়া পাঠগৃহই কুকুরগুলির আবাসগৃহরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। অনেক দিন চলিয়া গেল, কিন্তু কুকুরগুলি স্থানান্তরিত হইল না, এবং কুমারগণের লেখা পড়াও আরম্ভ হইতে পারিল না। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের জননীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু কুকুরগুলি মহারাজের অতি প্রিয় বলিয়া কেহ তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে তাঁহার কথাটা যদুর কাণে পৌঁছাইয়া এই নির্লজ্জ আগন্তুক অতিথিদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন। যদু শুনিয়া বলিল, "সে তো সহজ কাজ, এখনি আমি সাক্ষাতের কাছে যাচ্ছি।" তখন সে মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার বড় দুঃখের বিষয় যে ঘরটা উ-কারেই গেল।" মহারাজ জানিতেন যে মুগ্ধবোধকার বোপদেব স্বয়ং নিজ গ্রন্থের টীকা না করিয়া গেলে যেমন সেই হ-য ব-র-ল কাহারো বুঝিবার সাধ্য ছিল না, তেমনি যদুর সংক্ষিপ্ত বাক্যের ভাষ্যও সে নিজে না করিলে তাহা অপরের বুঝিবার যো ছিল না; সুতরাং তিনি কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কেমন যদু?" যদু বলিল, "মহারাজ ঘরটা তৈয়ার হয়েছিল কর্ত্তাদের জন্য, এখন লেগে গেছে কুত্তাদের কাজে।" মহারাজ একটু হাসিয়া কুকুর রাখিবার জন্য সেই মুহূর্ত্তে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিবার হুকুম দিলেন।

যদুর এই পরিহাস-রসিকতা সম্বন্ধে আরো অনেক গল্প জানা আছে, প্রবন্ধের কলেবর সংযত রাখিবার অভিপ্রায়ে তৎসম্বন্ধের উল্লেখ না করিয়া এখন বিষয়ান্তরে আসা যাক।

মহারাজের চক্ষুলজ্জা এত বেশী ছিল যে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে স্বাধিকারচ্যুত হইয়া চিত্তদৌর্ব্বল্যের সীমায় গিয়া পড়িয়াছিল। সহস্র ত্রুটি থাকিলেও তিনি কোন ব্যক্তির রোটিকা বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইতেন না। কোন পদস্থ কর্ম্মচারীর ঈর্ষা বা বিরাগোৎপাদন আশঙ্কায় অন্তঃপুর হইতে টাকা আনাইয়া গোপনে অধস্তন প্রিয় কর্ম্মচারীকে দান করিতেন। তাঁহার এই সর্ব্বনেশে চক্ষুলজ্জার বিষময় ফলে রাজদরবারে সময়ে সময়ে এমন সব জটিল ষড়যন্ত্রজাল বিস্তারিত হইত যে, তাহাতে পড়িয়া অনেক নিরাশ্রয় নির্দ্দোষ লোক বিপন্ন ও মরণাপন্ন হইত। অথচ মহারাজ ইচ্ছা করিলেই সেই কুচক্রজাল একটি ভ্রুকুটী-ফুৎকারে উর্ণনাভের জালের ন্যায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন।

স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্যে অনেক 'ওৎপা' (treacherous soil) দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের উপরিভাগ শুষ্ক মৃত্তিকা ও তৃণ গুল্মাদি দ্বারা আচ্ছাদিত, কিন্তু উহার অনতি নিম্নে কেবল নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ গলিত কর্দ্দম। সেই সকল স্থানের উপর দিয়া চলিতে গিয়া অনেক সময়ে হাতী ঘোড়া, এমন কি মানুষও সহসা আকণ্ঠ কর্দ্দম প্রোথিত হইয়া বিপদগ্রস্ত হয়, পূর্ব্ব প্যারায় উল্লিখিত ষড়যন্ত্রকে এই ওৎপার সহিত তুলনা করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়। এই রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ওৎপায় পড়িয়া অনেক ছোট বড় অশ্ব গজ জানোয়ারকে হাবুডুবু খাইতে নিজ চক্ষে দেখিয়াছি।

প্রাচ্য নরপতিদিগের অন্যতর লক্ষণ, তাঁহাদের বহু পত্নী; মহারাজ এই উপসর্গ হইতে মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি বহু বিবাহকে দূষণীয় মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। এক দিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আমাদের বহু বিবাহের প্রথাটা হয়ত তোমাদের চোখে কেমন কেমন ঠেকে। কিন্তু সাধারণ লোক ও আমাদের মত লোকের পক্ষে এক ব্যবস্থা খাটে না। তোমাদের দেশের এমন দুটী চুই রাজার কথা জানি, যাহারা প্রকাশ্যে একপত্নীক বলিয়া সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া গোপনে ইয়োরোপীয় মহিলার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন। শেষে সেই সন্তান তাঁহাদের সমগ্র বা অর্দ্ধেক রাজ্য লইয়া টানাটানি করিলে সন্তান-জননীকে প্রচুর অর্থ দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া আপনাদের রাজ্য ও একপত্নীকত্ব-খ্যাতি অক্ষত রাখিতে হইয়াছিল।

মহারাজের অন্তঃপুরে নানা বয়সের প্রায় দেড় শত রমণী ছিল। কোন দরিদ্র প্রজার গৃহে একটী সুন্দরী কন্যা জন্মিলে অনেক সময়ে প্রজা স্বতঃ সেই কন্যারত্নটী মহারাজকে উপহার দিয়া নিজের ও অধস্তন তিন চারি পুরুষের জীবিকাসংস্থানের চেষ্টা করিত। কোন বালিকার সৌন্দর্য্যখ্যাতি মহারাজের চিত্তাকর্ষণ করিলে তাহার পিতামাতাকে অর্থ বিনিময়ে সম্মত করিয়া সেই বালিকাকে রাজান্তঃপুরে আনয়নের বন্দোবস্ত করা হইত। তাহারা তাহাতে অসম্মত হইলে সেই পরিবারভুক্ত সকলকে রাজাজ্ঞা দ্বারা সমাজচ্যুত করা হইত; (আগরতলার ভাষায় ইহাকে 'কদ্বা' দেওয়া বলে; কদ্বা দেওয়া হইলে মহারাজের কোন প্রজা ঐ পরিবারের সহিত বিবাহ বা আহার বিহার করিতে পারিত না)। ইহা ছাড়া, কোন প্রজার পত্নী মুখরা ও দুশ্চরিত্রা হইলে, ক্রয় মূল্যে (অর্থাৎ বিবাহকালে স্বামীকে ঐ স্ত্রীর কল্যাণে যে অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, সেই অর্থের বিনিময়ে) তাহাকে রাজপুরীর কোন মহলার কাছে বিক্রী করিয়া দণ্ড বিধান করিত; বলা বাহুল্য এ জন্মে সেই রমণীর আর অন্দর-প্রাচীরের বাহিরে আসিবার বা দ্বিতীয় পুরুষের মুখ দেখিবার উপায় থাকিত না। রাজপত্নী বা কুমারাগণ অনেক সময়ে কোন দরিদ্র প্রজাকে টাকা ধার দিয়া প্রতিভূ স্বরূপ তাহার স্ত্রীকে অন্তঃপুরে রাখিয়া দিতেন। এইরূপেই অন্তঃপুরে এত অধিক সংখ্যক রমণীর সমাগম হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজের রাণী তিন জন মাত্র ছিল। বর্ত্তমান বড় ঠাকুর বড়রাণী ভানুমতী দেবীর এবং বর্ত্তমান মহারাজ দ্বিতীয়া রাণী রাজেশ্বরী দেবীর গর্ভের সন্তান। এই দুই রাণীর মৃত্যুর পরে তিনি প্রৌঢ় বয়সে মনোমোহিনী দেবী নাম্নী এক মণিপুরী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এই প্রখর বুদ্ধিশালিনী রমণী মহারাজের অন্তিম জীবনটিকে মোমের পুতলীর ন্যায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়াছিলেন। ফলতঃ সেই সিংহোপম স্বামীকে এমন বশীভূত করিতে প্রথমা দুই রাণী সমর্থ হন নাই। মহারাজের নামের সহিত ইঁহার নাম স্বাধীন ত্রিপুরার মুদ্রায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ইনি এখনো

জীবিত আছেন, এবং আপনার সুরম্যপুরী হইতে তাড়িত হইয়া বড় ঠাকুরের পুরীতে আশ্রয় নিয়া "রাণীর মা টুনীর" ন্যায় হতশ্রী অবস্থায় নিজের ছয়টী কন্যা ও একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথকে লইয়া অতীত জীবনের বিষাদ-মধুর রোমন্থন দ্বারা দিন যাপন করিতেছেন।

মহিষীদের সাধারণ উপাধি—মাতা ঈশ্বরী, মহারাণী ও মহাদেবী। ত্রিপুরা ভাষায় রাণীকে বলা হয়—মতাই বুরুই=রমণী কুলে দেবতা। এইরূপ মহারাজকে বলা হয়—মাইছুলি থক্=ধানের গোলা; সময়ে সময়ে মহারাজকে "মতাই ছেলম্"ও বলা হয়; উহার অর্থ—পুরুষ কুলে দেবতা; অন্তঃপুরের অপরা মহিলাদের সাধারণ সংজ্ঞা সেবাইত্তা (অর্থাৎ সেবিকা।) যদি কখন কোন সেবিকা স্বীয় বশীকরণ গুণে মহারাজের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিতেন বা তাঁহাদের সন্তানের জননী হইতে পারিতেন, তবে তাঁহার কাণে মন্ত্র দিয়া তাঁহাকে 'কাছুয়া রাণীর' পদে উন্নীত করা হইত; কিন্তু এইরূপ প্রমোশন পাইয়া পাটরাণী হইবার অর্থাৎ মাত'-ঈশ্বরী উপাধি পাইবার অধিকার কাহারো ছিল না। কোন অপ্রাপ্তযৌবনা বালিকাকে তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে আনিয়া সম্প্রদান মন্ত্র পাঠ প্রভৃতি সবিস্তার ক্রিয়াকলাপের সহিত বিবাহ করিলে তবে তিনি পাট-রাণী হইতে পারিতেন। পাট রাণী ও কাছুয়া রাণীর এবং তাঁহাদের সন্তানের সম্মান ও অধিকার তুল্য নহে। পাট রাণীর পুত্রের সম্মুখে কাছুয়া রাণীর পুত্রেরা উপবেশন করিতে পারেন না। পাটরাণী ও তাঁহার পুত্র প্রচলিত হিন্দু-প্রথার বিরুদ্ধে কটিদেশের নিম্নেও স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিতে পারেন; কাছুয়া রাণী বা তাঁহার পুত্র তাহা পারে না। এমন কি মহারাজের কোন কুমারী বা যুবরাজ ও বড় ঠাকুরের পত্নীও পারেন না।

পক্ষান্তরে পাটরাণীর দায়িত্বও অনেক বেশী। মহারাজের মৃত্যুর পরে তাঁহাকে এ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে হয়। তণ্ডুলান্নের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে কাওনের চাউলের ভাত খাইতে হয়, মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজন করিতে হয়. তৈল ব্যবহার ও অলঙ্কার-পরিধান পরিত্যাগ করিতে হয়, সাধারণ মাদুর বা পাটিতে শয়ন না করিয়া হস্তি-দন্ত-নির্ম্মিত পাটীতে শয়ন করিতে হয়। এবং অন্য কোন পাদুকা ব্যবহার না করিয়া হস্তি-দন্ত-নির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু কাছুয়া রাণীদিগকে কেবল এক বৎসর হবিষ্যান্ন আহার করিতে হয়; ঐ কালের পরে তাঁহারা আমিষ ভোজন ও দিনে দুই তিনবার আহার করিতে পারেন; কিন্তু জীবনে আর গহনা পরিতে পারেন না।

বহু বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফলে মহারাজ বীরচন্দ্রের জীবন-সায়াহ্ন বিষাদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। বর্ত্তমান মহারাজের সহিত তাঁহার পিতার মনোমালিন্যের কথা এ অঞ্চলের লোকের কাছে একটী সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত গোপনীয় সত্য। এ বিষয়ে পুত্রের স্বার্থত্যাগ ও সহিষ্ণুতা রাজস্থানের সেই চণ্ডের অপূর্ব্ব কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়।

সাধারণ হিন্দু পরিবারে যে সুমধুর প্রীতি অসঙ্কোচ ব্যবধান-হীনতা ও ওতপ্রোত সংমিশ্রনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, বহু বিবাহের ফলে রাজপরিবারের মধ্যে তাহা উপযুক্ত পরিমাণে ছিল না বলিয়া বোধ হয়। পুত্র পিতাকে "বাবা মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন—এখানেও যেন রাজা প্রজা সম্বন্ধটী অটুট থাকা চাই। অন্তঃপুরের পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে মুসলমান বাদশাহগণ যেরূপ সোয়েস সন্দিগ্ধ ও সশঙ্ক জীবন যাপন করিতেন এবং সেখানে যেমন খোজা ভিন্ন অপর পুরুষের অন্তপুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, এখানেও তাহাই পরিলক্ষিত হইত। অপর পুরুষের দূরে থাকুক স্বয়ং যুবরাজ এবং বড়-ঠাকুরও মহারাজের অন্দরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটীর মধ্যবর্ত্তী একটী নির্দ্দিষ্ট গৃহে জামাতৃগণ কুমারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। (এস্থলে বলিয়া রাখি, জামাতাদিগকে কুমারীদিগের কাছে নগ্নপদে যাইতে হইত; আপনাদের ইচ্ছামত যখন তখন যাইতে পারিতেন না, আহূত হইয়া যাইতে হইত; কুমারীদিগকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতে হইত, তাঁহারা কিন্তু স্বামীদিগকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বিবাহসময়ে কদলী বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণের বেলা সাধারণ হিন্দু প্রথার বিরুদ্ধে কন্যার পশ্চাতে বরকে ঘুরিতে হইত।) কয়েকটী প্রাচীন বয়স্ক মুসলমান অন্তঃপুরে প্রহরীর কার্য্য করিত। ঝুলন রাস প্রভৃতি পর্ব্বে যখন পুরমহিলারা নৃত্য গীতাদি করিতেন, তখন একটী অন্ধ বৃদ্ধ বাদকের কার্য্য করিত।

এই পরলোকগত নৃপতির জীবনী হইতে এইটী শিক্ষা পাওয়া যায় যে, চেষ্টা করিলে এবং সময়ের মূল্য জানা থাকিলে বিলাসরাশিতে পরিবৃত থাকিয়াও অনেক বিষয় শিক্ষা করা যাইতে পারে। বিবিধ সুকুমার বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত, ইংরাজী, মণিপুরী, টিপ্রা, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, ও ব্রজবুলী—ন্যূনাধিক পরিমাণে শিখিয়াছিলেন। তিনি বৃথা গালগল্প ও দাবা তাস পাশায় সময় নষ্ট করা ভাল মনে করিতেন না। নিজে বলিয়াছিলেন, "যদিও আমি তাস পাশা প্রভৃতি খেলা অনেকের চেয়ে ভাল জানি, তথাপি ঐ সকল খেলার প্রতি আমার কোন দিনই স্পৃহা নাই। খবরের কাগজের সংবাদ শীর্ষক স্তম্ভে যে সকল সংবাদ থাকে, সে সকল পড়িয়া সময় নষ্ট করা আমি পছন্দ করি না। চিৎপুরের বারান্দা হইতে পড়িয়া একটী শিশু মারা পড়িয়াছে, কোন অভিমানিনী অহিফেন খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, একটী নবপ্রসূত গোবৎসের তিনটী চক্ষু হইয়াছে, কোন শাশুড়ী তাঁহার প্রগল্‌ভা পুত্রবধূর নাসিকাচ্ছেদন করিয়া দিয়াছেন,—এ সকল পড়িয়া একটা অলস উদ্দেশ্যহীন কৌতূহল চরিতার্থ করা হয় মাত্র, বাস্তবিক কোন জ্ঞানলাভ হয় না। ঐরূপ আজগবি নূতন কথা চিরদিনই সংবাদ পত্রে আছে, এবং চিরদিনই থাকিবে।"

ফলতঃ যে দেশের অতি দরিদ্র ব্যক্তিরও একটু আতর, এক পেয়ালা মদ ও একটি বন্দুক না হইলে দিন কাটিতে চায় না, যে দেশের লোক দাবার ব'ড়ে টীপিয়া, হরিণ শিকার করিয়া. বাঁশী বাজাইয়া, কোন মতে দিন গুজরাণ করিতে পারিলে জীবনে আর কিছু লোভনীয় বা লভনীয় রহিল বলিয়া মনে করে না, যে দেশের লোক স্বদেশের কাণাকড়িকে বিদেশের সোণার মোহর অপেক্ষা মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, যেখানকার "লাইছাবী" নাম্নী মণিপুরী অবিবাহিতা যুবতীদের রূপ-জ্যোতিঃ দেখিলে মশারীতে আগুন লাগিবার আশঙ্কা মনে উদিত হয়, যেখানে স্বর্ণগর্ভা প্রকৃতি যৎসামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে তাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্য কৃষকের করে ঢালিয়া দেন, যেখানে রমণীদের—

"দাঁতে মিশি মুখে হাসি, কেশেতে কুসুমরাশি,
শ্রবণে শিরীষ পুষ্প চাঁপা মাপেখর,
"কাতুই-চুত্তুই' মুখে, স্বখচিত 'রিয়' বুকে,
চপলা চমকে চোখে বসনে আতর,"

যেখানে পুরুষেরা—

"আরাম সৌন্দর্য্য পেলে, মণিরত্ন পায়ে ঠেলে,
বড় লাট ছোট লাট বুঝিতে না চায়,
পলিটীক্স ডিপ্লোমেছি, না বুঝে ও কেচিমেচি,
তাওা বাঁশী রাঙা বৌ যদি ঘরে পায়,"

সেই দেশে—সেই বিলাস-সৌন্দর্য্যের রম্য নিকেতন স্বাধীন-ত্রিপুরার—মহারাজের কর্ম্মঠ বিবিধ গুণমণ্ডিত জীবন সর্ব্বশ্রেণীর সকল লোকের, বিশেষতঃ তাঁহারই মত অবসর ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ধনীদিগের সর্ব্বদা আলোচ্য।

(সমাপ্ত)

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।



কর্ণ-কুন্তী সংবাদ।

KUNTALINE PRESS.

কর্ণকুন্তী সংবাদ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌কালে, কুন্তী দেবী জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণকে দুর্য্যোধনপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবের পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পুত্রকে পুত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দেখিলে মাতার মনে ক্লেশ হইবারই কথা, এবং তদ্রূপ শোচনীয় ঘটনা নিবারণে যত্নবতী হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং এরূপ দৃশ্য সহজেই দর্শকের সহানুভূতিকে আকর্ষণ করে।

মাতৃস্নেহের আস্বাদন কর্ণের ভাগ্যে ঘটে নাই। জন্মমাত্রই মাতৃক্রোড়চ্যুত হইয়া, হীন লোকের গৃহে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন, সেই হীনলোককেই পিতৃ সম্বোধন করিয়া আসিয়াছেন। কর্ণ অধিরথ নামক রথচালকের পুত্র, একথাই সকলে শুনিয়াছে; পাণ্ডবগণ যে তাঁহার ভ্রাতা তাহা কেহই জানে না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে কর্ণের ক্ষত্রোচিত গুণ সকল বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভ্রাতৃত্বসূত্রে ভ্রাতাদিগের সহিত তাঁহার কোনরূপ পরিচয়ই হয় নাই। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে সূতপুত্র বলিয়া জানিয়াছেন, এবং তদুচিত অবজ্ঞাই তাঁহার প্রতি দেখাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূত্রেও পরস্পরের মধ্যে গুরুতর মনোমালিন্য ঘটিবার অনেক কারণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে দুর্য্যোধনের ব্যবহার বিশেষ প্রীতিকর। দুর্য্যোধন তাঁহার গুণের আদর করিয়াছেন, সখ্যদানে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন, রাজপদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

অভিমানী, দৃঢ়মন্যু, মহাশয়, মহাবীর কর্ণ যে ইহাতে পাণ্ডবের চিরশত্রু এবং দুর্য্যোধনের চিরবন্ধু হইবেন, তাহা বিচিত্র কি? এ সকল কথার কিছুই কুন্তীর নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না! কিন্তু রক্তের বন্ধন অন্য সকল বন্ধন অপেক্ষা দৃঢ়তর; সুতরাং তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, মাতা ও ভ্রাতাকে একবার চিনিতে পারিলে হয়ত কর্ণের হৃদয় বিগলিত হইবে।

এইরূপ আশা হৃদয়ে লইয়া কুন্তী যমুনাতীরে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। কর্ণ তখন স্নান সমাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া উর্দ্ধস্বরে বেদ পাঠ করিতেছেন, পশ্চিমদিক হইতে আগতা কুন্তীকে তিনি দেখিতে পান নাই। কুন্তীও পুত্রকে তদ্রূপ নিযুক্ত দেখিয়া সূর্য্যাতপ নিবারণার্থ তাঁহারই ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক বেদপাঠ সমাপনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুক্ত শশীকুমার হেশ মহাশয়ের চিত্রে এই অবস্থাটিই অঙ্কিত হইয়াছে। কর্ণের মুখশ্রীতে মহত্ত্ব ও তেজস্বীতা সুন্দররূপে পরিস্ফুট দেখাযায়। এই দীর্ঘকায়, মহাবাহু, সিংহগ্রীব, তীক্ষ্ণ-লোচন পুরুষের সহিত শত্রুতা করিতে সহজে কেহ প্রস্তুত হইবে না।

এহেন পুত্রকে অনিমেষে নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ জননীর নেত্র শীতল, মুখ উৎফুল্ল, এবং হৃদয় স্নেহরসে আপ্লুত না হয়?

ইহাই শেষ নিরীক্ষণ। যতক্ষণ না সূর্য্যদেব পশ্চিমগামী হইতেছেন, ততক্ষণ কর্ণের ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সেই পর্য্যন্ত দেখিয়া লইবার অবসর আছে—আর ততক্ষণ মাত্রই জননীর হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশা পোষণ করিবার সময় আছে। এ আশা সফল হয় নাই, ইহাই ক্ষোভের বিষয়।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়।

সরমার সুখ।

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত।

ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গার্হস্থ্য উপন্যাস। আমরা বঙ্গের ললনাবর্গের পক্ষে এই আখ্যায়িকাখানি বিশেষরূপ হিতকর ও উপযোগী মনে করি।

আধুনিক বাঙলা উপন্যাসগুলির মধ্যে মধ্যে কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা কিংবা ভাষার স্ফূর্ত্তি দুষ্প্রাপ্য নহে, কিন্তু ঘটনা ও অবস্থার কৌশলপূর্ণ সমাবেশ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। এই হিসাবে বিলাতের একখানি পেনি মূল্যের বিলিংস্‌গেট উপন্যাসও বাঙ্গলা অনেক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অপেক্ষা প্রশংসার্হ।

'সরমার সুখে' ঘটনার সন্নিবেশনৈপুণ্য বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সরমা প্রথমতঃ দাদার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে সম্মত হয় নাই; কিন্তু অবস্থাগুলিকে এমন স্বাভাবিক ভাবে পরিণত করা হইয়াছে যে, শেষে এই লাজশীলা সুকুমারী ললনাকে আমরা এক দুশ্চরিত্রা রমণীর সঙ্গে গৃহের বাহিরে সুদূর পথে যাইতে দেখিয়াও আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। চন্দ্ররশ্মিপাতে যেরূপ গৃহকোণের ক্ষুদ্র পুষ্পটিও অপার্থিব শোভা ধারণ করে, উচ্চ নীতি ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার জ্যোতিতে সরমাও সেইরূপ আদর্শ চরিত্রে পরিণত হইয়াছে,—বালিকা গার্হস্থ্য সুখদুঃখের সোপান অতিক্রম করিয়া স্বর্গে পৌঁছিয়াছে—কোন কল্পনার পুষ্পকরথ তাহার জন্য প্রেরিত হয় নাই। অবস্থাতেই মনুষ্য চরিত্রের বিকাশ পাইয়া থাকে; সোণার মানুষ অবস্থায় পড়িয়া মৃৎপিণ্ডের মত অসারত্ব প্রদর্শন করে, কখনও বা একান্ত অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিও অবস্থার সাহায্যে দেবচরিত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যে অবস্থার পরিবর্ত্তন চরিত্রের বিকাশ দেখাইবার

পক্ষে এরূপ আবশ্যকীয়, কবি ও ঔপন্যাসিকের সেই অবস্থার বৈচিত্র সংঘটন করিয়া দেখান প্রধান, কিন্তু কঠিন কার্য্য। অনেকে রোমহর্ষণ ঘটনাবলীর অতি সহসা অবতারণা করিয়া আখ্যান বস্তুর স্বাভাবিক পরিণতির মূলে কুঠারাঘাত করেন, কেহ বা এত স্বাভাবিক ভাবে অবস্থার প্রবর্ত্তন করেন যে পাঠকের কিঞ্চিন্মাত্রও কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় না। কিন্তু 'সরমার সুখ' গল্পটিতে অবস্থাগুলি পর পর এরূপ নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঠকালে কৌতূহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমরা এই পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারি নাই, অথচ উপন্যাসখানি ডিটেক্‌টিভের গল্পের ন্যায় শুধু আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার তালিকা নহে। গ্রন্থকার চরিত্র এবং সুনীতির জীবন্ত উদাহরণ দ্বারা পুস্তকখানির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তেলি বৌ এবং অনন্ত বাবুর চক্রান্তজাল অতি দক্ষতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে; ইহাদের কপটতার পার্শ্বে বিশ্বাসপরায়ণা সরমার সারল্য আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; বস্তুতঃ চক্রান্তশীল দুষ্ট বুদ্ধির বুহের মধ্যে একান্ত বিড়ম্বিত সরমা চিত্র বড় সুন্দর হইয়াছে; আবর্ত্ত পীড়িত সুকুমার প্রসূনটির মত কৃপা জাগাইতেছে। লেখক সরমার ব্যথায় পাঠককে এতদূর আর্দ্র করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, পুস্তকখানি কতদূর পাঠ করিলে সরমার জন্য আশঙ্কাপূর্ণ মাতৃকরুণায় হৃদয় ভরপুর হইয়া যায়। পাঠকের মর্ম্মের এই গূঢ়তন্ত্রী স্পর্শ করা সাহিত্যের কৌশলের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। এক একটি অবস্থা দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে আসিয়া এরূপ সমস্যা উৎপাদন করিয়াছে যে, তন্মধ্যে সরমাচিত্রের অনাবিল সৌন্দর্য্য অব্যাহত রাখা সহজ কার্য্য হয় নাই। প্রথম দিন সরমা সামাজিক বলির হাড়িকাটে স্বীয় গ্রীবা নিজেই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, দাদার অনুরোধে পলাইয়া নিজের উদ্ধার চেষ্টা করে নাই,—এ অংশটি বেশ হইয়াছে, যদি পলাইয়া যাইত, তবে গার্হস্থ্য রমণীর চিত্র কতকটা বিকৃত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এবং পলাইয়া আত্মরক্ষা করাই সে অবস্থায় খুব স্বাভাবিক ছিল। মুমূর্ষু বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে সরমা সুরেশ বাবুকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু লেখক সাবধানতার সহিত সেই পূর্ব্বরাগের আভাষ মাত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গের রক্ষণশীল সুগৃহস্থগণও খুঁত ধরিতে পারিবেন না, সে স্থলে সুদীর্ঘ "হা হতোস্মি'র অবতারণা করিলে অন্তপুরবাসিনী ভীরু বঙ্গীয় কুলবধূর স্বাভাবিক ভাবটির বিপর্য্যয় হইত, অথচ এ স্থলে প্রেম বর্ণনার এরূপ সুবিধা সাধারণ লেখকগণ কখনই ছাড়াইতে পারিতেন না। বিশেষ রূপে উৎপীড়িত হইয়া শেষে সরমা দাদার সঙ্গে পলাইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল—সে স্থানে চরিত্রের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহা অপেক্ষা স্বাভাবিক অন্য কোন পন্থা কল্পনা করা যায় না। তেলি বৌএর কথায় প্রতারিত হইয়া সর্ব্বশেষে সে গৃহত্যাগিনী হইল; এই পলায়ন ব্যাপারে তাহার নির্ম্মল মূর্ত্তিতে কলঙ্কের ছায়া মাত্র স্পর্শ করে নাই, বরং সারল্য এবং বিশ্বাসপরায়ণতার ভাবটি একান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। লেখক কলিকাতার যোড়াসাঁকো ভবনে সরমার পার্শ্বে অনন্তবাবুকে আনয়ন করেন নাই, ইহা তাঁহার বিশেষ কৌশলের পরিচায়ক। পবিত্র কুসুমরূপিণী বালিকাকে লেখক স্বাভাবিক ঘটনার পর্য্যায়ে সাবধানতার সহিত রক্ষা করিয়াছেন। যেথানে সরমা নৈতিক কিংবা গার্হস্থ্য বিপদের কোন প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়াছে, সেই স্থানেই গ্রন্থকার স্বাভাবিক অথচ আশাতীত কোন অবস্থার সুত্র উদ্ভাবন করিয়া বালিকাকে মুক্ত করিয়াছেন, সরমা তখন মেঘনিষ্ক্রান্ত শশী-লেখার ন্যায় সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে। সুরেশ এবং সরমার প্রেম—রোগশয্যায় পবিত্র সেবাব্রত উপলক্ষে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, বড় সুখের বিষয় সেখানে লেখক চলিত উপন্যাস সমূহের অনুকরণে ললিতলবঙ্গলতাশীলন কোমল সমীরণ কিংবা ফুল মধুর সহায় চন্দ্রকিরণের দোহাই দিয়া ইহাদের পূর্ণিমার অভিনয়ের মধ্যে বিলাসের আভাষ প্রদান করেন নাই। সুরেশের মাতাকে এই প্রণয়ীদ্বয়ের মধ্যে উপস্থিত করাতে আর একটী সাহিত্যিক নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বভাব সংস্কারাধীন নহে, সরমার গুণরাশি মাতার সংস্কারগুলিকে সহজেই পরাস্ত করিয়াছিল, অন্য সময় হইলে সরমার তাহা দেখাইবার সুবিধা হইত না, কিন্তু শঙ্কটাপন্ন ভাবে কাতর পুত্রের শয্যার পার্শ্বে সেবাব্রত শীলার কঠোর পরিচর্য্যা স্নেহময়ী জননী চক্ষু মুদিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন কি? বিবাহের যখন সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইল, যখন পরিণয় সংঘটিত হইলে আমরা সকলেই আনন্দিত হইতাম, তখন লেখক মহাশয় বজ্রের মত কঠিন চিত্তে আর একটী ঘটনা লইয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার সরমাকে আমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন বলিয়া এ নিষ্ঠুরতা করিলেন। পরিণয়ান্তে সরমাকে আমরা ভালবাসিতাম—মানুষী বলিয়া, কিন্তু সরমা মরিয়া দেখাইল সে মানুষী নহে দেবী। সামাজিক দুর্নামের ছায়াও আর তাহাকে ছুঁইতে পারিল না। বস্তুতঃ উপন্যাসখানির আদ্যন্ত সংযত নৈতিক গণ্ডীর মধ্যে সুন্দর ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে, লেখকের সাবধানতা তাঁহার কবিত্বের হানিকারক হয় নাই, এবং বিশেষরূপে তদ্বর্দ্ধক হইয়াছে। আমরা আজকালকার উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্যিক যুগে এইরূপ পুস্তকের সংখ্যা বেশী দেখিতে চাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১।—**সঙ্গীত কুসুমাঞ্জলী**—শ্রীদুর্গানারায়ণ চৌধুরী বিরচিত। ইহাতে জাতীয় সঙ্গীত, সামাজিক সঙ্গীত, পৌরাণিক সঙ্গীত এবং ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক অনেকগুলি ভাল সঙ্গীত আছে। সঙ্গীত শাস্ত্রে আমাদের তেমন অধিকার নাই—কিন্তু কবিতার হিসাবে গানগুলি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিলাম। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীত উচ্চ ভাবে পূর্ণ। সঙ্গীত গুলি পাঠ করিলে লেখকের কবিত্ব, ধর্ম্মানুরাগ ও স্বদেশ-হিতৈষণার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধানও অতি সুন্দর হইয়াছে।

২। **পুষ্পাঞ্জলী**—শ্রীরসময় লাহা বিরচিত। ইহাতে ৪৯টী চতুর্দ্দশপদী কবিতা আছে। রসময় বাবু একজন উদীয়মান কবি। তাঁহার পুষ্পাঞ্জলীর প্রতি কবিতা উচ্চভাবে পূর্ণ। রসময় বাবু কাহারও অনুকরণ না করিয়া আপন পথে চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জঘন্য অনুকরণের দিনে তাঁহার এ উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা এই নবীন কবিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

৩। **মধুর মিলন**—শ্রীরসময় লাহা ও শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সরকার এম্ এ প্রণীত—

ইহা একখানি গীতি নাটক। মধুর মিলনের মিলনটী সত্যই মধুর হইয়াছে। পুস্তক খানি অভিনীত হইবার যোগ্য।

৪। অভিমন্যু বধ কাব্য—শ্রীমহেশচন্দ্র দাস ডাক্তার প্রণীত এবং বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী হইতে প্রকাশিত।—মাইকেলের ক্ষীণ অনুকরণ, পড়িয়া সুখী হইতে পারিলাম না।

৫। কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক—শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত। বলা বাহুল্য ইহাও একখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত কাব্য গ্রন্থ। কিন্তু কবিত্বের একান্ত অভাব।

৬। লেখাবলী—শ্রীরাধানাথ রায় বিরচিত। রাধানাথ বাবু একজন সুপরিচিত ও প্রথিতযশা কবি। তাঁহার লেখায় ভাব আছে, কল্পনা আছে এবং গাম্ভীর্য্যও আছে। 'লেখাবলী' তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লেখাবলী পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিলাম

৭। কিরণশশী—ষ্টারবঙ্গমঞ্চে অভিনীত সামাজিক নাটক। শ্রীরাজকুমার বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকার সমাজের কল্যাণার্থে এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য সফল হইলে আমরাও সুখী হইব।

বুদ্ধগয়া।

জগতের কি সুখের সেই এক দিন।
যবে এ বিজন দেশে
রাজধন ত্যজি' এসে
পশিল ভিখারী বেশে
তাপস নবীন।
গিরি নদী ব্যবধানে
কি কুহকে তুচ্ছ মানে?
কি মধুর আহ্বানে
চেতনা বিহীন?
অদূরে চরণতল
জীবের ভরসা বল;
পায় নর মোক্ষ ফল
যথা চির দিন।
বুঝি লভিবারে স্থান
সেই পদে নিরবাণ,
ছুটিল উধাও প্রাণে
রাজ উদাসীন!

সে চরণ-চিহ্ন ধরি
বাহিল সোণার তরী
ভব সন্ধু পার করি
পাপী তাপী দীন।
পুণ্য তরুতলে বসি
কি শিখিল সে তাপসা
উজলিল দশ দিশি
এ ঘোর বিপিন।
অবণে উঠিল স্তূপ,
সৌধরাজি অপরূপ,
অদ্ধ ধরণীর ভূপ
চরণে আসীন।
অহিংসা ধর্ম্মের সার,
সর্ব্ব ভূত একাকার,
জন্ম মৃত্যু নাহি আর
জরা-শোক ক্ষীণ।

আর এক দিন
চাইল যখন দিশি
আঁধার তামসী নিশি—
কোথা গেল সে তাপসী?
কি ঘোর দুর্দ্দিন।
শাস্ত্রের বিধান মতে
যাগ, যজ্ঞ, পূজা, ব্রতে,
জীবের শোণিত স্রোতে
ভারত মলিন।
সে মন্দির, সে তোরণ,
ভূগর্ভে নিমগন,
গরজে গহন বন
জন প্রাণী হীন।
কোথা সেই 'বোধি দ্রুম'
জগতের পুণ্য ভূম—
আবরিত ভস্ম ধূম
প্রান্তর পুলিন।

আবার সে দিন
যবে সে আঁধার নাশি'
উদিল বিদেশী আসি;
বুঝিল কি ধন রাশি
মৃত্তিকায় লীন!

যতনে কাটিল খনি,
বাহির করিল মণি ;
ধরাতলে জয়ধ্বনি
ঘোষে তব চীন !
উদিবে কি পুন আর সুখের সে দিন ?
শ্রীমন্মথনাথ দে ।

ওয়াণ্টেড্ (Wanted) ।

ভূমিকা ।

সে দিন নাহিক আর, কালিন্দী যমুনাধার
নীপ মূলে কানু না বিরাজে,
এখন নূতন তানে, প্রতিদিন ষ্টেটস্‌ম্যানে
"ওয়াণ্টেড্" বংশীধ্বনি বাজে ।
সে ধ্বনিতে বঙ্গবাসী, সকলেরই মন উদাসী
সঙ্গে লয়ে কাগজ কলম কালী,
দাসখত লিখিয়ে তায়, বিকাইতে রাঙ্গা পায়
জীবন-যৌবন দেয় ডালি ।

১ম নমুনা ।

ওয়াণ্টেড্ এ টিউটার,
ভরসা আছে ফিউচার,
ছমাস পরে হতে পারে পাকা,
বি, এ, চাই ইংলিসে অনার,
আবেদন তবে গ্রাহ্য তার,
মাসিক বেতন পঁচিশ টাকা ।
খাটুনী খুব কম আছে,
ইস্কুলেতে ঘণ্টা পাঁচে,
(আর) টিফিন ঘণ্টায় চিটি পত্র লেখা—
ফিরে এসে স্কুল থেকে,
সেক্রেটারীর ছেলেটীকে
সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টাতিনেক দেখা ।
সেশন্ বড় কাছাকাছি
অতি শীঘ্র বাছাবাছি,
কর্ত্তে হবে, আর সময় নাই—
চরিত্রের সার্টিফিকেট,
চিঠির জবাবের জন্ম টিকেট
দিয়ে শীঘ্র আবেদন করা চাই ।
মাসিক পাঁচ টাকায় থাকা,
পছন্দ সই পাবেন বাসা,
থাকিতে হইবে উত্তর বঙ্গে,
এপয়েণ্টমেণ্ট পেলে পরে,
অতি অবজ্ঞি মনে ক'রে
একটী শিশি কুইনাইন্ নিবেন সঙ্গে ।

২য় নমুনা ।

ওয়াণ্টেড এ কেসিয়ার
জামিন নয় কো বেশী আর,
নগদ ক্যাস দশটী হাজার টাকা—
এ চাকুরী পার্মেনেণ্ট
টাকার সুদ সিক্স্ পার্সেণ্ট
লেখা পড়ি কত্তে হবে পাকা ।
চিটিং ব্রাদার্স কোম্পানী,
আমিরিকা ও জার্ম্মানী,
আর বিলাতে সদর আফিস এদের,
সংপ্রতি খুলেছে ফ্রান্স,
কলিকাতায় ছিল না ব্রান্স
এটা কিন্তু বড়ই কথা খেদের ।
সে খেদ মিটাতে এবার,
কলিকাতায় রাধা বাজার,
ব্রাঞ্চ আফিস হইয়াছে খোলা,—
পাঠাইতে হবে হোম,
আতপ চাউল তিশি গম,
হরিতকী মহুয়াবীজ আর ছোলা ।
কেশিয়ারের বেতন চল্লিশ,
বাড়বে বেতন টিকলে আফিস,
বাড়ীটী হবে তারির নামে ভাঁড়া—
এটা কেবল বিশ্বাসের জন্য.
মতলব কিছু নাই অন্য,
আফিসটী তার হবে না হাত ছাড়া ।
দশটা হতে সন্ধ্যা ছটা,
মাত্র এই ঘণ্টা কটা
কর্ত্তে হবে কেরাণীর কার্য্য,
সারা রাত্রি থাকলো ছুটী,
মাঝে মাঝে সাহেবের কুটী,
সকাল বেলায় যাওয়া থাকল ধার্য্য ।

উপসংহার ।

আমরা পেলেম ইন্‌ফরমেশন,
হাজার হাজার এপ্‌লিকেশন,
পড়েছে এই উভয় কার্য্যের জন্ম,—
তবে দেশের দুঃখ কি আর,
অতি নিকট ভারত উদ্ধার,
বাঙ্গালী যুবক ধন্য ধন্য ।
শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ।

২৫।১ নং স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

KUNTALINE PRESS.



চতুর্থ ভাগ। } অগ্রহায়ণ, ১৩০৮। { ১২শ সংখ্যা।

মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অবশিষ্ট ভাগ)

আজীবন শিক্ষাবিস্তারে তৎপর থাকিয়া কালীকৃষ্ণ বাবু একজন নিপুণ শিক্ষাদাতা (educationist) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষকরাজ প্যারীচরণ ও পণ্ডিত চূড়ামণি বিদ্যাসাগর মহাশয়, অধ্যাপনা ও পাঠ্য-পুস্তক রচনা বিষয়ে বন্ধুবর কালীকৃষ্ণের মতামত অতি মূল্য-বান্ বলিয়া মনে করিতেন এবং সতত তাঁহার সুপরামর্শ বা সহায়তা প্রার্থনা করিতেন। শেষ জীবনে পরলোকগত প্রথিতনামা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের কলিকাতার বাটীতে অবস্থানকালে কালীকৃষ্ণ বাবুর নিকট অনেকানেক কৃতবিদ্য অধ্যাপকগণের সমাগম হইত। তাঁহারা জ্ঞানালোক আদান-প্রদান সম্বন্ধে কালীকৃষ্ণ বাবুর উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সহিত উক্ত বিষয়ে কথোপকথন করিয়া আপনাদের ধন্য জ্ঞান করিতেন। স্বর্গগত রামতনু লাহিড়ী মহাশয় এই অধ্যাপক মণ্ডলীর অন্যতম।

কালীকৃষ্ণ বাবু অতি কঠোর নীতি শিক্ষাদান করিতেন, এবং তিনি নিজ জীবনে সেই শিক্ষার সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। সত্যের তিল মাত্রও ব্যতিক্রম তিনি অতি দূষণীয় বলিয়া মনে করিতেন। যাঁহারা "শ্যামা সুন্দরী দাসী বনাম কালীকৃষ্ণ মিত্র দিগর" নামক বারাসতের উদ্যান সংক্রান্ত আলিপুর জজ আদালতের মকর্দ্দমায় কালীকৃষ্ণ বাবুর সাক্ষ্যদানের কথা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন কালীকৃষ্ণ বাবুর সত্যসাধনা কি কঠোর ছিল। কালীকৃষ্ণ বাবু নিজের স্বার্থ,—সংসারীর চক্ষে অন্যায়রূপে—পদে পদে ঠেলিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার স্বপক্ষ স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বাহ্যতঃ যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল তাহাই ঠিক বিবৃত করিতে বলেন; এবং সেই কথা বলিবার জন্য স্বপক্ষ ব্যবহারজীবিগণ অনেক সুকৌশল প্রশ্নের মোহজাল বিস্তার করেন, অনেক কৃত্রিম রোষ ও ভ্রূভঙ্গি করেন, কিন্তু

তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল, যে সত্যের উপর ঐ মকর্দ্দমার ফলাফল নির্ভর করিতেছিল, কালীকৃষ্ণ বাবু সেই সত্যের প্রাণ ধরিয়া কথা কহিয়াছিলেন—তাহার বাহ্যিক ভাব স্বমঙ্গলপ্রদ হইলেও ভ্রমেও উহা সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই।

কালীকৃষ্ণ বাবুর সত্যনিষ্ঠা সংসারের রাগ বিরাগের অতীত ছিল। কালীকৃষ্ণ বাবুর জনেক স্নেহাস্পদ তরুণবয়স্ক পরমাত্মীয়ের একবার একটী গুরুতর পারিবারিক বিষয়ে কালীকৃষ্ণ বাবুকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। উক্ত তরুণ বয়স্ক আত্মীয়ের শিক্ষাভার আশৈশব মুখ্যত কালীকৃষ্ণ বাবুর উপরই ন্যস্ত ছিল—এবং তিনি কালীকৃষ্ণ বাবুর পুত্র স্থানীয় ছিলেন বলিলেই হয়। উক্ত স্নেহভাজন ব্যক্তির জননী-বিয়োগ হইলে কালীকৃষ্ণ বাবুর নিকট বিজ্ঞাপিত হয় যে সমাজে প্রচলিত শ্রাদ্ধ-প্রথায় ঐ আত্মীয় ব্যক্তির শ্রদ্ধা নাই, সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুযায়ী মাতৃশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন, এবং কালীকৃষ্ণ বাবু এ বিষয়ের যেরূপ নিষ্পত্তি করিবেন তিনি সেইরূপ কার্য্যই করিবেন। এই প্রস্তাব লইয়া কালীকৃষ্ণ বাবুদের হিন্দু পরিবার মধ্যে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। পরিবারস্থ সকলেই আশা ও অনুরোধ করিয়াছিলেন যে কালীকৃষ্ণ বাবু এই দেশাচারবিরুদ্ধ প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত হইবেন না। কিন্তু কালীকৃষ্ণ বাবু তৎকালে নিজের বা পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মতামতের বিষয় চিন্তা করিয়া ঐ তরুণ বয়স্ক আত্মীয়ের উক্ত বাসনার প্রতিকূলতাচরণ করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন নাই, বস্তুতঃ সেই অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। এই সমাজবিরুদ্ধ আচারে প্রশ্রয় দেওয়াতে তাঁহার স্ত্রীপরিবারস্থ সকলেই এবং আত্মীয় বন্ধুগণ কালীকৃষ্ণ বাবুকে নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, অনেকে তাঁহার এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালীকৃষ্ণ বাবু সকল প্রতিবাদের প্রধানতঃ একই উত্তর দিয়াছিলেন,—তিনি কপটাচারের সমর্থন করিতে পারেন না। তিনি যাহাকে আশৈশব সত্যনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাকে কি বলিয়া তদীয় বিশ্বাসের প্রতিকূল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিয়া, ঐ অনুষ্ঠানে বিশ্বাসের ভাণ করিতে বলিবেন!

জীবনমধ্যাহ্নে কালীকৃষ্ণ বাবু এক নিদারুণ বিপদে পতিত হয়েন। তাঁহার জীবনাবলম্বন, প্রাণাধিক অগ্রজ নবীনকৃষ্ণ বাবু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হয়েন। প্রিয়তম ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে কালীকৃষ্ণ বাবুর অর্থাগমের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইল, কিন্তু দায়িত্ব সকলই রহিল। পোষ্যবর্গ প্রতিপালন, সুবিশাল ও চিরপ্রিয় উদ্যান রক্ষণ এবং দীনসেবা,—সকলই ব্যয় সাপেক্ষ। শুভাদৃষ্ট বশতঃ কালীকৃষ্ণ বাবু, দুইটী (এ জগতে দুর্লভ) অকৃত্রিম বন্ধু পাইয়াছিলেন। এই বিপদকালে প্যারীচরণ বাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয়, যাহাতে কালীকৃষ্ণ বাবু ভ্রাতৃবিয়োগজনিত কোনরূপ সংসারিক ক্লেশ অনুভব না করেন তজ্জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া অযাচিতভাবে ও হৃষ্টচিত্তে তাঁহার ব্যয়ভার তুল্যাংশে বহন করেন। যদিও এই দায়িত্ব তাঁহাদের অধিক দিন বহন করিতে হয় নাই। বর্ষৈক কাল পরেই নবীনকৃষ্ণ বাবুর সুযোগ্য জামাতা পূর্ব্বোক্ত ৺ কালীচরণ ঘোষ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের হস্ত হইতে ঐ ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। এবং তিনি কালীকৃষ্ণ বাবুকে জীবনের অবশিষ্ট কাল কোন অভাবই বোধ করিতে দেন নাই—তাঁহাকে পরম যত্ন ও সমাদরে পিতৃস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কালীচরণ বাবুর পত্নীকে কালীকৃষ্ণ বাবু শৈশবাবধি কন্যাধিক যত্নে লালন পালন করেন ও নিজেই তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা দান করিয়াছিলেন—কুন্তীবালার প্রতি কালীকৃষ্ণ বাবুর স্নেহমমতার অবধি ছিল না, এবং প্রিয়তমা ভ্রাতুষ্পুত্রীও কালীকৃষ্ণ বাবুর সেই অনন্ত ভালবাসার তুল্যমূল্যে প্রতিদান করিতেন। এই স্নেহবন্ধনই কালীচরণ বাবু কালীকৃষ্ণ বাবুর পুত্রস্থানীয় করিবার অন্যতম কারণ। কালীচরণ বাবুর নৈসর্গিক সহৃদয়তা ও গুণগ্রাহিতা সেই স্নেহ ও ভক্তি বন্ধন উত্তরোত্তর দৃঢ়তর করে। তিনি কালীকৃষ্ণ বাবুকে লোকসেবা কার্য্যে সবিশেষ সহায়তা করেন।

কালীকৃষ্ণ বাবুর নিজের অভাব অতি সামান্যই ছিল। একখানি বিলাতী অল্প মূল্যের কাপড়, চটী জুতা ও শীতকালে একখানি বালাপোষ হইলেই তাঁহার বেশভূষা সম্পন্ন হইত, আর দীনদরিদ্রগণের ক্ষুন্নিবারণের উপযোগী আহারীয় হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন,—তিনি যৌবনকাল হইতে নিরামিষ ভোজী ছিলেন। টাকা পয়সা রাখিবার জন্য তাঁহার বিলাতী purse বা মনিব্যাগের প্রয়োজন হইত

না, একটী দেশলাইয়ের বাক্স হইলেই চলিত; এবং অধ্যয়ন বা লিখনের জন্য তিনি টেবিল-চেয়ার-সজ্জিত পাঠাগার অপেক্ষা, কোন বৃক্ষতলে স্থাপিত একখানি সামান্য কাষ্ঠাসন অধিকতর পছন্দ করিতেন। কালীকৃষ্ণের নিজের অভাব ছিল না বলিলেই হয়, কিন্তু পরের অভাব মোচনের জন্য তিনি সতত ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছিলেন—"Extremely simple and abstemious in his habits, he strongly remind ed one of Wordsworth's 'Wanderer,' and his life was one continuous self-sacrifice in word and thought and deed"* আড়ম্বর মাত্র বিবর্হিত অতি মিতাচারী তাঁহাকে দেখিলে কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের (Excursion নামক কাব্যে বর্ণিত নিভৃত কুটীরবাসী সরল ও পবিত্র পরহিতপরায়ণ ও ধর্ম্মাচরণরত প্রাচীন পরিব্রাজক বন্ধুর) Wandererএর কথা প্রবলভাবে স্মরণ পথে উদিত হইত। তাঁহার জীবন, বাক্যে, চিন্তায় ও কার্য্যে, একটী নিরবচ্ছিন্ন আত্মোৎসর্গের ইতিহাস।' এই শান্তিময় উপবনে কালীকৃষ্ণ বাবু ধর্ম্মচিন্তায়, জ্ঞানসঞ্চয়ে ও পরহিতসাধনে অতি প্রশান্ত ও সন্তুষ্ট মনে জীবন অতিবাহিত করিতেন। তিনি সেই পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া জগতের জনতা কোলাহলে মিশিতে চাহিতেন না। কখন কখন কোনও বিদ্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী ইংরাজ ধর্ম্মযাজক বা দেশীয় ভক্ত, বারাসতে যাইয়া সেই শান্ত দান্ত ঋষির জ্ঞানসম্পদে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার তপশ্চর্য্যা ভঙ্গ করিতে প্রয়াস পাইতেন, তাঁহাকে জ্ঞানীজন সমাজে আসিয়া আত্মপরিচয় দিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু কালীকৃষ্ণ বাবু সবিনয়ে সেই অনুরোধ প্রত্যাখান করিতেন। তিনি সিন্‌সিনেটাস্ প্রমুখ প্রাচীন রোমকগণের জীবনই এ সংসারে কামনার বস্তু বলিয়াই মনে করিতেন। কালীকৃষ্ণ বাবু বলিতেন, ঐ রোমকগণ প্রয়োজন হইলে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিতেন—শত্রুহস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতেন, কিন্তু সেই প্রয়োজনের অবসান হইলেই তাঁহারা নিজ নিজ পল্লীকুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কৃষি জীবন যাপন করিতেন; নগরের বিলাস বিভব আড়ম্বর অপেক্ষা পল্লীজীবনসুলভ সুখশান্তি তাঁহারা অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেন।

কালীকৃষ্ণ বাবু শান্তিময় পল্লীবাস ভাল বাসিতেন। কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট বিরাম প্রার্থনা করিতেন না। লোকসেবায় ও উদ্যান-পরিচর্য্যায় এবং অবসরকালে জ্ঞান অর্জ্জনে ও বিতরণে তিনি অহরহঃ রত থাকিতেন। প্রত্যহ প্রাতে বারাসতের সেই উদ্যানভবনে গ্রাম গ্রামান্তর হইতে শত শত দরিদ্র ব্যক্তি শরীরের ব্যাধি যাতনা, কেহ বা অন্তরের দারুণ নির্ব্বেদ লইয়া সেই মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইত। তিনি পীড়িতকে ঔষধ দিতেন, পথ্য দিতেন, শোকাতুরকে সান্ত্বনা করিতেন, অন্নহীনকে অন্ন এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করিতেন—আপনার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সাধ্য তাঁহাদের সাংসারিক অভাব ও ক্লেশ মোচন করিতেন। কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনের এই অধ্যায়টী স্মরণ করিয়াই সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তদীয় সুরধুনী কাব্যে লিখিয়াছিলেন—

"জ্ঞানাগার কালীকৃষ্ণ স্বভাব বিনত
বারাসতে প্রাণরক্ষা করে শত শত।"

বারাসতে কোন পথিক বা আগন্তুক আশ্রয়-প্রার্থী হইলে লোকে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে কালীকৃষ্ণ বাবুর নিকট প্রেরণ করিত। তিনি অতিথিকে পরম সমাদরে তুষ্ট করিতেন, এবং অসময়ে উপস্থিত হইলে হৃষ্ট চিত্তে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে ভোজন করাইতেন। এই পর-সৎকারবৃত্তি কালীকৃষ্ণ বাবুর সহিত সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। প্রাচীন বয়সে তিনি যখন মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় বাস করিতেন, তখন প্রতিনিয়ত প্রাতে তাঁহাকে লং সাহেবের গির্জ্জার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দেশীয় খৃষ্টান পল্লীতে এবং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ তৎকালীন মেথরের পল্লীতে (Depot) দরিদ্র ও পীড়িত পরিবারগণের দ্বারে দ্বারে ঔষধ বিতরণ করিয়া, নিরাময়ত্ব বিধানের আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। বাটীতে কোন ক্রিয়াকলাপ হইলে তিনি উদ্বৃত্ত বা উচ্ছিষ্ট আহারীয়গুলির কোনরূপ অপচয় করিতে দিতেন না, সেগুলিকে স্বহস্তে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, ও নিকটস্থ দীন দরিদ্র ভিক্ষুকগণকে ডাকিয়া আনিয়া বিতরণ করিতেন। ইং ১৮৬৬ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময়, যখন তাঁহার অপর দুই বন্ধু, প্যারীচরণ বাবু চোরবাগানে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, কালীকৃষ্ণ বাবু পটলডাঙ্গার গোলদীঘিতে ক্ষুৎপীড়িত ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইতেন।

* Hindu Patriot, 3rd August 1891.

কালীকৃষ্ণ বাবুর পরার্থপরতার শেষ ছিল না, এবং তাঁহার সরল, অমায়িক, ও সুপবিত্র স্বভাবের অমানুষী মাধুরীরও অন্ত পাওয়া যাইত না। তিনি সংসার হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই, অথচ তিনি বিরাগীর ন্যায় পরমপূত ছিলেন। তাঁহার চরিত্র মহিমা, স্বভাব সুষমা এবং পর সুখান্বেষী প্রবুদ্ধ জীবন, দেশীয় বিদেশীয়, শিক্ষিত অশিক্ষিত, হিন্দু অহিন্দু সকল লোককেই মোহিত করিত। যাঁহারা মহাত্মা কালীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সংসর্গ লাভে সৌভাগ্যবান হইয়াছিলেন যাঁহারা বারাসতের সেই তপোবনে যাইয়া কালীকৃষ্ণ বাবুর দৈনিক জীবন পরিদর্শন বা কলিকাতায় ৺কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার জ্ঞানময় অমৃত ভাষিতা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন সে মহাচরিত্রের কি মোহিনী শক্তি ছিল। সঞ্জীবনী লিখিয়াছিলেন "তাঁহার সহিত দণ্ডও থাকিলে জীবন উন্নত ও পবিত্র হইয়া গেল বোধ হইত।"* কোনও সুপণ্ডিত ও সুলেখক ইংরাজ ভক্তিপূর্ণ ভাষায় কালীকৃষ্ণ বাবুর অসাধারণ চরিত্রমাহাত্ম্যের গুণগান করিয়া লিখিয়াছিলেন—'His life was more striking than his words, and his conversation always came short of the depth and reality of his interior life and experience" † 'তাঁহার জীবন তদীয় বাক্যাবলী হইতেও অধিকতর বিচিত্র ছিল, এবং তাঁহার কথোপকথন কখনই তদীয় অন্তর্জীবনের অনুভূতির গভীরতা ও প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করিবার উপযোগী ভাষা পাইত না।'

কালীকৃষ্ণ বাবুর জ্ঞানোন্নতি ও চিত্তশুদ্ধি, আত্মসুখবর্জ্জন ও পরসুখান্বেষণ আদর্শস্থানীয, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণতাই সেই অপরূপ জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। তিনি অতি উচ্চতম অর্থে ধাম্মিক ছিলেন, সকল ধর্ম্মের সারাৎসার তাঁহার হৃদয়মন্দির ভরিয়া রাখিয়াছিল। সে ধর্ম্মজ্ঞান এরূপ উদার ও মধুর, সার্ব্বভৌমিক ও সর্ব্বজনীন, যে সম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রভাবের কণামাত্র তাহাতে স্পর্শ করিত না, সাম্প্রদায়িকতা মহত্তর ধারণায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টীয়গণ কালীকৃষ্ণ বাবুর মুখে আত্মত্যাগী খ্রীষ্ট চরিত্রের ভক্তিপূর্ণ গুণগান শুনিয়া তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম নিষ্ঠ মনে করিয়া আত্মসম্প্রীতি লাভ করিতেন; আত্মোন্নতি অহিংসাদি বৌদ্ধধর্ম্মাচরণের উচ্চঅঙ্গগুলিতে কালীকৃষ্ণ বাবুর অবিচল আস্থা দেখিয়া, তিনি গোতম বুদ্ধোক্ত ধর্ম্মকে ভারতের অতুলনীয় গৌরবের বস্তু মনে করিতেন বলিয়া, এবং তিনি ধ্যানের সহায়তার জন্য বুদ্ধদেবের একটী শিলামূর্ত্তি নিজ উপাসনাগারে পরমভক্তিভরে জীবনের শেষ দ্বাদশ বর্ষাধিক কাল রক্ষা করিয়া বুদ্ধদেবের চিরদয়িত নির্ব্বাণ প্রার্থনা করিতেন বলিয়া বৌদ্ধগণ তাঁহাকে স্বদলভুক্ত জ্ঞান করিতেন; ব্রাহ্মগণ কালীকৃষ্ণ বাবুকে বারাসতের সেই উদ্যানের কোনও বনস্পতিতলে ঈশ্বরোপাসনারত দেখিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী মনে করিতেন, থিয়জফিষ্টগণ তাঁহার যোগাভ্যাস, মুর্চ্ছাবিদ্যা, অতিপ্রকৃত প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বাস ও আসক্তি দর্শনে তাঁহাকে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞান করিতেন, এবং আত্মীয় স্বজনগণ কালীকৃষ্ণ বাবুকে পরম পবিত্র ঋষি তুল্য হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু নামে কিছু আসিয়া যায় কি? যিনি সকল ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ—সেই ভগবানের প্রতি অনন্ত ভক্তি ও প্রেমে কালীকৃষ্ণ বাবু আজীবন তন্ময় ছিলেন—কায়মনোবাক্যে তাঁহারই সুমঙ্গলময় ইচ্ছা পালন করিবার জন্যই তিনি জীবন ধারণ করিয়াছিলেন!

সাংসারিক ভাবে দেখিলে কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবন সুখস্বচ্ছন্দময় বলিয়া বোধ হয় না, তিনি নিরাময় স্বাস্থ্য বা সবল দেহের অধিকারী ছিলেন না, তিনি অসময়ে আপনার ইহজীবনের প্রধান সহায় স্নেহময় অগ্রজ নবীনকৃষ্ণ বাবুকে হারান, এবং জীবনাবসানের পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার অপর সোদরাধিক বন্ধু প্যারীচরণ বাবু এজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, প্যারীচরণের বিচ্ছেদ জীবন সায়াহ্নে এবং ভগ্নদেহে কালীকৃষ্ণ বাবুর হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু সংসারের কোন ঘাত প্রতিঘাতেই কালীকৃষ্ণ বাবু কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হয়েন নাই, কখনই নিরাশা বা দুঃখবাদ তাঁহার অন্তরের স্বর্গীয় আলোক নিষ্প্রভ করে নাই, তিনি চিরজীবনই জগদীশ্বরের অপার করুণায় অভ্রান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার পুরাতন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ই কেবল শেষাবধি জীবিত ছিলেন; উভয় বন্ধু একত্রে—ছয় দিন মাত্র ব্যবধানে পুণ্যলোকে আরোহণ করেন।

এই মহানগরীতে ৺কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের সুকীয়াপুর

* সঞ্জীবনী ২৪ শে শ্রাবণ, ১২৯৮।

† The Epiphany, 13th August, 1891

ষ্ট্রীটস্থ বাটীতেই কালীকৃষ্ণ বাবুর অন্তিম দিবসগুলি অতিবাহিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে পীড়া-কাতর ও চলৎশক্তি রহিত হইয়াও শিবিকারোহণে বন্ধু কালীকৃষ্ণ বাবুকে শেষ পীড়ার সময় দেখিতে আসিতেন। উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদের জীবনদীপ স্তিমিতপ্রায়, এবং সেই ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া বন্ধুযুগল যখন জরাখিন্ন পীড়াবিশীর্ণ মুখে পরস্পরের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেন, অতীত সুখ দুঃখের পুরাতন কাহিনী পর্য্যালোচনা করিতেন তখন মৃত্যুর ছায়া ভেদ করিয়া তাঁহাদের নয়নেও সৌহার্দ্র জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিত।

খ্রীষ্টীয় ১৮৯১ অব্দের ২রা আগষ্ট প্রভাত সময়ে সপ্ততিতম বর্ষ বয়সে, বর্ষীয়সী সহধর্ম্মিণী ও দুইটী বিবাহিতা কন্যা রাখিয়া কালীকৃষ্ণ বাবু অনন্তধামে গমন করেন।

সেই দুর্দ্দিনে, হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকল ধর্ম্মের বিদ্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ কালীকৃষ্ণের জন্য অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন, দেশীয় সকল সংবাদ পত্রে কালীকৃষ্ণের মহাজীবনের কথা শোকসন্তপ্ত ভাষায় আলোচিত হইয়াছিল। চয়দিন পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগজনিত দেশব্যাপী উচ্চতর শোকধ্বনির মধ্যে, সেই নিভৃতবাসী ঋষি জীবনের তিরোধানের কথা সর্ব্বসাধারণের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু সে সংবাদ বারাসতের গৃহে গৃহে—প্রতি দরিদ্র কুটীরে হাহাকার উত্থিত হইয়াছিল। এবং যাঁহারা জীবনে একবারও কালীকৃষ্ণ বাবুর সাক্ষাৎ সংসর্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন, কি অমূল্য জীবনই এজগত হইতে অন্তর্হিত হইল, কত সুদুর্লভ লোক-হিতৈষণার দৃষ্টান্ত লোকচক্ষু হইতে অপসৃত হইল,

"কত ধ্যান জ্ঞান　　আকুল আহ্বান
অবসান চিরতরে।"

বারাসতবাসিগণ তাঁহাদের চিরগৌরব কালীকৃষ্ণের স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁহাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যেটুকু সম্ভব সেটুকু করিয়াছিলেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কালীকৃষ্ণ বাবু বারাসতে যে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য প্রাণ পাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই অক্ষয় কীর্ত্তির স্মরণার্থে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়টীর তাঁহারা কালীকৃষ্ণের পবিত্র নামে নামকরণ করিয়াছিলেন। সেই "কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়" এর এখনও বারাসাতের "ট্রেবর হল" (Trevor Hall) নামক সাধারণ ভবনে অধিবেশন হইয়া থাকে। এবং সেই "ট্রেবর হলের" গাত্রেই বারাসাতবাসিগণ কালীকৃষ্ণের প্রতি অনন্ত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ যে প্রস্তরফলকখানি স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"This Tablet
SACRED TO THE MEMORY OF
THE LATE
BABU KALLYKRISSEN MITTRA
The Sage of Baraset
THE FATHER OF THE POOR
The first leader in the cause of philanthropic and educational reform
IN THIS PART OF THE COUNTRY
The founder of the first Girls' School in Bengal
AND THE PIONEER OF HOMŒOPATHY IN THE BARASET DISTRICT
HAS BEEN RAISED BY THE
BARASET ASSOCIATION
In reverent loving and mournful memory of his immortal services
RENDERED UNCEASINGLY DURING HALF A CENTURY
In the cause of peoples' well being
HIS VAST ERUDITION
His large sympathy in the cause of education for all
HIS CATHOLICITY IN MATTERS RELIGIONS AND SOCIAL
HIS SELFLESSNESS AND CHARITY
HIS SAINTLINESS OF CHARACTER
And the exalted purity and simplicity of his life
Ever devoted to the ministry of good works
AND HIS MANY PRIVATE AND PUBLIC VIRTUES
Not least amongst which was
HIS HIGH SOULED IDENTIFICATION AT WHATEVER COST
OF THE PUBLIC INTEREST WITH HIS OWN
Born 1822 A D.　　　　Died 1891 A D
"Aged 70 years',

আজ দশবর্ষ হইল, কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনান্তের পর, ইণ্ডিয়ান মিরার লিখিয়াছিলেন :—

"The memorials of his *rishi* life are left in the hearts that knew and honoured him in life, but such a sweet and pure life has leassons to teach to the present generation, and we shall be happy to have fuller records of a life which has been well called by the Indian Messenger "One faithful prayer" in a more permanent form by some one suited to the duty.*" "তাঁহার ঋষি জীবনের স্মৃতি যাঁহারা জীবিত কালে তাঁহাকে জানিতেন ও ভক্তি করিতেন তাঁহাদেরই হৃদয়ে রহিল, কিন্তু এমন মধুময় ও পবিত্র জীবনে বর্ত্তমান কালের জনগণের অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। এবং ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্র যে জীবনকে 'একটী একনিষ্ঠ ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা' বলিয়া সুন্দরভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কোন যোগ্য ব্যক্তি সেই জীবনকাহিনী স্থায়ী ও পূর্ণতর আকারে লিপিবদ্ধ করিলে আমরা সুখী হইব।" আমরাও সর্ব্বান্তকরণে মিরার সম্পাদক মহাশয়ের এই শেষ কামনাটীব সিদ্ধি প্রার্থনা করি। সহৃদয় পাঠকবর্গকে এই কথাটী স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। বর্ত্তমান লেখক স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সেই গ্রন্থ মধ্যে আনুষঙ্গিক ভাবে, কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনের যে কয়টী কথা প্রয়োজন বোধে উল্লেখ করিয়াছে, তাহারই সারাংশ মাত্র এস্থলে সঙ্কলন করিয়া দিল। ইহা কালীকৃষ্ণ বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী নহে—তাঁহার পুণ্যাচরণোদ্দেশে একটী ভক্তি অর্ঘ্য মাত্র।†

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

বর্ষায় পল্লীদৃশ্য।

[চিত্র]

ভাদ্রমাস। ভাদ্রের প্রায় শেষ হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে বর্ষা না বলিয়া শাস্ত্রানুসারে শরৎকাল বলিতে হয়; কিন্তু একালে শাস্ত্রের শাসন বড় কেহ মানিতে চাহে না, এমন কি

---

* The Indian Mirror, 16th August 1891.

† এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু রমেশ চন্দ্র বসু ৺কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনী সম্বন্ধে কতকগুলি ঘটনা বিবৃত করিয়া আমাদের কাছে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ঘটনাগুলির অধিকাংশই এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া পত্রখানি এস্থলে আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হইল না, কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিতে উড়ের মত (উড়িস্যা দেশবাসীর মত) ছিলেন এই কারণে কেহ কেহ ঠাট্টা"করিয়া বিদ্যাসাগরকে উড়ে সাগর" বলিত; বন্ধু কালীকৃষ্ণও বিশেষ সুশ্রী ছিলেন না, উদ্যানে বৃক্ষাদির সেবা নিরত কালীকৃষ্ণকে দেখিলেই লোকে (অপরিচিত ব্যক্তি) বাগানের মালী বলিয়া ভাবিত। একদিন কালীকৃষ্ণ তাঁহার কুটীর-সম্মুখে বসিয়া গাছের গোড়া খুঁড়িতে ছিলেন, পার্শ্বস্থ সদররাস্তা দিয়া কয়েকজন সিপাহী সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে যাইতেছিল। তাহারা বারাসতে কখনও আইসে নাই, কাছারী কোথায় তাহাও জানে না; সুতরাং কালীকৃষ্ণ বাবুকে গাছের গোড়া খুঁড়িতে দেখায় রুক্ষস্বরে বলিল "এ উড়িয়া হামালোক্‌কো কাছারীকা পথ দেখ্‌লায়ে দেও"। কালীকৃষ্ণ বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "কাছারী যাবে, যাও না। ঐ সদর রাস্তা ধরেই যাও" বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কাছারীর পথ দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ কাণ্ডজ্ঞানহীন পশ্চিমে খোট্টারা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিল "চল্‌ হাম্‌ লোককো সাৎমে চল্‌ দেখ লায়ে দেগা।" বৃদ্ধ কালীকৃষ্ণ "আমায় আবার কষ্ট দিবে চল" বলিতে বলিতে তাহাদের সঙ্গে চলিলেন।

আদালতে উপস্থিত হইলে তৎকালীন সবডিবিসনাল আপিসার মহাশয় মহাত্মা কালীকৃষ্ণের আগমন দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কালীকৃষ্ণবাবু হাসিতে হাসিতে সমস্তই বিবৃত করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ক্রোধে ঐসকল সিপাহীগণের জরিমানা করিতে উদ্যত হইলেন, সাধু কালীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন "দেখুন একে উহারা মূর্খ কাণ্ডজ্ঞান হীন, তায় পুলিষে কর্ম্ম করে, উহাদের শত দোষ মার্জ্জনীয়," বলিয়া চলিয়া আসিলেন। পথে ঐসকল লোক তাঁহার শরণাগত হইলে তিনি তাহাদের অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন "আমি তোমাদের হুজুরকে তোমাদের জরিমানা করিতে বারণ করিয়াছি, আর কোন ভয় নাই।" কি অপূর্ব্ব ক্ষমাশীলতা! অত্যাচারী দুর্জ্জনের প্রতি এরূপ ক্ষমা প্রদর্শন আর কোথাও দেখি নাই। ক্ষমাশীলতার আর একটা উদাহরণ দেখুন। তাঁহার মালী একদিন একটী লোককে গোটাকয়েক লেবু সমেত ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে বলিল "বাবু! এইবেটা প্রত্যহ লেবু চুরি করে, ক দিন থেকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি আজ বেটাকে ধরেছি" বলিয়া তাঁহারই সম্মুখে বেদম্ প্রহার করিল এবং পুলিষে দিবার জন্য বাবুকে অনুরোধ করিল। দয়ালু কালীকৃষ্ণ প্রহারের কারণ মালীকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া লেবুচোরকে নিকটে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় বলিলেন "দেখ বাপু! তোমার যদি লেবু খাইবার এত সাধ তবে আমায় বল নাই কেন? আমি তোমায় দিতাম, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয় তাহাও কি জান না? আমার বাগানে চুরি করিয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইলে, অন্য কাহারও হাতে পড়িলে তোমার জেল হইত; তাহাতে চিরকালের জন্য দাগি হইয়া যাইতে এবং ইহজন্মে আর কেহ তোমায় বিশ্বাস করিত না। এক্ষণে বাড়ী যাও, দেখ আর কখন এমন কর্ম্ম করিও না।" চোর কালীকৃষ্ণের এইরূপ সততা ও সাধুতা দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইল এবং পদে হস্ত দিয়া দিব্য করিয়া বলিল "খেতে না পাই সেও স্বীকার, তথাপি চুরী করিব না।" বাস্তবিক সে অবধি ঐ ব্যক্তি আর কখনও কোন দুষ্কর্ম্ম করে নাই।" প্রঃ সঃ

স্বয়ং প্রকৃতি দেবীও না। তাই ভাদ্র-শেষে এখনও পরিপূর্ণ বর্ষা। কলিকাতায় বসিয়া বর্ষার পূর্ণ প্রভাব অনুভব করিতে পারা যায় না, সেখানে মানুষ প্রকৃতির উপর হাত চালাইয়া যে কৃত্রিমতার সৃষ্টি করিয়াছে, বাহ্য প্রকৃতি তাহার উপর অসঙ্কোচে তাহার লীলাঞ্চল প্রসারিত করিয়া আপনার সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারে না, কিন্তু পল্লী-প্রকৃতি সম্বন্ধে একথা খাটে না, এখানে বর্ষা তাহার সকল সুখদুঃখ, সকল বিভব সম্পদ লইয়া সম্পূর্ণ-রূপে আত্ম প্রকাশ করে। নগরবাসিগণের সে সুখ সে দুঃখ উভয়ই বোধ হয় অপ্রীতিকর। কিন্তু কবিচিত্ত তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না, কারণ, তাহা যে কেবল মেঘদূতের অম্লান কাব্য হৃদয়ের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগাইয়াদেয় *তাহাই নহে, কবিকঙ্কণের 'অন্নাভাবে' শীর্ণমুখ দুঃখের* অস্তিত্বও তাহাতে অনুভব করিতে পারা যায়। এই সুখ ও দুঃখ, এই তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, এই মিলন বিরহের আশাভঙ্গ বিজড়িত, আনন্দ বেদনা কল্লোলিত ভাবরাশি বর্ষাপ্রকৃতির সুশ্যামল নবীন সৌন্দর্য্যের উপর মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য করণ ও সায়াহ্নের ধূসর মেঘাচ্ছায়ার তুলিকাসম্পাতে, পল্লিবাসিগণের জীবন কখন হাস্যময়, কখন বিপদে তমসাচ্ছন্ন করিয়া তোলে।—সে সুখ ও সে দুঃখ উভয়েই উপভোগ্য।

ক্ষুদ্র বিনোদপুর গ্রাম খানি নিতান্ত গণ্ডগ্রাম নহে, ভদ্র পল্লী। রেলপথ হইতে বহুদূরে অবস্থিত, নদীপথও বৎসরের অধিকাংশ কাল বিরল সলিল ও শৈবালদলরুদ্ধ থাকে। কিন্তু নদী এখন আর সংকীর্ণকায়া নহে, শৈবাল রাশিতে আর জলরেখা আচ্ছন্ন রাখিতে পারে নাই, পদ্মার বিপুল জলরাশি খাল, বিল, নালা প্রভৃতি সমস্ত জলাশয় ভাসাইয়া গ্রাম-প্রান্তবাহিনী সেই বিমল সলিলা সঙ্কীর্ণ তটিনীকে পঙ্কিল জলের উদ্দাম প্রবাহে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সে পুলক, সে চাঞ্চল্য, সে তরঙ্গভঙ্গ ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী তাহার অপ্রশস্ত বক্ষে আবদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না, তাই নদী-জল 'পাউড়ির' উপর বটগাছের স্কন্ধদেশ জলমগ্ন করিয়া, আমকাঁটালের বাগানের ভাঁট, আশ্শাওড়া ও কালকাসিন্দের জঙ্গল ডুবাইয়া গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী বাঁধের পদতলে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে। অপর দিকে দীঘির জল মাঠের নিম্ন জমিকে সরোবরে পরিণত করিয়া, জেলাবোর্ড নির্ম্মিত মেঠোপথের উভয় পার্শের নয়ানজুলি প্লাবিত করিয়া, গ্রামের পুষ্করিণী গুলি ছাপাইয়া বর্ষার বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। চতুর্দ্দিক জলময়; গ্রামখানি একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের আকার ধারণ করিয়াছে; এখন বিশ্বসংসারের সহিত এই গ্রামের স্থলীয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন-প্রায়, কিন্তু নৌকাপথে বহির্জ্জগতের সহিত তাহার নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, কত নূতন নূতন দেশের নূতন নূতন দ্রব্য পূর্ণ নৌকা আসিয়া গ্রামপ্রান্তে নঙ্গর করিয়াছে; সমস্ত গ্রামবাসী বাহির্জ্জগতের সহিত প্রীতিবন্ধনের নিবিড়তা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছে।

বন্যার এইরূপ অবস্থা, তাহার উপর বৃষ্টির বিরাম নাই। প্রভাতে মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে রাত্রে সর্ব্বক্ষণ বৃষ্টি—কখন মুষল ধারে বর্ষণ, কখন অতি সূক্ষ্ম শুভ্র জলকণা, সাধারণ ভাষায় *যাহাকে বলে, 'ইলশে গুড়ি'। আজ সমস্ত সকাল বেলাটা* ধরিয়া অবিরল ধারায় বর্ষণ হইয়া গিয়াছে, সেই বৃষ্টিধারা মস্তকে ধরিয়াই পল্লীবাসিগণ প্রসন্ন মনে তাহাদের নিত্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে, গৃহস্থ শাক বা বেগুনের ক্ষেতে নিড়ানী দিয়াছেন, রাখাল গরু চরাইয়াছে, চাষীরা আউস ধান কাটিয়াছে—কাহারও মস্তকে বাঁশের মোটা ডাটা বিশিষ্ট তালপাতার ছাতি, কাহারও মাথায় গামছা। কুলবধূগণ কেহ শোভাদিকারস্তে বঙ্গকন্যা ছোবান থানের গামছা, কেহবা বাঙ্গন চাবখানার বা তারকেশ্বরের গামছা মাথার উপর ফেলিয়া কলস কক্ষে ঈষৎ অবনত বদনে নদীপথে চলি-তেছেন। বৃষ্টি ধারায় সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়াছে, কপোলে ললাটে ঘর্ম্ম বিন্দুর ন্যায় বারিবিন্দু সঞ্চিত হইয়াছে, বায়ু বাহিত জলকণা তাঁহাদের সরল, সুন্দর, সঙ্কোচহীন মুখের উপর আনন্দের উদ্দীপনা সংমিশ্রিত কৌতুক হাস্যের রচনা করিয়াছে, বোধ হইতেছে—

"সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে
যৌবন সৌন্দর্য্য যেন লইতে চায় কেড়ে।"

সুন্দরীগণ পিচ্ছিল পথে পা ফেলিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছেন, কাহারও বা পদপ্রান্তে সুচিত্রিত অলক্ত লেখা, তিনি আরও সাবধানে পা ফেলিতেছেন, সম্মুখে কর্দ্দম দেখিলে দৈবাৎ তাঁহার ননদকে আহ্বান করিয়া ছড়া কাটিয়া বলিতেছেন,—

"পায়ে আলতা পথে কাদা
আমি যাই কেমন ক'রে?

ঠাকুর ঝি তোর পায়ে পড়ি,
আমায় নে কোলে ক'রে।
যদি থাক্‌তেন তোমার দাদা,
মুছিয়ে দিতেন পায়ের কাদা।"

ছড়ার আর শেষ হইল না, "মরণ আর কি, এত সখও যায়"—বলিয়া ঠাকুরঝি বৌকে ধরিয়া সেই কাদার উপরই ঠেলিয়া দিলেন, বধূ কৌতুক হাস্যে বলিলেন, "তোমার দাদারই খাটুনি বাড়্‌লো।" দত্তদের কাদম্বিনী বলিল, "হ্যালো বিন্দু দিদি, তোমার দাদা আবার নাপিত হলেন কবে হ'তে?"—বিন্দু খুব সপ্রতিভ মেয়ে, তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "যত দিন হ'তে ঘরে রসের নাপতিনি আমদানী করেছেন।" স্নানের ঘাটের পথে পল্লীরমণীগণ কি ভাবে আলাপ করিয়া থাকেন, পুরুষ লেখক তাহার সম্যক পরিচয় দানে অসমর্থ, কারণ 'রিপোর্টারের' মুখে অতি অল্প কথাই শুনিতে পাওয়া যায়।

রমণীগণ ধীরে ধীরে জলে নামিলেন, একহাঁটুর অধিক জলে নামিবার সাহস নাই—ডুবিয়া যাইবার ভয়ে, ভাসিয়া যাইবার ভয়ে, কুমীরের কবলে পড়িবার ভয়ে, এবং পাছে কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে সকল অপেক্ষা কলঙ্ক ভয়ে; তাঁহারা একহাঁটু জলে দাঁড়াইয়াই অবগাহন শেষ করিতেছেন, নদীর দূরব্যাপী বিস্তারের দিকে চাহিয়া আতঙ্কে তাঁহাদের বুকের মধ্যে দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছে, প্রবল স্রোতে টোপাপানা ও পাণিফলের জঙ্গল নদীর মধ্যস্থল দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। নদীর বুকে মেঘের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে, ভাসমান শৈবালের মধ্যে পানকৌড়ী একবার ডুব দিতেছে আবার অনেক দূরে গিয়া তাহার দীর্ঘ গলাটা জলের উপর তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে। নদী তীরস্থ জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া একটা ডাহুক 'কুয়া কুয়া' করিয়া অশ্রান্ত ভাবে ডাকিতেছে, সে ডাকে রস নাই, মাধুর্য্য নাই, পরিবর্ত্তন নাই। তথাপি বোধ হইতেছে এই বিশালকায়া তটিনীর প্রচণ্ড সৌন্দর্য্য ও রুদ্র ভাব প্রাণের মধ্যে সচেতন করিবার জন্য ডাহুকের এই প্রকার তীব্র আর্ত্তনাদ বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাহার সেই কণ্ঠস্বরে তরঙ্গাহত তটভূমির আবেগ কম্পিত কণ্ঠের উচ্ছ্বাসরব শুনিতে পাওয়া যায়।

নদীর অপরপারে অন্ধকার, শ্যামল বনশ্রেণী ধূসর মেঘের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে; কূলে কূলে জলভরা, বিটপী রাশী সমাচ্ছন্ন বিজন গ্রামখানি দূর হইতে ছবির মত দেখাইতেছে, বড় বড় মহাজনী নৌকা পালভরে কত দিক্‌দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে! একখানি খেয়া নৌকা এই বৃষ্টির মধ্যেও অপর পার হইতে এ পারে, আসিতেছে; তালপত্রের ছাতা মাথায় দিয়া মাঝি শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া বসিয়া আছে, দু জন বলবান্ দাঁড়ী হাতের শিরা ফুলাইয়া, নদীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সবলে দাঁড় টানিতেছে। দূরে গিয়া স্রোতের মুখে ফেলিবার জন্য নদীর কূলে কূলে নৌকা উজানে চালান হইতেছে। নৌকার উপর চাউল বিক্রেত্রীগণ নূতন আউসের চাউল লইয়া এপারে বিক্রয় করিতে আসিতেছে। সম্মুখে চিংড়িমাছের চুবড়ি নামাইয়া মেছনী নৌকার বাঁশের পাটাতনের উপর বসিয়া আছে। একটা বংশদণ্ড বিশিষ্ট কালো ছাতা মাথায় দিয়া বাউসুমারির চৌকীদার নৌকায় চড়িয়া থানায় হাজিরা দিতে চলিয়াছে, তাহার অঙ্গে নীলকোট, লালপাগ্‌ড়ি এখন দোছোটরূপে চৌকীদার-বরের স্কন্ধে বিরাজিত, টিনের চোঙাটি কটিদেশে আবদ্ধ, জানুদেশ পর্য্যন্ত কর্দ্দম বিরাজিত, দুইবস্তা আউশ ধান লইয়া দুজন চাষা নৌকার উপর এক পাশে বসিয়া 'চাষার নশিবে' আল্লা কি পরিমাণ 'দুসুখ্' লিখিয়াছেন। তাহারই আলোচনা করিতেছে। নৌকাখানি ভাটিতে পড়িয়া খরস্রোতে তর তর করিয়া কূলের দিকে অগ্রসর হইতেছে, টলমল করিয়া দুলিতেছে।

গৃহলক্ষ্মীগণ বৃষ্টিতে ভিজিয়াই গৃহস্থালীর সকল কাজ শেষ করিয়াছেন। প্রাঙ্গণে কূপ একহাত লম্বা, দড়ি হইলেই এখন কূপের জল তুলিতে পারা যায়, কলসি কলসি জল তুলিয়া তাঁহারা সেই বৃষ্টির মধ্যেই কূপ সন্নিকটবর্ত্তী স্নানে বসিয়া ছাই ও পাকা তেঁতুল সহযোগে বাসনগুলি ঝকঝকে করিয়া মাজিয়া, গৃহগুলি গোময়ানুলিপ্ত করিয়া, তুলসীমঞ্চ পরিমার্জ্জিত করিয়া স্নানান্তে হেঁসেলে প্রবেশ করিয়াছেন। উননে দুধের কড়া বসান, ভিজেকাষ্ঠ কিছুতেই ধরিতেছে না, তাই কেহ কেহ চালের খড় টানিয়া উননে দিয়া ক্রমাগত ফুৎকার দিতেছেন, প্রচুরোদ্যত ধূম্রে বধূর চক্ষু ছল ছল করিতেছে, ক্রমাগত ফুৎকারে মুখ লাল হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার আর্দ্র কেশজাল পৃষ্ঠদেশে লতাইয়া পড়িয়াছে, কাহারও কেশাগ্রে একটি গ্রন্থি বাঁধা, ধূমে কুহ, পরিপূর্ণ

ক্ষুদ্র বাতায়ন পথে কুণ্ডলী পাকাইয়া তাহা বাহিরে আসিতেছে। খড়ের চালের উপর চাল কুমড়ার গাছ, বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া চালখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে পীতবর্ণের বড় বড় ফুলগুলি সবুজ পাতার ভিতর হইতে স্বর্ণাভা বিকীর্ণ করিতেছে। নিকটে একটা শুজনে গাছ, চুই একটা ভিজে কাক একবার তাহার শাখায়, একবার ঘরের চালে, একবার বা রান্নাঘরের মুরির নীচে রক্ষিত ফেন জলের গামলার উপর আসিয়া বসিতেছে—'কা' 'কা' করিয়া ডাকিয়া মানসিক অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। একটা বিড়াল ভাঁড়ারঘরের হাঁড়ি কলসি রাখিবার মাচার নীচে সুখনিদ্রায় মগ্ন, তাহার তিনটি শাবক সমান্তরাল ভাবে ভূতলে দেহ-প্রসারণ করিয়া মাতৃস্তন্যে ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেছে। একটা কুকুর, ঢেঁকি ঘরের পরচালার নীচে ছাইগাদার উপর কুণ্ডলাকারে শয়ন করিয়া আছে। রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটা গরু উচ্ছিষ্ট কদলীপত্র চর্ব্বণ করিতেছে, চর্ব্বণ-সুখে নিমিলিত-নেত্র, তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বৃষ্টিধারা ঝরিতেছে। অদূরে বাঁশতলায় বর্ষাজলপুষ্ট নিবিড় বন,—চুটো শিয়াল তাহার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিতেছে। অশথ তলায় প্রকাণ্ড গর্ত্ত, বর্ষার জলে পরিপূর্ণ। সেই গর্ত্তের ধারে ছোট একখান তক্তা পাতিয়া সত্তর মা তাহার উপর ক্ষারসিক্ত ময়লা কাপড়গুলি আছড়াইয়া কাচিতেছে। গর্ত্তের ধারে কচুবন, ঢাল ঢাল কচু পাতায় বৃষ্টির জল আট্‌কাইয়া মুক্তার মত টলটল করিতেছে। বাঁশবনে বাঁশের আগা বায়ুভরে লুটোপুটি করিতেছে; নর্দ্দমা বহিয়া গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গন ও পথের জলরাশি কলকল শব্দে গর্ত্তের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। ব্যাঙগুলা গর্ত্তের নূতন জলে নানাস্বরে নানারাগিণীতে গান করিতেছে। ছোট বড় ডোবা, গর্ত্ত, নর্দ্দমা প্রভৃতির সংকীর্ণ মিলনপথে গ্রামবাসিগণ বংশ-নির্ম্মিত বৃত্তি বসাইয়া গিয়াছে, নানাপ্রকার মাচ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া তাহার মধ্যে বিশ্রাম লাভ করিতেছে।

বেলা দশ এগারটার সময় বৃষ্টির প্রকোপ কমিয়া আসিল। গ্রাম্য ইস্কুলের ছেলেরা শ্লেট, খাতা ও পুস্তকগুলি চাদরে জড়াইয়া, কটিদেশে বাঁধিয়া, খালিপায়ে মল্লবেশে স্কুলের দিকে চলিয়াছে। মুখ যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ, সমস্ত সকাল বেলাটা ধরিয়া বৃষ্টি হইয়া এখন ঠিক স্কুলের সময়টিতেই বৃষ্টি ধরিয়া গেল! কেহ কেহ 'রেণি-ডে' লাভের দুরভিসন্ধিতে জামা ও কাপড় নর্দ্দমার জলে ভিজাইতেছে, কেহ কেহ চলিতে চলিতে পিছলের উপর সথ করিয়া আছাড় খাইতেছে, আশা—স্কুলে উপস্থিত হইবামাত্র বস্ত্রের শোচনীয় অবস্থা দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ ছুটি পাইবে। মাষ্টার পণ্ডিত কেহই এখনও ইস্কুলে পদার্পণ করেন নাই, ছোট ছোট ছেলেরাই স্কুলের বাহিরে সেই অল্প বৃষ্টির মধ্যেই ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ কাহাকেও প্রহার করিতেছে, জিহ্বা বাহির করিয়া কেহ কাহাকেও মুখ ভেঙাইতেছে, কেহ কাহারও একপাটি চটি লইয়া তদ্দ্বারা ফুটবলের অভাব মিটাইতেছে। পাঁচ সাতটি বালক নাচিতে নাচিতে সুর করিয়া বলিতেছে—

"রেণ্ কম ঝমাঝম,—
আমরা এলাম তাড়াতাড়ি,
মাষ্টার গেল শ্বশুরবাড়ী।"

আজ অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য গ্রাম্যহাটে অধিক সামগ্রী বিক্রয় হইতে আসে নাই। তরকারী বিক্রেতারা লাল কস্কার শাক, শোলা কচু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলা, পটোল, সাদা আলু ও কাঁচা কলা লইয়া এক হাঁটু কাদার মধ্যেই ঝোড়া সমেত বসিয়া গিয়াছে। বাগ্দিনীরা একধারে বসিয়া গোড়া লেবু, ওল, কলমী ও হেলাঞ্চার শাক, শশা, কুমড়ো, ঝিঙে, কাল কাল পাকা তাল বিক্রয় করিতেছে। ভাদ্রের পাকা তাল পল্লী অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সামগ্রী, বর্ষার অপরাহ্নে পল্লী যুবকগণের পরম রমণীয় মুখরোচক খাদ্যের মধ্যে একটি প্রধান খাদ্য—তালের বড়া। পল্লীগ্রামে বাস করিয়া যে ব্যক্তি তালের বড়ায় রসনেন্দ্রিয়ের কখন তৃপ্তিসাধন না করিয়াছে তাহার জীবনই বৃথা, পল্লীগ্রামে বাসও বৃথা। বাড়ীর অদূরে তালবৃক্ষের মূলে 'ধম্' করিয়া পাকা তাল পড়িবার শব্দ হইলে—ছেলে মেয়েরা যে উৎসাহে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ছুটিয়া যায়, এবং তাহা লাভ করিয়া যে আনন্দ-উদ্দীপনায় তাহাদিগের শিশু-হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তাহা না দেখিলে অনুভব করা যায় না।

মেছো বাজারে মাছের আমদানী এ সময়ে প্রায় একেবারে বন্ধ, মাছের দুর্ভিক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুই এক ঝোড়া চিংড়ি, বেলে, কৈ, জিয়োল প্রভৃতি মাছ লইয়া মেছুনীরা তাহা বিক্রয় করিতে বসিয়াছে; হাটের এই অংশ খুব সরগরম। ক্রেতাদিগের ছত্রাচ্ছাদিত মস্তকগুলি মেছুনীর

ডালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দৈবাৎ একজনের ছাতার শিকে আর একজন ক্রেতার মস্তকে কিছু আঘাত লাগিল; আহত ক্রেতাটি তাহার মাছের 'টোকা' উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল "বাহারে মজা! চোখে দেখ্‌তে পাওনা নাকি? আর একটু হ'লেই চোখটা যে কাণা হয়ে গিয়েছিল!" ছত্রধারী বলিল, "কাণা হওনি ত, অত চোট্‌ কেন বাবু"—সঙ্গে সঙ্গে মেছুনিকে বলিল, "দেনা বেটি আর একমুটো চিংড়ি, নিযে চলে যাই।" মেছুনি দুইবার চিংড়ি ফাউ দিয়াছে, আবার ফাউ চাওয়াতে তাহার ধৈর্য্য নষ্ট হইল। সে ক্রেতার হস্তস্থিত কচুর পাতা হইতে মাছগুলি কাড়িয়া লইবার জন্য সবেগে হাত বাড়াইয়া দিল, বলিল, "আ মোলো যা অলপ্পেয়ে মিনসে, এক পয়সায় এক ঝুড়ি মাছ খেতে এসেছে। আর মাছ খেতে হবে না, যা। এই বাদলায় গাঙ্গের জলে মাছ মিলছে কি না?" হঠাৎ বাজারের কয়াল সেই দ্বন্দ্বক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল। সে সেই জন প্রাচীর ভেদ করিয়া মেছুনির ডালা ঠেলিয়া তাহার ঝুড়ির ভিতর হাত পুরিয়া দিল এবং মুঠা ভরিয়া চিংড়ি তুলিয়া লইয়া তাহা নিজের ঝোড়ায় নিক্ষেপপূর্ব্বক ব্যস্তভাবে অন্য দোকানে চলিল। মেছুনী রাগ করিয়া ঝুড়িটা ঠেলিয়া ফেলিয়া কয়ালের সপ্ত পুরুষ নবকস্থ করিতে করিতে মুখে ঝড় বহাইতে লাগিল। সে ঝটিকাবেগ অসহ্য ভাবিয়া ও তাহার রুদ্রমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ক্রেতার দল সসম্ভ্রমে দুই হাত তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘোলা মেঘ করিয়া আবার প্রবল বেগে বৃষ্টি আসিল। অট্টালিকা সমূহের ছাদ হইতে মুরি দিয়া কল কল শব্দে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কাগজের নৌকা প্রস্তুত করিয়া বাতায়ন পথে তাহা রকের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ তক্তপোষের উপর দাঁড়াইয়া "ঐ আমার নৌকা আগে যাচ্ছে" বলিয়া করতালি দিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। খড়ের ঘরের 'ছাঁচে' জলের স্রোত বহিতে লাগিল, তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ উঠিয়া মনুষ্যজীবনের নশ্বরতার উদাহরণস্বরূপ মুহূর্ত্তে লয় পাইতে লাগিল। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ বৃষ্টির সুযোগ দেখিয়া আজ পলাণ্ডুখচিত খেঁচুড়ীর আয়োজন করিলেন; দরিদ্রগণেরই যত কষ্ট, তাহারা ভিজেকাঠের জালে কোন প্রকারে আউসের মোটা চাউল সিদ্ধ করিয়া কচুসিদ্ধ, শজনের শাক ভাজা ও কাঁচা তেঁতুলের অম্বল দিয়া উদরস্থ করিল। যাহারা বাজারে যৎকিঞ্চিৎ চিংড়ি মাছ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, তাহারা পুঁইশাক দিয়া পুঁই চিংড়ির আস্বাদনে রসনা তৃপ্ত করিল। পল্লীললনাগণের নিকট পুঁইশাক বর্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তরকারী।

ছেলে মেয়েদের আহার শেষ হইলে, কেহ ঘরে গিয়া শয়ন করিল, যে বাড়ীতে ছেলে মেয়ের সংখ্যা অধিক, সে বাড়ীর বালকবালিকাগণ চক্রাকারে বসিযা 'আগডুম বাগডুম' খেলিতে লাগিল, একটু অধিক বয়স্কা মেয়েরা 'ঘুটিং' লইযা খেলা করিতে বসিল। কর্ত্তারা আহারান্তে তামাক টানিতে টানিতে তন্দ্রামগ্ন হইলেন, কোন কোন বাড়ীতে পাশার আড্ডা পড়িল। অন্দরের মেয়েরা পা ছড়াইয়া আহারে বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দত্তদের ছোট জামাই, বোসেদের মেজ বৌ, মজুমদারদের নগিন্নি এবং চাটুর্য্যেদের হারাণী সম্বন্ধে নানা কথার সমালোচনা চলিতে লাগিল। কোন বিরহিণী আহারান্তে নির্জ্জন ঘরের বাতায়নপ্রান্তে বসিয়া পরম আগ্রহভরে প্রিয়তমকে পত্র লিখিতেছেন, এক একবার সভয়ে দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, যদি কেহ হঠাৎ আসিযা পড়ে! আকাশে কালমেঘের শোভা, জলের ছলছল শব্দ, মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন, ভেকের আনন্দ ধ্বনি আর আর্দ্র বায়ুর হিল্লোল—বর্ষা-প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি একত্র মিলিযা তাহার বিরহখিন্ন ক্ষুব্ধ হৃদয়কে সংসারের প্রতি উদাসীন করিয়া তুলিতেছে। তাহার অধীরচিত্ত যেন সংসারের মোহাচ্ছাদন বিদীর্ণ করিয়া মুক্তপক্ষ প্রজাপতির ন্যায় কোন অজ্ঞাত রাজ্যে চির আকাঙ্ক্ষিতের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতেছে। হৃদয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে একটা অভাব, একটা অতৃপ্তি একটা বেদনা কেন যে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছেনা, এবং পত্রেও সেভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রাণের সকল কামনা ঢালিয়া লিখিতেছে, "প্রিয়তম, এমন দিনে তুমি কোথায় আছ, তোমার জন্য আমার মন বড় কেমন করিতেছে।"

সূর্য্যদেব মেঘের অন্তরালে থাকিয়াই ধীরে ধীরে অস্তগমনোন্মুখ হইলেন। আর বেলা নাই। ঘাট হইতে জল আনিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া পুরললনাবর্গ চুল বাঁধিয়া, কক্ষে কলসী লইয়া দল বাঁধিয়া জল আনিতে চলিল। এ জল আনিতেই হইবে; দুর্য্যোগে মাথার উপর আকাশ ভাঙ্গিয়া

পড়িলেও, নদী, দিঘী বা সরোবরের জল আনিতে যাইতে হইবে।

" বেলা যে পড়ে এ'লো জল্‌কে চল "

এই পুরাতন সুর বঙ্গের প্রতিপল্লীতে দিবাবসানে সখী-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াও কোন দিন নবীনত্ব বঞ্চিত হয় নাই। ঘরের কলসীতে জল থাক বা না থাক, একবার 'জলকে চলিতে' হইবেই। সেই তরুলতাবেষ্টিত বিজন বনপথ, বাঁশের বন, অশথের তল, বায়ুর অব্যাহত গতি এবং মুক্ত আকাশতলে, দুঃখের পর দুঃখের প্রসারণ, নির্ভয়ে প্রিয়সখার সহিত বিশ্রম্ভালাভ,—সখীজন ইহার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিতে পারে?

হঠাৎ মেঘান্তরিত গগনপথ উদ্ভাসিত করিয়া অস্তাচল-যাত্রী তপনের লোহিত কিরণচ্ছটা ধারাপাত পুষ্ট সজল শ্যামল প্রকৃতির উপর বিকীর্ণ হইল, বোধ হইতে লাগিল—প্রকৃতির চক্ষে অশ্রু ও অধরে হাস্য শোভা পাইতেছে। বাঁশগাছের নতমস্তকে, গৃহস্থের 'খোড়ো' চালের মটকায়, তেঁতুল গাছের স্থানাবড় পত্রাগ্রভাগে রৌদ্র ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। গ্রাম্যপথের কাদা ভাঙ্গিয়া গোপবালকবৃন্দ মাঠ হইতে গাভীগুলিকে গৃহমুখে আনিতেছে। গোপপল্লীর প্রতিগৃহ হইতে সাঁজালের ধুম উঠিতেছে, পোয়াল গাদার কাছে দাঁড়াইয়া দুই তিনটি গরু উন্নমিত মুখে পোয়াল চর্ব্বণ করিতেছে, নিকটে কয়েকজন কৃষাণ 'খোলায়' কতক-গুলি সদ্যঃকর্ত্তিত আউস্ ধানের আটি বিছাইয়া বলদ দিয়া তাহা 'মলাই' করিতেছে। পাঁচটি বলদ একরজ্জুতে শ্রেণী-বদ্ধ, ধানের আটির উপর তাহারা ক্রমাগত ঘুরিতেছে, একজন কৃষক বলদগুলির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। তাহার হাতে হুঁকা কলিকা, বাম হস্তে হুঁকা ধরিয়া নাক মুখ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া সে প্রবল টানিতেছে, দক্ষিণহস্তে অবাধ্য বলদের লেজ মলিতেছে, কখন বা বলদের পিঠে সজোরে পাচনের আঘাত করিতেছে, আর একজন কৃষাণ একটা 'কাঁদাল' দিয়া (লোহার হুক যুক্ত দীর্ঘ বংশদণ্ড) বলদের পদতলের ধানের আটি উলটাইয়া দিতেছে। তাহার অদূরে একটা তালপত্রের ছাতি পড়িয়া আছে, সম্মুখবর্ত্তী সংকীর্ণ পথ দিয়া একজন কৃষাণ তাহার 'মাথালের' উপর এক আটি ঘাস লইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়াছে; পথের উপর একটা বাবলা গাছ, তাহার শাখায় বসিয়া গোটাকত 'ক্যাচকেচে' পাখী ক্রমাগত 'ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌' করিতেছে। ঘোষানী তাহার ঘরে বসিয়া বড় 'তোলো' হাঁড়িতে ধানসিদ্ধ করিতেছে, তুঁষের জ্বালে ধানসিদ্ধ হইতেছে, দপ দপ্‌ করিয়া তুঁষগুলা জ্বলিতেছে,—ঘোষানীর ক্রোড়ে স্তন্যপানরত শিশু। বারান্দায় একটা ছেঁড়া মাদুর জড়ান কতকগুলি শুষ্কপ্রায় ধানের স্তূপ। সিক্ত খড়ের চাল হইতে ফোটা ফোটা বৃষ্টির জল এখনও ছাঁচের নীচে গড়াইয়া পড়িতেছে—বর্ণ কৃষ্ণাভ লাল। প্রাঙ্গনে শশা ও ঝিঙের টালে ঝাঁকে ঝাঁকে বুল্ বুল পীতবর্ণ ফুলগুলি কাটিয়া ফেলিতেছে, কচি কচি শশাগুলিও কাটিতেছে, তাহাদের সহর্ষ কণ্ঠস্বরে টালটি ঝঙ্কারিত, টালের উপর একটা কঞ্চিতে কয়েকটি শামুক গুচ্ছাকারে আবদ্ধ—এক একবার বায়ু-হিল্লোলে সে গুলি থর্‌থর্ করিয়া নড়িতেছে, আর পাখীগুলি এক একবার ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া অদূরবর্ত্তী নিম গাছের পাতার ভিতর গিয়া বসিতেছে—আবার ক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিতেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র গ্রাম খানি আচ্ছন্ন করিল। ভাঁট ও কাল কাসিন্দের পাতায় পাতায় জোনা-কীর মান আলো মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গ্রাম্য বাজারের দোকানে দোকানে দীপাবলী প্রজ্জ্বলিত হইল, দেব মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। গ্রাম্য কালী মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ঘন শাখাপত্র সমন্বিত সুবৃহৎ বকুল বৃক্ষমূলে গঞ্জিকাসেবী সন্ন্যাসিগণ ধুনী জ্বালিয়া মহা উৎসাহে গাঁজা টানিতে লাগিল, তাহাদের 'বোম বোম' শব্দ বায়ু-তরঙ্গ কম্পিত করিয়া চতুর্দ্দিকে সুগম্ভীর প্রতিধ্বনি উত্থিত করিল। দোকানদারগণ স্ব স্ব দোকানে ধুনা জ্বালাইয়া, দোকানের দ্বারে দ্বারে জলসেক পূর্ব্বক 'লক্ষণ' করিয়া পিতলের ময়লা বা পিলসুজের উপর সংস্থাপিত মৃৎ-প্রদী-পের মৃদু আলোকে বসিয়া সুর করিয়া "কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ" পাঠ করিতে লাগিল। দাড়ী গোঁফ কামানো মোটা কাঠের মালা গলায় প্রৌঢ় দোকানদার দোকানের মাদুরের উপর বসিয়া, ময়লা সূতা বাঁধা একখান পুরাতন কাঁচের চসমা নাকে লাগাইয়া, বটতলার পুঁথি হইতে সেই বহু প্রাচীন যুগের সুখ দুঃখ ও আশা নিরাশার অনিন্দ্য সুন্দর কাহিনী মাথা দুলাইয়া, অক্ষরের পর অক্ষর মিলাইয়া পাঠ করিতেছে—শ্রোতৃগণ রুদ্ধ নিশ্বাসে নিবিষ্ট মনে স্তব্ধ

ভাবে তাহা শ্রবণ করিতেছে। এই সাহিত্য-রসে তাহারা চিরনিমগ্ন; রামায়ণ ও মহাভারত, তাহাদিগের পল্লী-জীবনের অবসরকাল-ক্ষেপণের জন্য, ভাষার অনন্ত ভাণ্ডার।

বাজারের ভিতর দিয়া পাকা সড়ক থানা পর্য্যন্ত প্রসারিত, ইহা গ্রাম্য মিউনিসিপালিটীর গৌরবময় পদাঙ্ক রেখা। এই পথের উপর দিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে সমাগত একখানি গো শকট হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, গাড়ীর চাকা দুখানি কর্দ্দমে সমাচ্ছন্ন, বলদের লেজের কর্দ্দমে গাড়োয়ানের সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত। ছৈয়ের ভিতর আরোহিণী আছে বলিয়া তাহার সম্মুখভাগ এক খানি পাতলা চাদর দিয়া ঢাকা, গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে প্রকাণ্ড একটা ঘাসের বোঝা, তাহার উপর বলদের 'জাব' মাখিবার টোকরা, গাড়ীর নীচে একটা গোলাকার টিনের লণ্ঠন, ভিতরে একটি কেরোসিনের টিমি, লণ্ঠনের গাত্রস্থ ছিদ্র পথে আলো অপেক্ষা অধিক ধূম নির্গত হইতেছে। এই লণ্ঠনটি পথ দর্শনের সৌকর্য্যার্থ নহে, গ্রাম্য মিউনিসিপালিটির আদেশ পালনার্থ এস্থানে রক্ষিত। মিউনিসিপালিটীর কড়া হুকুম, আলো সঙ্গে না লইয়া যে সকল গাড়ী 'সহরের' ভিতর প্রবেশ করিবে, তাহাদিগকে পাঁচ আইনের বলে আটক্ করিতে হইবে। গাড়োয়ানেরা বুদ্ধিমান্, এমনই করিয়া তাঁহারা পাঁচ আইনের এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের আবর্জ্জনাস্বরূপ মিউনিসিপালিটীর সম্মান রক্ষা করে।

মেঘ কাটিয়া গিয়া পূর্ব্বাকাশে শুক্ল পক্ষে শশধর সমুদিত হইল। সহসা বর্ষান্তে শরৎ যেন তাহার শুভ্র মহিমায় ধরাতলে বিকসিত হইয়া উঠিল, উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে সিক্ত প্রকৃতি হাসিতে লাগিল। গ্রামের জলপূর্ণ ডোবা ও গর্ত্তগুলিতে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইতেছে, গৃহস্থগণের বেড়ার ধারে রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধা কুসুম ক্ষীণবৃন্তে ভর করিয়া ঊর্দ্ধ মুখে সুমিষ্ট গন্ধ বিকিরণ-পূর্ব্বক তরল জ্যোৎস্নালোক ও বায়ুস্তর সুরভিত করিতেছে। কামিনী গাছের নিবিড় পত্র আচ্ছন্ন করিয়া থোকা থোকা কামিনী ফুল ফুটিয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বালক বালিকাগণ জ্যোৎস্নালোকে পুলক-স্পন্দিত হৃদয়ে ঠাকুরমার কাছে 'রূপকথা' শুনিতেছে—ঠাকুরমার হস্তে হরিনামের মালা। বধূগণ কেহ কোলের ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইতেছেন; কেহ দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে ক্রন্দনশীল শিশুকে অদূরবর্ত্তী তেঁতুল গাছে জোনাকীর স্পন্দন দেখাইয়া জুজুর ভয় দেখাইতেছেন; কেহ নিদ্রিত শিশুকে তাহার ভগিনীর কাছে শোয়াইয়া রাখিয়া ভাত রাঁধিতেছেন, শিশুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণিদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ, কজ্জলপূরিত নয়ন মুদ্রিত, তাহার বক্ষের উপর বস্ত্র খণ্ড, শিথানে কাজল-লতা, প্রদীপের ম্লান আলো তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার মুদ্রিত নয়নের ঊর্দ্ধে অস্ফুট ভ্রূ এক একবার সঙ্কুচিত হইতেছে, ওষ্ঠ এক একবার কম্পিত হইতেছে। তাহার মা উননের সম্মুখে বসিয়া ভাত রাঁধিতেছেন, উননের অগ্নি রাশির কম্পিত আলোক শিখা মুখের উপর আভা বিস্তার করিয়া সেই গ্রাম্য যুবতীর সরল সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে।

কৃষক-পল্লীতে কৃষকগণ খঞ্জনী বাজাইয়া গলা কাঁপাইয়া আকাশে সুর তুলিয়া বেহুলা লখিন্দরের গান করিতেছে। দিবসের পরিশ্রমের পর সূত্রধর-নন্দনগণ ডুগি বাজাইয়া মাথা নাড়িয়া বে-সুরে চীৎকারপূর্ব্বক গাহিতেছে—

"আমার বাড়ী এসো যাদু বস্‌তে দেবো পিঁড়ে
জল পান করতে দেবো সরু ধানের চিঁড়ে।"

অদূরবর্ত্তী কলুপাড়ার ঘাণিঘরে ক্যাঁ-কোঁ করিয়া ঘানির শব্দ উঠিতেছে, সে শব্দের বিরাম বিশ্রাম নাই, বলদ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ঘানি গাছের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে আর অশ্রান্ত ক্যাঁ-কোঁ শব্দ উঠিতেছে। কিন্তু সে সকল শব্দকে ডুবাইয়া, নিতাইদাস বৈরাগীর আখড়া হইতে বহু কণ্ঠের সংকীর্ত্তন শব্দ উত্থিত হইয়া গ্রাম পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। তালে তালে মৃদঙ্গ বাজিতেছে, আর গায়কগণ বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে টিকি দুলাইয়া মুখ-ব্যাদান-পূর্ব্বক প্রাণপণে চীৎকার করিয়া গাহিতেছে—

"সংকীর্ত্তন মাঝে আমার গোরা নাচে"

দেখিতে দেখিতে আকাশ আবার ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইল, চন্দ্র মেঘের অন্তরালে লুপ্ত হইল। আবার ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামখানি জনহীন ও সুপ্ত বোধ হইতে লাগিল। কেবল চারিদিকে জলের ঝর্ ঝর্ শব্দ, ভেকের গ্যাঁৎ গ্যাঁৎ হর্ষধ্বনি, শন্ শন্ বায়ু-প্রবাহ অন্ধকার-মণ্ডিতা বৃষ্টি প্লাবিতা নৈশ-প্রকৃতির জীবন-প্রবাহের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে লাগিল। গ্রামবাসিগণ শয্যালীন, কাহারও ওষ্ঠে হাস্য, কাহারও চক্ষে

অশ্রু। কেবল জন্মদুঃখিনী বিধবা ও প্রোষিতভর্তৃকা বিরহিণী অন্ধকার গৃহের মুক্ত বাতায়নপথে তাহাদের কাতর হৃদয়ের যে নীরব বেদনা উচ্ছ্বাস বিধাতার উদ্দেশে উৎসারিত করিতে লাগিল—তাহা সেই সর্ব্বদর্শী চির-জাগ্রৎ অনাদি অনন্ত দেবতা ভিন্ন অন্য কাহারও মর্ম্মস্পর্শ করিল না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

হিমাচল বক্ষে।

(৩)

অপরাহ্নের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সঙ্গী স্বামীজির নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বামিজী বলিলেন, "এখন কর্ত্তব্য কি"? আমি বলিলাম, "কর্ত্তব্য মহদাশ্রয়। জমীদার মহাশয়ের পাইক যখন আমাদিগকে ভরসা দিয়াছে, আর তিন মাইল চলিলেই তিহরীর রাজার আর একখানি বাঙ্গালা পদধূলির স্পর্শে পবিত্র করিতে পারিব, তখন আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য ত কিছু নাই। সমস্ত দিন এখানে কাটিল, আর ত ভাল লাগে না।"

স্বামীজির বোধ করি, রাত্রিতে আহারের আবশ্যককতা ছিল না। তিনি যাত্রার নামটি না করিয়া দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিলেন; বলিলেন, "তা বাপু, ভাল না লাগ-লেও সমস্ত জীবনটা এইরকম করিয়া কাটাইতে হবে। অদৃষ্ট ছাড়াইয়াত আর পথ নাই। অদৃষ্টই যদি বশে রাখিতে পারিবে ত, সুখে থাকিতে এরকম ভূতের কিলের রসাস্বাদন করিতে এ পথে আসিলে কেন?"—আমি বলিলাম, "বৃদ্ধেরা যখন সামর্থ্য ও উৎসাহের অভাবে ক্রমাগত সাবধান হইয়া চলিবার উপদেশ প্রদান করেন, তখন যুবকেরা স্ব স্ব উন্মত্ত যৌবন ও অসীম আগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। তাহাতে তাহারা শান্তি না পাক্, সুখ পায় বটে; আমি সে সুখে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করি না।"—আমি লাঠি ও কম্বল লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। আর কি বৃদ্ধ স্থির থাকিতে পারেন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা উভয়েই পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথটির কিছু বিশেষত্ব দেখা গেল। পথের পার্শ্বে কোন দিকে একখানি গ্রাম নাই, পথও পরিষ্কৃত নহে, লতা-গুল্ম জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া যেন পথের একটা অস্ফুট ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে, অপরাহ্নের সূর্য্যালোকে সেই বক্র সঙ্কীর্ণ পথচ্ছায়াকে সেই পার্ব্বত্য বন্য প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্য পুষ্পমালার মৌনচ্ছায়া বলিয়া মনে হইতে লাগিল। স্বামীজি সেই পথের উপর দিয়া নির্লিপ্ত সন্ধ্যার শ্রান্ত পথিকের মত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন, গমনের সেই উদাসীন ভঙ্গি তাঁহার মত লোকের পক্ষেই সম্ভব। যিনি নিশ্চিত জানেন, সন্ধ্যার পর স্বগৃহ-সান্নিকটবর্ত্তী পান্থের ন্যায় তাঁহার আশ্রয় অবশ্যই মিলিবে, তিনি এমনই বিশ্বাসভরে, নিরুদ্বেগে চলিতে পারেন। যিনি ইহ সংসারের সর্ব্বস্ব পরম দেবতার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার করুণা-কণাকে মাত্র ইহ জীবনের অবশিষ্ট কতিপয় দিনের অন্তিম অবলম্বনস্বরূপ জ্ঞান করিতেছেন, তিনিই এমন প্রসন্ন মনে অব্যাকুলচিত্তে চলিতে পারেন। কিন্তু আমার মনে সে বিশ্বাস, সে প্রসন্নতা, সে নির্ভর নাই,আমার কোন উদ্দেশ্যই নাই—তবু আমি উদ্ধশ্বাসে চলিতে লাগিলাম। কোন্ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ধাবে চলিব? সহিষ্ণুতা-লক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিয়া আমি এই কয় বৎসর যেভাবে চলিয়া আসিয়াছি, আজও তেমনি চলিতে লাগিলাম। আমার অজ্ঞাতসারেই আমার গতির বৃদ্ধি হইল, স্বামীজি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেন। তিনিও ডাকিলেন না, আমিও তাঁহার জন্যে অপেক্ষা করিবার আবশ্যকতার কথা ভুলিয়া গিয়া-ছিলাম। বৃদ্ধ হয়ত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন, "স্নেহ-ডোরে তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া বাঁধিয়াছি, সে পলাইবে কোথায়?"

হায়, বাঁধিলেই যদি আটকাইয়া রাখা যাইত!

আমার একটা লক্ষ্য ছিল, সন্ধ্যাকালে একটা আড্ডা চাই। সমস্ত জীবনটাই ত এই রকম এক আড্ডা হইতে আর এক আড্ডা পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছি। এক সময় আড্ডাকে সত্য ঘর বাড়ী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। মানুষ দুর্ব্বল, সম্পূর্ণ দূরদৃষ্টিহীন, একান্ত ঘটনাচক্রের দাস, সুতরাং হয়ত আবার এক দিন এই রকম আর আড্ডাকেও সুখের অনন্তকালস্থায়ী গিরি-দুর্গ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্ত যখনকার কথা বলিতেছি, তখন সন্ধ্যার আড্ডা এক বিশ্রাম-নিকেতন বলিয়াই মনে হইত। সমস্ত দি

ার
পাই
ল না।

পরিশ্রমের পর মুক্ত গিরিক্রোড়ে আমার জীর্ণ কম্বলখানি প্রসারিত করিয়া শ্রমখিন্ন পদদ্বয়কে বিশ্রামদানের জন্য তাহার উপর পড়িতাম, আর আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিশ্ববিধাতার উদ্দেশে চাহিয়া বলিতাম

"পাপ-তিমির-চন্দ্র তপন, নাশ তাপ মোহ-স্বপন
করহ প্রেম-বীজ বপন, সিঞ্চি ভকতি-বারি।"

তখন মনে যে আনন্দ, যে তৃপ্তি, যে সুখ পাইয়াছি, স্নেহ ও মায়ার এই সহস্র বন্ধনে আর সে আনন্দ, সে সুখ, সে তৃপ্তি পাইলাম না। পাশ্চাত্য দর্শনে বলে, "Life is earnest, life is real"—আমার শঙ্করাচার্য্য ঠাকুর উপদেশ দান করিলেন, "নলিনীদলগতজলমতিতরলং—তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।" এই তর্কের মীমাংসা কোথায়? তুমি শক্র-শোণিতে তাহাদের সুখময়ী শান্তিময়ী জন্মভূমি কলঙ্কিত করিয়া বলিবে, "উহারা অসভ্য, আমরা উহাদিগকে সভ্য করিব,"—আর আমি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীরস্বরে বলিবে, "Life is real, life is earnest"—এ তোমাদের খৃষ্টানী মত। আমাদের প্রাচ্য মত ঐ "তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।" সত্যই ত জীবন অতি চপল ক্ষণপ্রভ দীপ্তিবৎ চঞ্চল, এই সামান্য সময়টুকু ভূমানন্দ স্বামীর চরণপঙ্কজ ধ্যান কর। আমাদের এ মত ভ্রাতার বুকে ছুরী বিঁধাইয়া পিতৃরাজ্য অপহরণ করিবার কল্পনাও করে না। তথাপি সুখের যাহা আবরণ মাত্র, তাহাকেই প্রকৃত সুখের পদে বরণ করা তোমাদের জীবনের একটি মহৎ শিক্ষা।—কিন্তু যে সুখ প্রাচ্যমতে শ্রেষ্ঠ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমার এ উদাসীন হৃদয় সংসারের মধ্যে কোথায় শান্তি লাভ করিবে?

তাই ত, জীবনের অসারতার কথা চিন্তা করিতে করিতে নিতান্তই অসার লোকের মত কাজ করিয়া ফেলিয়াছি। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কেবলই 'বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে' দ্রুতবেগে চলিতেছি। এ পথের কি শেষ নাই? পৃথিবীর পথ ত এক দিন শেষ হয়, কিন্তু আজ এ একেবারে অনন্ত বোধ হইতেছে। সমুচ্চ বৃক্ষশ্রেণী তাহাদের পল্লবে অন্ধকার বাঁধিয়া আমার মস্তকের উপর তাহা নত করিয়া ধরিল। আমি একবার স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলাম, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, পর্ব্বত-গাত্রে মীরজের বাঙ্গালা দেখিতে পাওয়া যায় কি না; কিন্তু চক্ষুর সম্মুখে মরীচিকার মত তাহার একটা ছায়াও দেখিতে পাইলাম না। একবার ভয়চকিত নেত্রে দূরে চাহিলাম। দেখিলাম, পর্ব্বতশ্রেণীর শৃঙ্গগুলি দূর হইতে দূরে তরঙ্গিত হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর গোধূলির শেষ রৌদ্রচ্ছটা একটু স্বর্ণময় আভা অঙ্কিত রাখিয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে সন্ধ্যার ধূসর ছায়ার লঘু রেখাপাত হইয়াছে। ঊর্দ্ধে চাহিলাম, গগনপথ অন্ধকারাচ্ছন্ন, সে নীল সরোবরে একটা নক্ষত্র-কমলও তখন ফুটিয়া উঠে নাই।

সভয়ে পদতলে চাহিলাম, দেখিলাম, পথ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে—কে জানে, কোন্ ভীষণ জন্তুর গুহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া এ পথের শেষ হইবে। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে নানা হিংস্র জন্তু আছে, তাহা জানিতাম, বুঝিলাম—পথ ভুলিয়া আসিয়াছি। বুঝিলাম; মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলাম—"তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্"—এখান হইতে অদূরবর্ত্তী ব্যাঘ্রের গুহায় প্রবেশ করিতে যতখানি সময় লাগে, 'নলিনীদলগত জলম্' তাহা অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী হয়।—দেখিলাম, তর্ক অনুসারে জীবনটাকে পরিচালন করা যায় না। যাঁহারা তাহা পারেন, তাঁহারা দেবতা। তেমন দেবতা পৃথীতে কয় জন?

কিন্তু এ সকল তর্ক তখন মনে আসে নাই। তখন কোন্ দিকে পলায়ন করিলে অতি অল্প কালে দুর্জ্জনের স্থান পরিত্যাগ করিতে পারা যায়—সেই চাণক্যনীতি-ঘটিত যুক্তি শাস্ত্রের আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম।

তাহার পর, "যঃ পলায়তি স জীবতি,"—পশ্চাদ্বর্ত্তী ব্যাঘ্রের কল্পনা আমার পদদ্বয়ে পবনের গতি প্রদান করিল। হঠাৎ মনে হইল—স্বামীজি!—তাঁহাকে সেই যে পশ্চাতে ফেলিয়া বীর গর্ব্বে ছুটিয়াছিলাম! এখন আবার কাপুরুষের মত পশ্চাতে ছুটিতেছি। স্বামীজিকে কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছি! একটা ভয়ঙ্কর আত্মদ্রোহকর তিরস্কার মনের মধ্যে ভয়ানক প্রদাহ উপস্থিত করিল। সেই দুর্ব্বল, কৌশলজ্ঞান-হীন ধার্ম্মিক বৃদ্ধ এই অন্ধকারময় গিরিপথে একাকী প্রাণধারণ করিতে পারিবেন? হয়ত ভয় করিবেন না, কিন্তু বিপদ্ হইতে তাঁহাকে কে রক্ষা করিবে?—মনে হইল, ভগবানই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, আমরা কেবল মূঢ়তা-বশতঃ নিজের অক্ষম চেষ্টাকে তাঁহার বিধানের ঊর্দ্ধে স্থাপন-পূর্ব্বক মানবীয় দাম্ভিকতার আদর্শ রক্ষা করি।

মন একটু শান্ত হইল বটে, কিন্তু উদ্বেগ একেবারে দূর হইল না। তাঁহাকে কাছে পাইবার জন্য একটা আকুলতা, আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, বোধ হয় তাঁহার অমঙ্গল আশঙ্কায়। বীরত্ব প্রকাশে এমন শোচনীয় পরিণামের সম্ভাবনা, একবার কল্পনা করিলেও কি কখন এ পথে বীরদর্পে অগ্রসর হই?

বন্ বন্ করিয়া ছুটিতেছি, অন্ধকার ক্রমে প্রগাঢ় হইয়া উঠিল, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে সমান অন্ধকার—সূচিভেদ্য; বহুদূরে গিরিঅঙ্গে ওষধির উজ্জ্বল বিকাশ অধিকাংশত লোহিত, আমার কল্পনানেত্রে দেখিলাম, যেন মুক্তকেশী কালীর করালমূর্ত্তি আমাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে—দিকে দিকে তাঁহার কেশরাশি উড্ডীন হইয়া অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, তৃতীয় নেত্রে ধক্ ধক্ অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। কে বলিবে, জগজ্জননীর এ সংহারমূর্ত্তি ভয়ঙ্করী নহে। একবার উদ্ধাকাশে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম শত শত উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাহা হইতে স্বর্গীয় শান্তি ও করুণা ক্ষরিত হইতেছিল।

কিছু দূর ছুটিয়া যাই, আর একবার দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি, যদি কোন দিকে স্বামীজির ছায়া দেখিতে পাই। দুই এক বার ভ্রমও হইল। অগ্রসর হইয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকি, স্বামীজি! স্বামীজি নিরুত্তর। শেষে সাবধানে হস্তপ্রয়োগ করিয়া দেখি—স্বামীজির সুদীর্ঘ দাড়ী বলিয়া যাহা অনুভব হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মুখশোভার বৃদ্ধিকর শ্মশ্রুভার নহে, একটা পার্ব্বত্য গুল্মের কণ্টকিত অগ্রভাগ। দৃষ্টি শক্তি দ্বারা কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বোধ করি ভৌতিক জগতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রতারিত হয় নাই।

এইরূপে প্রতারিত হইতে হইতে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে যেন কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। হঠাৎ দশহাত তফাতে কে বলিল—মনুষ্যকণ্ঠে—সুধাময় মনুষ্য কণ্ঠে বলিল, "কোন্ হ্যায়?"—স্বরে ভয়, সন্দেহ, উদ্বেগ কিছু নাই, কিন্তু তাহা অসীমস্নেহে সিক্ত, করুণারসে আর্দ্র। যেন তিনি বুঝিয়াছিলেন, আমি তাঁহার দৃষ্টি ছাড়িয়া গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আর একজনের দৃষ্টি ছাড়াইয়া যাইতে পারি নাই। আমি স্বামীজির আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইলাম, বৃদ্ধের কি শান্তিপূর্ণ, পুণ্যময় প্রগাঢ় আলিঙ্গন! বক্ষের চিন্তাগ্নিরাশির উপর ত্রিদিবের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইল।—দুজনে কোন কথা কহিতে পারিলাম না, আমি স্বীয় বাহুপাশে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সেই অন্ধকার পথের উপর দাঁড়াইয়া কেবল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বৃদ্ধের বাহুদ্বয় আমার স্কন্ধে স্থাপিত, তাঁহার সুদীর্ঘ শ্মশ্রু বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু আমার উত্তপ্ত, শ্রান্ত ললাটে নিপতিত হইল,—আমি এবার শিশুর ন্যায় অধীর হইয়া তাঁহার বক্ষে মস্তক স্থাপন করিলাম, তিনি আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "গাও 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা।"

আমি আকাশের দিকে চাহিয়া উন্মত্তের মত তাঁহার আদেশে কম্পিত কণ্ঠে গান আরম্ভ করিলাম,—

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্র মাঝে আর, হ'ব না'ক পথহারা।"

পথ হারাইয়া পথ হারাইবার বিপদ উত্তমরূপে অনুভব করিতে পারা যায়, আমরা তাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাই আজ কাতর কণ্ঠে, সেই গিরিপ্রান্তে নৈশ অন্ধকারের মধ্যে আকুল হৃদয়ে গানটি গাহিতে লাগিলাম। সমস্ত পৃথিবী যেন স্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল, আমার অন্তরাত্মা পবিত্রতার সহিত তাহা গাহিতে লাগিল।—ভাববিহ্বল স্বামীজি সেই লতা গুল্ম বিজড়িত পথের উপরই বসিয়া পড়িলেন। আমিও তাঁহার ক্রোড়ের কাছে বসিয়া নৈশস্তব্ধতা আলোড়িত করিয়া হৃদয় ঢালিয়া গাহিতে লাগিলাম—"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা।"

গান শেষ হইলে অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বিশ্রামান্তে উঠিলাম। স্বামীজি বলিলেন, "কেমন বাপু, বিপৎসমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়া কি রকম সুখলাভ হয় তাহার কিছু প্রমাণ পাইলে কি?"—আমি বলিলাম "যথেষ্ট; কিন্তু এই কষ্ট, ভয় ও যন্ত্রণা অপেক্ষা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়নপূর্ব্বক নিদ্রা যাওয়া অধিকতর আরামজনক হইতে পারে, কিন্তু এরূপ আরামপূর্ণ জীবন জননী বন্যপ্রকৃতির অনাবৃত বক্ষে ছুটিয়া আসিয়া সুখ দুঃখ আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করে নাই।"

স্বামীজি বলিলেন যে, আমিই উৎসাহ বশে পথ ভুলিয়া বিপথে গিয়া পড়িয়াছিলাম, শেষে তিনি আমাকে ফিরাইবার জন্য অনেক ডাকিলেন, কিন্তু সে ডাক আর শুনিতে পাই নাই; বোধ হয় তাঁহার কথা একেবারেই মনে ছিল না।

শেষে যখন মনে হইল, তখন ফিরিলাম, ভুল পথে পদার্পণের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলাম, পথের যেখানে সন্দেহ হইল, তাহাকে খুঁজিতে লাগিলাম—শেষে তাহাকে পাইলাম।—পথ একই, কিন্তু মানুষের দাম্ভিকতা ক্রমাগত তাহাকে ঘুরাইয়া কেবল স্বকীয় অসারতা প্রতিপন্ন করে।

আমার যে পথ ভুল হইয়াছিল, তাহা স্বামীজি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি আমার অবলম্বিত ভুল পথেরই অনুসরণ করিয়া ছুটিতে ছিলেন। আমার উদ্ধারের জন্য এমন জাগ্রৎ চেষ্টা, আর কখন দেখি নাই।

এবার স্বামীজির প্রদর্শিত পথে চলিতেছিলাম। বুঝিলাম, যে পথে যাওয়া উচিত ছিল—এবং আমি ভ্রমক্রমে যে পথ এক পাশে ঠেলিয়া উঠিয়া গিয়াছি—এ সেই পথ; বন-গুল্মে সমাচ্ছন্ন হইলেও সম্পূর্ণ দুর্গম নহে। অন্ততঃ বুঝিলাম, আমার সেই ব্যাঘ্রগহ্বরের সান্নিহিত পথ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।—সেই পথে চলিতেছি বটে, কিন্তু আর কত দূর চলিব? রাত্রি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে—পর্ব্বত-দেহ ক্রমেই ভীষণতর ভাব প্রকাশ করিতেছে, কোন দিকে জনমানবের সংস্রব নাই, এমন কি লোকালয় কতদূর তাহাও জানিবার উপায় নাই, যেন কোন পর্ব্বত গুহাশায়ী পাষাণ-হৃদয় দৈত্যের কঠোর অভিশাপে পর্ব্বতস্থ জীবিত প্রাণিসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে—আমরা দুই জন বহুকাল পরে প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সেই প্রেতলোকে বিচরণ করিতেছি। নিজের নিঃসঙ্গতা সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইল।—কিন্তু আর ত অগ্রসর হওয়া যায় না; অন্ধকারের মধ্যে কোন্ গুহায় পদদ্বয় পড়িবে, তাহা অনুমান করিবার সামর্থ্য ছিল না। নিরাশ হৃদয়ে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম, একটি অনতিদীর্ঘ শাখাবহুল বৃক্ষ। স্বামীজিকে অঙ্গুলী প্রসারণে তাহা প্রদর্শন করিলাম এবং অগত্যা তাহারই স্কন্ধদেশে রাত্রিবাস করিব, মনে করিয়া সেই বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইলাম। করস্পর্শ করিয়া দেখি—আঃ রাম, এ যে তিন দিকে দেওয়াল বিশিষ্ট একখানি মৃৎ কুটীর! ছাদ নাই, দেওয়ালগুলি দাঁড়াইয়া আমার নিকট অন্ধকারের মধ্যে বৃক্ষমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। দৃষ্টি শক্তির শোচনীয় অবস্থার কথা আর একবার স্মরণ-পথে উদিত হইল, কিন্তু মনে ক্ষোভ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ আনন্দই হইল। এমন স্থানে এই রাত্রে যে বৃক্ষারোহণে কালযাপন করিতে হইল না, ইহাই আমাদের পক্ষে পরম সুখকর কল্পনা বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সেই গিরিপ্রান্তে ভগ্ন-প্রাচীরাবশিষ্ট কুটীর জীবনের আরামদায়ক অবলম্বন বলিয়া মনে হইতে লাগিল—মনে হইল, সত্যই মানব সামাজিক জীব। একখানি ভাঙ্গা কুটীরও তাহার পক্ষে এ নির্জ্জন গিরি প্রদেশে যথেষ্ট সান্ত্বনার কারণ।

দেওয়ালের পাশে একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া স্বামীজি বসিয়া পড়িলেন, লম্বা সুরে বলিলেন, "বৃন্দাবনম পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।"—সে স্থান হইতে 'পাদমেকং' অগ্রসর হইবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। কম্বল বিছাইলাম, মাথার উপর সহস্র নক্ষত্রদীপ্ত অনন্ত আকাশ, পদতলে সুকঠিন গিরি দেহ, তিন দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর, এক দিকে পার্ব্বত্য অরণ্য—এইরূপ মহা সুখকর স্থানে রাত্রিজাগরণের সম্ভাবনায় স্বামীজি বিধাতার কৃপা স্মরণপূর্ব্বক ভাব বিভোর হইয়া পড়িলেন। হাসিয়া বলিলেন, "আঃ রাজার সিংহাসন কি ইহা অপেক্ষা পবিত্র? ইহা অপেক্ষা নির্ব্বিকার, এমন আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত? গাও ত বাপু, ঐ কম্বলের ভিতর হইতেই ভগবৎ প্রেমের একটা গান গাও। আজ সন্ন্যাসীর কামনার কিছু পরিচয় পাইয়াছি, তাহা প্রেম। সে প্রেমের নাম মনুষ্যের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। সে প্রেমে মিশিতে একেবারে জল হওয়া দরকার। গাও প্রাণ ভরিয়া একবার ভগবানের প্রেমের গান শুনি।"

আমি আমার বন্ধুবর—বাবুর রচিত একটি প্রেমের গান ধরিলাম—গিরি কানন প্রতিধ্বনি তুলিয়া প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল:—

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে;
কঠিনে মেশে না সে, মেশে রে সে তরল হ'লে।
অবিরাম হ'য়ে নত, চলে যাও নদীর মত,
কলকল অবিরত, 'জয় জগদীশ' বলে;
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহ পাড়ি ভাঙ্গ সমূলে;
চেয়োনা কোন কূলে, (শুধু) নেচে গেয়ে যাওরে চলে।
সে জলে নাইবে যা'রা, থাকবে না মৃত্যু জরা,
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধুলে;
(যারা) সাঁতার ভুলে নামতে পারে, (তাদের)
টেনে নেযাও একেবারে,
ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে যাও, সেই পরিণাম সিন্ধুজলে।

কতবার গাহিলাম, ক্রমে স্বর কমিয়া আসিল, শেষে পথশ্রমে তন্দ্রারও আবির্ভাব হইল। সেই হিমাচল বক্ষস্থ অনাবৃত তৃণশয্যায় বিধাতার মঙ্গল কিরণবর্ষী নত নেত্রের ছায়ায় ধীরে ধীরে নিদ্রিত হইলাম—তখন বোধ হয় মধ্যরাত্রি অতীত হইয়াছে।

শ্রীজলধর সেন।

মৃণালিনীর দৌত্য।

(অবশিষ্টাংশ।)

ইতস্ততঃ

বর দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বড় ইতস্ততের মধ্যে পড়িলেন। বরের বয়স চল্লিশের উপর হইবে না, দুই বিবাহ, অনেকগুলি সন্তান সন্ততি। অবস্থা ভাল নয়। সামান্য কিছু জোত জমির উপর নির্ভর। কয়েকখানা জীর্ণ খড়ের ঘর, আর গরু গোশালা, গোময় ও বিচালির স্তূপ। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিরকাল বাস কলিকাতায়; নিজে চাকরী বাকরী করিয়া সংসার চালাইয়াছেন, এখন তো যোগ্য পুত্রের উপার্জ্জনে অবস্থা একরূপ স্বচ্ছলই হইয়াছে। পুত্রের ইচ্ছানুসারে কন্যা নলিনীকে বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া তিন চারি বৎসর লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। পরে নলিনী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃবধূ কুমুদিনীর সঙ্গে একত্রে বাড়ীতেই পড়াশুনা করিয়া বেশ সুশিক্ষিতা হইয়াছিল। কন্যাকে এতদিন লালন পালন ও সুশিক্ষিতা করিয়া এখন এই দূর পল্লীগ্রামে যুগ্মসপত্নীশাসিত অস্বচ্ছল ঘরে তাহার বিবাহ দিতে হয় দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বড় মানসিক কষ্টে পড়িলেন। তাঁহার চিত্ত নির্ম্মম ছিল না; কিন্তু পুরুষপরম্পরাগত কুলমর্য্যাদা সহসা পরিত্যাগ করাও সহজ নহে। বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া আসিলে গৃহিণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেমন দেখিয়া আসিলে?"

কর্ত্তা। অবস্থা এক রকম মন্দ না। ঘরদুয়ার, ক্ষেতখামার আছে, গরুবাছুর আছে, এক প্রকার চলে।

গৃহিণী। কয় বিবাহ?

কর্ত্তা। দুইটী; দুই স্ত্রীই ঘরে।

গৃহিণী। কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া আসিয়াছ?

কর্ত্তা। একেবারে ঠিক করি নাই; দাবী বেশি।

গৃহিণী। সে কি?

কর্ত্তা। তিন শত টাকা নগদ দিতে হইবে।

গৃহিণী। মেলের ঘরে টাকা কেন?

কর্ত্তা। মেলের ঘর বটে, কিন্তু ঠেকা আমাদের, মেয়ে আমাদের!

গৃহিণী। অক্ষয় কোন মতেই এখানে কার্য্য করিবে না। সতীনের ঘর, বুড়ো মূর্খ বর——

কর্ত্তা। আর যে ঘর নাই। আর বর কোথায় পাইব?

গৃহিণী। মেল ছাড়।

কর্ত্তা। তুমি পাগল হইয়াছ?

তাহার পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রের সঙ্গে আলাপ করিলেন। অক্ষয়চন্দ্র এ কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিমত প্রকাশ করিলেন। পিতা অনেক যুক্তি দেখাইলেন, পুত্র স্বীকার হইলেন না।

পিতা। তবে আর কোথায় করিবে? আর ঘর নাই।

পুত্র। ঘর নাই, মেল ছাড়িয়া করিব। ঘর নাই বলিয়া কি নলিনীকে জলে ভাসাইব?—রমেশের সঙ্গে করি না কেন? অমন বর কি পাইব? স্বভাব চরিত্র, বিদ্যা বুদ্ধি, ধন সম্পত্তি, সকল বিষয়েই তো শ্রেষ্ঠ।

পুত্রের মত পিতা পূর্ব্বেই গৃহিণীর নিকট শুনিয়াছিলেন, অমন জামাতা কে না আকাঙ্ক্ষা করে? কিন্তু—সে যে শ্রোত্রিয়!

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুই অবধারিত করিতে পারিলেন না। দিন যাইতে লাগিল। এ দিকে খোকার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতে চলিল। অল্প অল্প জ্বর, যকৃতের দোষ। গৃহিণীও দিন দিন অধিক কাতর হইয়া পড়িলেন।

রমেশচন্দ্র মুঙ্গেরে ভগিনীর চিঠি পাইলেন;—"ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিছুই ঠিক হয় নাই। এখানে কেবল আলোচনা চলিতেছে। ঠাকুরের এক মত, আর সকলের আর এক মত। খোকার অসুখ কমিতেছে না; দিন দিন রোগা হইতেছে। ঠাকুরাণী তো অচল প্রায়।"

কয় দিন পরে অক্ষয়চন্দ্রের চিঠি আসিল;—"গঙ্গার ধারে ভাল দেখিয়া একখানা বাড়ী ঠিক করিবে। মা ও খোকা দুইয়েরই অবস্থা খুব খারাপ। এখানে চিকিৎসায় কোন উপকার হইতেছে না। চিকিৎসকগণ ইঁহাদিগকে পশ্চিমে মুঙ্গের লইয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন। সেখানকার জলবায়ুতে উপকারের বিশেষ সম্ভাবনা। তুমি সেখানে আছ, বড় ভাল হইয়াছে। একটা বাড়ী ঠিক করিয়া শীঘ্র লিখিবে; তোমার চিঠি পাইলেই আমি সকলকে লইয়া যাত্রা করিব।"

মুঙ্গেরের প্রাচীন দুর্গ মধ্যে গঙ্গাতীরে একটী অতি সুন্দর বাড়ী রমেশচন্দ্র স্থির করিয়াছিলেন। সে বাড়ীর নাম "বসন্ত কুটীর।" কয়েক দিন পরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুত্র কন্যা পুত্রবধূ পৌত্র চাকর চাকরাণী লইয়া সেই বাড়ীতে আসিলেন।

বিবৃতি।

এক দিন সন্ধ্যার সময় রমেশচন্দ্র নিজের বাড়ী হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে ভগিনীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। গঙ্গাসীকরস্পর্শশীতল, করবীকুসুম-সুবাসিত মৃদুবায়ু ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বহিতেছিল। বাটীর তিন দিক বেষ্টন করিয়া প্রসন্নসলিলা গঙ্গা প্রবাহিত। মন্দ প্রদোষবাতোত্থিত, জ্যোৎস্নাপ্রফুল্ল ক্ষুদ্র বীচিমালা বাটীর প্রান্তবর্ত্তী প্রস্তরপ্রাচীরমূলে প্রতিহত হইতেছিল।

এই সুন্দর সুখময় সময়ে রমেশচন্দ্র একবারে ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাটী সংলগ্ন ফুলের বাগানে প্রবেশ করিলেন। গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে চন্দ্রবিম্ব শতধা চূর্ণ হইতেছিল। বাগানে নানাজাতি ফুল ফুটিয়াছিল। কোথায় কোন্ নিভৃত দেশে বসিয়া যেন একটা কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া দিগন্ত আকুল করিতেছিল। দেখিয়া শুনিয়া রমেশচন্দ্রের চিত্তও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

নিকটে একখান বেঞ্চ ছিল, রমেশচন্দ্র তাহার উপর বসিলেন। বেঞ্চের উপরে একখান পুস্তক পড়িয়াছিল, তুলিয়া লইয়া দেখিলেন সেখানি বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনী"। তাঁহার কৌতুহলের উদ্রেক হইল; পাতা উল্টাইতে লাগিলেন; স্থানে স্থানে পাঠকের সহানুভূতিসূচক রেখা চিহ্ন, স্থানে স্থানে রমণীহস্ত লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য। পুস্তকে যেখানে মনোরমা হেমচন্দ্রকে বলিতেছেন;—"ভাই, গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও, গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, গঙ্গা, তুমি পর্ব্বতে ফিরিয়া যাও।" তাহার পার্শ্বে স্পষ্ট রেখাচিহ্ন। তাহার পর যখন হেমচন্দ্র বলিতেছেন;—"বিস্মৃত হও", এই উপদেশের অপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কিছুই নাই। কেহ কাহাকে বলে না, অর্থ চিন্তা ছাড়, যশের ইচ্ছা ছাড়, * * * তবে কেন বলিবে ভালবাসা ছাড়? ভালবাসা কি এ সকল অপেক্ষা ছোট?" তাহার পাশে অতি স্পষ্টাক্ষরে লেখা—"অতি যথার্থ!" যেখানে মৃণালিনী গিরিজায়াকে বলিতেছেন;—"ভাল বাসিতাম কি? তুমি ভাল বাস; নহিলে কাঁদিলে কেন?" সেখানে পার্শ্বে সেই হস্তাক্ষরে লেখা—"ঠিক!". "আমি ভাবিতেছি, মনোরমাই ভাগ্যবতী। আমি হেমচন্দ্রের সেবা করিতে পারিলাম না, সে করিল।" —মৃণালিনীর এই উক্তির পার্শ্বে সহৃদয় সম্মতিসূচক বৃহৎ দাঁড়ি চিহ্ন। আরও স্থানে স্থানে মর্ম্মগ্রহ বোধক চিহ্ন, হস্তাক্ষর! রমেশচন্দ্র পুস্তকের প্রথমে মলাটের পর পৃষ্ঠায় দেখিলেন গ্রন্থস্বামিনীর নাম লেখা রহিয়াছে—"শ্রীনলিনী সুন্দরী দেবী।" জানিনা তখন কেন যে রমেশচন্দ্রের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। স্ফুট চন্দ্রালোকে রমেশচন্দ্র আরও দেখিলেন, গ্রন্থস্বামিনীর নামের নীচে কি যেন কতকগুলি অঙ্কপাত রহিয়াছে;—১৮।১২।১০—১৮।১৩।১ ইত্যাদি। কিছুই মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলেন না। রাত্রি হইতে চলিল। রমেশচন্দ্র পুস্তকখানি জামার পকেটে লইলেন।

সেদিন রমেশচন্দ্র ভগিনীর বাটীতে অধিক গৌণ করিলেন না। নিজের বাসায় আসিয়া পকেট হইতে পুস্তকখানি বাহির করিয়া যেখানে কোন মন্তব্য, যেখানে কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন, সেই সকল স্থান পড়িতে লাগিলেন। যিনি এ সকল মন্তব্য লিখিয়াছেন, স্থানে স্থানে চিহ্ন প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই সেই সকল স্থানের মর্ম্ম বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছেন, মন্তব্য ও চিহ্নগুলি তো মর্ম্মগ্রহণকুশল হৃদয়শালীতার পরিচয়! ভগিনী কুমুদিনীর হস্তাক্ষর রমেশচন্দ্র চিনিতেন, এ সে হস্তাক্ষর নহে। গ্রন্থাধিকারিণীই মন্তব্যলেখিকা! হা ঈশ্বর! দুরধিগম্য তড়াগবক্ষে কমল বিকসিত হয়, হউক; কিন্তু সৌরভ শোভা বিস্তার করিয়া মধুলুব্ধ দূরতটবিহারী পথিকের চিত্ত কেন আকুলিত করে?

রমেশচন্দ্রের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল আর, এ অঙ্ক-পাতগুলি কি?—

১৮।১২।১০—১৮।১৩।১—২৪৪।১১।৬—৩০।১১।১

১৫২।১১।৮—১০৮।১৪।৬—১৯৪।১।২—১৫১।৭।৫

২৪৯।১৬।৪—১২২।১০।১১—১৬৩।৫।৩—৭৮।৫।৫

রমেশচন্দ্র অনেক চিন্তা করিলেন, অনেক অনুধাবন করিলেন। বার তিথি নক্ষত্র?—না। তারিখ মাস বৎসর?—না। দণ্ড পল বিপল?—না। তবে এগুলি কি? অকস্মাৎ তাঁহার মুখ হর্ষবিকসিত হইয়া উঠিল ১৮।১২।১০। মৃণালিনীর অষ্টাদশ পৃষ্ঠা খুলিলেন, দ্বাদশ পংক্তির দশম শব্দ "এ", ত্রয়োদশ পংক্তির প্রথম শব্দ—"সংসারে",—এ সংসারে।—তাহার পর ২৪৪ পৃষ্ঠার একাদশ পংক্তির ষষ্ঠ শব্দ "কামনা", ৩০ পৃষ্ঠার দ্বাদশ পংক্তির প্রথম শব্দ—"সামগ্রী";

'এ সংসারে কামনার সামগ্রী'—।

রমেশচন্দ্র তখন তাড়াতাড়ি অঙ্ক ভেদ করিয়া একখানি কাগজে লিখিতে লাগিলেন, শেষে পড়িয়া দেখিলেন, অঙ্কপাতের অর্থ—

"এ সংসারে কামনার সামগ্রী
বড়ই দুর্লভ, তাহা না
হইলে পৃথিবী স্বর্গ হইত॥"

পাঠ করিয়া রমেশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। নলিনী সুন্দরী লিখিয়াছেন! কামনার সামগ্রী! নলিনী সুন্দরী তো বালিকা নহেন। তবে কি—?

হরি! হরি! মানুষের দুয়ারের পাশে, ঘরের কোণে, হাতের কাছে কামনার বস্তু বিরাজ করে; তথাপি তাহা কত দুস্পর্শ, কত দুর্লভ!—স্বর্গ?—স্বর্গ কি গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র লোকের অপর পারে?—যাহার পুণ্যবল আছে, তাহার শয়নকক্ষই তো অমরার স্বর্ণকক্ষবিজয়ী পরম রমণীয় সুখাগার! কিন্তু সে সুকৃতিসঞ্চয় কয় জনের আছে?

সে রাত্রিতে রমেশচন্দ্রের নিদ্রা অতি কম হইয়াছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়া শুনা চিন্তা কল্পনায় কাটিয়া গেল। কখনও বা কামচারিণী কল্পনার পক্ষাশ্রয় করিয়া সুরঞ্জিত ইন্দ্রচাপরঞ্জিত নীলাকাশতলে সুরজনকাঙ্ক্ষিত নন্দন কাননের সুবাসিত কুঞ্জে কুঞ্জে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কখনও বা গুরুপ্রস্তরভারগ্রস্ত অতল জলে নিমজ্জমান হতভাগ্যের ন্যায় অবসন্ন, মথিতচিত্ত হইতে লাগিলেন। প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রমেশচন্দ্রের নিদ্রা আসিয়াছিল।

খোকার অবস্থা এখন অনেক ভাল। তাহার হাসি খুসি এখন ফিরিয়া আসিয়াছে; খোকা পুনরায় হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু মাতার স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হইতেছিল। বায়ু পরিবর্ত্তনে তাঁহার কোন উপকার হয় নাই, বরং অপকারই হইয়াছে।

এক দিন মাতার শরীর যেন কিছু ভাল বোধ হইল। তৃতীয়প্রহরে তাহার সুনিদ্রা হইল। নলিনী কুমুদিনীর শয়নঘরে খোকাকে খেলা দিতেছিল। এমন সময় কুমুদিনী একখানা চিঠি আর একখানা পুস্তক হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল,—

"ঠাকুরঝি, কাল হতে না তুই তোর 'মৃণালিনী' খুঁজে পাচ্ছিলিস্ না?—এই নে তোর 'মৃণালিনী'; আর দ্যাখ্ চিঠি পড়িয়া, কোথাকার বই কোথায় গিয়াছিল।"

চিঠিতে লেখা ছিল,—"কাল তোমাদের ফুল বাগানে বেঞ্চের উপর এক খানা বই পাইয়াছিলাম, এই লোকের সঙ্গে তাহা ফেরত পাঠাইতেছি।—তোমার দাদা।"

চিঠি পাঠ করিয়া নলিনী সুন্দরী কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিল,—

"বোধ হয় সন্ধ্যার সময় বাগানে বেঞ্চের উপর ফেলিয়া আসিয়াছিলাম।"—কিন্তু পুস্তক খুলিয়াই বলিল, "এ বই তো আমার নয়! এ যে—" প্রথমেই নলিনী দেখিল, পুস্তকে "শ্রীরমেশচন্দ্র রায়" নাম লেখা রহিয়াছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎই দেখিতে পাইল, নামের নিম্ন ভাগেই কতকগুলি অঙ্ক লেখা রহিয়াছে,"—

২৪৪।১১।৬—২৪৪।১১।৭—১০৪।১৪।৬—৩৫।১৩।৪

৮৪।১৬।৬—৯৪।১১।১—৮৬।৪।২—২৪৫।২০।৭

৩৫।১৭।৭—৩৫।১১।৭—১৫৫।১।১—২১৩।১৬।৯

৪১।১৮।৪—১১০।১৫।৩—১২৫।২।৩—১৮৭।১৪।৪

৭।১৬।৬—৮।১২।৫—১৩৩।৩।৪॥

নলিনীর সাগ্রহ দৃষ্টি সেই গুলির প্রতি ন্যস্ত ছিল।

কুমু। কিলো?—কার বই?

নলিনী। নাম পড়িয়া দ্যাখ্।

কুমু। তাই তো, দাদা দেখি দিব্য ভুল করিয়াছেন!

—নামের নীচে ধারাপাতের নামতা, কাঠাকিয়ার মত এ আঁক গুলি কি?

নলিনী দেখিয়াই সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়াছিল; অর্থোদ্ধার করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ভবিষ্যত ভাবিয়া তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার নিজের পুস্তকে লিখিত কথা গুলির সঙ্গে কি এ গুলির কোন সম্বন্ধ আছে? সে গুলি তো রমেশচন্দ্র দেখিয়াছেন!

কুমু। আঁক গুলির অর্থ কি কিছু বুঝিলি?

নলিনী। যখন স্কুলে যাইতাম, আমাদের ক্লাসের একটী মেয়ে এই রকম একটি সঙ্কেত আমাদিগকে শিখাইয়াছিল। এ বোধ হয় সেই সঙ্কেতই হইবে।

তখন নলিনী সুন্দরী অর্থোদ্ধার করিয়া থরকম্পিত হস্তে এক খানা কাগজে পেন্সিল দিয়া লিখিল;—

কামনার বিষয় দুর্লভ হইতে
পারে কিন্তু মানুষ শেষ
পর্য্যন্ত আশা ত্যাগ করে
না আশা অবলম্বন করিয়া
জীবন ধারণ করে॥

পাঠ করিয়া নলিনীর বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কুমুদিনীও কিছু চিন্তাকুল হইল।—দাদা এই সাঙ্কেতিক লেখাযুক্ত বই কি ইচ্ছা করিয়া, না ভুল করিয়া পাঠাইয়াছেন? ইচ্ছা করিয়া, ঠাকুরঝি পড়িবে বলিয়া যদি পাঠাইয়া থাকেন,—না, দাদা তেমন লোক নহেন। একটা মস্ত ভুল হইয়াছে। কিন্তু কাজ ভাল হয় নাই। প্রকাশ্যে বলিলেন;—

"রাখিয়া দে, ঠাকুরঝি, বই খানা; চাকরটী চলিয়া গিয়াছে, বিকালে দাদা আসিলে ফিরাইয়া দিব।—আমি যাই, ঠাকুরাণী ডাকিতেছেন।"

খোকা দুলিতে দুলিতে মায়ের কোলে গেল। নলিনী একাকিনী সেই ঘরে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

এমন সময় চাকরাণী আর এক খানা চিঠি ও বই লইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল;—

"দিদি বাবু, বৌঠাকরুণ্ কোথায়?"

নলিনী। দে, আমার কাছে দে।

পুস্তক ও চিঠি খানি রাখিয়া চাকরাণী চলিয়া গেল। নলিনী দেখিল এখানা তাহারই 'মৃণালিনী'। তখন চকিত নেত্রে দরজার দিকে চাহিয়া নলিনী দ্রুত হস্তে নিজের নাম ও সেই অঙ্কপাতযুক্ত পাতাখানি আমূল ছিন্ন করিয়া লুকাইয়া রাখিল। আজ দুই তিন দিন হইল কেন যেন সেই কিশোর কালের শিক্ষিত সঙ্কেত স্মরণ করিয়া নলিনী কয়েকটা কথা পুস্তকের সেই পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিল। সে পুস্তক যে বাহিরে কাহারও হাতে পড়িবে এ সন্দেহ তাহার মনে উদয় হয় নাই। কুমুদিনীও এপর্য্যন্ত তাহা দেখেন নাই। নলিনীর বড় ভয় হইল, যদি কুমুদিনী এখন তাহা দেখিয়া তাঁহার দাদার পুস্তকে লিখিত কথা গুলির সঙ্গে তুলনা করেন, তবে কি মনে করিবেন? ভয়ত্রস্তহস্তে নলিনী সেই পাতা খানি ছিঁড়িয়া লুকাইয়া রাখিয়া কুমুদিনীকে ডাকিল।

নলিনী। এই নে, তোর চিঠি নে। আমার বই আমি পাইয়াছি। ভুল সংশোধন জন্য আবার লোক আসিয়াছে!

চিঠিতে লেখা ছিল;—"বামন ঠাকুর বৃহৎ ভুল করিয়াছে। তোমাদের পুস্তকের পরিবর্ত্তে আমার নিজের খানা পাঠাইয়াছে। তোমাদের 'মৃণালিনী' পাঠাইতেছি। আমার খানা এই লোকের সঙ্গে শীঘ্র পাঠাইবে।"

বামন ঠাকুরকে ডাকাইয়া কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রমেশচন্দ্র সে দিন আহারান্তে বাহিরে চলিয়া যাইবার সময় ব্রাহ্মণের হাতে সে চিঠিখানা দিয়া এবং নলিনী সুন্দরীর "মৃণালিনী" খানা দেখাইয়া দিয়া এ বাড়ীতে শীঘ্র পাঠাইবার জন্য বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বাড়ীর চাকর টেবল পরিষ্কার করিবার সময় কাগজ পত্র পুস্তকাদি যাহা যাহা তাহার উপর ছিল তৎসমস্তের শৃঙ্খলা করিয়াছিল। পরে আহারান্তে বামন ঠাকুর যখন চিঠি সহ চাকরকে পাঠায়, তখন ভুল ক্রমে রমেশ চন্দ্রের নিজের পুস্তক খানা তাহার হাতে দেয়। ঠাকুর বাঙ্গলা লেখা পড়া কিছু কিছু জানিত।

কুমুদিনী দেখিলেন, ভুলই হইয়াছিল; কিন্তু বড় মারাত্মক ভুল। দাদার এই ভ্রম ঠাকুরঝিকে অগাধ জলে না ডুবায়!

রাত্রিতে কুমুদিনী স্বামীকে বলিলেন;—"ঠাকুরঝির সম্বন্ধে একটা কিছু শীঘ্র ঠিক করিতে হবে।"

অক্ষয়চন্দ্র বলিলেন ;—

"মা'র অসুখটা আ'রাম হইলেই সব ঠিক ঠাক করিব। আমি তো মনে মনে ঠিকই করিয়াছি ; মাকেও বলিয়াছি।"

গ্রন্থিবন্ধন।

কিন্তু মাতার অসুখ আর সারিল না। ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া শেষে অতি আশঙ্কাজনক অবস্থায় দাঁড়াইল। দিনরাত্রি জাগিয়া কন্যা পুত্রবধূ তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন ; দিন রাত্রি জাগিয়া অক্ষয়চন্দ্র রমেশচন্দ্র তাঁহার তত্ত্বাবধান, তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইলেন। সেবাশুশ্রূষা, যত্ন চেষ্টা চিকিৎসা যতদূর সম্ভব তাহা হইল, কিন্তু তাঁহার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গৃহিণীকে কলিকাতা লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু গৃহিণী তাহাতে স্বীকার হইলেন না। রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগিরথীর মনোহর তরঙ্গলীলা দেখিতে পান ; জ্যোৎস্না প্রফুল্ল যামিনীতে গঙ্গার শীতল মৃদু বাতাসে তাঁহার গাত্রজ্বালা প্রশমিত হয় ; এমন পবিত্র নিরিবিলী স্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার ক্ষুদ্র গলি মধ্যে ক্ষুদ্র বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে গৃহিণীর একান্ত অনিচ্ছা। দিনই যদি আসিয়া থাকে, তবে—ঈশ্বর করুন—গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি শুনিতে শুনিতে, সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গভঙ্গ দেখিতে দেখিতে, পুত্র পৌত্রের সাক্ষাতে স্বামীর চরণপ্রান্তে মস্তক রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। শুনিয়া স্বামী পুত্র কন্যা পুত্রবধূ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল না। সেই খানেই চিকিৎসা চলিতে লাগিল ; কিন্তু আর ভরসা রহিল না।

রমেশচন্দ্র এখন দিন রাত্রির প্রায় অধিকাংশ সময় সে বাড়ীতে। পুত্রের ন্যায় গৃহিণীর কাছে আছে। সময় সময় অক্ষয়চন্দ্র ভাবী বিপদ আশঙ্কায় নিতান্ত ম্রিয়মাণ অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র অকাতরে নিরন্তর খাটিতেন। বিদেশে বিপাকে আত্মীয়তা আরও গাঢ় হয়।

মাতা দেখিতেন ; রমেশচন্দ্রের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, তাহার অন্তরভরা মায়া; তাহার অকপট ব্যবহার, তাহার [illegible] চরিত্র মাতা দিবারাত্রি লক্ষ্য করিতেন। আর দেখিতেন-নলিনী ও রমেশের ভাব। কেহ কাহারও দিকে মুখ তুলিয়া চাহিত না। কিন্তু সেবাশুশ্রূষা, পথ্য ঔষধ প্রদান ইত্যাদি কার্য্যে যখন যাহার যতটুকু সাহায্য করা আবশ্যক অপরে তখনই নিঃশব্দে তাহা করিয়া দেয় ; এক জন গৃহে প্রবেশ করিলে অন্য জন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যায় না,—কেনই বা যাইবে? রোগশয্যাপার্শে লজ্জার তীব্রতা কমিয়া যায়!—কিন্তু কেমন যেন মৃদু সঙ্কোচে আরব্ধ কার্য্যে আরও মনসংযোগ করে। মাতা দেখিতেন, আর কত কি ভাবিতেন ;—প্রজাপতি কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন ?

এক দিন দ্বিপ্রহরে গৃহিণীর অবস্থা বড়ই খারাপ হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাশের ঘরে একটুকু আরাম করিতে ছিলেন। গৃহিণীর নিকট নলিনী কুমুদিনী, অক্ষয়চন্দ্র আর রমেশ। খোকা এখন অনেক সময়ই চাকরাণীর কোলে। গৃহিণীর অবস্থা বড়ই খারাপ ; তাঁহার যেন বাক্য রোধ হইয়া আসিতেছে। সমস্ত শরীরের যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে। পদসম্বাহনকারিণী পুত্রবধূকে ইঙ্গিত করিয়া কাছে আনিয়া তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। খোকাকে কাছে আনাইয়া তাহাকে ক্ষণকাল আপনার শীর্ণ বক্ষসংলগ্ন রাখিলেন। অক্ষয়ের দিকে আকুল চক্ষে চাহিয়া কর্ত্তাকে ডাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। পাশে থাকিয়া নলিনী মাতার হাতে বাহুতে হাত বুলাইতেছিল, মাতা কাতর চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া তাহার কেশ রাশিতে হাত দিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কর্ত্তা সেঘরে প্রবেশ করিয়া অবস্থা দেখিয়া চকিত হইলেন। গৃহিণীর নিকট যাইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"এখন কেমন আছ ?" গৃহিণী ক্ষীণস্বরে কি যেন বলিতে চাহিলেন ; তাঁহার চক্ষুর ভঙ্গীতে বুঝা গেল যেন বলিলেন—ভাল আছি। কিন্তু তাঁহার চাঞ্চল্য যেন বৃদ্ধি হইল ; কি যেন বলিতে চাহিতেছেন, বলিতে পারিতেছেন না। কর্ত্তা অতি কাতর জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিলেন। তখন গৃহিণী হাত দিয়া আপনার মস্তক দেখাইয়া তাহাতে স্বামীর পদস্পর্শ প্রার্থনা করিলেন। অতি সংক্ষুব্ধ-চিত্ত স্বামী সতীর বাসনা পূর্ণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্বামীর পদস্পর্শে গৃহিণীর নীলিয়মান মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সীমন্তশোভী সিন্দুরবিন্দু যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া

উঠিল। রমেশচন্দ্র পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছিলেন, গৃহিণী অপরিমেয় স্নেহভরা চক্ষে রমেশের দিকে চাহিয়া তাহার হস্ত গ্রহণ করিলেন, এবং নলিনীর থর কম্পমান যুগলহস্ত অপর হস্তে ধরিয়া দুইহাত একত্র করিয়া গভীর মর্ম্মস্পর্শী কাতর প্রার্থনা সূচক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিলেন। মাতার সেই অন্তিম প্রার্থনায় পিতা কি উত্তর করেন দেখিবার জন্য পুত্র পুত্রবধূ পিতার মুখের দিকে যুগপৎ দৃষ্টি প্রয়োগ করিলেন।

মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই হস্তগ্রন্থি স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, শেষে মৃদুস্বরে বলিলেন ;—"তাহাই হইবে।"

গৃহিণীর ক্ষীণ মুখে দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলাবৎ হাসির রেখা দেখা দিল। রমেশচন্দ্রের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। নলিনীর বুক কাঁপিয়া উঠিল ;—সেখানে বসিয়া থাকা তাহার অসাধ্য হইল—নীরবে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘরে শয্যায় পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

লোকের পূর্ণ হৃদয় যখন আবেগসংক্ষুব্ধ হয়, তখন চিত্তের অজ্ঞাতসারে নেত্রে অশ্রু দেখা দেয়!

সেই রাত্রিতে চন্দ্রোদয়ের পর গঙ্গাস্রোতভঙ্গের কুলু কুলু ধ্বনি শুনিতে শুনিতে স্বামী, পুত্র, পৌত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, ভাবী জামাতা—সকলের সাক্ষাতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সতী ঈশ্বরধামে চলিয়া গেলেন।

* * * *

কালে রমেশচন্দ্রের সঙ্গে নলিনীর বিবাহ হইল ; সে আজ প্রায় চারি বৎসরের কথা। খোকা এক বৎসরের হইলে সকলের ফটোগ্রাফ তোলা হয়। সেই ফটোগ্রাফগুলি ফ্রেমে বাঁধিবার সময় রমেশ মৃণালিনীর সেই অশ্রুপাতযুক্ত দুইখানি পাতা ছাঁটিয়া কাটিয়া যোড়া দিয়া অতি উৎকৃষ্ট বিলাতি ফ্রেমে বাঁধাইয়া নিজের শয্যাপার্শ্বে দেয়ালে খাটাইয়া রাখিয়াছেন।

১৮।১২।১০—১৮।১৩।১——

২৪৪।১১।৬—২৪৪।১১।৭——!

সে দিকে দৃষ্টি পড়িলেই দুজনের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠে!

পরিশিষ্ট।

রমেশচন্দ্র অশ্রুপাত কাহিনী বর্ণনা শেষ করিলেন। কিন্তু সেঘরে নলিনী সুন্দরীর আশু প্রবেশের সম্ভাবনা কম দেখিয়া দুই বন্ধু পরিশেষে ভিতর বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন।

রাত্রিতে আহারান্তে রমেশচন্দ্র নিজ শয়নকক্ষে টেবিলের নিকট বসিয়া পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার দুই চক্ষু নিদ্রায় ভারি হইয়া আসিতেছিল। শেষে পুস্তক রাখিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন ;—

"কাজের কি আর শেষ নাই? রাত যে এগারটা বাজে!"

এমন সময় মৃদু রুণু ঝুণু শব্দে নলিনী সুন্দরী সে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

রমেশ। আগমন হইল কি? বহু ভাগ্য, রাত্রি যে এখনো প্রভাত হয় নাই!

নলিনী। কেন, আজ কি-ঐ যে টচনটার না কি পোড়ামুখো সাহেবগুলোর পিণ্ডদান এত শীঘ্রই হইয়া গেল?

রমেশ। আজ কি আর কোন কাজে অঙ্কে মন যায়? অতুলের কাছে অশ্রুকাহিনী আলোচনা করিতে করিতে আজ সারাটা বিকাল কাটাইয়াছি!

নলিনী। তোমার কি একটুকু লজ্জাও হইল না? সমস্তই বলিয়াছ? আমার সাক্ষাতেই আরম্ভ!—আজ হইতে ও আয়নাখানা আমি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিব।—কই সেখানা?

রমেশ। "পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার জন্য অতুল তাহা বৈঠকখানায় লইয়া গিয়াছে।—আয়না বাক্সে বন্ধ করিলেই কি আর লোকের মুখ বন্ধ করিতে পারিবে?"

নলিনী। বটে!

নলিনী [illegible] টেবিলের পার্শ্বে আর একখানি কেদারায় বসিলেন ; রমেশচন্দ্রের সম্মুখে যে পুস্তকখানি ছিল, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন ; ডিবা খুলিয়া একটা পানের খিলি স্বামীর মুখে দিয়া বলিলেন ;—

"তোমার মুখ তো বন্ধ করিলাম। কিন্তু আজ যাঁহার নিকট বলিয়াছ, তাঁহার কৃপায় অশ্রুপাতের কাহিনীটা সংবাদপত্রে না উঠিলে বাঁচি।"

রমেশ। অতুলকে মানা করিয়া দিব, সংবাদপত্রে যেন বাহির না করে।

নলিনী। নৌকা ডুবাইবার কথা তুমি আর পাগলকে মনে করিয়া দিও না!—সে কথা থাক্। ঠাকুরঝিকে কবে আনাইবে?

নলিনী সুন্দরী শ্বশুরগৃহে থাকা সময় কুমুদিনীকে "ঠাকুরঝি," আর পিত্রালয় গেলে "বৌ" বলিয়া ডাকিতেন। কুমুদিনীও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রমেশ। তুমি যেদিন বল।

নলিনী আপনার নিবিড় কেশরাশি পীবর অংশদেশের উপর দিয়া বক্ষের দিকে আনিয়া ক্ষিপ্রহস্তে বেণীবন্ধন করিতেছিলেন। তাঁহার দ্রুত-সঞ্চালিত গৌর অঙ্গুলিদাম আষাঢ়ের নবীন মেঘবৎ সেই কৃষ্ণ কেশরাশির কোণে কোণে বিদ্যুৎবিভ্রম জন্মাইতেছিল। গ্রীবা বক্র করিয়া বেণী বন্ধন কার্য্যে চক্ষু রাখিয়া নলিনী বলিলেন;—

"আজ রবিবার, পরশ্ব না তোমাদের কলেজ বন্ধ আছে?"

রমেশ। হাঁ।

নলিনী। সেই দিনই আনিতে পাঠাও।

রমেশ। হাঁ।

নলিনী। ঠাকুরঝি গতবার আসিয়া এক রাত্রি মাত্র এখানে ছিল; এবার কিন্তু তা হইতে পারিবে না।

রমেশ। না।

নলিনী। ঠাকুরঝির ছোট খোকা দিব্য ফর্‌সা হইয়াছে!

রমেশচন্দ্র নিরুত্তর।

নলিনী। ছোট থাকিতে ঠাকুরঝি বলিয়াছিল, তত ফর্‌সা হইবে না; কিন্তু এখন কেমন ফুট্‌ফুটে ফর্‌সা হইয়াছে!

নলিনীসুন্দরীর বেণীবন্ধন শেষ হইল। মুখ তুলিয়া দেখিলেন রমেশচন্দ্র নিদ্রায় বিভোর; আস্তে আস্তে নলিনী সম্মুখস্থ আলোটি উজ্জ্বলতর করিয়া দিয়া নির্নিমেষনেত্রে স্বামীর সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুপ্ত মুখের বড়ই শোভা। মানুষ যখন জাগিয়া থাকে তখন মনের ভাব গোপন রাখিয়া কত হাসে, কত কাঁদে—কত কি করে! কিন্তু ঘুমন্ত মুখে কোন ছল চক্র নাই, অন্তরের প্রকৃত চিত্র মুখে ফুটিয়া উঠে। নলিনী সুন্দরী দেখিলেন, এমুখে অন্তরের অপরিমেয় প্রেমের প্রভা প্রস্ফুরিত হইতেছে। চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। স্বামীর স্কন্ধে বাহু রাখিয়া নলিনী মনে মনে কহিলেন;—"প্রাণাধিক, ঘুমাইয়াছ!" পরে মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন;—

"ওগো, জাগো; রাত ভোর হইয়াছে!"

রমেশচন্দ্র জাগিয়া উঠিলেন। তখন যদি কেহ পার্শ্বস্থ সুবৃহৎ মুকুরাভ্যন্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত,—পরস্পর গাঢ় সংশ্লিষ্ট যুগলমূর্ত্তি হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছে!

এমন সময় দ্বারের কাছে ঝি আসিয়া ডাকিল;—

"দাদাবাবু, জাগিয়া আছ?"

রমেশ। কে ও, ঝি?

নলিনী সুন্দরী দরজা খুলিয়া দিলেন। ঝি ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা বই ও তাহার একখানা আয়না দিয়া বলিল,—

"বৈঠকখানা হইতে দাদাবাবু পাঠিয়েছেন।" ঝি চলিয়া গেল। রমেশচন্দ্র আয়নার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিলেন;—

"ওগো, দেখ, অক্ষয় যেন নীচে কি লিখিয়া দিয়াছে!"

২২।১।১০।১১—১৬৩।৫ ৩—২৪৫ ৬।২

৯৪।১১ ৭—১৪৯।১২।৫

২৩১।১১।৬—১৩।১৬ ৬—৭৭।৫।২॥

নলিনী তাড়াতাড়ি "মৃণালিনী" খুলিলেন; উভয়ে মিলিয়া অর্থোদ্ধার করিলেন;—

পৃথিবী স্বর্গ হইয়াছে
ঈশ্বর করুণাময়
তাঁহাকে প্রণাম করি॥

তখন দুই জনে একই মুহূর্ত্তে, এক মন, এক প্রাণে যোড় হস্তে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। (সমাপ্ত)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

কুকি জাতির বিবরণ।

(২)

কুকিগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। তাহারা বলে, ঈশ্বর প্রয়োজনমতে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র বিচরণ এবং প্রাণিগণের হিতাহিত ও শুভাশুভের বিধান করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা

প্রকারান্তরে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করা হয়। ইহারা দেব দেবীকে "পাতিযেন" বলে এবং তাহারই অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

কুকিগণ পরকাল অথবা পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাস করে না। সুতরাং তাহাদের সর্ব্ব প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠানই ঐহিক মঙ্গলের কামনায় হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে সুখ-শান্তির কামনায় এবং সময় সময় রোগ-প্রশমনার্থ ইহারা পূজা করিয়া থাকে। কুকিগণ মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে না। কোনও বৃহৎ বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত বা বংশনির্ম্মিত আসনকে অবলম্বন করিয়া "পাতিযেনের" পূজা করে। পূজক দণ্ডায়মান অবস্থায় সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পূজার জিনিসে যাহাতে থুতু পড়িতে না পারে, এজন্য তাহারা মুখে কাপড় দিয়া সমস্ত অর্চ্চনা কার্য্য সম্পাদন করে। তাহারা প্রথমতঃ আবাহনীয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতাকে আহ্বান করে। আমরা 'হালাম' সম্প্রদায়ের জনৈক 'ওঝাই'* এর নিকট হইতে পূজার কয়েকটি মন্ত্র পাইয়াছি, তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।

"আ থালে কাণুয়ই সাং যোয়ঙ্‌র কাণুয়ই যেই চেকো যেই মা লুয়ঙ্গ।

অর্থ—হে শ্বেতাঙ্গিনী দেবীমাই, শূন্যপথে, পিচ্ছিল গতিতে এখানে আসিয়া এই স্থান পূর্ণ করিয়া ফেল।†

"সিমাকুনা মারকুনা সাং যোয়ঙ্‌র সিম্‌নিয়ম্ সরথায়ন তৈঙ্গাই থিম্ রালা সাং যোয়ঙ্‌র কাণু

অর্থ—উত্তরের দক্ষিণের দেবতা, পূর্ব্বের পশ্চিমের দেবতা, জলের দেবতা (গঙ্গা), দূরের দেবতা, সকলেই শূন্যপথে আইস মাই।

"রাকুন থাং রবলেন থাং কানুয়ং সাং যোয়ঙ্‌র।"

অর্থ—সমস্ত সমুদ্রের দেবতা এবং সমুদ্রের দেবতার প্রধান দেবতা সকলেই আইস মাই।

এই প্রকারে আবাহনের পর নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়;—

"ছিপ ছিপ ন হং শিপ্র জেই রেং জোরা।"

অর্থ—আমার পূজার জিনিস সকলে আসিয়া গ্রহণ কর।

ইহার পরে বলিদান হয়। সাধারণতঃ ছাগ, বরাহ, হংস ও কুক্কুটাদির বলিদান হইয়া থাকে। গবয় একটি বিশেষ বলির মধ্যে পরিগণিত। গবয় একপ্রকার গো এবং মহিষের মধ্যবর্ত্তী বন্য পশু। অনেকে ইহাকে বনগরু বলিয়া অনুমান করে। মহিষ অপেক্ষা এই প্রাণী আকারে ছোট নহে, শক্তি মহিষের তুলনায় অনেক বেশী। ইহাদের ললাটদেশ গো এবং মহিষের ললাট অপেক্ষা বেশী চৌড়া। শৃঙ্গদ্বয় মহিষের শৃঙ্গের ন্যায় লম্বা নহে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক মোটা ও দৃঢ়। শিং প্রথমতঃ সোজাভাবে গজাইয়া থাকে, পরে যত বড় হয়, ততই উপরের দিকে বাঁকাইয়া উঠে। কলিকাতার চিড়িয়াখানায় অনেকেই গবয় দেখিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

বলিদানের পরে প্রার্থনা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কুকিগণ ঐহিক মঙ্গল কামনায় দেবার্চ্চন করিয়া থাকে। ইহারা কেবল আত্মমঙ্গলকামী নহে, এবং পূজা করিয়া কেবল যে দেবতার নিকট বর প্রার্থনা করে, এমনও নহে। সঙ্গে সঙ্গে রাজার জন্যও তাহাদের প্রার্থনা আছে। পূজা সমাপ্তির পরে, রাজার জন্য, রাজ্যের জন্য, সমস্ত মনুষ্যের জন্য এবং নিজের জন্য তাহারা বর মাগিয়া থাকে।

ওকা পুমা রেং পাথিংেং মিমান দাস্রো দেশী হৈরসে, রাজ্য হৈরসে, দামরং উং রেং দাস্রেছে।

অর্থঃ—হে আমার রাজা ও রাজার দেবতা, মনুষ্যের ভাল কর, দেশের ভাল কর, রাজ্যের ভাল কর; আমাদের ভাল কর এবং মহারাজ বাঁচিয়া থাকুক।

দেবতার নিকটে দাঁড়াইলে,—হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত হইলে, মানুষের চিত্তবৃত্তি কত উদার হয়, এস্থলে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নরমাংস-লোলুপ হিংস্র-স্বভাবাপন্ন কুকি, দেবসন্নিধানে মনুষ্যের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছে, ইহা অপেক্ষা উদারতার দৃষ্টান্ত আর কি থাকিতে পারে।

হালামগণ রাজভক্ত প্রজাও বটে। দেবতার সঙ্গে সঙ্গে রাজার নিকট বর প্রার্থনা করাই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতদ্ভিন্ন আমরা এবিষয়ের আরও যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

সার্দ্ধ ত্রিশত বর্ষকাল পূর্ব্বে (ত্রৈপুরী দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে) প্রবল পরাক্রমশালী ও রাজনীতিকুশল মহারাজ বিজয়মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।*

* কুকির পুরোহিতগণকে ওঝাই বলে।

† যে সকল কুকি ভাষার বঙ্গানুবাদ লিখিত হইল, জনৈক ছিত্তাষীর সাহায্যে আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়াছি। এই অনুবাদের ভ্রম প্রমাদের জন্য আমরা দায়ী নহি।

* মহারাজ বিজয়মাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালের বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে, মল্লিখিত "মহারাজ বিজয়মাণিক্য বাহাদুর" শীর্ষক প্রবন্ধে নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে।

তৎকালে জয়ন্তিয়াধিপতি মহারাজ বিজয় কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হইয়া তাহার প্রতিশোধ লওয়ার মানসে পার্ব্বত্য কিরাত জাতির সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ কথা গোপন রহিল না; অল্পকাল মধ্যেই জয়ন্তিয়াধিপের ষড়যন্ত্রের বিষয় বিজয় মাণিক্য বাহাদুরের কর্ণগোচর হইল।

তৎকালে জয়ন্তিয়া রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী সাখাচেপ্' ও 'থাঙ্গাচেপ্' দফার হালামগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহাদের বাহুবলে ত্রিপুরার রাজশ্রী যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের বিশেষ অনুগত এবং রাজভক্ত প্রজা হইলেও এই সময়ে মহারাজ বিজয় ইহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি কৌশলক্রমে, তাহাদিগকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন যে, তাহারা কোন কালে বশ্যতার বিপরীত কোন কার্য্য করিবে না। তিনি সেই প্রতিজ্ঞা চিরস্মরণীয় ও অক্ষুণ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে ধাতুনির্ম্মিত বিতস্তি পরিমিত একটী হস্তী ও একটী ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।* উক্ত প্রতিমূর্ত্তি দ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে, বাঙ্গলা অক্ষরে, নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত বাক্যাবলী খোদিত আছে :—

"পূর্ব্বাপোর্য্যা ক্রমাত্তবন্ত আত্মীয়া,
ইদানীং যদি বৈপরীত্যমাচরন্তি,
তদোপরি ধর্ম্মঃ শস্তনাশো ভবিষ্যতি,
পশ্চাদ্গজ শার্দ্দূলৌ।"+

মর্ম্ম :—পূর্ব্ব হইতেই তোমাদের সহিত আত্মীয়তা চলিয়া আসিয়াছে। ইদানীং যদি তাহার বিপরীত আচরণ কর, তবে তোমাদের ধর্ম্ম ও শস্য নষ্ট হইবে, এবং পশ্চাৎ গজ ও শার্দ্দূল কর্ত্তৃক তোমরা বিনষ্ট হইবে।

কুকিগণের রাজভক্তি এত দৃঢ় যে, অদ্যাপি তাহারা উক্ত আদেশবাণীর কোনরূপ অবমাননা করে নাই। এবং উপরি উক্ত প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়কে দেবতা জ্ঞানে স্থাপিত বিগ্রহের ন্যায় প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকে। সার্দ্ধ ত্রিশত বর্ষকাল যাবৎ পুরুষানুক্রমে, এই আদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসা অসভ্য কুকি জাতির পক্ষে সামান্য রাজভক্তির পরিচায়ক নহে।

এতদ্ব্যতীত লঙ্গাই দফার হালামগণের নিকট সুসজ্জিত যুধ্যমান সোয়ার সহ, ধাতুনির্ম্মিত একটি সুন্দর অশ্বমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই অশ্বের পৃষ্ঠদেশে মহারাজ বিজয় মাণিক্য ও মহারাজ ছত্র মাণিক্যের নাম এবং যে সরদারকে উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার নাম খোদিত আছে। প্রদানের সন অশ্বপুচ্ছে খোদিত ছিল, এখন তাহা এক রকম উঠিয়া গিয়াছে। আমরা আয়তন-বর্দ্ধক কাচের সাহায্যেও তাহা পাঠ করিতে পারি নাই। কোন্ মহারাজের শাসন কালে ইহা প্রদত্ত হইয়াছিল, লিপিতে তদ্বিষয়ের উল্লেখ নাই; সুতরাং ইহা কত কালের জিনিস, তাহা নির্ণয় করিবার সুবিধা হইল না। ছত্র মাণিক্য, মহারাজ বিজয় মাণিক্য বাহাদুরের বহু পরবর্ত্তী ভূপতি। অশ্বপৃষ্ঠে ছত্র মাণিক্য বাহাদুরের নাম খোদিত থাকায় এই প্রতিমূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত হস্তী ও ব্যাঘ্রমূর্ত্তি অপেক্ষা আধুনিক বলিয়াই সাব্যস্ত হইতেছে। ছত্র মাণিক্যের শাসনকালে প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, তাহাও দুই শত বৎসরের অপেক্ষা পুরাতন। রাজদত্ত উপহার বলিয়া কুকিগণ এই প্রতিমূর্ত্তিটি পুরুষানুক্রমে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন ত্রিপুরার দরবার হইতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আমরা কুকিগণের নিকট দেখিয়াছি। এই সকল জিনিস বহু পুরাতন, ইহার মধ্যে অনেক সামান্য সামান্য বস্তুও আছে, কিন্তু রাজদত্ত বলিয়া তাহা কুকিগণের অতি আদরের জিনিস এবং তাহাদিগের দ্বারা বহু যত্নে রক্ষিত হইতেছে।

সাখাচেপ্ ও থাঙ্গাচেপ্ দফার হালামগণের রক্ষিত জিনিসের তালিকা;—(১) অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি, ছত্রের তালা (তাম্র নির্ম্মিত) ৪টী; (২) রৌপ্য নির্ম্মিত কর্ণভূষণ ৪টী; (৩) দেবতার পদতলে দেওয়ার রৌপ্য নির্ম্মিত পাত্র ৮ খানা; (৪) রমণীগণের বক্ষে বাঁধিবার রৌপ্য নির্ম্মিত স্তনাবরণ ২টী; (৫) ছত্রের ফুল (তাম্র নির্ম্মিত) ২টী; (৬) রৌপ্যপত্র ২খানা; (৭) জোড় ঘণ্টা ১টী; (৮) সূর্য্যাকৃতি ছত্রের ফুল (তাম্র নির্ম্মিত) ৪টী; (৯) রৌপ্য নির্ম্মিত পূজার জল দেওয়ার চুঙ্গ ১টী; (১০) লৌহ

* এই মূর্ত্তিদ্বয় দর্শন কালে ফটোগ্রাফের কাজ জানিতাম না। এজন্য সেই প্রাচীন রাজনীতির নিদর্শনের প্রতিকৃতি, পাঠকগণকে উপহার দিতে অক্ষম হইয়া নিতান্তই দুঃখিত আছি।

+ পাঠের প্রথমাবধি "শস্তনাশো ভবি" শব্দপর্য্যন্ত হস্তিপৃষ্ঠে এবং অবশিষ্টাংশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে খোদিত হইয়াছে।

নির্ম্মিত খড়্গ ১ খানা; (১১) রৌপ্য ফলক ১ খানা;* (১২) লৌহ নির্ম্মিত তুলাদণ্ড ১টী;* (১৩) রৌপ্য নির্ম্মিত কোটরা ২টী;* (১৪) হনুমান মূর্ত্তি-অঙ্কিত নিশান ১খানা।

লঙ্গাই দফার রক্ষিত জিনিসের তালিকা;—

(১) লৌহ নির্ম্মিত তুলাদণ্ড ১টী; (২) লোহার ওজনী (বাট খারা) ১টী; লৌহ নির্ম্মিত ফুড়ই + ১টী

তাম্র নির্ম্মিত জিনিসগুলির উপরে পূর্ব্বে সোণার গিলটি ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। শীঘ্র নষ্ট হইবার আশঙ্কায় ইহার কোন জিনিসই কুকীগণ ব্যবহার করিতেছে না। অতি মূল্যবান ও গৌরবের পরিচায়ক জ্ঞানে তাহা যত্ন সহকারে রক্ষা করিতেছে। বর্ব্বর জাতির পক্ষে রাজ-ভক্তির নিদর্শন ইহার বেশী আর কি হইতে পারে? আমাদের বিশ্বাস, পর্ব্বতে অনুসন্ধান করিলে এই রকমের আরও বিস্তর জিনিসের খোঁজ পাওয়া যাইবে।

বরাহ, গবয়, ছাগ ইত্যাদি পশু সচরাচর কুকিগণ পোষণ করিয়া থাকে। ইহাদের পোষিত ছাগ স্বতন্ত্র জাতীয়। স্বাধীন ত্রিপুরা অঞ্চলে ইহা "কু'কে পাঠা" নামে অভিহিত। এই ছাগগুলি সাধারণ ছাগ অপেক্ষা অনেক বড় হয়। এই সকল ছাগের লোমাবলী খুব লম্বা ও কোমল। অনেকে বলে, ইহা তিব্বত দেশীয় ছাগের বংশ-সংসৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তাহা হউক বা না হউক, এই সকল ছাগের লোমেও উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। পার্ব্বত্য জাতির পরস্পর সংস্রবে তিব্বত দেশীয় ছাগের বংশ বিস্তার হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব ঘটনা নহে।

স্বাধীন ত্রিপুরায় প্রাচীন কাল হইতে বহু সংখ্যক কুকি-প্রজা বস-বাস করিয়া আসিতেছে। কুসাই পর্ব্বতও এক সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল; কাল প্রভাবে এখন তাহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কুকিপ্রজা ঐ রাজ্যে বাস করিতেছে, তাহা-দের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুকিগণের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। বিগত আদম শুমারীতে ত্রিপুরারাজ্যের কুকি ও হালাম সম্প্রদায়ের সংখ্যা সাত হাজারের কিছু বেশী সাব্যস্ত হইয়াছে। জন সংখ্যা গণনার কাজ যে সম্পূর্ণ শুদ্ধরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না, একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। কুকি পল্লীর ন্যায় দুর্গম অরণ্য মধ্যে, ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা অধিকতর অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং কুকিসংখ্যা আরও বেশী আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ত্রিপুরেশ্বরের অধীন কতিপয় কুকি জাতীয় সামন্ত রাজা দ্বারা ইহারা শাসিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে।* এতকাল কুকি-গণের অপরাধের বিচারাদি সামন্ত রাজগণ দ্বারাই হইত। তাঁহারা অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড করিতেন। কয়েদিকে কারা-গারে আবদ্ধ থাকিতে হইত না; রাজার বাড়ীতে উপস্থিত থাকিয়া বিনা বেতনে তাঁহার কাজ করিতে হইত। এখন আর সে নিয়ম নাই। আজকাল মহারাজ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত আদালতে কুকিগণের অপরাধের বিচার হইয়া থাকে। কেবল সামাজিক বিচারের মীমাংসাদি কুকিরাজ-গণ করিয়া থাকেন। অনেকস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের বিচারও তাঁহারাই করেন।

কুকিগণ ত্রিপুরেশ্বর বাহাদুরের সরকারে "ঘরচুক্তি কর" নামে একটি কর আদায় করে। এই করের সহিত ভূমির কোনরূপ সম্বন্ধ নাই; 'খানার' উপর ইহা ধার্য্য হইয়া থাকে। অন্ধ, আতুর, কুষ্ঠরোগী, বিধবা ও বিপত্নীকগণকে কর দিতে হয় না। এতদ্ভিন্ন সামন্ত রাজাদিগকে সকলে মিলিয়া প্রতিবৎসর একটি 'জুম' ক্ষেত্র করিয়া দেয়। আব-শ্যকতা মতে তাঁহাদের বাড়ীঘর নির্ম্মাণ ও উৎসবাদি উপ-লক্ষে বিনা বেতনে তাহাদিগকে কাজ করিয়া দিতে হয়। ইহা ব্যতীত সামন্ত রাজগণ অন্য কোনরূপ কর গ্রহণ করেন না।

শেল, জাঠা, তরবারি ও ধনুর্ব্বাণ কুকিগণের যুদ্ধের অস্ত্র। এই সকল অস্ত্রে ইহারা বিলক্ষণ সিদ্ধহস্ত। ধনুর্ব্বাণ দ্বারা তাহারা সর্ব্বদা পশু পক্ষী ইত্যাদি শিকার করিয়া থাকে। প্রবাদ আছে যে বীর পুরুষ, রমণীগণের কর্ণলতিকার ছিদ্রের ভিতর দিয়া অনায়াসে তীর চালাইতে পারে, সে ব্যক্তি সমাজে বিশেষ সম্মান ও গৌরব লাভ করিয়া থাকে। 'খোং' নামক একপ্রকার কাংস্য নির্ম্মিত বৃহৎ বাদ্য যন্ত্র দ্বারা ইহাদের রণবাদ্যের কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই যন্ত্রের

* এই জিনিস গুলিতে অনেক কথা লিখিত ছিল, অস্পষ্ট হওয়ায় তাহা পাঠ করিতে পারা গেল না।

+ 'ফুড়ই' একটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন। যুদ্ধ কালে বা অন্য কোনও প্রয়োজনে এই চিহ্ন পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রেরণ করিলে, তাহা দৃষ্টিমাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলে সমবেত হইতে বাধ্য। ফুড়ইতে রক্ত মাখাইয়া দিলে, যুদ্ধ উপস্থিত বুঝিয়া বুঝা যায়। ত্রিপুর দরবারের অনুমত্যনুসারে ফুড়ই চালনার প্রথা এখন রহিত হইয়াছে।

* এই সামন্ত রাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পরে লিখিব।

শব্দ অতি গম্ভীর ও দূরগামী। ইহার আকার কাঁশীর ন্যায়। পাঁচ ছয় ফুট পর্য্যন্ত ব্যাসের "ঘোং" যন্ত্র আমরা দেখিয়াছি। ইহার পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থলে বর্ত্তুলাকার একটী উচ্চস্থান থাকে, সেই স্থানে আঘাত করিয়া বাজাইতে হয়। যন্ত্রটী বংশ বা কাষ্ঠ খণ্ডের মধ্যস্থলে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া দুইজনে কাঁধে লয়, অন্য একজনে বাজায়।

কুকিগণের রণসজ্জা অতি সুন্দর। তাহারা আপনাদের নির্ম্মিত কাপড়ের একটী জামা পরে, কাল পাছুড়ি দ্বারা মাথায় পাগড়ি বাঁধে এবং তাহার উপর কুক্কুট-পুচ্ছ বা ময়ূর-পুচ্ছ গুঁজিয়া দেয়। বক্ষঃস্থলে (যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ঝুলাইয়া) আট অঙ্গুলি পরিমিত চৌড়া একটী পটি বাঁধে। এই পটিটি কড়িদ্বারা সাজান হয়। হস্তে একটী শেল (বর্শা) থাকে, তাহার ফলক উপরের দিকে রাখিয়া কাঁধে ফেলিয়া লয়। এই সকল পরিচ্ছদ পরিধান করিলে, কুকিগণের উগ্রমূর্ত্তি অধিকতর উগ্রভাব ধারণ করে। আমরা স্বাধীন ত্রিপুরার কতিপয় কুকি সৈন্যের প্রতিকৃতি এই সঙ্গে প্রদান করিলাম।

এই কামান বন্দুকের যুগে ধনুর্ব্বাণ বা শেলশূল কার্য্যকরী হয় না। এজন্য কুকিগণ বন্দুক ব্যবহারও শিক্ষা করিয়াছে। অন্যান্য অস্ত্রের ন্যায় বন্দুকেও ইহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ। স্বাধীন ত্রিপুরার বন্দুকধারী কতিপয় কুকি সৈন্যের ছবিও প্রদত্ত হইল।—

কুকিগণ সম্মুখ সংগ্রামে তত পটু নহে। লুক্কায়িতভাবে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া শত্রুদলকে ইহারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। ত্রিপুরার ইতিহাস আলোচনা করিলে, কুকিগণের এই উপায়ে যুদ্ধ জয় করিবার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

"হিন্দু" শব্দ-রহস্য।

সম্প্রতি "ভারতী" পত্রিকায়, সুযোগ্য লেখক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়, "হিন্দু শব্দ-তত্ব" বহু গবেষণার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি "হিন্দু" শব্দ সম্বন্ধে যে সকল ভুলের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার ব্যাখ্যা পড়িয়া, কিন্তু তাহার মধ্যে একটী ভুল আমাদের সত্য বলিয়াই ধারণা জন্মিয়াছে। মহাভারতী মহাশয় দফায় দফায়, অনেক "ভুল" উল্লেখ করিয়াছেন এবং নিজ বক্তব্য স্থলে অনেক "ইস্যু" ধার্য্য করিয়া, পূর্ব্বাহ্নেই স্বপক্ষে "ডিক্রী"র স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহারই কথায়, তাঁহারই সিদ্ধান্ত বোধ হয় উল্‌টাইয়া গিয়াছে; অথবা তিনি যাহা "ভুল" বলিয়া সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, পরিণামে তাহাই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

আমি বহু ভাষাবিৎ পণ্ডিত নহি, এবং গবেষণার শক্তি, সামর্থ্য এবং সময়ও আমার নাই; কিন্তু তথাপি, মহাভারতী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সুপাঠ্য প্রবন্ধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে যাইতেছি। ইহা আমার পক্ষে প্রগল্‌ভতা মাত্র, সন্দেহ কি? তবে, আমি "হিন্দু" শব্দের অর্থে, হীনতাজনক কিছু না বুঝিয়াও, নিজেকে "হিন্দু" মনে করি, এবং "হিন্দু" শব্দ "সিন্ধু" শব্দেরই প্রকারান্তরে অপভ্রংশ বলিয়া বিশ্বাস করি। "ভারতী"র প্রবন্ধ পড়িয়াও, সে বিশ্বাস দূর হইল না; সেই জন্য, আমার বক্তব্য প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। আশা করি, মহাভারতী মহাশয় আমার (এবং বোধ হয় আমার মত অনেকেরই) ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য পুনরায় এ সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিবেন।

মহাভারতী মহাশয়ের প্রবন্ধদ্বয়ের সার সঙ্কলন করিলে "হিন্দু," শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষেপতঃ এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—

(১) জেন্দাবেস্তায় "হপ্তহিন্দব" শব্দের উল্লেখ আছে।

(২) "বেদে" ইহাই "সপ্তসিন্ধবঃ"। "সপ্তসিন্ধবঃ" বলিয়া এক আর্য্য রাজ্য ছিল।

(৩) "বেদ" ও "জেন্দাবেস্তা" সামসময়িক।

(৪) "বেদ" ও "জেন্দাবেস্তা," হিব্রু ভাষা ও ওলড্ টেষ্টামেণ্টের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।

(৫) জেন্দ ভাষা হিব্রু ভাষার জননী। য়ীহুদী জাতি ও দেশ তাহাদের প্রাচীন কালে জেন্দ-ভাষাভাষী পারসিকগণের অধীন ছিল।

(৬) হিব্রু "ওলড্ টেষ্টামেণ্টে" "হন্দু" শব্দের উল্লেখ আছে।

(৭) হিব্রু ভাষার নিয়মানুসারে, "হিন্দব" শব্দ জেন্দ

ভাষা হইতে রূপান্তরিত হইয়া "হন্দ্" শব্দে পরিণত হইয়াছে।

(৮) হিব্রু শাস্ত্র রচনা কালে "হন্দ্" জাতি শক্তিশালী, পরাক্রান্ত, মহিমময় বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং "হন্দ্" শব্দ গৌরব ও শক্তিসূচকরূপে "হন্দ্" জাতিকে বুঝাইত।

(৯) গ্রীক-আক্রমণ কালে এই "হন্দ" জাতি বর্ত্তমান আফগানিস্থানের কিয়দংশ এবং বর্ত্তমান পঞ্জাবের কতক অংশে উপনিবিষ্ট ছিল। "হন্দ" অধিকারের সীমা বলিয়া উত্তর পশ্চিমের সীমা পর্ব্বত "হন্দকোশ্" নামে গ্রীকদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছিল। ইহাই "হিন্দুকুশ"।

(১০) গ্রীকেরা "হন্দ্কোঃ', বা "হন্দকোশ"কে Hondkosh, Indikos, 'ইণ্ডিকস্' বলিয়া লিখিতে ও বলিতে আরম্ভ করে।.

(১১) ইণ্ডিকস্ বা ইণ্ডিযস হইতে "ইণ্ডিয়া" শব্দ উৎপন্ন।

(১২) পশতু ভাষায় হন্দ্ বা হিন্দ "হন্দু" রূপে পরিণত।

(১৩) শিখ গুরুমুখী ভাষায় "হন্দু" "হিন্দ্" হইয়া গিয়াছে।

এখন কথা হইতেছে "হিন্দু" শব্দ সম্বন্ধে প্রচলিত "ভুল" কি? লোকে মনে করে যে, "সিন্ধু" শব্দের "স" যাবনিক ভাষায় "হ" হইয়াছে। এখন মহাভারতী মহাশয়ের প্রমাণ অনুসারে যেন স্বীকার করা গেল, আরবী বা পারসীতে "স" "হ" বলিয়া উচ্চারিত হইবার প্রয়োজন নাই, এবং সংস্কৃত "সপ্তাহ," পারসী "হপ্তা" রূপে পরিণত হয় নাই। কিন্তু উপরিলিখিত "হিন্দু" শব্দের ইতিহাসে, স্পষ্টই ত দেখা যাইতেছে, বৈদিক ("সংস্কৃত" নাই বা হইল!) "সপ্তসিন্ধব' শব্দ "হপ্তহিন্দব" বলিয়া জেন্দ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। "সপ্তসিন্ধবঃ" যদি "হপ্তহিন্দব" হইল, তাহা হইলে কি "স" স্থানে "হ" হইল না? জেন্দ ভাষা পরবর্ত্তী পারসীক ভাষার ন্যায় 'যাবনিক' না হইলেই বা কি? আর্য্য ও ইরাণী একই মূল জাতির বিভিন্ন শাখা বটে। কিন্তু বৈদিক আর্য্যেরা যেখানে "স" উচ্চারণ করিতেন, জেন্দিক্ ইরাণীরা সেখানে 'স'কে যে 'হ' উচ্চারণ করিতেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এখনও ত অনেক কথিত ভাষার দেশান্তরভেদে এরূপ অনেক স্থলে দেখা যায়। যেমন বাঙ্গালা ভাষায়। তদ্ব্যতীত বৈদিক "অসুর", কি জেন্দ্ "আহুর" নহে? বৈদিক "সোম" কি জেন্দ্ 'হোম" নহে? যদি বৈদিক 'স' স্থানে জেন্দ্ উচ্চারণ 'হ' স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে অপর পক্ষে স্বীকার করিতে হয় জেন্দ্ 'হ' বৈদিক 'স'তে পরিণত হইয়াছিল; অর্থাৎ, পূর্ব্বের "হপ্তহিন্দব," পশ্চাতে বেদে, "সপ্তসিন্ধবঃ" আকার ধারণ করিয়াছিল। এ কথা কি প্রামাণ্য? যে দেশে যাহারা বসবাস করে, সে দেশের নাম মূলতঃ তাহারাই দেয়। মূল আর্য্যস্থান হইতে, বৈদিক আর্য্যেরা দক্ষিণবাহী হইয়া, হিন্দুকুশ ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে উপনিবেশ স্থাপন করিলে, তাঁহারাই নদীর সংখ্যা দেখিয়া, দেশকে সপ্তসিন্ধব নাম দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের প্রতিবেশী অগ্নিপূজক ইরাণীগণ ঐ "সপ্তসিন্ধবঃ" নাম "হপ্তহিন্দব" বলিয়া উচ্চারণ করিতেন, এইরূপ অনুমানই ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়।

"সিন্ধু" শব্দ বেদের সময় উৎপন্ন হয় নাই, বা "সিন্ধু" অর্থে প্রবহমান নদ-নদী ও সাগর বুঝাইত না, এ সিদ্ধান্ত কিরূপে প্রমাণ হইল, বুঝা যায় না। লেখক মহাশয় (এবং "ভারতী-সম্পাদিকা মহাশয়া) কি, "হিন্দব" হইতে "সিন্ধব" এবং "সিন্ধবঃ" হইতে "সিন্ধু" শব্দের উৎপত্তি ধরিতে চান? "পরবর্ত্তী বৈয়াকরণিকের" উপর আক্রোশের ত কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া গেল না। "সিন্ধু" শব্দের বহুবচনেই ত "সিন্ধবঃ" নিষ্পন্ন হইতে পারে! আগে একবচনান্ত মূল শব্দ, না আগে বহুবচনান্ত নিষ্পন্ন শব্দ? "সিন্ধু" শব্দের উল্লেখ নাই বলিয়া বা তখনও "ব্যাকরণ" প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে, যে "সিন্ধু" শব্দ ছিল না? আগে ভাষা, না আগে ব্যাকরণ? 'সপ্ত" শব্দ ত বহুবাচক বটে; 'সপ্ত' এই বিশেষণ যোগে বিশেষ্য, "সিন্ধব" না হইয়াই পারেনা! "সিন্ধব" ছিল, "সিন্ধু" ছিল না, পরে হইয়াছে, ইহা নিতান্তই অপ্রামাণ্য।

"মহাভারতী" মহাশয়ের নানাভাষাজ্ঞানদীপ্ত আলোচনায় সপ্রমাণ হয়, "হিন্দু" শব্দ "সপ্তসিন্ধবঃ" এই দেশবাচক আর্য্য শব্দ হইতে, জেন্দ্ ভাষায়, পরে হিব্রু ভাষায়, তৎপরে গ্রীক্ ভাষার ভিতর দিয়া, সহস্র সহস্র যুগ বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে, এবং পশতু ও গুরুমুখী ভাষায় বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। সংস্কৃতে "হিন্দু" নাম পাওয়া না যাইতে পারে, কিন্তু সেই "সপ্তসিন্ধবঃ" দেশবাসী-

দিগকেই প্রাচীন জাতিরা, এবং তাহাদের সভ্যতায় উন্নত আধুনিক বৈদেশিক জাতিরা, 'হুন্দ' 'হিন্দ' বা 'হন্দ' বা 'হিন্দু' বা 'ইনডু' বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিতেছে ইহা স্পষ্টই জানা যায়। সিন্ধুতীরবাসী আর্য্য ঔপনিবেশিকের বংশধরেরাই "হিন্দু" বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, এবং হইতেছে, এবং তাহাদের দেশই বর্ত্তমানে "হিন্দুস্থান" নাম ধারণ করিয়াছে। "সিন্ধু" ও "হিন্দু" নিতান্ত অসংসৃষ্ট নহে, এক অপরের বিকৃতি ও পরিণতি, ভাষান্তরের মধ্য দিয়া হইলেই বা, মূল সম্পর্ক কোথায় যাইবে?

আমার বোধ হয়, ভারতে মুসলমানের আবির্ভাব ও প্রভাব কালে, ভারতীয় আর্য্যগণের যে 'হিন্দু' নাম পাশ্চাত্য বৈদেশিক জাতিগণের মধ্যেই পরিচিত ছিল, তাহা পুনরায় পাশ্চাত্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারতে সমধিক প্রচলিত হয়, এবং মুসলমান রাজগণের দেখাদেখি আমরাও আপনা দিগকে "হিন্দু" বলিয়া সাধারণ্যে অভিহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। 'হিন্দুস্থান' নাম, মুসলমান কর্ত্তৃক প্রদত্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমানেরা এরূপ অনেক দেশের নামকরণ করিয়াছিল, যথা আফ্‌গানস্থান, বেলুচিস্থান, কুর্দ্দিস্থান, তুর্কিস্থান ইত্যাদি।

শ্রীস্থ—

"চলি চলি পা—পা।"

ধরণী, শ্যামল অঙ্ক
দাও দাও বিছাইয়া—
"চলি, চলি, পা-পা" ধায়
বাছা হেলিয়া দুলিয়া।

পরশ-হরষে মত্ত
অধীর হ'য়োনা ধরা,
ফেল'না বাছারে মোর
কোলেতে লইতে ত্বরা।

পড়েছে তোমার কোলে
ভানুর কিরণ-ধারা,
সে সোণা কুড়াতে দেখ
ছুটেছে পাগল পারা;

হোথায় ডাকিছে পাখী—
তারই মত হর্ষ-স্বরে,
গাছ পালা হেলি' দুলি'
ডাকিছে কাঁপায়ে করে।

চৌদিকে স্নেহের ডাক,
চৌদিকে প্রীতির আঁখি,
কোন্ দিকে যাবে বাছা?
কোথা তারে ধরে রাখি?

এখন হাসিছে যথা
মাণিকের চারি ধারে,
স্নেহ্যাগের ফুল-বীথি—
গাঁথা চুম্বনের হারে,

বয়সের সনে যেন
কঠিন সংসার-পথ
প্রীতি শ্যামায়িত রহে
পূর্ণ করি মনোরথ।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

মান—অপমান।

তুমি দিয়াছিলে মান তুমি নিলে কেড়ে—
আমার কি ক্ষোভ তাহে আছে গো জননি?
তোমার এ বঙ্গভূমে যা সাজাবে মোরে
অম্লান-বদনে তাই সাজিব তখনি।

'চিরদিন রাজা হব, হব না ভিখারী'—.
একি অপরূপ কথা—একি আব্‌দার!
তুমি যার কেনা দাসী এ দাবী তাহারি—
আমি কে যে হেন সাধ খাটিবে আমার?

সকলেই সেনাপতি, কেহ নহে সেনা—
আমার লাগে না ভাল এমন নিয়ম:—
তোমার কথায় কথা আমার সহে না,
আবদার দেখে মোর উপজে সরম;

তাইত তোমার পায় দিয়াছি অঞ্জলি—
আমার যা কিছু আছে মান অপমান;

যা করাবে হাসিমুখে করিব সকলি—
কখনো সাজিব রাম—কভু হনুমান।

শ্রীবিজয় কুমার সেন।

নির্ব্বাসিতা সীতা।

উত্তরিল রথ যবে ভাগীরথীপারে,
লক্ষ্মণ করুণ কণ্ঠে কহিলা সীতারে
রামের কঠোর আজ্ঞা। মূর্চ্ছি না সীতা
সামান্যা নারীর মত—সাধ্বী শুচিস্মিতা
পড়িলা না মহাদুঃখে ভাঙ্গিয়া গলিয়া;
ক্ষণতরে সতী-গর্ব্বে উঠিলা জলিয়া
নিরপরাধিনী শুধু! কহিলা লক্ষণে,—
আপনার মন্দভাগ্য, জেনো নাহি গণে
নির্ব্বাসিতা সীতা। ভাবিতেছি মনে,
ধর্ম্ম কি সহিবে, হায়, আজি অকারণে
রাজহস্তে অপমান! সে অমূল্য ধন
দেবেন্দ্রদুর্লভ। নিমিষের অযতন
নাহি সহে তার। যশে নাহি ক্রীত হয়;
বলে নাহি হারে।—রাজদণ্ডে তারি ক্ষয়!
এত কহি নিরবিলা—ফিরে এল প্রাণে
আত্মবিস্মিতার ভাব। পতিপদ ধ্যানে
সকলি ডুবিয়া গেল। সস্নেহ নয়নে
বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে কহিলা লক্ষ্মণে,
রাজ-আজ্ঞা, ভ্রাতৃ-আজ্ঞা, করেছ পালন,—
ধন্য তুমি! যাও ফিরে রামের সদন
কর্ত্তব্যে রহিও স্থির—করি আশীর্ব্বাদ!
কেন লজ্জানত? তোমার কি অপরাধ?
শ্বশ্রূ ভ্রাতা পৌরজনে প্রবোধিও, বীর,
কহিও নাথের কাছে দীনা জানকীর
এই নিবেদন,—রাজা তিনি, তিনি স্বামী;
তার কিছু নাহি দোষ! অভাগিনী আমি,
তেঁই মোরে বাম সবে! মাতা বসুমতি
কোলে নাহি দিলা স্থান—হায়, কি নিয়তি!
শুনেছি অনলে স্বর্ণ ধরে উজ্জলতা,
স্বর্ণ নহি—নাহি গেল নিন্দা-মলিনতা!
কিন্তু না হইনু ছাই!—রামের সন্তান
ধরেছি যে গর্ভে আমি; যদি থাকে প্রাণ,
পিতৃগুণে বিমণ্ডিয়া তুলিব তাহারে।
রহিব নির্জ্জন বনে শুদ্ধ তপাচারে
অন্তরে জাগিবে মোর এক মনস্কাম,—
জন্মে জন্মে পতি যেন হন মোর রাম।
এতবলি নিবারিলা রঘুকুলেশ্বরী,
ছিন্নতন্ত্রী বীণাসম। শূন্য তটোপরি
অস্ত গেল সন্ধ্যাসূর্য্য। মুছি দুনয়ন
ফিরিলা পশ্চাতে বাখি' শোকার্ত্ত লক্ষ্মণ,—
স্তব্ধ ব্যোম, স্থির নদী, উদাস অটবী,
মাঝে তার জ্যোতির্ম্ময়ী বিষাদের ছবি!

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

কঙ্গ্রেস,—সপ্তদশ অধিবেশন

[ব্যয় সমর্থন]

অনর্থক আত্মবিরোধ, যেদেশের একাল সেকালব্যাপী বদ্ধমূল ব্যাধি,—পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের কাল হইতে, শিশিরবাবু সুরেন্দ্র বাবুর সময় পর্য্যন্তও, আত্ম-বিরোধ, যেদেশে, কোন অনিষ্টেরই অবধি রাখে নাই—রাখিতেছেনা,—অধীনতা, অসম্ভ্রম, অন্নক্লেশ, সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক অবনতি ও দুর্গতি, এককথায় অধঃপতনের সর্ব্বরকমেরই প্রকার ভেদ, যেদেশে একমাত্র আত্ম বিরোধেরই ফল,—আত্ম-বিরোধ যে দেশের স্বাধীন জীবন, বহুকাল পূর্ব্বে, বিনষ্ট করিয়া, অধীন জীবনেরও অস্থি মজ্জা, কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া চলিয়াছে,—পরন্তু, যেদেশের একটা ক্ষুদ্র পল্লীতেও পাঁচটা পৃথক পৃথক দল,—যেদেশে দশজনের অনুষ্ঠিত একটা অতি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান—একটা যৎসামান্য যৌথ বিধান, কচিৎ জীবিত থাকে,—"দশে মিলে করিকাজ, হারি জীতি নাহি লাজ"—যেদেশের বহুপুরাতন ও একান্ত প্রচলিত প্রবচন হইয়াও, দেশবাসী কর্ত্তৃক তাহা পদে পদে উপেক্ষিত অগ্রাহ্য;—সেদেশে, এই "কঙ্গ্রেস" নামক সমগ্র দেশব্যাপী দেশের প্রত্যেক প্রদেশ-স্পর্শী, সমবেত-ভারতবর্ষের এই বিরাট, বিচিত্র, অপূর্ব্ব রাজনৈতিক একতানুষ্ঠান—বিপুল



চলি চলি পা পা



শ্রীযুক্ত এন্, জি, চন্দ্রভাবকাব।



শ্রীযুক্ত ডি, ই, ওযাচা।



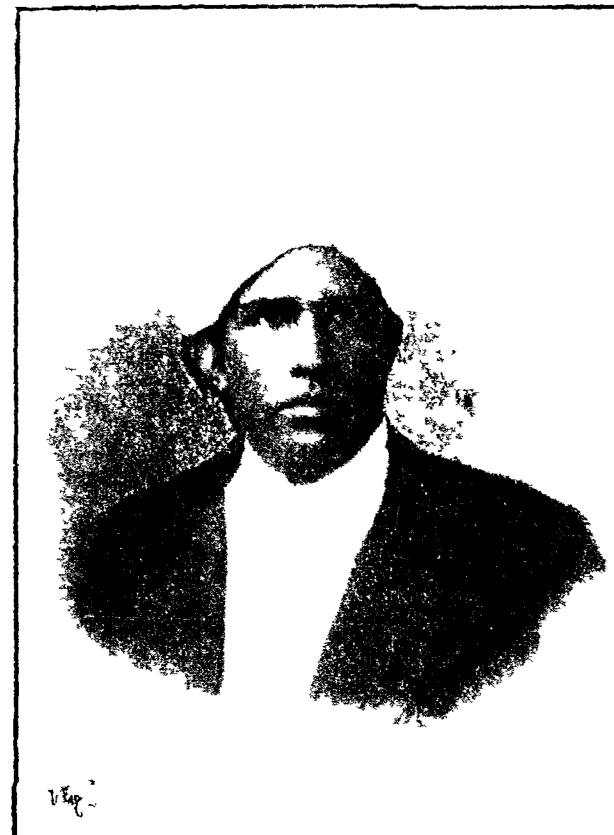
শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু।



শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত।



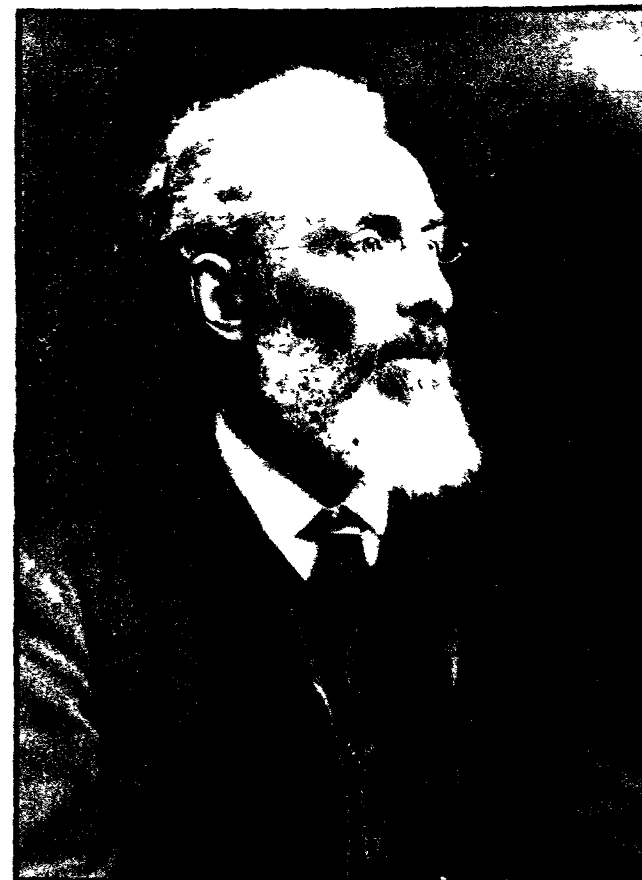
শ্রীযুক্ত আর, এম, সায়ানি।



শ্রীযুক্ত শঙ্কর নায়ার।



শ্রীযুক্ত আনন্দ চার্লু।



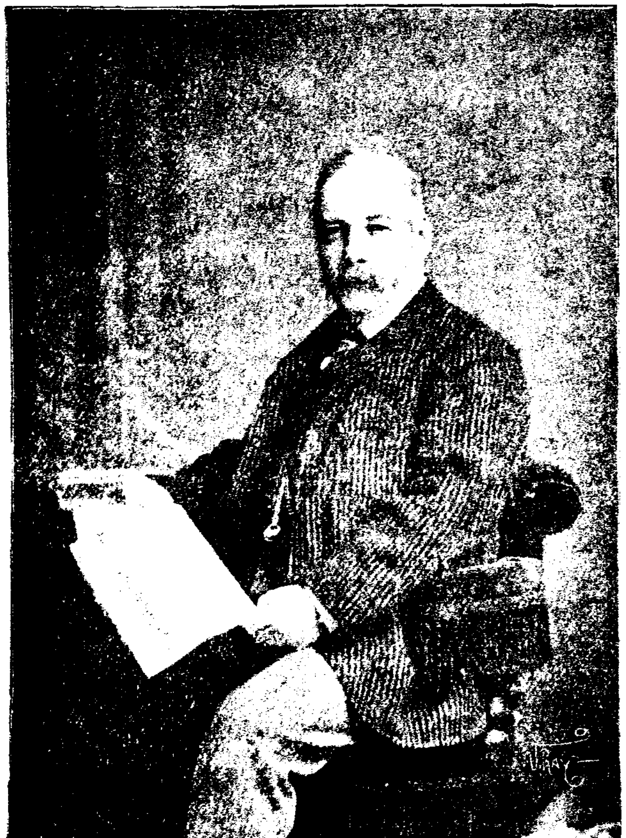
শ্রীযুক্ত এলফ্রেড্ ওয়েব।



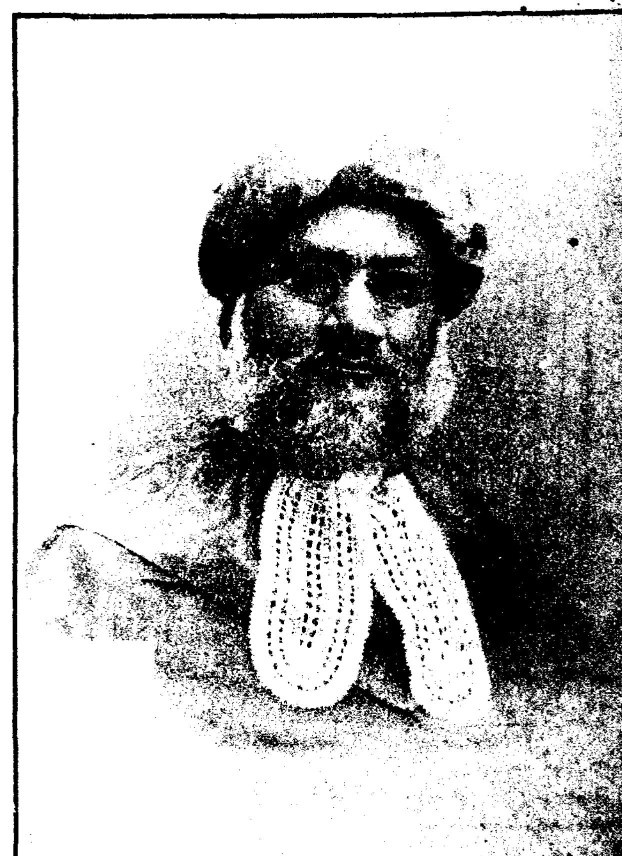
শ্রীযুক্ত ফেরোজ সা মেটা ।



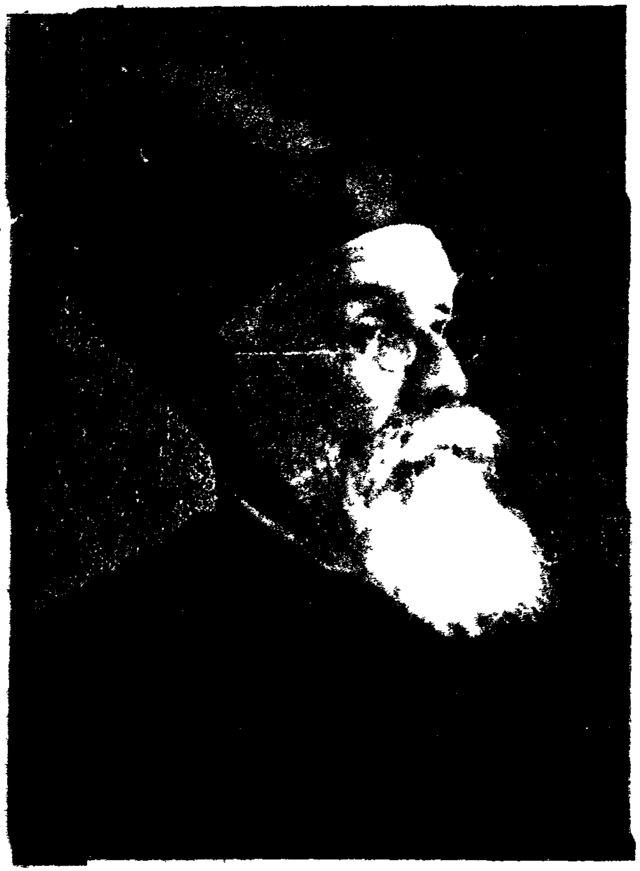
শ্রীযুক্ত উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ ।



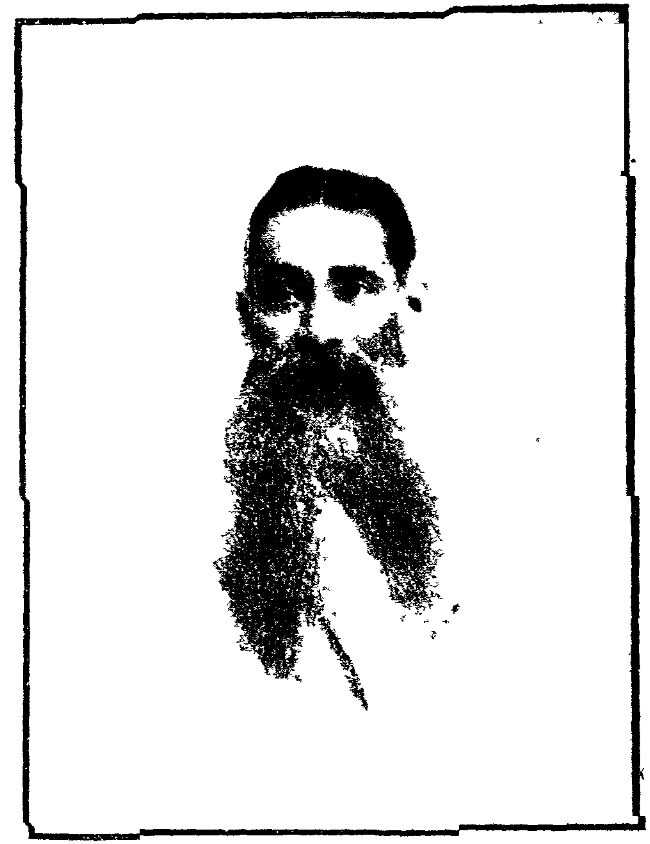
শ্রীযুক্ত জর্জ্জ ইউল্।



শ্রীযুক্ত বদরুদ্দিন তায়েব জী।



শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরাজী।



শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রজাস্বত্ব" ষোলবৎসর কাল সজীব থাকিয়া, সেই সজীবতার সহিত আজ সপ্তদশ বর্ষে, পৌঁছিতে পারিয়াছে, ইহাইযে আমাদের প্রথমতঃ পরম সৌভাগ্য,—কেবল ইহাতেই,—ইহার কৃতকার্য্যের ফলাফল দূরে রাখিয়া এবং গণনার মধ্যে না লইয়া,—কেবল মাত্র ইহাতেই—সজীব-ভাবে এই ১৭ বৎসর কাল জীবিত থাকাতেই যে, কংগ্রেসের "জয়জয়কার"। পরন্তু, সপ্তদশ-বর্ষ-ব্যাপী উহার এই নাতি দীর্ঘ-জীবন কালটুকু, নেহাত পুষ্প বাসে ও প্রীতিরসেও কাটে নাই। বড়ই পিচ্ছিল, পঙ্কিল ও পদে পদে কণ্টকাকীর্ণ এবং বিঘ্ন-বিপদ সঙ্কুল পথ পারাইয়া, বহু ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রপাতের মধ্যদিয়া, উহাকে এই সপ্তদশে আসিতে হইয়াছে। একদিকে, রাজশক্তির ভ্রুকুটি কটাক্ষ—অলক্ষ লোহিত লোচন এবং বিপক্ষ পক্ষের অপ্রীতির ও অহেতুক বিদ্বেষের প্রখর দংশন এবং ব্যঙ্গ বিদ্রুপের বিষাক্ত লেহন, পরন্তু অপর দিকে, স্বপক্ষ পক্ষের ও স্বজনগণের উপেক্ষা ঔদাসিন্য, অবসাদ মনোমালিন্য,—শত শত প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া, শত শত সাংঘাতিক বাধা বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে "কংগ্রেস" আজ সপ্তদশে উপস্থিত হইয়াছেন। সহৃদয় ভারত সন্তান মাত্রেরই অনাবিল আনন্দের বিষয়, সজাতীয় সম্ভ্রম এবং কিঞ্চিৎ শ্লাঘার বিষয়ও নয় কি?

কিন্তু, এখন এই উপস্থিত অবস্থায় আরও অধিকতর সমর্থন, অধিকতর সন্তর্পণ ও মনোমিলন, অধিকতর সতর্কতা ও সমবেত সহায়তা এবং অচল অটল একতার প্রয়োজন। বঙ্গের,—বোধহয় সমগ্র ভারতের সর্ব্বপুরাতন ও প্রবীন প্রজানৈতিক সমিতি,—বৃদ্ধ ও বিশিষ্ট "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের" কি বিসদৃশ অবস্থা. অন্তঃবিবাদ বিজৃম্ভিত ও আত্মবিদ্বেষ-বিক্ষোভিত কি শোচনীয় ও সাংঘাতিক দৃশ্য,—কি অসার ও বিদ্রুপকর অভিনয়, আমরা সম্প্রতি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম, প্রায় প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই আত্মকলহ-বিচ্ছিন্ন, আত্ম-বিরোধ বিদগ্ধ দেশে, এই ব্যক্তি গত প্রাধান্য স্থাপনের এবং অতিমাত্র আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রলোভন-কলুষিত জল বায়ুতে, সমবেত সাধারণ অনুষ্ঠান মাত্রেরই পদে পদে শঙ্কা, ইহা সর্ব্বদাই স্মরণীয়। এবং অন্ততঃ সেই সূত্রেও আত্ম সমাজ বা সম্প্রদায় গত স্বার্থ, আবশ্যকস্থলে, বরং কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া, বিশেষতঃ আত্ম ব্যক্তিগত খ্যাতি প্রতিপত্তির কামনা, একেবারে বিলুপ্ত না হউক, অন্ততঃ সম্যকরূপে আবৃত ও উপেক্ষিত করিয়া, কংগ্রেস-ক্ষেত্রে, উহার পরিচালক গণের বিচরণ ও স্ব স্ব অংশে নির্দ্দিষ্ট, নিরতিশয় কঠিন সাধারণ কার্য্য সকল সাধন করা কর্ত্তব্য, ইহা বলা একটু অতিরিক্ত হইলেও উহার কেবল একান্ত ও আদৌ অলঙ্ঘনীয় আবশ্যকতা নিবন্ধন, নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্যের পক্ষেও অনুপযুক্ত নহে। যেক্ষেত্রে, আত্ম-ত্যাগ, আত্ম ব্যক্তিত্বের বিলোপ, বিসর্জ্জন, বিস্মরণ ও বলিদান একমাত্র কার্য্যোপদান, সে ক্ষেত্রে, আত্ম বিস্তার বা অণুমাত্রও আত্ম-প্রভা, প্রতিপত্তির প্রসার, নিরতিশয় সাংঘাতিক ও সর্ব্বনাশ বিধায়ক নয় কি? কে ইহা না জানেন, না বুঝেন, বিশ্বাস না করেন?

নিশ্চয়, কংগ্রেসের ন্যায়, প্রজানীতির সাধারণ সমালোচনা ও মন্ত্রনা-গৃহে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই, এমন কি সংযম ও শিষ্টাচারের অপেক্ষাকৃত উচ্চ আদর্শ—বৃটিশ পার্লেমেণ্টেও অসহিষ্ণুতা, অধীরতা ও অনৈক্য এবং আত্ম-ব্যক্তিত্বের ও সম্প্রদায়িক স্বার্থের অযথা বিস্তার ঘটিত বিসদৃশ ব্যাপার ও লজ্জাকর দৃশ্যের অভাব নাই, সচরাচরই সেরূপ—অনুপযুক্ত, অশিষ্ট ও অসংযত অভিনয়ের সংবাদ শুনা যাইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের অসামান্য উন্নত ও নিত্য উন্নতিশীল অবস্থা, ও অবস্থিতি, ও আমাদের নিরতিশয় অবনত ও একান্ত দুরাবস্থা ও দুর্গতি এ উভয়ের মধ্যে অপরিসীম প্রভেদ,—আকাশ পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান। সে সকল স্থলে, যে পারপক ও চির প্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় শক্তি পরম্পরা সর্ব্ববিধ পার্থক্যের সমাহার ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, পরস্পর বিরোধী ব্যক্তি নিচয়কে, সাধারণ কল্যাণের একই মহা কেন্দ্রে, মাধ্যাকর্ষণবৎ আকৃষ্ট করে, এবং সেইই কল্যাণের একই অব্যাহত, ও অলঙ্ঘনীয় সুপ্রসর পথে, সদা পরিচালিত ও প্রবাহিত করে, তাহা আমাদের মধ্যে কোথায়? সৌভাগ্য ও শুভসংযোগে, তাহা যদি কখন সৃষ্ট ও গঠিত হয়, হইতে কত কাল লাগিবে? পরন্তু, সে সকল স্থলের বিমানস্পর্শী, সংগঠন-ক্ষম ব্যক্তিগত অতুল প্রতিভা, অবিচলিত দৃঢ়তা, অসীম কার্য্যশীলতা, পুরুষ পরম্পরাগত অব্যাহত উৎসাহ, উদ্যম. একই অবাধ, উন্মুক্ত প্রবাহে প্রবাহিত,-সদাই সজীব ও সতেজ "জোয়ারে" পূর্ণ, জাতীয়

জীবন, আমাদের অকর্ম্মণ্য, অবসন্ন, অসংখ্য ভগ্নাংশে বিচ্ছিন্ন জাতি নিচযের মধ্যে কোথায়! কতকালের স্বাধীন আবহাওয়ায়, ও, স্বাস্থ্যকর, সুনিয়মিত শিক্ষায়, ঐ সকল শক্তি, অদ্যাকার য়ুরোপীয় জাতি নিচয়ের মধ্যে অভিব্যক্ত ও সঞ্চিত হইয়াছে? এ সোপানে, আমরা আজও দাঁড়াইতেও শিখি নাই, সোজা হইয়া দাঁড়াইবার শক্তিই আমাদের হয় নাই, পদে পদেই পদস্খলন ও পতনের সম্ভাবনা; অতএব কতই সাবধানতা ও সতর্কতা প্রয়োজন, তাহা চিন্তাশীল চিত্তেরই অনুভবনীয়।

তবে,—আত্মশ্লাঘা প্রচারার্থে নয়, ষোলআনা সত্যের খাতিরে, ইহাও এ প্রসঙ্গে বক্তব্য বিবেচনা করি যে, অপরাপর স্বাধীন ও সজীব জাতির তুলনায়, আমাদের নির্জীব ও অনাত্ম শাসনাধীন, বহুবর্ণে ও বিভাগে বিভক্ত ও বিযুক্ত জাতি নিচয়ের এই সমবেত সমষ্টিভূক্ত ও এক জাতীয় একতা যুক্ত, জাতীয় অনুষ্ঠান, যতই ক্ষীণ, যতই ক্ষুদ্র, যতই অঙ্গহীন, অপূর্ণ ও অশেষ অভাব পূর্ণ হউক না কেন, ইহার সাধারণ ক্রিয়ায় ও প্রক্রিয়ায়, আমাদের ভারতীয় কঙ্গ্রেসের কোন অধিবেশনেই, কখনও অশিষ্টতা বা অসংযততার, অধিরতার বা অভব্যতার বিসদৃশ ও বিরক্তিকর দৃশ্য সংঘটিত হয় নাই। এরূপ বৃহৎ সমাগমের, ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষী ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মী বহুজন সমবেত সভার কার্য্য নিচয় এতাদৃশ শান্ত, শৃঙ্খলা—সংযম—শিষ্টাচার সমন্বিত ভাবে সমাধা হইতে, প্রায় খুব কমই শুনা যাইয়া থাকে। অন্ততঃ এই একটী বিষয়েও আমাদের এই জাতীয় মহাসমিতি অপরাপরের আদর্শ স্থল, স্বাধীন ও শৌর্য্য-বীর্য্যবন্ত য়ুরোপীয় সভাসমতি নিচয়েরও দ্রষ্টব্য দ্রব্য।

বিপক্ষ বর্গের ত কথাই নাই,—কঙ্গ্রেস-বিদ্বেষী ত বলেনই,—বলিবেনই; কিন্তু যাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে কঙ্গ্রেসের বিপক্ষ-সপক্ষ কোন পক্ষেরই পক্ষাবলম্বী নহেন, এমন অল্পাধিক পরিমাণে নিজপক্ষ বা নিরপেক্ষ, কোন কোনও শ্রেণীস্থ লোকের মৌখিক ও লিপিবদ্ধ সমালোচনায়, (বলা আবশ্যক এই সব লোক নেহাত নির্ব্বোধ নহেন ও সংখ্যার হিসাবে স্বল্প ও নগন্য) অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে সাধারণতঃ এই একটা খুব অবাধ অথচ অল্পাধিক পরিমাণে অনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ অবগত হওয়া যায় যে, কঙ্গ্রেস এই ষোল বৎসর ব্যাপিয়া, যাহা কিছু করিয়াছেন এবং এখন বৎসরে বৎসরে, সেই বিগতকেই পুনঃ সংঘটিত করিয়া, যে ব্যাপার করিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে তাদৃশ কোন ইষ্টই ত দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে রাজ দ্বারে এবং কর্ত্তৃত্ব প্রভুত্ব প্রভাবিত রাজপুরুষ নিচয়ের নিকটে, প্রত্যক্ষে বা পরক্ষে আমাদের বরং শাফ্ অনিষ্টই হইতেছে।—জমিদার তালুকদার বা তদনুরূপ রূপেয়াদার ও শক্তিধর শ্রেণীস্থ লোকদের সন্দেহ ও শঙ্কা বাড়িয়াছে, তাঁরা অনেকেই, পূর্ণ মাত্রায় কঙ্গ্রেস-নির্ম্মুক্ত এবং কেহ কেহ প্রচ্ছন্নভাবে কঙ্গ্রেস ভুক্ত থাকিয়াও আঁধার দেখিতেছেন; সন্দেহ শঙ্কার সর্ষপ পুষ্প সদাই তাঁদের নয়ন সমক্ষে প্রস্ফুটিত হইতেছে। পরন্তু,চাকুরীর উমেদারগণের চাকুরী হইতেছে না। এবং বহাল চাকুরেরা কর্ত্তা সাহেবদের বিষনয়নে পড়িয়া, চাকুরী বাঁচান ও চাবুক এড়ান, উভয় দিকেই শঙ্কটাপন্ন হইয়াছেন। কঙ্গ্রেস কর্ত্তৃক রাজদ্বারে, দেশের অপরাপর অনেক অপ্রকাশ্য লঘু গুরু অনিষ্টের সংঘটনের মধ্যে, জমিদার দলন ও কেরাণী পীড়ন, এই দুইটা অনিষ্ঠ, নিতাই বেশি বেশি ফুটিয়া উঠিতেছে, এবং দণ্ডে দণ্ডে ডাগর হইয়া দাঁড়াইতেছে। পক্ষান্তরে, কঙ্গ্রেসী গণ, কঙ্গ্রেস করিয়া এই দরিদ্র দেশের লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় ও অপব্যয় করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে আপনাদের মানসিক শক্তি সামর্থের অনর্থক ক্ষয় করিতেছেন। ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে, কঙ্গ্রেসের বিরুদ্ধে, আর অনেকানেক অভিযোগ বরং অল্পাধিক যুক্তিযুক্ত, ও বিশ্লেষণ ও বিচারের যোগ্য এবং তাহাদের কোন কোনও অভিযোগ প্রকৃত পক্ষেই, কঙ্গ্রেসের প্রতি প্রযোয্য এবং কঙ্গ্রেসের যথার্থ অপরাধের পরিচায়ক হইলেও, উপরিউক্ত অভিযোগ দুইটার একটা অর্থাৎ প্রথমটা, এতই অসার, অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রকৃত এবং উহা পূর্ণ বয়স্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধিমান ও অল্পাধি খ্যাতি-প্রতিপত্তি যুক্ত বৈষয়িক লোক ও লেখকগণের প্রকৃত বা আরোপিত উক্তি বলিয়া পরিচিত হইলেও, এতাধিক বালক-বিনিন্দী অনভিজ্ঞতায় পূর্ণ এবং অন্তর্দৃষ্টির অভাব জ্ঞাপক যে, উহা পরীক্ষা ও প্রতিবাদ উভয়েরই অযোগ্য; উপেক্ষাই উহার এক মাত্র প্রাপ্য। উহার অসারতার আলোচনায় অবশ্য কিছু কৌতুক ও হাস্য রসের অবতারণা ও উদ্দীপনা হইতে পারে; কিন্তু তজ্জন্য অনাবশ্যক আরও কতকটা স্থান গ্রহণ-করিতে উৎসুক নহি।

তবে দ্বিতীয় অভিযোগটী একটু পরীক্ষা করিলেও চলে। ইহা সর্ব্বথা পরীক্ষণীয়ই বটে, কিন্তু সম্যক বিশ্লেষণ ও বিচারের স্থল এখানে হইবে না। স্বতন্ত্র ভাবে, বিশেষ সমালোচনার তীক্ষ্ণ ও সন্নিকট দৃষ্টি নিক্ষেপে, ব্যয় "আইটেম" নিচয়ের অঙ্কপাত করিয়া, রীতিমত গণনা ও বিষয়ের অভ্যন্তরস্পর্শী আলোচনা দ্বারাই তাহা সম্ভাব্য; তাহাতে হিসাবের অঙ্ক আবশ্যক, অজ্ঞাত ও অনির্দ্দিষ্ট উপাদানের উপর বা উপাদান-বিহীনতার উপর নির্ভর করিয়া, এবিষয়ে কোনও একটা "ঢালোয়া" কথা বলা চলে না;—বলা ভালও শুনায় না, আর বলাও বৃথা। সংক্ষেপে, কয়েকটী কথায় আমরা এই সারবান ও যৌক্তিক অভিযোগটা অতিক্রম করিয়া যাইতেছি।

ব্যয় ভিন্ন, সংসারের অতি তুচ্ছ ও সামান্য কার্য্যও সম্পন্ন হয় না। কংগ্রেসের মত বৃহৎ ব্যাপারে ব্যয়, বহু ব্যয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী—অনিবার্য্য। তবে কিনা, কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের বহিরঙ্গ গঠনে ও অঙ্গরাগের প্রসাধনে, যে অর্থরাশি ব্যয় হইতেছে, পরন্তু আরও অনেকানেক অবাস্তব অস্থায়ী ও অল্পে-হলে ও-চলে এমন সকল বিষয়ে যে ব্যয়, শুনিয়াছি, সে ব্যয়ও নাকি প্রভূত হইয়া থাকে; তাহা অপেক্ষা অন্ততঃ পাঁচ সাতগুণ কম হইয়া, উদ্বৃত্ত টাকা, উদ্দিষ্ট কার্য্যের উদ্ধারার্থে একান্ত আবশ্যকীয়, এবং একাল পর্য্যন্ত অল্পাধিক উপেক্ষিত বা একেবারেই বিস্মৃত, বিষয়নিচয়ে ব্যয়িত হইলেই উপযুক্ত হইত এবং প্রকৃত কার্য্য অধিকতর অগ্রসর হইতে পারিত। দরিদ্রা, চিরদুঃখিনী বিধবা মাতার সন্ততিগণের, বর্ণ বৈচিত্র্যে ও বহিঃ চাকচৌক্যে, বাহ্যাড়ম্বর বা বিলাসকলার কিছুমাত্র সংস্পৃষ্ট বিষয়ে বহু ব্যয়ের প্রয়োজন কি?—সে ত কেবল অপব্যয় নয়, অতীব বিসদৃশ ও বৈরিগণের বিদ্রূপোত্তেজক ব্যয়। যে পরিমাণ ব্যয়ে জননীর সম্ভ্রম রক্ষা হয়, তাহাই প্রচুর।

তত্রাচ, এই ব্যয়ের সপক্ষে, গুটি দুই তিন সাংসারিক ও সামাজিক সামান্য কথা, এবং কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্যগত একটী উচ্চতর কথা অসঙ্কোচে উপস্থিত করা যাইতে পারে। প্রতি বৎসর কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশন, উহার অন্তর্নিহিত সারগর্ভ মুখ্য কার্য্য সাধনা, স্বভাবতই, কিয়ৎ পরিমাণে সামাজিক অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দাঁড়াইবারই কথা। এক এক বৎসর এক এক প্রদেশের এক একটী স্থানে বহু প্রদেশের, বহুতর বিভাগের এবং উপবিভাগের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক-প্রতিনিধি,—অতি সম্ভ্রান্ত অতি উচ্চ পদস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি কংগ্রেসের ব্যবস্থানুসারে, আহূত ও আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হন; এবং ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৩।৪ দিন মাত্র, অর্থাৎ কার্য্য সমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত, তথায় অবস্থিতি করেন। এই ক'টী দিন তাঁহাদিগকে যথাবিহিত আদর আহ্বান করা, সম্মান সৎকার করা, তাঁহাদের আহার, শয়ন, উপবেশন, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা, কেবল সাধারণ সামাজিক কর্ত্তব্য নহে,—উহা মনুষ্য-স্বভাব-প্রণোদিত অনিবার্য্য ক্রিয়া। স্বদেশে সমাগত বিদেশীয়দিগকে বিশেষতঃ স্বদেশে আমন্ত্রিত বিদেশীয় বন্ধু বান্ধবদিগকে, একই ব্রতে বদ্ধ, একই সাধারণ কার্য্যসূত্রে সংযুক্ত সুহৃদবৃন্দকে, কিরূপে আদর যত্ন করিলে, কোথায় কোন্ সুখাসনে বসাইয়া সৎকার সম্মান করিলে, বাসনা মিটে, বহু ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া, বুকের উপর রাখিয়াও অতৃপ্ত আতিথ্য, অনুষ্ঠানের তৃপ্তি হয় না, ইহা সহৃদয় সামাজিক ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। পরন্তু, অপরাপর প্রদেশ হইতে, অপর্য্যাপ্ত আতিথ্যের আদর অভ্যর্থনা উপভোগ করিয়া আসিয়া, তাহার প্রতিদান করার স্পৃহাও স্বাভাবিক! অপিচ, আপন আপন প্রাদেশিক নগরের সম্ভ্রান্ততা,—এমনকি এক মাত্রা অধিক গৌরব গরিমা প্রদর্শন করার প্রবৃত্তি ত মনুষ্য-স্বভাবোচিতই বটে। অতএব, ঐ সকল বিষয়ের ব্যয় বরাদ্দ করিবার সময়ে, অর্থ-নীতির নিয়ম, স্বভাবতই মনে পড়ে না, দুঃখ দরিদ্রতার প্রতিও দৃষ্টি যায় না, আতিথ্য সম্পাদন ও স্বস্থানের সম্মান সংরক্ষণের প্রবৃত্তি, প্রবল হইয়া, 'এষ্টিমেট' ফর্দ্দের অঙ্ক অবাধে স্ফীত করিয়া তুলে। এ কথাটা নিজের নিজের উপর খাটাইলে, সামঞ্জস্যই বুঝা যায়। যে দেশের অতি দরিদ্রও মাতৃ-পুণ্যার্থে, বাস্তুভিটা বাঁধা দিয়া, "দানসাগর" করিতে চাহে, বা যে দেশের নিস্বঃ লোকে ভিক্ষা দ্রব্য আনিয়া, দুর্গোৎসব করে, সে দেশের লোককে এ কথাটা নিশ্চয়ই বুঝাইতে হইবে না। অতএব, ইহা কিছুই বিচিত্র নয় যে বক্ষ্যমান বিষয়ে ব্যয়াধিক্য হয়।

তবুও প্রকৃত ও পুরা অতিথি সৎকার হয় কি? আমাদের হিন্দু হিসাবে, তাহার কিছুই হয় না। কোনও আশ্রম ধর্ম্মী ও সমাজ-ধর্ম্মের স্বধর্ম্মানুসারে তাহা বোধ হয়, হয় না, ইহাই বড় আক্ষেপ। কংগ্রেস অধিবেশনে, অভ্যাগত প্রাদেশিক প্রতিনিধি ও ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেটগণের নিকট হইতে, তাঁহাদের আহারের ব্যয় গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যুগধর্ম্মে ইহা যাহাই হউক, আমাদের সমাজ-প্রচলিত প্রথানুসারে, ইহা কখনও হইতে পারিত না। আমরা অভ্যাগত ডেলিগেটদিগকে, বরং সামান্য কম্বলাসনে বসাইয়া কয়েকদিন, যৎকিঞ্চিৎ শাকান্নও খাইতাম; তথাচ আগন্তুকের আহার্য্য ও পেয় যোগাইয়া, কখনও তাহার মূল্য গ্রহণ করিতাম না। তাহা আশ্রম ধর্ম্ম, সমাজ ধর্ম্ম, সদাচার ও মনুষ্য স্বভাবের বিরোধী। চক্ষু লজ্জার ত কথাই নাই। হইলই-না-হয়, তাঁহারা আসিয়াছেন, সাধারণ র্য্যে, আসিয়াছেন ত আমাদের আশ্রমে। আমরা কোন্ খে, হোটেলওলার মত অম্লান বদনে, খোরাকির কয়েকটী করিয়া মুদ্রা গ্রহণ করি!

কংগ্রেস, সবই বিলাতি কেতায় করিতেছেন। কাযেই এটাও করিতেছেন। কিন্তু ইহা এ দেশের প্রথা নয়। মনে হয় স্বদেশীয় প্রথা সবই আগা গোড়া বাদ দেওয়াতেই, কংগ্রেস আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, এখন মনে কর যে স্বদেশী সাবেক প্রথানুসারে, ডেলিগেটদিগকে, যদি আহার দিতে হইত,—সত্য সত্য কিছু আর শাকান্ন দেওয়া যাইত না; যিনি যেমন ব্যক্তি, যিনি যে প্রণালীর আহার্য্যে অভ্যস্ত, তাঁহাকে তাহাই দিতে হইত এবং তাহাতে এখন অপেক্ষা আরও কত অধিক ব্যয় হইত, বিবেচনা কর।

তা, যতই ব্যয় হউক, কঙ্গ্রেসের তাহাই করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহাতে সাধারণ-তহবিল ক্ষয় হইত না, নিশ্চয়ই বর্দ্ধিত হইতে থাকিত। কিরূপে, এখনি অঙ্কপাত করিয়া ও প্রচুর নজির ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়া, দেখাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু, তাহার প্রয়োজন দেখিতেছিনা। ফলতঃ কঙ্গ্রেসকে, কোনও কথা কর্ণে শুনাইবার, যদি আমাদের কিছুমাত্র অধিকার থাকিত, তাহা হইলে উহার পরিচালকবৃন্দের নিকট, অন্ততঃ উহার বঙ্গীয় কর্ত্তৃপক্ষের কাছে, ডেলিগেট দিগের আহ্বান সম্বন্ধে, প্রচলিত বিদেশীয় ও বিসদৃশ প্রথা পরিবর্ত্তিত করিয়া, তাহার স্থলে স্বদেশ সনাতন রীতি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সানুনয় প্রার্থনা করিতাম। এবং তজ্জন্য প্রকৃত পক্ষে, ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিতে হইলেও আমরা তাহাতে অসম্মত হইতাম না সর্ব্বাগ্রেই ঝুলিস্কন্ধে ঝুলাইতাম। এক কথায়, এখন এই "রিসেফ্সনের" ব্যবস্থাটা, যে মিশ্রিত প্রণালীতে, হওয়ার কথা শুনিয়াছি, তাহা অর্থনীতি ও সমাজ নীতি, উভয়ের কাহারও পুরা অনুমোদিত বলিয়া মনে হয় না; কারণ দুয়ের কেহই পুরাপুরি ভাবে উহার মধ্যে নাই।

অতঃপর, এসম্বন্ধে কঙ্গ্রেসের সমর্থক আর একটা সামান্য কথা এই যে, উহার বার্ষিক অধিবেশনে, সন সন যে ব্যয়টা হইয়া থাকে, সে টাকাটা সবই, কংগ্রেসের অধ্যক্ষ পরিচালকবৃন্দ ও প্রাদেশিক পৃষ্ঠ-পোষকগণ পরস্পরের মধ্যে স্বতঃ পরতঃ সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ সমগ্র দেশ হইতে, অর্থ উঠেনা, উঠাইবার উপযুক্ত তেমন উপায় ও চেষ্টাকরা হয়না। সমগ্র দেশ হইতে অর্থ উঠিলে কি রক্ষা থাকিত? এতদিন সর্বদিকে, "সামাল সামাল" শব্দ উঠিত। কংগ্রেসীগণ তাহার কোনও পথ করিতে পারেন নাই, সেই খানেই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান ক্রটি। এখন তাঁরা আপনাদেরই টাকা আপনারা খরচ করিতেছেন, তাহাতে অপরের কথা কহিবার অধিকার কি? আমরা শ্রমজীবী সামান্য রায়ত, তাহাতে একেবারেই কোন কথা কহিতে পারি না। জমিদারেরা প্রকাশ্যে ও গোপনে এখন যে টাকাটা, এ তহবিলে দেন, টাকাটা নেহাত কমও না হইতে পারে,—সে টাকাটা অবশ্য রায়তেরই টাকা বটে; রায়তের ঘরে রায়তের গা-ঘামান কড়ি বই, তাহা আর কিছুই নয়। তথাচ রায়ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে টাকা দেয় না। সে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, সবই দিয়া থাকে জমিদার বাবুদিগকে। কাযেই সব ব্যাপারেই সে নির্ব্বাক। বোঝেই না কিছু, তা আর বলিবে কি! বোঝাই বহিয়া মরে, কিছুই বোঝে না। কংগ্রেস যদি কখনও সেই অবোধকে বুঝাইতে পারেন, সেই অবাকের মুখে বাক্য দিতে পারেন, রায়তের বিন্দু বিন্দু রক্তেযদি কঙ্গ্রেসের দেহ কখনও পুষ্ট হয়, তখনি জানা যাইবে যে, কঙ্গ্রেস এ দেশে টিকিয়াছে ও তাহার উদ্দেশ্য সাধনের শক্তি সামর্থ্য সঞ্চয় করিয়াছে। সে আশা এখন "আকাশ কুসুম।" আকাশ-কুসুমকে

সেল পুষ্পে পরিণত করিতে সম্ভবতঃ আমাদের খনকার এই কঙ্গ্রেস—এই শীতল কোমল "কুসুম কঙ্গ্রেস" পারিবেন না। তজ্জন্য "কুঠার কঙ্গ্রেস" আসিবে। কুসুম, কালে "ক্রিষ্টালাইজড্" হইয়া লৌহ হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব হইতেও পাবে যে, এই কুসুম কংগ্রেস" কুঠার কংগ্রেস" কে উত্থিত করিয়া, ও তাহাকে স্বকীয় আসন দিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করিবে।

বলা বাহুল্য, তবুও খুলিয়া বলা ভাল যে, এই কয়টা কথা একটু "আলঙ্কারিক" ও এক বিন্দু আবৃত হইলেও, তাহার একটা কথাও "আন্‌কনষ্টিটিউসনল" ও "আনকোর-টিউস" নয়। যে "ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন" উপস্থিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য এবং যাহার সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধি, এ-স্থলে কল্পিত ও উত্থান সম্ভাব্য ভবিষ্য কংগ্রেসের করণীয় কার্য্য বলিয়া অনুমিত, তাহা আধুনিক য়ুরোপীয় রাজ-বিধির বিরোধী নয়; প্রত্যুত তাহা আধুনিক য়ুরোপীয় হিসাবেই "ইম্পিরিয়ালিজমের" আবশ্য-কীয় একটী অঙ্গেরই মধ্যে। পরন্তু সেরূপ "ডেমোক্রেসী" এক দিকে এ দেশের পুরুষ পরম্পরাগত ও স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত ও নানা সময়ে নানা, আকারে পরিবর্ত্তিত, পুরাতন ও পলিত গলিত "আরিষ্টোক্রেসির" দুর্জ্জয় ও দুর্গন্ধময় আবহাওয়ায়, এবং অপর দিকে, এ দেশীয় সামাজিক ও বৈষয়িক বদ্ধমূল দাসত্বের ও দাসত্বের জ্ঞানান্ধ-তার গাঢ় অন্ধকারে, উদ্ভব হওয়া অসম্ভব। প্রাচ ভূমির এই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও শোধন আলোক বিন্দু বিবর্জ্জিত অন্ধকার রাশি, সমূলে উৎপাটন করিয়া, তথায় পাশ্চাত্য প্রজাশক্তির সতেজ শোণিত সঞ্চার করা সহজ-সাধ্য হইবে না; তাহার জন্য কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে। ইহাই ঐ কয়টা কথার অর্থ।

ব্যয় সম্বন্ধে শেষ সামান্য কথাটা এই যে, রঙ তামাসা নাচ মুজরা, ও মজলিস মফেলে এবং তদনুরূপ ও তাহারও অপেক্ষা সামান্য ও জঘন্য অকিঞ্চিৎকর ও হেয় ব্যাপারে, ঐশ্বর্য্যশালী ও ইদানী মধ্যবৃত্তবর্গেরও কত অর্থ উড়িয়া যাইতেছে। এক "বারইয়ারী"তেই প্রতি বৎসর কত কত লক্ষ বিনা বাক্য-ব্যয়ে বারির মত ব্যয় হইয়া যায়। শাফ অমিতাচার ব্যসন ও ব্যভিচারে, এই নগরে, নিত্য রজনীতে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ধ্বংস হইয়া শত শত শরীর ও আত্মার ধ্বংস হইয়া থাকে। নিত্য নিয়মিত ভাবে, এই অর্থরাশি অদৃশ্য হইয়া যায়। পরন্তু, নৈমিত্তিক নৈশ অনাচারের অপব্যয়ে, এই সহরেই, কত কত লক্ষ রাজপথের গ্যাসের বাতি না নিবিতে নিবিতেই গলিয়া যায়, তাহা ও গণনাতীত। এই সব অপব্যয় অপচয়ের—এই সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় পর্ব্বত অনিবার্য্য, অপরিমিত বর্দ্ধিত ও স্ফীত; দেদীপ্যমান সকলেরই সমক্ষে দণ্ডায়মান। পুরোহিত, পাদরী, ধর্ম্ম-যাজক, নীতি শিক্ষক, সমাজ সংস্কারকাদি থাকিতে হয় আছেন; উহারা যেমন আছে, ইঁহারাও তেমনি আছেন। ইঁহাদের অস্তিত্বে; উহাদের অস্তিত্বের ও উন্নতির এক বিন্দুও ব্যাঘাত হয় নাই। ইঁহাদের অস্তিত্ব উহারা একেবারেই আমলে আনে না, গণনার মধ্যেই গ্রহণ করে না; কিন্তু, উহাদের অস্তিত্বহেতু, বরং ইঁহারা বাঁচিয়া আছেন ও বর্দ্ধিত হইতেছেন। কই কখনও ত আমাদের কোন অর্থনৈতিক ও সাধারণের সুখ দুঃখের সমালোচক ও দেশের আয় ব্যয় ব্যবস্থার পরিদর্শক, ঐ সকল নিত্য নৈমিত্তিক অমিতাচার-জনিত অপরিসীম অপব্যয়ের বিরুদ্ধে বাঙনিষ্পত্তি করেন না। দেশের দুর্ভিক্ষ দরিদ্রতা, দুর্গতি, কই কখনও তো, উহাদের সুপ্রসর রাজ-পথ, এক মুহূর্ত্ত কালও আটকাইয়া দাঁড়ায় না। অথচ ঐ অপব্যয়গুলা কিছু আর নেহাত বনের পশুতে করে না। প্রধানতঃ সমাজের ঐশ্বর্য্যশালী, মান্য গণ্য বড় বড় লোকে-রাই করেন। আর তাঁহাদের স্ব স্ব শ্রম-লব্ধ অর্থও তো উহা নহে। অপরের শোণিত মেদ অস্থিতে গঠিত লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ, তাঁহারা যথেচ্ছাচারে, জলবৎ প্রবাহিত করিয়া দিয়া, পুনঃ অন্নক্লিষ্ট শ্রমেরই শোণিত মোক্ষণে জলৌকা প্রয়োগ করেন! জলৌকা মুখে মোক্ষণ ও যথেচ্ছাচার-সুখে ব্যয়ভূষণ উভয় প্রক্রিয়াই যুগপৎ চলিতেছে। অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সব নীতিই, এ ক্ষেত্রে নির্ব্বাক। অনিবৃত্ত অনিবার্য্য বলিয়াও নির্ব্বাক, আরও নানা কারণে নির্ব্বাক। সর্ব্বোপরি, উহা নিবারণ বা ছেদনের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নূতন হাতিয়ারেরও প্রয়োজন, যে হাতিয়ার গঠন-সাপেক্ষ, তাহা এ দেশ প্রচলিত অতীত ও বর্ত্তমান কোন নীতিতেই নাই। কাযেই নীতি বা নৈতিকগণ নির্ব্বাক। বরং পুরোহিত প্রভৃতি পাপ দুর্গের মামুলী প্রহরী বা পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে, বাক্য স্ফূর্ত্তি সমালোচকদের মুখে হয়,

কিন্তু দৃঢ় দুর্গস্থিত সেই নির্ব্বিঘ্ন দ্রব্যনিচয়,—অমিতাচার, ঐশ্বর্য্যের অপচার, সাধারণ ভাণ্ডারের কোটী কোটী স্বর্ণের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে, কে কথা কহিবে! কাহার এত স্পর্দ্ধা! আর উহাদের আর সবই ত আর অপ্রকাশ্য ও নীতি অননুমোদিত নয়।

উপরে আমরা যে কয়টা অপব্যয়ের "হেড" দিয়াছি, সকলেই জানেন, তাহার দুই একটা মাত্র কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন, কি না open secrets আর অবশিষ্ট সব কয়টীই পুরাতন ও নূতন সামাজিক আচার ব্যবহারে ও প্রচলিত নীতি অনুমোদিত ও তাহাদের দ্বারা সদা সমর্থিত হইয়া থাকে। যে কোন সময়ে, কোনও একটী দেবপ্রতিমা দালানে বা ময়দানে খাড়া করিয়া, তাঁহার সমক্ষে বা উদ্দেশে অসমক্ষে, যাহা খুসি কর, যত পার লুট ও লুটাও সব মঞ্জুর। সম্বন্ধ সাধারণের হইলে, "বারইয়ারী"। বশ্ নিশ্চিন্ত। কার বাপের সাধ্য কথা কয়। 'বারইয়ারী' একে. দায়ে দেব-কার্য্য। দুনিয়ার যত কিছু দুর্গন্ধ আছে, বারইয়ারী তলায় তাহা সবই অবাধ বিধেয়, সবই সুগন্ধ অপব্যয়ের অঙ্ক যতই ভাবি, ততই বেশি বাহাদুরী। পরন্তু, ব্যাপার যদি বড় ছোট বা মধ্যবৃত্ত বাবু বাড়ীতে হইল, তবে তাহা ব্যক্তিগত বৈভবের বিশেষ অনুষ্ঠান অতএব বাসন কেবল মঞ্জুর নয়, যশস্কর। পীঠ-বস্ত্র,—যৎসামান্য ব্যয়ে, অল্পাধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালীকে, কিছু কিছু আহার্য্য ও দুই চারিটা করিয়া পয়সা বিতরণ। ইহাতেই সর্ব্বপাপক্ষয়। কিন্তু, এই "পাপক্ষয় কর" পদার্থত্রয়,—দেব প্রতিমা, বামুন ও কাঙালীও, ক্রমে "ইজেষ্ট" হইতে বসিয়াছে। এসব আবরণ-দান অনুষ্ঠান এখন না হইলেও চলে। বিশেষতঃ বাগান পার্ট ও সাহেবি-আনা, গায়রহে কিছুই লাগেনা।

সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ সাহেব শুবারাও এসব সৎকীর্ত্তি-ক্ষেত্রে শুভাগমন করিয়া ও কৃতী-গণের মুরুব্বি হইয়া, তাহাদের পুরুষার্থের প্রসার ও পরামার্থের ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া থাকেন। অমিতাচারে অপব্যয়ের আর অধিক কি সাপোর্ট ও সার্টিফিকেট চাই? কিন্তু, এসব হইল মঞ্জুরি ও মিশনরি "আইটেমস"। ইহাতে লুকোচুরি কিছুই নাই। লুকোচুরি যাহাতে কিছু কিছু এতকাল ছিল, সভ্যতা ও সরলতার উন্নতিতে; তাহা হইতেও সে "লুকাচুরি" এখন শাফ সরিয়া দাঁড়াইয়া, তাহাকে দিব্য দিবালোকে দীপ্যমান ও দর্শনীয় হইয়া সদর্পে আত্ম-স্বরূপ প্রচার করিবার অবসর দিতেছে। ইহাদের সমর্থ মুখপত্র, লিপি-কুশল অসংখ্য সমর্থক ও কল্পা প্রিয় প্রতিপালক ও "পেট্রন" গণ-দেখা-দিয়াছেন, এবং অনপেক্ষনীয় প্রভাবে ইহাদের পক্ষ সমর্থন ও পুষ্টি সাধন করিতেছেন।

সভ্যতার এই সদ্য অভিব্যক্ত অভিনব "স্পীরিট" কে কঙ্গ্রেসের স্পীরিট কি বলিবেন? শেষে ইতিহাসে ত উঠিবে না যে, তাঁহারা একত্রে একই জাহাজ হইতে নামিয়াছিলেন।

এখন কথাটা এই যে, প্রতিবৎসর এই সকল "আইটেমে" যদি সমগ্র ভারতবর্ষে পাঁচসাত ক্রোর করিয়া টাকা বিনা বাক্যব্যয়ে মঞ্জুর করা যায়, তবে বৎসরে কঙ্গ্রেসের একটা অধিবেশন ও কনফারেন্স কয়েকটার এক একটা করিয়া অধিবেশনে, মোট ৭০।৭৫ হাজার টাকা বড়জোর লাগে, এত খানেক টাকা কি খুবই বেশি! তবুও আমরা বলি এবং কঙ্গ্রেসীগণেরও বোধহয় সকলেরই ইচ্ছা যে, ইহা অপেক্ষা আরও কমব্যয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। যাউক এসব অতি তুচ্ছ ও অবান্তর কথা, যদিও তাহা বলিতে বলিতে স্থান ও সময় অবসান হইয়া আসিয়াছে।

কঙ্গ্রেসের বহু বহু লক্ষ্য, কর্ত্তব্য ও মন্তব্যের মূল ও বহু ভাষ্য হইতে 'সার সঙ্কলন' করিয়া, এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র লেখক—আমরা মোটের উপর উহার দুইটী সর্ব্ববিষয়-ব্যাপী উদ্দেশ্য বুঝিয়া, তাহারই সাধন কল্পে কঙ্গ্রেসের কৃতকার্য্যের ও অকৃত কার্য্যের পরিমাণের একটা 'সরদর' স্থূল হিসাব করিয়া থাকি। আমাদের এই একটা "ঘরোয় হিসাব" এই ষোলবৎসর যাবৎ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই, করিয়া আসিতেছি। কেন? ঠিক বলিতে পারিনা। কঙ্গ্রেস বা কঙ্গ্রেসের কোনও বিশেষ নিকটবর্ত্তী লোকের সহিত কোনও সম্বন্ধ সংস্রব আমাদের নাই;—আমরা সকল দিকেই প্রকৃতই তাহার অযোগ্য। কিন্তু, কঙ্গ্রেস হওয়ার দিন হইতে, আমাদের তখনকার সেই তরুণ-চিত্তের সতৃষ্ণ কল্পনায়, কেমনই একটা অনির্দ্দিষ্ট, অবক্তব্য, সুমধুর কুহক মোহের মহা-রাজ্যস্থিত, অদ্ভুত—পূর্ণভাব আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, যাহা, একাদিক্রমে এই ষোল বৎসর কাল কঙ্গ্রেসকে, উহার অস্তিত্বের ও অবস্থার অপরিচ্ছিন্ন [illegible]